

পতঞ্জলি শ্রুত ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

সম্পাদিত

বঙ্গানুবাদ বিয়তি ও পাদটীকা-সমন্বিত

অনুবাদক ও সম্পাদক

দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম

কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

প্রকাশক :—

দণ্ডিহামী দামোদর আশ্রম

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণসঙ্ঘ

আত্মাপীঠ, কলিকাতা— ৭৬

প্রাপ্তিস্থান

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

২৮ নং বিধান সরণি, কলিকাতা ৭০০১০৬

২। আত্মাপীঠ

মুদ্রণ :—

শ্রীঅরুণ রায়

শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৫৪।১বি আমপুহুর ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০০৪

বিষয়সূচিকা

	পৃষ্ঠা
ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রয়োজন	১—৫৬
ব্যাকরণাধ্যয়নের আবশ্যিক প্রয়োজন	৫৭—১৩৭
শব্দানুশাসনের কর্তব্যতা	১৩৮—১৪৭
শব্দোপদেশের কর্তব্যতার প্রকার	১৪৮—১৬২
পদের অর্থ	১৬৩—১৬৭
শব্দের নিত্যত্ব ও কার্বত্ব	১৬৮—১৭০
শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব	১৭১—১৮৬
জাতি ও ব্যক্তির পদার্থত্ব	১৮৭—২০১
অনাদি ব্যবহার দ্বারা শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যতা	২০১—২০৬
ব্যাকরণশাস্ত্রে ধর্মনিয়ম	২০৭—২১৮
শব্দের অপ্রযুক্তত্বের আক্ষেপ ও সমাধান	২১৯—২৩৩
শব্দের জ্ঞান ও প্রয়োগের ধর্মজনকতা	২৩৪—২৫১
ব্যাকরণশব্দের অর্থ	২৫১—২৬৩
বর্ণোপদেশের প্রয়োজন	২৬৩—২৭১

উপক্রমণিকা

অগদগুনবরত্নমালাস্তব, বতিসার্বভৌমোপহার, বালমনোদ্যমা, নটরাজস্তব, নটেশবিজয়, পাতঞ্জলবিজয় পুণ্যশ্লোকমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ জানা যায়। প্রাচীন কালে ‘পণী’ নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি ‘পাণিনি’ নামক এক পুত্রলাভ করেন। পণী মুনি তাঁর পুত্র ‘পাণিনিকে’ দক্ষের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। কালক্রমে দাক্ষীর গর্ভে পাণিনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রের নাম হয় পাণিনি। তিনি কার্তিকেব মত রূপবান ছিলেন। পাণিনি কঠোর তপস্চরণ করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে নিজ হস্তে স্তম্ভিত ভীমরূতে চতুর্দশবার দণ্ডাঘাত করেন। পাণিনি মুনি শব্দসমূহের ব্যাকরণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। মহাদেবের চতুর্দশবার ভীমরূপে জনিত ১৪টি সূত্রে তিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের আদিসূত্র করে মহাদেবের অমৃতগ্রহে তাৎকে সূত্রসমূহ রচনা পূর্বক শব্দ সমূহের ব্যাকরণ করলেন। তারপর কাত্যায়ন মুনি মহাদেবের কঠোর তপস্যা করে পাণিনি সূত্রের পদার্থের বোধকরূপে বার্তিকগ্রন্থ রচনা করেন। কোন একসময়ে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁর শয়্যারূপী শেষ নাগকে [অনন্ত নাগ] বলেন আমি একবার মহাদেবের নৃত্য দর্শন করেছিলাম; সেই নৃত্য স্মরণ করে আমার পঞ্চম আনন্দ হচ্ছে, আনন্দে আমার শরীরের ভার অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, তুমি আমাকে বহন করছ, তোমাত খুব কষ্ট হয়েছে। আর তুমি দীর্ঘ কাল আমাকে বহন করেছ, তুমি মহাদেবের নৃত্যদর্শন কর, তোমার পুত্র তখন আমাকে বহন করবে। তুমি তপস্তা কর, তপস্তায় সন্তুষ্ট হলে মহাদেব তোমাকে দর্শন দিবেন এবং তাঁর নৃত্য তোমাকে দর্শন করাবেন। আর তুমি পাণিনি সূত্রের দুই বার্তিকের উপর ভাষ্যরচনা কর। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়েই তোমাকে ভাষ্যরচনায় নিযুক্ত করবেন। এইভাবে ভগবানের কথায় আনন্দিত হয়ে কণিপতি মহাদেবের নৃত্য দর্শন, মানসে এবং তাঁর নিয়োগ পাবার অভিপ্রায়ে পৃথিবীতে নিজের অবতরণের ষোণ্য মুনিবংশ অবস্থান করতে লাগলেন। তখন পৃথিবীতে গোণিকা নাম্নী অতি গুণবতী

এক রমণী পুত্রের প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দ্বারক তপস্তায় কালাতিবাহন করছিলেন । একদিন সেই রমণী সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিবার জন্য অঞ্জলি পুটে পবিত্র জল গ্রহণ করে চক্ষুঃ নিম্নীলনপূর্বক আদিত্যের ধ্যান করতে লাগলেন ; মনে মনে আদিত্যের নিকট প্রার্থনা করলেন—‘হে আদিত্যদেব ! আমাকে বিদ্বান্ পুত্র প্রদান করুন ।’ তখন আদিত্যের আদেশে নিযুক্ত হয়ে ফণিপতি সেই রমণীর অঞ্জলি জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন । তারপর যখন সেই ‘গোণিকা’ রমণী সূর্যের উদ্দেশ্যে অঞ্জলির জল নিঃক্ষেপ করলেন তখন সেই জল থেকে ফণিপতি তপস্বীর আকৃতিরূপে পতিত হলেন । তখন গোণিকাদেবী আনন্দিতা হয়ে, আমার গুণ্যের ফলে অগ্নির মত তেজস্বী আমার পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছে বলে পুত্রের মন্তক আশীর্বাদ করলেন । পুত্র জননীকে প্রণাম কবলেন, প্রণাম করার সময় জননী ‘অঞ্জলি থেকে পতিত হয়েছে’ বলে পুত্রের নাম পতঞ্জলি রাখলেন এবং পুত্রকে সেই নাম শুনিয়া দিলেন । পুত্র পতঞ্জলি জননীকে প্রণাম করে বললেন—মা—আমি আপনার নিকট আসব, এখন তপস্তায় যাচ্ছি । এই বলে পুত্র তপস্তায় জন্তু চলে গেলেন এবং দুষ্কর তপস্তা করতে লাগলেন । তাঁর তপস্তায় প্রসন্ন হয়ে মহাদেবশ্রীমন্মহার সহিত বৃষভে আরোহণ করে, পতঞ্জলির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন । আবির্ভূত হয়ে বললেন—হে শেষ ! আমি তোমার তপস্তায় সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে বর দিবার জন্য এসেছি, তুমি বর চাও । ফণিপতি মহাদেবের কথায় প্রথমে পানিনি স্ত্র ও বার্তিকের উপর ভ্রাতৃত্বচনার পটুতাবর প্রার্থনা করে মহাদেবের নৃত্যদর্শন করবার যোগ্যতা প্রার্থনা করলেন । তখন মহাদেব তাঁকে তথাস্ত্ব বলে বর প্রদান করে বললেন বৎস ফণিপতে ! তুমি এই বনপথে চিদম্বরক্ষেত্রে গমন কর । আমি তোমাকে সেখানে আমার নাট্যলীলা সন্দর্শন করাব । এই কথা বলে মহাদেব অন্তর্হিত হয়ে গেলেন । তখন পতঞ্জলি মহাদেবের নাট্যদর্শনলোভে চিদম্বরে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা কর্তৃক রচিত মহাদেবের নাট্য পর্বোগী স্তবর্ময় সভা সন্দর্শন করলেন । তারপর দেখলেন মহাদেব বৃষ থেকে অবতরণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন । মহাদেব রূপাপূর্বক পতঞ্জলিকে এবং ব্যাঘ্রপাদ নামক অপর ঋষিকে দিব্যচক্ষুপ্রদান করে বললেন, তোমরা আমার নৃত্যসন্দর্শন কর । তখন তাঁরা এবং আরও কয়েকজন ঋষি ও কয়েকজন দেবতা মহাদেবের নৃত্যদর্শন করে ধস্তা হলেন । তারপর পতঞ্জলি অগতে

উপকারের জন্তু পাণিনিমূত্র ও বাত্বিকের উপর মহাভাষ্য রচনা করলেন। তখন হাজার হাজার ছাত্র সেই ভাষ্য পড়বার জন্তু পতঞ্জলির কাছে উপস্থিত হলেন। পতঞ্জলি তখন একটা যবনিকার মধ্যে থেকে হাজার হাজার ছাত্রকে নিজের সহস্রমুখে ভাষ্য পড়াতে লাগলেন এবং বললেন ; 'তোমরা আমার এই পর্দা উঠাবে না বা এর মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা করবে না। পতঞ্জলি পাঠের পূর্বে এবং শেষে শাস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করে ভাষ্য পড়াতেন। শিষ্যেরা এইভাবে পড়ছিল। একদিন শিষ্যদের বিন্ময় হল, গুরুদেব কি করে একমুখে যুগপৎ আমাদের সকলকে ভাষ্য পড়ান। শিষ্যেরা কৌতুহল বশত পর্দা উঠিয়ে পতঞ্জলির সহস্রজ্ঞা সমন্বিত সর্পরূপ যেই দেখেছে, অমনি পতঞ্জলির দৃষ্টিমাঝে তাঁরা ভস্মীভূত হয়ে গেল। একশিষ্য সেই সময় বাহিরে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে দেখে সতীর্থেরা ভস্মীভূত। তখন সে পতঞ্জলিকে বলল প্রভু আমি পর্দা উঠাই নাই। আমি বাহিরে গিয়েছিলাম। তখন পতঞ্জলি বললেন কেন তুমি শাস্ত্রমন্ত্র শেষ হবার পূর্বে আমাকে না বলে বাহিরে গিয়েছিলে—তুমি রাক্ষস হও। তখন সে অনেক অন্তর্নিয় 'বিনয়' করে পতঞ্জলিকে প্রসন্ন করলে পতঞ্জলি বললেন—আমার কথা অত্যাধা হবে না। তবে তুমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করবে পচ্‌ধাতুর ক্ত প্রত্যয়ে কিরূপ হয়। যখন কোন লোক 'পক্' এইরূপ প্রকৃত উত্তর দিবে, তখন তুমি রাক্ষস থেকে মুক্ত হবে—এবং তুমি আমার এই মহাভাষ্য জগতে প্রচার করবে—এই বলে পতঞ্জলি অন্তর্হিত হলেন।

তারপর পতঞ্জলি গোনর্দাখ্য দেশে গিয়ে জননী গোণিকাকে প্রণাম করলেন। কিছুকাল পরে তাঁর জননী স্বর্গারোহণ করলেন। তখন পতঞ্জলি কিছুকাল নিজ দেশে বাস করলেন। এদিকে পতঞ্জলির সেই জিজ্ঞাসা রাক্ষস হয়ে এক বটগাছে বাস করল। সেই বটগাছের প্লাস দিয়ে যে যায় তাকে রাক্ষস জিজ্ঞাসা করত পচ্‌ধাতুর ক্ত প্রত্যয়ে কিরূপ হবে। কেউই ঠিক উত্তর বলতে পারতো না। অনেকে 'পচিভম্' এই উত্তর করত। যারা 'পচিভম্' উত্তর করতো রাক্ষস তাদের খেয়ে ফেলত। একভাবে বহুদিন যাওয়ার পর এক ব্রাহ্মণ সেই বটগাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। রাক্ষস তাঁকে জিজ্ঞাসা করল পচ্‌ধাতুর ক্ত প্রত্যয়ে কিরূপ হবে। সেই ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন

“পক্ষ্ম”। ব্রাহ্মণের এই উত্তর শুনে রাক্ষস আনন্দে বটগাছ থেকে নেমে এল। তার খুব আনন্দ হল। সে বুঝলো আমার শাপ শেষ হয়ে গেল। এই মনে করে সে ব্রাহ্মণকে বলল, আপনি কে? কিজন্তুই বা এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আপনি আমার নিকট ফণি ভাণ্ডাধ্যয়ন করুন। রাক্ষস এই কথা বললে— সেই ব্রাহ্মণ বললেন আমার নাম চন্দ্রশর্মা আমার বাসস্থান উজ্জয়িনীতে। হাঁ আপনার নিকট ফণিভাণ্ডাধ্যয়ন করব। রাক্ষস শুনে সন্তুষ্ট হলেন। ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হয়ে ভোজন ও নিদ্রা ত্যাগ করে দুইমাসকাল নিরন্তর রাক্ষসের কাছে থেকে সমগ্র ফণিভাষ্য শুনলেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যতটা শুনতেন, সেটা বটপাতায়, নিজের নখের দ্বারা লিপে রাখতেন। অনন্তর রাক্ষস, রাক্ষসম্বরীর পরিত্যাগ করে দিব্যমূর্তি ধারণ করলেন এবং ব্রাহ্মণকে বললেন তুমি স্থখে পৃথিবীতে বিচরণ করে এই ফণিভাষ্য প্রচার কর। এই কথাবলে সেই পতঙ্গলি শিষ্য হিমালয়ে এসে স্বর্গগমন করলেন এবং দিব্যদেহে শুকুম্নির শিষ্য গোড়পাদাচার্য হলেন। এদিকে সেই চন্দ্রশর্মা ব্রাহ্মণ নথলিখিত বটপাতাগুলি নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে যেতে লাগলেন। রাস্তায় যেতে যেতে পথে এক ক্ষুদ্র নদী দেখে—সেই নদীর জলপান করে সেই নদীর তীরস্থিত এক বৃক্ষমূলে বস্ত্রের মধ্যে বটপাতাগুলি বেধে, সেটা মাথায় দিয়ে শ্রম দূরকবার জন্য শুয়ে পড়লেন। শোয়ামাত্রই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন এক বৎস [বাছুর] খাদ্য মনে করে তাঁর মাথার নীচেথেকে সেই কাপড়ে বাঁধা বটপাতাগুলি টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করছে; এমন সময়ে ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি বাছুরের মূখ থেকে সেই বটপাতাগুলি টেনে নিলেন। নিয়ে দেখলেন কিছু কিছু লেখা বটপাতায় সেই বাছুরের দাঁত সংযুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু অক্ষর বিকল হয়ে গেছে। তারপর সেই ব্রাহ্মণ চলতে চলতে সিন্ধু নদীর তীরে উপস্থিত হলেন, সেখানে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় ক্লান্ত হয়ে উপবেশন করলেন। তখন এক কন্যা তাঁকে নবনীত ভক্ষণ করতে দিলেন এবং বললেন আমাকে কোন তপস্বী বলেছেন, আমার সঙ্গে আপনার বিবাহ হবে। স্বতরাং আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ইত্যাদি। তারপর সেই কন্যার সহিত তাঁর বিবাহ হলো। সেই কন্যার গর্ভে তাঁর দেবোপম পুত্র হলো। কোন একসময় সেই ব্রাহ্মণ বটপাতায় লিখিত সেই ভাষ্যপঙ্ক্তিগুলি মেলাবার জন্য সেগুলিকে বের করে দেখতে লাগলেন, মাঝে মাঝে বৎসকর্তৃক ভক্ষিত

হৃদয়, তিনি সেই সেই স্থানে বেড়া পাঠ বলে লিখে রাখলেন। এইজন্ত শোনা যায় মহাভাষ্যের স্থানে স্থানে পাঠ মিলে না।

তারপর সেই চন্দ্রশর্মা ব্রাহ্মণ সংসার ত্যাগ পূর্বক চতুর্থাশ্রমে গোড়পাদাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গোবিন্দপাদ নামে খ্যাত হ'লেন। এই গোবিন্দপাদের শিষ্য হচ্ছেন ভগবান্ শঙ্করাচার্য। বিজ্ঞারণ্য মুনির মতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য পতঞ্জলি মুনির শিষ্য।

— — —

ভূমিকা

নব্যমতাবলম্বীদের মতে পাণিনি, কাত্যায়ন, যাস্ক প্রভৃতি শব্দ গ্রন্থকারগণের ব্যক্তিগত নাম নয়। প্রাচীনকালে এই সকল শব্দ বংশের পরিচায়করূপে ব্যবহৃত হয়ে গ্রন্থকারগণেরও নামরূপে প্রচলিত হোত। এইভাবে ঠিক চাণক্য বা কোটিল্য নামও ব্যক্তিগত নাম নয়। কিন্তু ঐনামও বিষ্ণুগুপ্তের বংশগত নাম। যাস্ক শব্দটি যস্কের অপত্য এইরূপ অর্থে [যস্কশ্যাপত্যং যাস্কঃ । শিবাভ্যঃ (শিবাদিভ্যোঃ ৪।১।১১২ সিদ্ধান্তকৌমুদী অপত্যাদিকার)] নিম্পন্ন হয়েছে। অমরকোষে অপত্য শব্দকে পুত্র ও কন্যার বাচকরূপে লেখা হয়েছে [আশ্বজন্তনয়ঃ স্তম্ভঃ সূতঃ পুত্রঃ স্ত্রিযাংতমী । অহিহিতরঃ সর্বেত পতাং তোকং তয়োঃ সর্য়ে—অমরকোষ-মহুসাবর্গ] বটে কিন্তু পতঞ্জলি বলেছেন “যার দ্বারা পূর্বপুরুষদের পতন হয় না তাঁকেই অপত্য বলে” (১) এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বংশের পরবর্তী যে কোন সম্ভাবন পূর্বপুরুষের অপত্য হয়।

পাণিনির গণপাঠে শিবাদির মধ্যে বর্তমানে যস্ক শব্দের প্রচলন না দেখতে পেলেও পাণিনি ‘যস্কাদিভ্যো গোত্রে’ [পাঃ সূঃ ২।৪।৬ঃ] এই সূত্রে যস্ক শব্দের উল্লেখ করেছেন। উক্তসূত্রের অর্থ এইরূপ—অপত্যের বহু অর্থ বুঝালে যস্ক প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে যে প্রত্যয় হয়, তার লুক হয়। যস্কবংশীয় এক অথবা দুইজন ব্যক্তি বুঝালে ‘যাস্ক’ এইরূপ প্রয়োগ হবে, কিন্তু

(১) “অপত্যশব্দঃ ক্রিয়ানিমিত্তো ন তু আত্মরূপধারঃ। ‘ন পতন্তানেনেতাপত্যম্’ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ‘পতন্তি বিঃশতি’ ইতি সূত্রে [৪।১।১১২] ভাষ্যকৃত্য। দশিতবাদ্ বাহুল্যং করণে বৎ প্রত্যয়ঃ। বহিঃশিতঃ যতাপত্যনং তত্তদ্যাপত্যমিতি ফরিতোর্থঃ। তথা চ পৌত্রাদিরপি পিতামহাদীনামপতনে হেতুরিতি তেভ্যমপত্যং ভবতি। প্রদিকং চ ব্যবহিতোহপি পিতা-সহাদানামৃদ্ধর্তেতি ভবৎকার্বীনামুপাখ্যানেষু ‘‘অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি’’ তি (৪।১।১৩১) প্রসঙ্গ-মপাত্রানুগম্, ১।...অমরসূত্র সূত্রভাষ্যাди বরোদ্ধাপেকাঃ—‘‘তত্ত্বোদিনি’’ অপত্যাদিকার। প্রাচীনমোক্ষমা এবং শব্দেন্দ্রশেখরেও এই প্রকার কথা বলা হয়েছে। ৪।১।১৩০ সূত্রে পদমঞ্জরীতেও এই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পুঞ্জী অপত্যমিত্যপত্যনামপত্যম্—মহাভাষ্য ৪।১।১৩১।

বঙ্গবংশীয় বহু ব্যক্তি বুঝালে ‘যাস্ক’ এইরূপ প্রয়োগ হবে না কিন্তু ‘যস্ক’ এইরূপ প্রয়োগ হবে। কারণ অপত্য অর্থে বহুবচনে অণ্ প্রত্যয়ের লুক্ হয়ে যাবে।

পাণিনি তাঁর সূত্রপাঠে ও গণপাঠে অনেক ঋষির নামোল্লেখ করেছেন। তাঁরা যে সকলেই গ্রন্থকার ছিলেন তা নয়। কিন্তু সেইসব ঋষি ব্যাকরণের তৎকাল প্রচলিত শব্দ সম্বন্ধে যেরূপ মত পোষণ করতেন, সেইমত দেখাবার জন্য পাণিনি শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগ দ্বারা শব্দার্থ বুঝাতে প্রসঙ্গক্রমে সেই সকল ঋষির নামোল্লেখ করেছেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে পাণিনি বংশপ্রবর্তক যস্ক ঋষির নাম জানতেন, কিন্তু সেই বংশের যে ব্যক্তি নিরুক্ত রচনা করেছেন তিনি যে পাণিনির পূর্ববর্তী, তাতে কোন প্রমাণ নাই। মূলপুরুষ যস্ক ঋষির অপত্য অর্থে “যাস্ক” শব্দ নিষ্পন্ন এইটা দেখানই পাণিনির অভিপ্রায়। সেই যাস্ক পাণিনির পূর্ববর্তী হলেও কোন অল্পপপত্তি হয় না।

বরং নিরুক্তকার যাস্ক যে পাণিনির পূর্ববর্তী এবিসরে প্রমাণ হচ্ছে—যাস্কের উক্তি। যাস্ক তাঁর নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের ১৭শ খণ্ডে “পরঃ সন্নিবর্ধঃ সংহিতা” [পাঃ সূঃ ১।৪।২] এই পাণিনির সূত্রটিকে অবিকল উদ্ধৃত করেছেন (২)।

আশঙ্কা হতে পারে যে ‘যাস্ক পাণিনির সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু পাণিনির পূর্ববর্তী কোন বৈয়াকরণের রচিত সূত্রই উদ্ধৃত করেছেন। পাণিনি ও সেই পূর্ববর্তী বৈয়াকরণের সূত্রটি অবিকল উদ্ধৃত করেছেন।

এর উত্তরে বক্তব্য এই, যে—এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৈয়াকরণের সূত্রই পাণিনি উদ্ধৃত করেছেন এরূপ বলনাতে কোন প্রমাণ নাই। উক্ত বিষয় প্রমাণিত করতে গেলে দেখাতে হবে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে আরও দু একটি সূত্র, অথবা ব্যাকরণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তা তাঁর কেউ দেখাতে পারবেন না। এইজন্য পাণিনির সূত্রগুলি তাঁর নিজের রচিত—এটাই দৃঢ় ভাবে সিদ্ধ হয়।

(৩) যাস্ক যেমন পাণিনির “পরঃ সন্নিবর্ধঃ সংহিতা” সূত্রের উদ্ধৃতি করেছেন সেইরূপ শৌনকের প্রাতিশাখ্যেরও উদ্ধৃতি করেছেন।

যথা:—“পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা” [ঋকপ্রাতিশাখা ২।১]। আর একটি বচনও উদ্ধৃত করেছেন—“পদপ্রকৃতিঃ সংহিতাঃ পাদধানি।”

অতএব যাক্ষই পাণিনিমুদ্রণ ও প্রতিশাখ্য অবিকল উদ্ধৃত (৩) করেছেন। যাক্ষ পাণিনির পরবর্তী হলেও পতঞ্জলির পূর্ববর্তী। কারণ মহাভাষ্যে নিরুক্তের দু'চারটি কথার প্রতিধ্বনি দেখা যায়। যেমন নিরুক্তকার বলেছেন—“তান্বে-তানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাচ্চ (২১১৮)। মহাভাষ্যে একথা মার্জিত ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে “চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপ সর্গনিপাতাচ্চ” (মহাভাষ্য—পম্পশাস্ত্রিক)। এখানে নিরুক্তকার দুটি সমাসের উল্লেখ করেছেন, মহাভাষ্যকার একটি সমাসের উল্লেখ করে সকলকে চমৎকৃত করেছেন। এর দ্বারাও পতঞ্জলি যাক্ষের পরবর্তী বলে প্রমাণিত হয়। কারণ পরবর্তীকালেই ভাষা প্রভৃতির মার্জিত অবস্থা দেখা যায়। পাণিনিতে কিন্তু এই চারিপ্রকার পদবিভাগের কোন ইঙ্গিত দেখা যায় না।

নিরুক্তকার আরও বলেছেন—“তত্র নামান্ত্রাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ” অর্থাৎ সমস্ত নাম বা প্রুতিশব্দিক আখ্যাত ধাতু হতে উৎপন্ন—ইহা (৪) শাকটায়ন [একজন বৈয়াকরণ ঋষি] বলেছেন এবং ইহা নিরুক্তবিদগণের সম্মত। মহাভাষ্যকার এই কথাঃ প্রতিধ্বনি করেছেন—“নাম চ ধাতুজ্জমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটায় চ তোকম্ (মহাভাষ্য ৭৩১১)। আবার তিনি [পতঞ্জলি] নিজেই ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন “নাম খলুপি ধাতুজম্। এবমাহনৈরুক্তাঃ। বৈয়াকরণানাং শাকটায়ন আহ ধাতুজং নামোতি।” অর্থাৎ নাম ধাতুজাত একথা নিরুক্তকারগণ বলেন। বৈয়াকরণদের মধ্যে শাকটায়নও বলেন নাম ধাতুজাত। এখানে দেখা যুচ্ছে নিরুক্তকারের ভাষা থেকে মহাভাষ্যকারের ভাষা প্রাঞ্জল। নিরুক্তকার প্রথমে [১১১১১]

(৩) যাক্ষ পাণিনি বা পাতিশাখ্যের পঞ্জি অবিকল উদ্ধৃত করলেও আকরহান নির্দেশ করেন নাট বা সেইসব গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে এখানে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে যাক্ষের সময় ব্যাকরণশাস্ত্র বেশ পরিপূর্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। যেজন যাক্ষ বলেছেন—“তদিতঃ বিদ্বান্ধনঃ (নিরুক্তঃ) ব্যাকরণস্ত কাব্যশ্চ।” অর্থাৎ এই নিরুক্তকপ বিদ্বান্ধন [বৈদ্যার্জুনের উপকারক] ব্যাকরণ শাস্ত্রের সম্রাট। ব্যাকরণের পরিণতি বর্ণন হচ্ছে নিরুক্ত। যাক্ষ নিরুক্তে [১ ১১১৩] বৈদ্যাকরণদের মত গ্রন্থ গ্রন্থ করে অষ্টোক্তকরণকে নিরুক্ত খাণ্ডোপদেশের অধোপায় বলেছেন। পাণিনির মুদ্রণ বা কাটায়নের ব্যতিক্রম নিরুক্ত সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ দেখা যায় না। কেবল মহাভাষ্যে [৭৩১১] নিরুক্তের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৪) পাণিনির মুদ্রণ শাকটায়নের উল্লেখ আছে [৮.৩.১৮, ৮.৩.১৯]। পরবর্তীকালে শাকটায়ন নামে একজন নৈন বৈয়াকরণ ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থও মুদ্রিত হয়েছে। ভট্টোজীদীক্ষিত এই পরবর্তী শাকটায়নকে প্রৌঢ়-বায়স গ্রন্থে “অভিনব শাকটয়ন” বলে উল্লেখ করেছেন।

আখ্যাত শব্দের তিঙ্‌বিভক্তি যুক্ত অর্থ (৫) করেছিলেন কিন্তু পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে “আখ্যাতজানি” অংশের উল্লেখ থাকায় তিঙ্‌বিভক্তিযুক্তপদের অংশ যে ধাতু, তাকে আখ্যাত বলে বুঝিয়েছেন। তাতে অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে নাম ধাতুজাত। এতে নিরুক্তকারের উক্তি অস্পষ্টতা থেকে গেছে। কিন্তু মহাভাষ্যকার বলেছেন—“নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে।” এতে মহাভাষ্যকারের স্পষ্ট উক্তি দেখা যাচ্ছে।

নিরুক্তকার তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে বলেছেন—“ঋদ্ ভাববিকার। ভবন্তীতি, বার্ষ্যায়নির্জায়তেহন্তি বিপরিণমতে বর্ধতেহপক্ষীয়তে বিনশ্তীতি।” এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে বার্ষ্যায়ণি নামে এক অতি প্রাচীন আচার্য ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ যাক্ষের সময় ছিল। কিন্তু এখন সেইগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং সেইগ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে। মহাভাষ্যকারও বলেছেন “ঋদ্ ভাববিকার। ইতি হ স্মাহ বার্ষ্যায়ণিঃ জায়তেহন্তি বিপরিণমতে বর্ধতেহ পক্ষীয়তে বিনশ্তীতি” [মহাভাষ্য ১।৩।১]। যাক্ষের উক্তি দেখলে মনে হয় তাঁর সময় বার্ষ্যায়ণির গ্রন্থ ছিল। কিন্তু পতঞ্জলির উক্তি দেখে মনে হয়, তাঁর সময় বার্ষ্যায়ণির গ্রন্থ ছিল না।

যাক্ষ পাণিনির পরবর্তী হলেও বাতীককার কাत्याয়নের পরবর্তী নন। কারণ পাণিনি অরণ্যশব্দের ত্রীলিঙ্গে অরণ্যানী শব্দের সাধন করেছেন [অষ্টাধ্যায়ী ৪।১।৪২]। যাক্ষ অরণ্যের পত্নী অর্থে অরণ্যানীশব্দের সাধন করেছেন। [নিরুক্ত “৫।২২—অরণ্যানী—অরণ্যস্ত পত্নী]। কিন্তু বাতীককার অরণ্যানী শব্দের মহৎ অরণ্য অর্থ করেছেন। শব্দের ব্যবহার কালে কালে পরিবর্তিত হয়। পাণিনি ও যাক্ষের সময়ে অরণ্যের স্ত্রী অর্থে অরণ্যানী শব্দের ব্যবহার হোত। বাতীককারের সময় সেই অর্থে অরণ্যানী শব্দের প্রয়োগ হোত না—এটাই বহুমান করা যায়। যাক্ষজ্ঞ বাতীককার মহৎ অরণ্য অর্থে অরণ্যানীশব্দ সিদ্ধ করবার জ্ঞান বাতীকরচনা করেছেন। পাণিনি একই নৃত্তে ইন্দ্র, বরুণ, ভব, শর্ব প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অরণ্যশব্দের পাঠ করেছেন। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, বরুণের স্ত্রী বরুণানী শব্দ সিদ্ধ হয়, এই সকল শব্দের সহিত অরণ্যশব্দ পাঠিত হওয়ায় অরণ্যের স্ত্রী অরণ্যানী এই শব্দ সিদ্ধ হয় বলেই বহুমান করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তা না হলে পাণিনি

ইহ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সাধারণভাবে একই শব্দে অব্যয়শব্দের গ্রহণ না করে
অব্যয়শব্দের সিদ্ধির জন্য ভিন্ন শব্দের রচনা করতেন। পূর্বেই বলেছি
একটি নির্দিষ্ট অর্থেই একটি শব্দের চিরকাল প্রয়োগ হয় না। নতুন ভাষায়
যেমন কালে কালে অর্থভেদে শব্দের ব্যবহার বদলে যায় সেইরূপ প্রাচীন
ভাষায়ও কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অনেক শব্দের ব্যবহার হয়। বৈদিক ভাষায়
পূর্বে কর্ম অর্থে ধী শব্দের (৬) ব্যবহার হোত এখন সেরূপ হয় না। কর্ম
অর্থে বেদে (৭) শক্তি শব্দেরও ব্যবহার হয়েছে, এখন সেরূপ হয় না। সামর্থ্য
অর্থে শক্তি শব্দের (৮) ব্যবহার বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়। নিষক্টভেদে কর্মনামের
মধ্যে শিল্প শব্দ (৯) পঠিত হয়েছে। পানিনি কলাকৌশল অর্থে শিল্প শব্দের
(১০) প্রয়োগ করেছেন।

লৌকিক সংস্কৃতেও অনেক শব্দের পূর্বব্যবহৃত অর্থের পরিবর্তন হয়ে গেছে।
পানিনিব্যাকরণে ব্যবধান অর্থে ব্যাবায়শব্দের (১১) প্রয়োগ দেখা যায়। পূর্বমীমাং-
সাতেও 'ব্যবধান অর্থে ব্যাবায় শব্দের (১২) প্রয়োগ দেখা যায়। অমরকোষে
ব্যাবায় শব্দের (১৩) ঘোষসংযোগ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এইরূপ পানিনি
ইচ্ছা অর্থে মতি শব্দের (১৪) ব্যবহার করেছেন, পরবর্তিকালে বুদ্ধি অর্থে মতি
শব্দের (১৫) ব্যবহার করা হয়েছে। এইজন্ত বৈয়াকরণগণ বলেন—“সর্বৈ সবার্থ-
বাচকাঃ।” অর্থাৎ সব শব্দ সব অর্থের বাচক।

শব্দের অর্থ এইভাবে কালে কালে পরিবর্তিত হইলে বলা বাস্তবিক

(৬) নিষক্ট, ২য় অধ্যায়। (৭) নিষক্ট, ২য় অধ্যায়। জ্যোতেন^১ই দ্বিবি^২ হেবানো।
অগ্নিস্রীঃ^৩ক্ৰিতিভী রোদসিগ্রাম্। তম্, অক্লমঃ^৪তথা ভূবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বকপাঃ।
[বৃক্সংহিতা ৮।৪।১১।] শক্তিভিঃ=কর্মভিঃ। নিষক্ট ৭।২৮।

(৮) শব্দঃ সর্বভাবানামচিন্তাজ্ঞানসৌচরাঃ। স্তুতাহতো ব্রহ্মণতাস্ত সর্গাতা ভাবশক্তয়ঃ।
[বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ ৩২]

(৯) নিষক্ট, ১১শ অধ্যায়। (১০) অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।৫৫। শিল্প কৌশলম্, কাশিকা।
কৌশলমিতি ক্রিয়াভ্যাসপূর্বকো জ্ঞানবিশেষঃ। পদমঞ্জরী।

(১১) অষ্টাধ্যায়ী ৮।৩৩ ; ৩৮।

(১২) শৈবসিন্ধু ২।১।৪০।

(১৩) বাবারো গ্রামার্থো নমৈধুনং নিধুনং রতম্। [অমরকোষ ২ ক্যঃ ব্রঃ কর্ণ ৫৭]

(১৪) অষ্টাধ্যায়ী ৩.২।১৮৮

(১৫) অমরকোষ প্রথম কাণ্ড ধীরগ ১।

কাত্যায়নের সময় অরগ্যানী শব্দ মহারণ্য অর্থে পল্লিবার্ভিত হয়ে যায়। অবশ্য এখনও সেই অর্থে অরগ্যানী শব্দের ব্যবহার হয়। পাণিনি তৎপ্রণীত অঙ্ক-
স্থায়ীতে কোন প্রসঙ্গেও স্পষ্টভাবে দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করেন
নাই। কিন্তু কাত্যায়নের বার্তিকে দার্শনিক বিষয়ের বিচার দেখা যায়।
কাত্যায়ন তাঁর প্রথম বার্তিক গ্রন্থেই শব্দ অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধের নিত্যতা
(১৬) প্রতিপাদিত করেছেন। যাক্ষও তাঁর নিরুক্তগ্রন্থের প্রারম্ভে দার্শনিক
বিচারের অবতারণা করে শব্দের নিত্যতার উল্লেখ করেছেন (১৭)।
বার্তিককার কাত্যায়ন পাণিনির সূত্রের উপর নানাস্থানে নানা প্রসঙ্গে অনেক
প্রকার বিচারের উত্থাপন করেছেন। যাক্ষও তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে অনেক বিচার
প্রণালীর প্রদর্শন করেছেন (১৮)। এই ধরণের বিচারপদ্ধতি পাণিনির
পরবর্তিকালে উদ্ভূত হয়েছে। পাণিনির স্টোখ্যায়ী সূত্রযুগের গ্রন্থ। সূত্র
যুগে সূত্রসকলই বহু অর্থের সূচকরূপে রচিত হয়েছিল। যাক্ষের নিরুক্তে
নানাপ্রকার বিচারের অবতারণা দেখেও নিশ্চয় করা যায় যে যাক্ষ পাণিনির
পরবর্তী।

ষাটশ খৃষ্টাব্দে জাত কাশ্মীরদেশীয় সোমদেব ভট্টের রচিত কথাসরিৎসাগরের
উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেছেন “পাণিনি ও
কাত্যায়ন সমসাময়িক। কাত্যায়ন পাণিনির সূত্রের অনেক সংস্কার
করেছেন।”

কিন্তু এটা যুক্তিবদ্ধ মনে হয় না। কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কথাসরিৎ-
সাগরের গল্পের প্রামাণ্য যথেষ্ট শিথিল। কাত্যায়ন পাণিনির সূত্রের উপর

(১৬) “নিরুক্ত শব্দার্থসংক্ষেপে”। [কাত্যায়ন বার্তিক—পল্লিবার্ভিক মহাভাষ্যে উদ্ভূত]।
আচার্যভট্টহরি তাঁর বাক্যপদীর গ্রন্থে বলেছেন—সূত্র, বার্তিক ও ভাষ্যের প্রণেতা তিনজন
রবি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি, শব্দ, অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধকে নিত্য বলেছেন; [বাণ্য-
পদীর ১২০]।

(১৭) নিরুক্ত ১১২

(১৮) নিরুক্ত ১১২ এই স্থলে নাম যে খাত্ত থেকে উৎপন্ন হয়েছে—নিরুক্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত
রূপে তাৎসম্যনি করা হয়েছে। নিরুক্তের ১১১ গ্রন্থে, বেদের মন্ত্রের অর্থ আছে, যন্ত্র সকল
নিরর্থক শব্দসমষ্টি নহু—এই সিদ্ধান্তকে বিচার করার দ্বীকৃত করা হয়েছে। পূর্ববীক্ষাণোদগমের
সূত্রে এবং শাধরভাষ্যেও মন্ত্রের অর্থ আছে—এই বিষয়ে বিচার করা হয়েছে। নিরুক্ত ৭৪
—গ্রন্থে দেবভাসন্ধে বিচার করা হয়েছে।

প্রায় ৪০০০ বার্তিক রচনা করেছিলেন। কাত্যায়ন যেমন অরণ্যঙ্গী শব্দের অর্থের পরিবর্তন দেখে বার্তিক রচনা করেছেন, সেইরূপ পাণিনি যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ দেখে সূত্র রচনা করেছিলেন, বার্তিককার তাঁর সময়ে সেই শব্দের সেই অর্থের পরিবর্তন দেখে অল্প অনেক স্থলেও বার্তিক রচনা করেছেন এবং অনেকস্থলে পাণিনিসূত্র দ্বারা যে শব্দের যে আকার সিদ্ধ হতে পারত, বার্তিককার তার আকারেরও পরিবর্তন করেছেন। মহাভাষ্যকার 'পতঞ্জলি পাণিনিকে 'প্রমাণভূত আচার্য' বলেছেন। এইরূপ প্রামাণিক আচার্য পাণিনির সূত্রের সংশোধন তাঁর সমসাময়িক অল্প কোন বৈয়াকরণ করে দিবেন এটা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত যে পাণিনির সময়ে যে ভাবে ভাষার প্রচলন ছিল, পরবর্তিকালে তার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কাত্যায়ন সেটা লক্ষ্য করে স্তম্ভভাষ্য বার্তিক রচনা করেন। তার দ্বারা পাণিনির সূত্রের সংস্কার হয়েছে বলা যেতে পারে। অতএব কাত্যায়ন পাণিনির পরবর্তী ইহাই সিদ্ধ হয়। কাত্যায়নের অনেক পরবর্তিকালে কাশিকার ভাষার এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করে সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই সংস্কার বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তারও বহু পরবর্তিকালে ভট্টোজ্জী দীক্ষিতের উক্ত সংস্কারসাধন ফলবৎ হয়েছে।

কাত্যায়ন যদি পাণিনির সমসাময়িক হতেন, তা'হলে তিনি পাণিনির ব্যাকরণের সংস্কার না করে নিজে স্বতন্ত্র একটি ব্যাকরণ রচনা করতেন। কারণ অপরের ব্যাকরণের সংস্কার অপেক্ষা নিজে স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করলেই, গ্রন্থকারকে লোক অধিক সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু কাত্যায়ন পাণিনির পরবর্তী হলে বরং তাঁর এই পাণিনি ব্যাকরণের উপর সংস্কার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ কাত্যায়ন যখন আসেন তখন পাণিনির ব্যাকরণ লোকসমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে এবং সমস্ত প্রামাণিক ব্যক্তি কর্তৃক আদৃত হয়ে গেছে এটা তিনি দেখলেন। দেখে তিনি বুঝলেন যে আমি যদি স্বতন্ত্র একটা ব্যাকরণ রচনা করি তা হলে পাণিনি ব্যাকরণ থাকতে থাকতে আমাব গ্রন্থকে লোকে গ্রহণ করবে না। অতএব আমি পাণিনি ব্যাকরণের উপর সংস্কার করি। সেই সংস্কার বিধানগণ গ্রহণ করবেন। অতএব পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক নন।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কাল সম্বন্ধে বিদেশীয় ও ভারতীয় অনেক বিদ্বান্ পর্যালোচনা করেছেন।

অধ্যাপক গোল্ডষ্ট্রুকার খৃষ্টপূর্ব .৪১—২০ অব্দ, পতঞ্জলির সময় নির্দেশ করেছেন (১৯)। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে পতঞ্জলির সময় হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধ। তাঁর মতে পতঞ্জলির সময় খৃষ্টাব্দের আরম্ভের পূর্ববর্তী হতেই পারে না (২০)।

অধ্যাপক ভিন্সেন্ট এম্বিথ, নানা প্রকার প্রমাণ দ্বারা পতঞ্জলির সময় খৃষ্টপূর্ব ১৫০ হতে ১৪০ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন (২১)। অধ্যাপক কীথের মতে পতঞ্জলির সময় খৃষ্টপূর্ব ১৫০। (২২)। অধ্যাপক বেলভেনকারও খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দকে পতঞ্জলির কাল বলে স্বীকার করেছেন (২৩)।

ভগবৎস্মরণ প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র খৃষ্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে মৌর্য বংশের শেষ অকর্মণ্য রাজা বৃহদ্রথকে বধ করে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র পিতার মৃত্যুর পূর্বে খৃষ্টপূর্ব ১৪৯ অব্দে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব ১৮৫ হতে ১৪৯, প্রায় ৩৬ বৎসর। কিন্তু পুষ্যমিত্র শান্তিতে রাজ্য শাসন কর্তে পারেন নি। তাঁর রাজ্য লাভের প্রায় ২০ বৎসর পরে সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ১৬৫ অব্দে কলিঙ্গের জৈন রাজা ধারবেল পুষ্যমিত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। উক্ত আক্রমণে ধারবেল বিশেষ কিছুই হ্রবিধা কর্তে না পেরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তার আবার ৪ বৎসর পরে ধারবেল অতর্কিত ভাবে পুনরায় পুষ্যমিত্রের রাজ্য আক্রমণ করে পুষ্যমিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। ধারবেল কর্তৃক উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এর পর খৃষ্টপূর্ব ১৫৫—১৫৩ অব্দে কাবুল ও পাঞ্জাবের গ্রীক রাজা মেনাণ্ডার পুষ্যমিত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। পুষ্যমিত্র এই গ্রীক রাজাকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেন। এর পাঁচ বৎসর পরে পুষ্যমিত্র

(১৯) Proffessor Goldstueker's Panini (2nd Edn) P, 180.

(২০) A History of Sanskrit Literature (Macdonell) fourth Impression, P. 481.

(২১) The Early History of India (4th Edn) P. 229

(২২) A History of Sanskrit Literature (Dr. A. Keith) P. 428.

(২৩) System of Sanskrit Grammar (1915) P. 32.

পরলোকগমন করেন। অথচ ইতিহাসে দেখা যায় যে পুষ্যমিত্র তাঁর রাজত্ব কালে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নাম পাঁচবার উল্লিখিত দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে ১১১৬৮ সূত্রের ভাষ্যে (২৪) পুষ্যমিত্রসভা শব্দটি দেখা যায় এবং পুষ্যমিত্র যে একজন রাজা তাও সেই প্রकरणের পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায়। মহাভাষ্যে ‘পুষ্যমিত্রসভা’ এই শব্দের পর ‘চন্দ্রগুপ্তসভা’ শব্দটি দেখা যায় এবং চন্দ্রগুপ্ত যে একজন রাজা তাও সেখানে বলা হয়েছে। এর পর ৩১১২৬ সূত্রের মহাভাষ্যে (২৫) পুষ্যমিত্রের নামের তিনবার উল্লেখ দেখা যায় (২৬)। তারপর ‘বর্তমানে সচ’ [১১১২১] সূত্রের মহাভাষ্যে “ইহ পুষ্যমিত্রঃ বাজায়ামঃ” এই উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

এইভাবে মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নামের অনেকবার উল্লেখ দেখে এবং বর্তমানকালের ক্রিয়াপদের সঙ্গে তাঁর নামের প্রয়োগ দেখে পুরাতত্ত্ববিদগণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এর উপর আশঙ্কা হতে পারে যে মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ দেখে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলা যেতে পারে না। মহাভাষ্যে চন্দ্রগুপ্তেরও নামের উল্লেখ আছে। তজ্জন্তু কেহই পতঞ্জলিকে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলেন না। ১১১৬৮ সূত্রের মহাভাষ্যে চন্দ্রগুপ্তের নামোলেখন আছে। এই সূত্রের কাশিকারভিত্তিতে একইভাবে পুষ্যমিত্র ও চন্দ্রগুপ্ত এই উভয়ের নামের উল্লেখ দেখে যেমন কাশিকার জয়াদিত্যকে (২৭)

(২৪) স্বরূপং শব্দস্য শব্দসংজ্ঞা।

(২৫) হেতুমতি চ।

(২৬) যজ্ঞানিহ চাধিপর্ষাসো বজ্রব্যঃ। পুষ্যমিত্রো যজতে যাজ্ঞঃস্বীতিঃ। তত্র ভবিতব্যং পুষ্যমিত্রো যাজয়তে যাজকঃ বজ্রস্বীতিঃ। ...নাবশ্যং ত্বজিহ্বা বিদ্রুকেপণে এষ বর্ততে, কিং তর্হি, তস্মৈ গংগি বর্ততে। অহো যজ্ঞত ইত্যাচ্যতে যঃ সূত্বং তাগং করোতি। তং চ পুষ্যমিত্রঃ করোতি যাজকঃ প্রয়োজয়ন্তি।

(২৭) বামন ও জয়াদিত্য নামক দুইজন বৌদ্ধগণিত একত্র কাশিকারভিত্তি রচনা করেন। জয়াদিত্য পালিনিব প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কাশিকার রচনা করেন অবশিষ্ট অংশ বামন রচনা করেন।

প্রথমদ্বিতীয়পঞ্চমষষ্ঠা জয়াদিত্যকৃতবৃত্তয়ঃ। ইত্যর।—

— বামনকৃতা বৃত্তয়ঃ ইত্যভিযুক্তাঃ। শব্দরত্ন-সংগ্রহাবচনাচ্চ বীজানাম্।

পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলে সিদ্ধান্ত করি না। কাশিকায় প্রত্যাধারণরূপে ‘পুষ্যমিত্রসভা’ শব্দে উল্লেখ দেখে জয়াদিত্যকে পুষ্যমিত্রের সমকালিক বলি না। কারণ জয়াদিত্য পুষ্যমিত্রের বহু পরবর্তী ব্যক্তি—এটা ইতিহাসবিদগণ জানেন। সেইরূপ মহাভাষ্যে “পুষ্যমিত্রের” নামের উল্লেখ দেখেও মহাভাগ্যকার পতঞ্জলিকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কাশিকায় জয়াদিত্য যেমন পরবর্তিকালে গ্রন্থ লিখে পূর্বজাত পুষ্যমিত্র বা চন্দ্রগুপ্ত নাম উল্লিখিত করেছেন, সেইরূপ পতঞ্জলিও পরবর্তী ব্যক্তি হয়ে পূর্বজাত পুষ্যমিত্র ও চন্দ্রগুপ্তের নামের উল্লেখ করেছেন। নতুবা মহাভাষ্যে চন্দ্রগুপ্ত নামের উল্লেখ দেখে পতঞ্জলিকে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িকও বলা যেতে পারে। অথচ চন্দ্রগুপ্তকে পতঞ্জলির পূর্ববর্তী বলা হয়েছে। সেই যুক্তিতে পুষ্যমিত্রকেও পতঞ্জলির পূর্ববর্তী বলা সঙ্গতি।

এর উত্তরে বক্তব্য এই যে যার গ্রন্থে পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ আছে তাঁকে কোন প্রকারে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলা যেতে পারে না। এইজন্য বিদেশীয় পণ্ডিতগণ পতঞ্জলিকে চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু পতঞ্জলির মহাভাষ্যে অনেকবার পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ থাকায় পুষ্যমিত্রের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল—ইহা মনে হয়। এইরূপ মনে হওয়ার আরও কারণ এই যে মহাভাষ্যকার পানিনির ৩।২।১২১ শ্লোকের মহাভাষ্যে উদাহরণরূপে তিনটি বাক্যের উল্লেখ করেছেন—

বথা :—[১] “ইহ বসামঃ” [এখানে আমরা বাস করছি]

[২] “ইহপীমীমতে” [এখানে আমরা অধ্যয়ন করছি]

[৩] “ইহ পুষ্যমিত্রঃ যাক্ষয়ামঃ” [এখানে আমরা পুষ্যমিত্রকে যজ্ঞ করছি]। এই উদাহরণ তিনটির ক্রমিক বিকাশ থেকে মনে হয় পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের সময় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্‌কর্মে ব্রতী ছিলেন। ৩।১।২৬ এবং ৩।২।১২১ এই দুটি শ্লোকে যেভাবে বর্তমানকালের লটবিভক্তি দ্বারা পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মহাভাষ্যের উক্ত অংশ পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের সময় রচিত হয়েছিল। কাশিকায় জয়াদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত ও পুষ্যমিত্রের নামযুক্ত প্রত্যাধারণ মহাভাষ্য থেকেই সংগ্রহ করেছেন—ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। কিন্তু মহাভাষ্যকার যে পুষ্যমিত্রের নামযুক্ত উদাহরণ ও প্রত্যাধারণগুলি অস্ত্রের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন—এ

বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ইতিহাসে পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের উল্লেখ থাকলেও তাঁরা সেই যজ্ঞের কালের নির্দেশ করেন নাই। যুবরাজ অগ্নিমিত্র পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব ১৪২ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন—একথা পূর্বে বলা হয়েছে। তাহলে মনে হয় যে সেই খৃঃ পূঃ ১৪২ অব্দেই পুষ্যমিত্র স্বর্গারোহণ করেন। মেনাগুপ্তের আক্রমণের উল্লেখ মহাভাষ্যে (২৮) আছে। মহাভাষ্যকার যেভাবে মেনাগুপ্তের আক্রমণের উল্লেখ করেছেন তাতে বুঝা যায়, মেনাগুপ্তের আক্রমণের সময়ে মহাভাষ্যকার জীবিত ছিলেন এবং মেনাগুপ্তের আক্রমণের পরে মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন। তবে মহাভাষ্যকার আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেন নাই।^১ এই সমস্ত প্রমাণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে—পুষ্যমিত্রের জীবিতকালের খৃষ্টপূর্ব ১৫৩ হতে ১৪২ অব্দের মধ্যে মেনাগুপ্তের আক্রমণের পরে মহাভাষ্য রচিত হয়েছিল এবং সেই সময়েই পুষ্যমিত্রের যজ্ঞাহুষ্ঠান ও তাতে মহাভাষ্যকারের ঋত্বিক কর্মে নিয়োগ হয়েছিল। নব্যমতাবলম্বীদের মতে এই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে অলৌকিক মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন, সেটা তিনি অধিক বয়সেই করেছিলেন। কারণ এইরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন কর্তে তাঁর অনেক সময়ই লেগেছিল। এই পাণ্ডিত্য শঙ্করাচার্যের মত অল্পবয়সে সম্ভব হয় না বা তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। আমরা প্রস্তাবনায় প্রাচীন মতানুসারে বর্ণনা করেছি।

(২৮) “পর্যাক চ লোকবিজ্ঞাতে প্রবোক্তদর্শন বিষয়ে [কণ্ঠ্যায়নবাতিক]। “পর্যাক্ চ লোক বিজ্ঞাতে হব্যোক্তদর্শন বিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ। অরুণদ যবনঃ সাকৈতম্। অরুণদ যবনো যথামিকান্” [মহাভাষ্য ৩২।১১১]।

“অনুভূত্বাং পর্যাকোচাপি হত্যাহব্যোপাত্যমাত্রাজয়েণ দর্শনবিষয় ইতি বিরোধোভাবঃ।” [কৈয়ট] •

যে ব্যাপারটি পর্যাক অথচ লোকপ্রসিদ্ধ এবং যিনি শব্দ প্রয়োগ কচ্ছেন তাঁর প্রত্যক্ষের যোগ্য অর্থাৎ তিনি চেষ্টা করলে সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পারতেন—এরূপ হলে লঙ্ হয়। যবন সাকৈত অবরোধ করেছিল। যবন যথামিকা অবরোধ করেছিল। ভাঃ কীলহর্ষ সিদ্ধান্ত করেছেন—যথামিকা দ্বিত্যের নিকটবর্তী একটা প্রাচীন নগরী। [Indian Antiquary VII P 266] । অনেকে সাকৈতের অর্থ ক.রতেন—উত্তর অ বাধ্য প্রদেণ।

কাশিকায় এই দুটি উদাহরণ অবিকলভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

মহাভাষ্য বিশাল গ্রন্থ। (পরিমাণে উহা বাল্মীকি রামায়ণের সমান। ২৪০.০ অশ্বষ্টপ্, চন্দ্রোবৃত্ত) অভিজ্ঞগণ বলেন ২৪০০০ অশ্বষ্টপ্ চন্দ্রের (শ্লোকে পরিমিত মহাভাষ্য) শ্লোকে বহু অক্ষর থাকে মহাভাষ্য সেই পরিমিত অক্ষরে নিবদ্ধ।

অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণে অশ্বষ্টপ্ চন্দ্রের শ্লোক ব্যতীত অশ্বষ্টপ্ চন্দ্রের শ্লোকও আছে।

পুষ্যমিত্র খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৫ অব্দ হতে ১৪২ অব্দ পর্যন্ত রাজ্যাশাসন করেন—ইহা পতঞ্জলির কাল। পূর্বে বলা হয়েছে। তিনি যখন মেনাগারকে ভারত হতে বিতাড়িত করেন তারকাল হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫—১৫৩ অব্দ।

মেনাগারের বিতাড়িত হবার পর পাশ্চাত্যদেশীয় কোন আক্রমণকারী স্থলপথে ভারত আক্রমণ করেছিলেন এই সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৩—১৪২ অব্দ পর্যন্ত পুষ্যমিত্র নিকৃপদ্রবে রাজ্যাশাসন করিতে পেরেছিলেন। অতএব সেই নিকৃপদ্রব কালেই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। পতঞ্জলি যখন সেই যজ্ঞে ঋত্বিক হয়েছিলেন এবং তার অনতিবিলম্বকালে মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন তখন অনুমান করা যায় যে পতঞ্জলি তখন প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং পতঞ্জলির জন্ম, খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ বৎসর সময়ে হওয়া সমীচীন মনে হয় এবং তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ হতে ১০০ অব্দের মধ্যে বিজ্ঞান ছিলেন।

আচার্য ভট্টহরি বলেছেন—পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হবার পূর্বে পানিনি ব্যাকরণে “সংগ্রহ” নামক বিশাল বিস্তৃত নিবদ্ধ ছিল। কালক্রমে সেই বহু বিস্তৃত গ্রন্থের পঠন, পাঠনে শিথিলতা উপস্থিত হয়। তখন বৈয়াকরণগণ বিস্তৃত গ্রন্থ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পাঠেই ইচ্ছুক হন। বৈয়াকরণের এই শিথিলতার জন্য সংগ্রহের পঠনপাঠন লুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়ায় সকল শাস্ত্রার্থদর্শী ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্য (২২) রচনা করেন।

(২২) প্রারম্ভ সংক্ষেপকটীনজবিজ্ঞানগ্রন্থান্।

প্রাপ্য বৈয়াকরণান্ বৈ সংগ্রহেঃ স্তম্ভপাপহে ॥

কৃত্তেৎ পতঞ্জলিনা জ্ঞরূপা তীর্ণাশিনা।

সর্বেষাং জ্ঞারবোজ্ঞানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে ॥

অলঙ্কারে গান্ধার্যদ্বিতান ইব সৌষ্টবাং । [বাণ্যপদ্য ২ ৪৮৪—৪৮৮]

স্বতন্ত্রগুলির উপর ভাব্যবুপে ভাব্যগ্রন্থ লিখা হয়েছে। যেমন কৈমিনি স্বতন্ত্রের উপর শাবর ভাষা। গৌতম স্বতন্ত্রের উপর বাৎস্তায়ন ভাষা। কণাদ (মহাভাষ্যের মহাভাষ্য ! স্বতন্ত্রের অর্থাবলম্বনে প্রশস্ত পাদভাষা।

এইভাবে পাণিনি ও কাত্যায়ন স্বতন্ত্রের উপর পতঞ্জলির ভাষা। কিন্তু কোন ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলা হয় না। কেবলমাত্র এই পতঞ্জলির ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলা হয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য ভর্তৃহরি (৩০) কৃত বাক্য পদীয়ার টীকাকার (৩১), কৈয়ট ও তাঁর টীকার ব্যাখ্যাকার নাগেশ 'প্রভৃতি' (৩২) বলেছেন এই মহাভাষ্য অর্থগাস্তীর্থে অতলম্পর্শ অথচ ললিত পদবিভাসের সৌষ্ঠবে সরল বলে প্রতীয়মান হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি "সংগ্রহ" গ্রন্থের অন্ত-পরণে মহাভাষ্য রচনাকরে প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংক্ষেপপদ্ধতি দেখিয়েছেন। সমস্ত জ্ঞানের [যুক্তির] মূলতত্ত্ব সকল এই গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকায় এবং অর্থগাস্তীর্ষ ও ভাষ্য-সৌষ্ঠবে এই গ্রন্থটি অতুলনীয় হওয়ায়—ইহার [ভাষ্যের] উৎকর্ষ ব্যাপনের জন্য 'মহৎ' শব্দের যোগ করে ইহাকে মহাভাষ্য বলা হয়েছে। বাক্যপদীয়ার টীকাকার পুণ্যরাজ মহাভাষ্যের মহত্বের কারণ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন [৩১নং পাদটীকা]।

নাগেশভট্ট মহাভাষ্য প্রদীপোদ্যোতে মহাভাষ্যের নামের কারণ বলেছেন—“মহাভাষ্য গ্রন্থ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলেও অন্য ভাষ্য অপেক্ষা এর বৈলক্ষণ্য আছে। অপর ভাষ্যে কেবল মূলের ব্যাখ্যা থাকে। এই ভাষ্যে ব্যাখ্যা আছেই, তদ্ব্যতীত আবশ্যক স্থলে শব্দসিদ্ধির জন্য স্বতন্ত্রভাবে বচন রচনা করেছেন। এই স্বতন্ত্র ভাবে রচিত বচন গুলিকে ইষ্টি বলা হয়। এই বৈলক্ষণ্যের জন্য অন্য ভাষ্য অপেক্ষা এই ভাষ্যের মহত্ব আছে। সেই জন্য ইহাকে মহাভাষ্য বলা হয়। (৩২)

(৩০) 'অন্তেন সংগ্রহানসারেণ ভগবতা পতঞ্জলিন সংগ্রহসংক্ষেপনৃতমেন প্রায়শো ভাষ্করশ-নিবদ্ধমিভ্যুক্তং বেদিতব্যম্'। [পুণ্যরাজটীকা বাক্যপদীয়া ২।৪৮৫]

(৩১) 'অতএব সর্বজ্ঞায়বীজহেতুস্বাদেব মহচ্ছব্দেন বিশিষ্য মহাভাষ্যমিভ্যাক্যতে লোকে। অথ মহচ্ছব্দেব বিশেষণদ্বারেণাস্যোপপাদয়িতুমাহ—অলরুগাধে...' [পুণ্যরাজটীকা বাক্যপদীয়া ২।৪৮৫]

(৩২) "ব্যাখ্যাত্বংহ প্যন্তেষ্টাদিকথনেনাবাখ্যাত্বাদিতরভাষ্যবৈলক্ষণ্যম্"।

[কৈয়টকৃত উপক্রমঃ মমিঙ্গাকের নাগেশভট্টকৃতব্যাখ্যা উদ্যোত]

বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে সূত্রকার পাণিনি অপেক্ষা বার্তিককারের অধিক প্রামাণ্য, আবার বার্তিককার অপেক্ষা মহাভাষ্যকারের অধিক প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় (৩৩) ।

প্রাচীনকালে মহাভাষ্যকে চূর্ণি বা চূর্ণিন্ নামে আখ্যাত করা হতো । ভর্তৃহরির মহাভাষ্যটীকার যে খণ্ডিত অংশ বালিন লাত্রেয়ীতে রক্ষিত আছে তাতে মহাভাষ্যকারকে চূর্ণিকার বলে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে । [ডাঃ কীলহর্গ সম্পাদিত মহাভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ড ভূমিকা] ।

যুক্তি দীপিকাতেও মহাভাষ্যকারকে চূর্ণিকার বলা হয়েছে এবং মহাভাষ্য হতে কিছু কিছু পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ।

গৌতমসূত্রের ব্যাংঙ্গায়নকৃত ভাষ্যের উপর উদ্যোতকরকৃত ব্যাখ্যাকে বার্তিক বলা হয় । “জৈমিনিসূত্রের শব্দস্বামিকৃত ভাষ্যের উপর কুমারিলভট্টকৃত ব্যাখ্যাকেও বার্তিক বলা হয় । বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাকর ভাষ্যের স্তবেশ-বাচার্য প্রণীত ব্যাখ্যার অন্ত বার্তিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে (৩৪) ।

(৩৩) “যথোক্তং হি মুনিত্রয়স্ত প্রামাণ্যম্ [টেক্সট ১ ১১২১]

“উত্তরোক্তঃস্য বহুলক্যাদিশিবাং স্পষ্টং চেদং বিধিকৃৎসরিতি সূত্রে [৩১১২০] ভাষ্যে ।”
[মহাভাষ্যপ্রদ.পাদ্যোক্ত]

“এতচ্চ বিধিকৃৎসরোচেতি সূত্রেভাষ্যো ধ্বনিতম্” [লঘুশব্দেন্দুশব্দর সর্বনামপ্রকরণ]
নাপেশভট্ট বলেছেন পূর্ববর্তী মুনি অপেক্ষা পরবর্তী মুনির অধিক প্রত্যাপের জ্ঞান থাকে পরবর্তীকালে ভাষার অধিক পরিপূষ্টি হয় বলে পরবর্তী মুনির অধিক প্রামাণ্য ।

(৩৪) “স্বাক্ষরমসন্দিক্ঃ সারবদ্ বিবর্তোমুখম্ ।

অন্তোক্তমনবধ্যক সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥” [যুক্তিদীপিকাদিতে উদ্ধৃত]

“লব্ধি সূচিত্যার্থানি স্বাক্ষরপদানি চ

সর্বতঃ সারভূতানি সূত্রাগ্রাহমনীষিণঃ [বাচস্পতিমিশ্রকৃত তাৎপর্যটীকার উদ্ধৃত
ভাঃ সূঃ ভাষ্য বাঃ ১১১১]

ভাষ্যের লক্ষণ “সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পট্টে সূত্রাসুকারিভিঃ ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যভাষ্যবিদো বিদুঃ ।” [ব্রঃ সূঃ ভাষ্য টীকা আনন্দ
সিঙ্গি]

বার্তিকের লক্ষণ—“উক্তাসুত্ৰকল্পার্থচিন্তা যত্র প্রবর্ততে ।

“তঃ প্রথং বার্তিকং প্রাচঃ ঐতিহ্যজ্ঞান মনীষিণঃ ।” [বৃহদারণ্যক সম্বন্ধবার্তিকের
আনন্দ সিঙ্গিটীকা]

টীকার লক্ষণ—“টীকা নিরন্তরং ব্যাখ্যা”

“
[পরীক্ষাসূত্র সূত্রের টীকার উদ্ধৃত]

কিন্তু পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে কাত্যায়নকৃত বার্তিকেরই প্রধানভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে আনুশঙ্গিকভাবে কিছু কিছু পাণিনিয়সূত্রেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোটকথা মহাভাষ্যটি বার্তিকের ব্যাখ্যা। পতঞ্জলি কোন কোন স্থলে পাণিনি সূত্রেরও স্বতন্ত্রভাবে মহাভাষ্য রচনা করেছেন। সমস্ত পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যা মহাভাষ্যে দেখা যায় না। যে সূত্রে বিশেষ কোন বিচার্য বিষয় পতঞ্জলির লক্ষ্য হয় নাই সেই সূত্রের উল্লেখ তিনি করেন নাই। কাশিকাতে কিন্তু সমস্ত পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যা আছে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কালের কথা বলা হয়েছে, দেশের সম্বন্ধেও নানা পাণ্ডিত্যের নানা বিবাদ আছে। তবে ভাষ্যকার “গোনদীয়ন্তনাহ” এইরূপ পরোক্ষ ভাবে নিজের পরিচয় দেওয়ায় গোনর্দ দেশে ভাষ্যকারের জন্ম বলে অনুমান করা যায়। গোনর্দ দেশকে দেশীয় ভাষায় গোঁড়া বলে কল্পন করা হয়। এইগোড়া সম্ভবত অযোধ্যাদেশই হবে। যদিও পুষ্যমিত্রের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র তথাপি ঐতিহাসিকগণ বলেন পুষ্যমিত্রের অযোধ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। সেই সম্বন্ধ হতে বুঝা যায় পতঞ্জলির সঙ্গে পুষ্যমিত্রের সম্বন্ধ হয়েছিল।

বার্তিককার কাত্যায়নের দেশ, কাল সম্বন্ধে ও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাত্যায়নের অপর নাম বরকচি বলে আমরা মহাভাষ্যে পাই। আর মহাভাষ্যে “প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ” [পশ্চাৎ দক্ষিণ মহাভাষ্য] এইভাবে বার্তিককারের সম্বন্ধে উক্তি আছে বলে—দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে কাত্যায়নের জন্ম এই পর্যন্ত বুঝা যায় কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কোন দেশে কি কোন নগরে তাঁর জন্ম তা সঠিক ভাবে এখনও জানা যায় না। কাল সম্বন্ধেও কাত্যায়নের বিষয়ে বিবাদ আছে। তবে সরুপসূত্রে বার্তিককার “দ্রব্যাব্যভিধানং ব্যাভিঃ” এইকথা বলেছেন বলে বুঝা যায় পাণিনির সূত্রের উপর ব্যাভির যে সংগ্রহ নামক বিশাল গ্রন্থ ছিল, সেই গ্রন্থরচনার বা ব্যাভির পরবর্তী হচ্ছেন কাত্যায়ন। আবার কাত্যায়নের বার্তিকের উপর পতঞ্জলি মহাভাষ্য প্রণয়ন করায় সম্ভবত পতঞ্জলির ৩৫ শত বৎসর পূর্বে কাত্যায়নের কাল। স্তত্র্যাং ষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বৎসরমতানুসারে কাত্যায়নের কাল বলে মনে হয়।

পাণিনির দেশ সম্বন্ধে অনেকে গান্ধার দেশকে পাণিনির জন্মস্থান বলে অনুমান করেন। অবশ্য এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোনো কঠিন কাল সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে পাণিনির সূত্রের উপর সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল।

সেই গ্রন্থ নিশ্চয় অনেকদিন প্রচারিত হয়েছিল, তারপর বার্তিককার বার্তিক রচনা করেন। তারপর পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করেন। সুতরাং পতঞ্জলির অন্তত এক হাজার বৎসর পূর্বে পাণিনি সূত্র রচনা করেন। আর বার্তিককারের বার্তিকের অন্তত পাঁচশত বৎসর পূর্বে পাণিনি-সূত্র রচিত হয়েছিল। নতুবা পাণিনির অল্পকালের পরে বার্তিক রচিত হয়েছে—ইহা বলা যায় না। কারণ পাণিনি ও বার্তিকের মধ্যে সংগ্রহ গ্রন্থের পঠন পাঠনের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দী পাণিনির কাল বলে মনে করা যেতে পারে। পাণিনির সমগ্র অষ্টাধ্যায়ীতে আটটি অধ্যায় আছে, এবং তার প্রত্যেক অধ্যায়ে চারটি চারটি পাদ আছে। সুতরাং পাণিনি ব্যাকরণে সর্বমুদ্র ৩২ টি পদ আছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির ঐ পাদগুলিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভক্ত করেছেন। মহাভাষ্যে সর্বসমেত ৩৪ টি আঙ্গিক আছে। তার মধ্যে প্রথম আঙ্গিকে পম্পশা আঙ্গিক বলা হয়।

স্পর্শনার্থক স্পর্শ ধাতুর উত্তর যঙ্ করে সেই যঙস্ত স্পর্শ পম্পশানামের অর্থ। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করে তার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় করে পম্পশা শব্দ সিদ্ধ হয়। পম্পশা শব্দটি স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ। উহার প্রকৃতি-প্রত্যয় লভ্য অর্থ হচ্ছে—যা অধিকভাবে স্পর্শ করে। এই আঙ্গিকটি ব্যাকরণ শাস্ত্রকে বা ব্যাকরণাধ্যায়ীকে অতিশয় স্পর্শ করে। কারণ ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কথা পম্পশাআঙ্গিকে থাকায় ব্যাকরণাধ্যয়নে পাঠার্থীকে এই আঙ্গিক প্রবর্তিত করে। কেহ কেহ বলেন স্পর্শ বাধনে একটি স্পর্শ ধাতু আছে। সেই ধাতুর পূর্বোক্তরূপে যঙস্তরূপের উত্তর অচ্, স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করে পম্পশা শব্দ সিদ্ধ হয়। অর্থ হচ্ছে যে অঙ্গিকটি ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নে পাঠার্থীর বাধা দূর করে দেয় তা পম্পশা। অধ্যয়নার্থী স্বভাবত ব্যাকরণশাস্ত্র নীরস বলে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু এই পম্পশা আঙ্গিকে ব্যাকরণের অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য এর প্রয়োজন আছে ইত্যাদি বলে অধ্যয়নার্থীর অধ্যয়নে প্রবৃত্তি বাধা দূর করে দেয়।

এই পম্পশা আঙ্গিকটিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রের ভূমিকা বলা যেতে পারে। এই আঙ্গিকে যদিও কোন সূত্রের ব্যাখ্যা নাই তথাপি শব্দের স্বরূপ কি শব্দ শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজন কি ইত্যাদি বিষয় সমূহের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণসম্বন্ধীয় বহুতত্ত্বের বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করেছেন বলে

পাণিনিব্যাকরণাখ্যায়ার নিকট এর মূল্য যথেষ্ট আছে : শুধু তাই নয় এই আঙ্গিক হতে ভাষাতত্ত্বের অঙ্গশীলনকারিগণও অনেক উপাদান সংগ্রহ কর্তে পারেন । এই গ্রন্থে সেই পম্পশা আঙ্গিকের অঙ্গবাদ ও বিবৃতি করার যথাশক্তি যথাবুদ্ধি প্রবত্ত করা হয়েছে ।

ইতি ভগবত্‌করাচার্য পূজ্যপাদ শ্রীকৃষিকেশাশ্রম শিষ্য দামোদরশাস্ত্রম ।.

পতঞ্জলি প্রণীত ব্যাকরণ মহাভাষা

পম্পাশাস্ত্রিক

[অন্তবাদ ও বিবৃতি]

মূল

অথ শব্দানুশাসনম্ । অথৈত্যানুশাসনোক্তধিকারার্থঃ প্রযুক্ত্যতে ।

শব্দানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অথ শব্দানুশাসন [শব্দোপদেশঃ] । “অথ” এই শব্দটি অধিকার [আরম্ভ] অর্থে প্রযুক্ত [ব্যবহৃত] হচ্ছে । শব্দানুশাসন নামক শাস্ত্র অধিকৃত [আরম্ভ] হচ্ছে—ইহা বুঝতে হবে ॥ ১ ॥

বিবৃতি—কোন শাস্ত্র আরম্ভ করতে গেলে সেই শাস্ত্রে বুদ্ধিমান ব্যক্তি গণের প্রবৃত্তির উপযোগিকরূপে চাবটি অনুবন্ধের বর্ণনা করতে হয় । অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের জ্ঞান না হলে বুদ্ধিমান লোকদের সেই শাস্ত্রে ঐচ্ছিক হয় না । অনুবন্ধচতুষ্টয় হচ্ছে—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন (১) । যে ব্যক্তি যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যোগ্য, তাকে সেই শাস্ত্রের অধিকারী বলা হয় । যে পদার্থ যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহাই সেই শাস্ত্রের বিষয় ও বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের বী শাস্ত্রের সহিত প্রয়োজনের যে সম্বন্ধ তাকে সম্বন্ধ বলা হয় । যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে যে ফললাভ হয় তাকে প্রয়োজন বলা হয় সেই শাস্ত্রের । অব্যবহিক বী উন্নত ব্যক্তি ভিন্ন যে ব্যক্তি যে কাঁখে প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রবৃত্তি হওয়ার পূর্বে “এই কাঁধ আমি করতে পারব” এইজ্ঞান হয় । প্রবৃত্তির উপযোগী এইরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানের ভাষায় ‘কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান’ বলে—“ইদং মৎকৃতিসাধ্যম্ ।”

১। প্রবৃত্তিপ্রয়োজকজ্ঞানবিষয়তম্ অনুবন্ধতম্ [তর্কসংগ্রহ টীকা] অর্থাৎ যে বিষয়ের জ্ঞান হলে গোন্ধের শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয়, তাকে অনুবন্ধ বলে । অধিকারীর জ্ঞানটী কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান উৎপাদন করে শাস্ত্রে প্রবৃত্তির উপযোগী হয় ২ আর বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের জ্ঞান ইইসাধনত-জ্ঞানের উৎপাদন করে শাস্ত্রে প্রবৃত্তির উপযোগী হয় ।

এইকাল আমার কৃতি বা যত্নদ্বারা সাধিত হবার যোগ্য। শাস্ত্রে অধিকারীর জ্ঞান না হলে, সেই শাস্ত্রাধ্যয়নে কৃত্তিসাধ্যাতা জ্ঞান হয় না। কৃত্তিসাধ্যাতা জ্ঞান না হলে শাস্ত্রে বিচারশীল ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয় না। অধিকারীর জ্ঞান হলে অধিকারী নিজের সামর্থ্য প্রভৃতির চিন্তা করে, নিজের ভিতর সেই অধিকারীর অমূরূপ সামর্থ্য আছে—ইহা যদি জ্ঞানতে পারে তাহলে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এইজন্ত কোন বিষয়ে বা শাস্ত্রে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে অধিকারীর জ্ঞান আবশ্যক। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও শাস্ত্রে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ‘ইদং মদিষ্টসাধনম্’ ইহা আমার অভিলষিত বস্তুর সিদ্ধির উপায়—ইহা জেনে সেই ইষ্টসাধন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এইজন্য যে কার্যে নিজের কোন ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে—বলে মনে হয় না। সেই কার্যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয় না। শাস্ত্রের প্রয়োজন জ্ঞান জন্মালে সেই শাস্ত্রে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ইষ্ট সাধনতাজ্ঞান হয়ে প্রবৃত্তি হয়। এই হেতু শাস্ত্রের প্রয়োজন জ্ঞান আবশ্যক (২)। বিষয়ের জ্ঞানও ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের উপযোগী। যে বিষয়কে অবলম্বন করে শাস্ত্র রচিত হয় সেই বিষয়ের জ্ঞানই শাস্ত্রের সাংক্ৰান্ত প্রয়োজন। এই বিষয় জ্ঞানটি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যরূপ যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন জ্ঞানের সহায়ক। এইভাবে শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের, বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের, শাস্ত্রের সহিত প্রয়োজনের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধজ্ঞানও ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের সহায়ক হয় যে প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করে শাস্ত্র রচিত হয়, সেই প্রয়োজনটি সেই শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা হতে পারে—এরূপ দৃঢ়জ্ঞান না হলে শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হতে পারে না। শাস্ত্রের সহিত বিষয় এবং প্রয়োজনের সম্যগ্ জ্ঞান যদি না হয়, তা হলে সেই শাস্ত্রকে অসম্বন্ধ প্রলাপ বলে মনে হয়, তাহলে সেই শাস্ত্রে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয় না। বিষয় ও প্রয়োজনের জ্ঞান হলে তা থেকে সম্বন্ধ ও অধিকারীর জ্ঞান অনায়াসে হতে পারে। এইহেতু মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সর্বপ্রথম ‘শব্দা-লুপাসন’ এই সার্থক নামের উল্লেখ করে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সূচিত করেছেন।

শব্দানুশাসন—যার দ্বারা অসাধু = অশুদ্ধ-অপভ্রংশ প্রভৃতি শব্দ হতে পৃথগ্ভাবে সাধু! শুদ্ধ] শব্দের জ্ঞানোৎপাদন করা হয়।
শব্দানুশাসন শব্দের অর্থ (৩) তার নাম শব্দানুশাসন। অল্পপূর্বক শাস ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ [অনট্] প্রত্যয় করে অল্পশাসন শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। [“করণাদিকরণযোগ্য” ইতি ল্যুট্ পাংশুঃ ৩৩।১১৭ । তারপর “শব্দানামনুশাসনম্” এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করে “শব্দানুশাসনম্” শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এখানে “আচার্য কর্তৃক” [আচার্যেণ] এইরূপ কত্ববাচক পদের উল্লেখ না থাকায় কর্মে ষষ্ঠী সমাসের কোন বাধা হয় নি। কর্তা কর্ম, উভয়ত্র ষষ্ঠী প্রাপ্ত হলে কর্মে যে ষষ্ঠী হয়, সেই ষষ্ঠীন্ত পদের সঙ্গে সমাস হয় না। এখানে কর্তৃপদের উল্লেখ না থাকায় উভয়ত্র ষষ্ঠীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় কর্মষষ্ঠীর সঙ্গে সমাস হতে কোন বাধা হয় নাই।

“ব্রাহ্মণেন নিকারণো ধর্মঃ ষডঙ্গো বদোহধোয়ো জ্ঞেয়শ্চ” [মহাভাষ্য পশ্চ-শাস্তিক]। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র—এই ছয়টি বেদের অঙ্গ (৪)। এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদের অধ্যয়ন অর্থাৎ অক্ষর-গ্রহণ ও তার অর্থজ্ঞান—ইহা ব্রাহ্মণের নিকারণ ধর্ম। অভিপ্রায় এই যে বেদের অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান—ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্য। এরজন্তু ব্রাহ্মণের কোন প্রকার লৌকিক ফলের অপেক্ষা করা উচিত নয়। এখানে নিকারণ ধর্ম বলায় সন্ধ্যা বন্দনার মত ষডঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন ও তার অর্থজ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষে একটি নিত্যকর্ম বলে প্রতিপাদিত হয়েছে। সন্ধ্যাবন্দনা না করলে যেমন ব্রাহ্মণ পাপভাগী হয়, সেইরূপ ষডঙ্গসহিত বেদের অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান না করলেও পাপভাগী হয়। যারা উত্তম অধিকারী, তাঁদের ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রয়োজন না বললেও এই শাস্ত্রব্যাক্যানুসারে ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হতে পারে এই মনে

৩। “অনুশিষ্টন্তে অসাধুভ্যো বিবিচ্য জ্ঞাপ্যন্তে বেনেতি”

[মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত]।

অনুশিষ্টন্তে বিবিচ্য অসাধুভ্যো বিভজ্য বোধ্যন্তে বেনেতি করণ্যুট্ [শব্দকৌস্তভ]।

বিবিচ্যঃ সাধবঃ শব্দাঃ প্রকৃত্যাদিবিভাগতো জ্ঞাপ্যন্তে বেন তচ্ছাস্ত্রমত্র শব্দানুশাসনম্।

[পদমঞ্জরী]

৪। শিক্ষা বল্লো ব্যাকরণঃ নিরুক্তং জ্যোতিষাং গতিঃ।

ছন্দোবিচিতিরিতোঃ ষডঙ্গো বেদ উচ্যতে ॥ • [অমরকোষ শব্দাদিকা ভানুকৌস্তভ

টীকাঃ]

করে ভগবান্ পানিনি ব্যাকরণের কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করেন নি।
 বার্তিককার বলেছেন—ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রক্রিয়াজ্ঞান পূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ
 করলে ধর্ম হয় (৫)। তার দ্বারা ধর্মলাভ ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রয়োজন ইহা
 স্থচিত হয়েছে। যারা মধ্যম অধিকারী তাঁরা ধর্মলাভের জন্ত ব্যাকরণাধ্যয়নে
 প্রবৃত্ত হতে পারেন, এইহেতু বার্তিকারের এই প্রয়োজন মধ্যম অধিকারীর
 প্রতি কথিত হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু সূত্রকার পানিনি এবং
 বার্তিককার কাত্যায়ন—এঁরা কেউই নিকৃষ্ট অধিকারীর ব্যাকরণাধ্যয়নে
 প্রবৃত্তির জন্ত কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করেন নাই। যারা নিকৃষ্ট অধিকারী
 তাঁদের শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা না থাকায় তাঁরা জন্মান্তরে প্রাপ্তব্য স্বর্গাদি-
 কলের পুতি বিশ্বাসস্থাপন করতে পারেন না। এইজন্য তাঁরা প্রত্যেক কর্মের
 ঐহলৌকিক ফলের অনুসন্ধান করেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ইহা লক্ষ্য করে
 অধ্যম অধিকারীর প্রবৃত্তির উপযোগী প্রয়োজন স্থচিত করেছেন। ‘শব্দানুশাসন’
 এই সার্থক নামের প্রয়োগ করায়, শব্দজ্ঞানই [সাধুশব্দজ্ঞান] যে ব্যাকরণ
 শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন—তাহা স্থচিত হয়েছে। এখানে শব্দ বলতে যে
 সাধু [শুদ্ধ] শব্দ এবং ব্যাকরণ বলতে যে সাধু শব্দের অণুশাসন [জ্ঞাপন]
 তাহা ভাষ্যকার একটু পরে নিজেই বলবেন। শব্দানুশাসন—এই নামের
 শব্দের [শব্দানাম, অনুশাসন [অনুশাসনম্] এইরূপ অর্থ হওয়ায়, শব্দই
 যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় তাহাও স্থচিত হয়েছে। মহাভাষ্যপ্রদীপ নামক
 মহাভাষ্যের টীকায় আচার্য্য পট বলেছেন—যে শব্দানুশাসন—এই সার্থক
 নামের দ্বারা মহাভাষ্যকার যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন শব্দের জ্ঞান
 তাহা স্থচিত করেছেন। শব্দানুশাসন এই সার্থক নামের দ্বারা ব্যাকরণ
 শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত বিষয় যে সাধু শব্দ তাহা স্থচিত হয়েছে একথা জিনেন্দ্রবুদ্ধি
 প্রণীত কাশিকাবিবরণ পঞ্জিকায়, ভট্টোজীদীক্ষিতপ্রণীত শব্দকোষভে এবং
 হরদত্তপ্রণীত পদমঞ্জরীতে বলা হয়েছে। মহামতি নাগেশভট্ট মহাভাষ্য
 প্রদীপোদ্যোতে এই দুইপ্রকার মতের সামঞ্জস্য করে বলেছেন যে, ব্যাকরণ
 শাস্ত্রের প্রয়োজন শব্দজ্ঞান ও প্রতিপাত্ত বিষয় শব্দ এই উভয়ই শব্দানুশাসন—
 এই সার্থক নামের দ্বারা স্থচিত হয়েছে। এইভাবে শব্দজ্ঞান ব্যাকরণশাস্ত্রের
 সাক্ষাৎ প্রয়োজন হলেও মূল প্রয়োজন হচ্ছে—ধর্ম এবং মোক্ষ। স্থ বা

দুঃখনিবৃত্তিই হচ্ছে আসল প্রয়োজন। শব্দজ্ঞান—সুখ নয় বা দুঃখ নিবৃত্তি নয়। কিন্তু সুখের বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হচ্ছে শব্দজ্ঞান। এই জন্ত নাগেশ ভট্ট বলেছেন—প্রয়োজন হচ্ছে ধর্ম এবং মোক্ষ। ব্যাকরণাধ্যয়নের দ্বারা শব্দজ্ঞান হলে তার দ্বারা শব্দের অর্থেরও জ্ঞান হয়। তার দ্বারা বেদের অর্থজ্ঞান হয়। বেদের অর্থজ্ঞানপূর্বক শুদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা বৈদিক কর্মসুষ্ঠান করলে ধর্ম উৎপন্ন হয়। সেই ধর্মদ্বারা স্বর্গস্থত্ব হয়। আবার ব্যাকরণাধ্যয়ন হতে শব্দজ্ঞান হলে উপনিষদের অর্থজ্ঞান হয় বা ব্যাকরণশব্দ প্রক্রিয়াজ্ঞান পূর্বক আসল শব্দ ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। অতএব শব্দজ্ঞানটি সাক্ষাৎ প্রয়োজন হলেও ব্যাকরণাধ্যয়নের পরস্পরায় ফল হচ্ছে ধর্ম ও মুক্তি।^{১০} তবে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি নিকৃষ্ট অধিকারীর ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রবৃত্তির উপযোগিকরূপে শব্দজ্ঞানকে সাক্ষাৎ প্রয়োজন বলে সূচিত করেছেন—ইহাতি অভিপ্রায়।

ভাগ্যের লক্ষণ পবাশর উপপুরাণে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে—

“সূত্রস্তং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রাসুসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাগ্যবিদো বিদুঃ॥” [১৮ অধ্যায়]

যে গ্রন্থে সূত্রস্থিত পদকে গ্রহণ করে, সূত্রের অনুকূল পদের দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা হয় এবং নিজের পদেরও ব্যাখ্যা করা হয়, ভাষ্যভিজ্ঞগণ সেই গ্রন্থকে ভাগ্যরূপে অঙ্গীকার করেন। পতঞ্জলিকৃত ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলার (৬) কারণ এই যে এই পতঞ্জলি প্রণীত ব্যাকরণভাষ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলেও, ইহাতে অনেকস্থলে সূত্র ও বাতীকের অপেক্ষা না করে, ইষ্টি অর্থাৎ স্বতন্ত্র বচনের প্রণয়ন করে স্বাধীনভাবে শব্দের সাধন করা হয়েছে। ইহাই এই ভাষ্যের অন্তঃভাষ্য হতে বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বের জন্তই এই ভাষ্যে মহত্ব। সেইজন্ত একে মহাভাষ্য বলা হয়। বাক্যপদীয়ার দ্বিতীয় কাণ্ডের শেষে ভট্টহরি এই ভাষ্যের অন্তঃপ্রকার মহত্বের কথা বলেছেন এবং বাক্যপদীয়ার টীকাকার পুণ্যরাজ সেইস্থলের অ ভপ্রায় স্পষ্টকরে বলেছেন। তিনি বলেছেন—এই ভাষ্য কেবল ব্যাকরণের নিবন্ধ নয়, কিন্তু ইহা সমস্ত জ্ঞানদীপের অর্থাৎ সমগ্রযুক্তি কলাপের মুগতত্ত্বের সংগ্রহ। এই জন্ত এইগ্রন্থকে ‘মহত্ব’ শব্দের দ্বারা বিশেষিত করে মহাভাষ্য নামে অভিহিত করা হয়। এই গ্রন্থে প্রতিপাত্ত বিষয়ের বাহুল্য

১০। “ব্যাখ্যাত্ত্বংপদোষ্টমিকবনেনাব্যখ্যাত্ত্বাদিতঃ ভাষ্যবৈলক্ষণো ন বৃহত্ত্বম্।”

থাকায় ইহা অতি গভীর অর্থাৎ অন্তলম্পর্শ এবং প্রতিপাদন রীতির স্বন্দরতার জন্য ইহা অতিস্পষ্ট। অতএব সজ্জন ব্যক্তিগণের চিত্তের মত এই গ্রন্থ স্বভাবত সূক্ষ্মার অথচ অতিগভীর। এই কারণে ইহাকে মহাভাষ্য বলা হয় (৭)। এই গ্রন্থ ভাষ্য বলে এতে স্বকীয় পদেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৮) এই জন্য “অথৈতয়ং শব্দোহধিকারার্থঃ প্রযুক্ত্যতে” বলে অর্থ শব্দের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থ শব্দের বাচ্যার্থ দুটি এবং আর তিনটি আনুমানিক অর্থ বা প্রয়োজন (৯)। এখানে আরম্ভ অর্থেরই গ্রহণ করতে হবে ইহা বুঝাবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে। ‘অর্থ শব্দানুশাসনম্’ এই বাক্যে অর্থ শব্দের আরম্ভ অর্থ গ্রহণ করলে সমগ্র বাক্যটির যে অর্থ প্রযুক্ত হয়, তাই ব্যাখ্যায় বলেছেন “শব্দানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্” শব্দানুশাসন নামক শাস্ত্র আরম্ভ হচ্ছে ইহা বুঝতে হবে।

আর একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় এই যে—কোন গ্রন্থকার বা কোন বক্তা যে বিষয়ের বর্ণনা করবেন, সেই বিষয়টির প্রথমে যদি নির্দেশ করেন, তাহলে শিষ্যদের বা শ্রোতৃ বর্গের তাতে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়, নতুবা আলোচ্য বিষয়ের জ্ঞানের অভাবে শ্রোতার মনোনিবেশ ঘটে না। কোন গ্রন্থ বা প্রকরণের আরম্ভে সেই গ্রন্থ বা প্রকরণের আলোচ্য বিষয়ের নির্দেশকে প্রতিজ্ঞা বলে। গ্রন্থকার বা বক্তা যদি নিজের ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে কোন আভাষ না দিয়ে প্রথমেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করেন তাহলে শিষ্য বা শ্রোতৃবৃন্দের সে বিষয়ে মনোনিবেশ না থাকায় তাঁর সেই প্রতিপাদন অরণ্যরৌদ্রের মত বার্থ হয়। এই জন্য প্রাচীন গ্রন্থকারগণ তাঁদের

৭। “ভূতেন পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।

সর্বেষাং দ্বায়গীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে ॥

[বাবাপদীর ১৮৮৪/৮৫]

অলঙ্কারার্থোপাস্তীর্থাহুতান ইবু সৌঠবাং ॥

“তচ্চ ভাষাঃ ন কেবলং ব্যাকরণস্ত নিবন্ধনঃ..... সজ্জনমানসমিব” [পূণ্যরাওচাঁকর]

৮। পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যবোজনঃ।

আক্ষেপোঃ সমাধিকঃ ব্যাখ্যানং বড়বিধঃ স্তনঃ ॥ [পরিভাষেনুপেখর ভৈরবী ঠিকা]

পদচ্ছেদ, পদার্থের বর্ণনা, সমাসাদির বিগ্রহ প্রদর্শন, সমগ্র বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের পরস্পর অর্থ প্রদর্শন, প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপরে সম্ভাবিত আশঙ্কা এবং সেই আশঙ্কার সমাধান। ব্যাখ্যা এই ৬ প্রকার।

৯। “মলানন্তরায়ন্তপ্রকরণংগ্রোথো অর্থঃ”

[অমরকোষ]

প্রতিপাদ্যবস্তু বলার পূর্বে প্রতিপাদ্য বিষয়ের এইরূপ আভাস দিয়ে থাকেন। মহাভাষ্যকারও তাঁর গ্রন্থের আরম্ভে “অথ শব্দানুশাসনম্” এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা নিজের বক্তব্য বিষয়ের প্রতি শিষ্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। অতএব “অথ শব্দানুশাসনম্” এই বাক্যটি যেমন শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজনের প্রতিপাদক সেইরূপ শিষ্যদের মনোনিবেশের হেতুভূত প্রতিজ্ঞাবাক্যও বটে।

প্রশ্ন হতে পারে আন্তিকগ্রন্থকারগণ সকলেই গ্রন্থারম্ভের পূর্বে মঙ্গলাচরণ করে থাকেন, মহাভাষ্যকার এতবড় বিশাল গ্রন্থ করার পূর্বে মঙ্গলাচরণ করলেন না কেন? তার উত্তরে বৈয়াকরণগণ বলেন “অথ শব্দানুশাসনম্” এই বাক্যে প্রথমে ‘অথ’ শব্দের উচ্চারণ করায় মহাভাষ্যকারের মঙ্গলাচরণ হ্রস্বশব্দই সিদ্ধ হয়েছে। মহাভাষ্যকার অতি আন্তিক ছিলেন। তিনি নিজেই শাস্ত্রের আদিতে মধ্য ও অন্তে মঙ্গল থাকে, সেই শাস্ত্রের বিস্তার, অর্থাৎ প্রচার হয়, যারা সেই শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন তাঁরা বীরপুরুষ হয়ে থাকেন অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁরা কখনও পশ্চাৎপদ হন না এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকেন। মহাভাষ্যকারের গ্রন্থারম্ভে প্রযুক্ত অর্থ শব্দট যদিও আবৃত্ত অর্থের বাচক তথাপি এই অথ শব্দ উচ্চারণ করাতে মঙ্গল হয়েছে শ্রোতার ও মঙ্গল হয়েছে (১১) ॥ ১ ॥

— — —

১০। মহাভাষ্য পশ্চাৎগতির ‘নিক্কে শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই বাস্তবিকের বাধায় পতঞ্জলি বলেছেন—“মঙ্গলানীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথমে বীরপুরুষাণি চ ভবন্ত্যনুশাসনপূর্ব্বাণি চ অধোভারত সিন্ধুর্থা যথা স্থারিতি। [“বুদ্ধিরাদৌ,” ১১১] [“ভবাদয়ো ধাতবঃ”] [১১৩] শাস্ত্রের মহাভাষ্যে শাস্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে মঙ্গলের কর্তব্যতা বলা হয়েছে।

১১। শুঁকারশ্যশব্দচ্চ দ্বাবেতো প্রমাণঃ পুরা।

কণঃ ভিষ্য। বিনির্ধাতৌ তদ্রূপাঙ্গালকাগ্ভৌ ॥

বকহৃতের [১১৩] ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন—“অর্থান্তর পশুতো হৃৎশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গল প্রয়োজনো ভবতি।” অর্থাৎ অন্য অর্থে উচ্চারিত হৃৎশব্দ এবং যাত্র মঙ্গল জনক হয়। কাটম্পতি মিশ্র বলেছেন যেমন পানের জন্ত কেউ জলের কলসী জলপূর্ণ করে নিয়ে গেলে তা ফর্দন করে ওপরের মঙ্গল হয় সেইরূপ, অন্য অর্থে উচ্চারিত অথ শব্দ এবং করে শব্দাদিসমূহের বস্তু মঙ্গল হয়।

মূল

কেবাং শব্দানাম্? লৌকিকানাং বৈদিকানাং চ।

তত্র লৌকিকান্তাবদ গৌরথঃ পুরুষো ইস্তী

শব্দুনিম্নগৌ ব্রাহ্মণ ইতি। বৈদিকাস্থঃ খবপি—

শব্দো দেবীরভীষ্টয়ে [অঃ সং ১।৬১]। ইষে ভোর্জে ভা [যজুর্বেদ]।

[ঐতঃ সং ১।১।১।১]। অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ [ঋঃ সং ১।১।১]।

অগ্ন আয়াহি বীতয় [সাঃ সং ১।১।১] ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—কোন শব্দ সকলের [অনুশাসন]? লৌকিক ও বৈদিক শব্দসকলের। তার মধ্যে লৌকিক শব্দ [দেখান হচ্ছে] গোঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ, ইস্তী, শব্দুনিঃ মৃগঃ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বৈদিক শব্দ [দেখান হচ্ছে]। শব্দো দেবীরভীষ্টয়ে [অথর্ব বেদ] ইষে ভোর্জে ভা [যজুর্বেদ]। অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ [ঋগ্বেদ]। অগ্ন আয়াহি বীতয়ে [সামবেদ] ইত্যাদি ॥ ২ ॥*

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার প্রথমেই বলেছেন—“অথ শব্দানুশাসনম্” অর্থাৎ শব্দের অনুশাসন বা উপদেশক শাস্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে। এখন আশঙ্কা হতে পারে কোন শব্দের উপদেশ করা হবে। শব্দ বলতে তো অনেক বহুশব্দ বোঝায়—কাকের শব্দ, হাতীর শব্দ, ঘোড়ার শব্দ, মৃদঙ্গ, শাস্ত্র প্রভৃতির শব্দ আবার মানুষের ব্যবহৃত শব্দ। কোন শব্দের উপদেশ করা হবে? এই আশঙ্কা মহাভাষ্যকার নিজেই উঠিয়েছেন “কেবাং শব্দানাম্”। এই বাক্যে। এই শাস্ত্রে [ব্যাকরণে] কাক প্রভৃতির শব্দের স্তাপন করা হবে না, কিন্তু লৌকিক শব্দের ও বৈদিক শব্দের। লোকে বিদিতঃ [জ্ঞাতঃ] এইরূপ বর্ণে

* পাঠটীকা :—মহাভাষ্যে ‘তাবৎ’ এই একটি অবার পদ প্রযুক্ত হয়েছে, তার কোন অর্থ নাই। ঐ শব্দট বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত হয়েছে। বাক্যের প্রতিমার্থে সম্পাদনের ক্ষণটি উহার প্রয়োগ। আবার এই ‘তাবৎ’ শব্দের ‘আদৌ’ অর্থাৎ প্রথমে এইরূপ অর্থও ধরা যেতে পারে। তাতে অর্থ হবে—প্রথমে লৌকিক শব্দ দেখান হচ্ছে। তারপর “বৈদিকাস্থঃ খবপি” এখানে ‘খবপি’ শব্দ দেখা যাচ্ছে। ওটা একটা শব্দ নয় কিন্তু ‘খলু’ ও ‘অপি’ এই দুটি অবার শব্দের সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ হয়েছে। এই দুটি শব্দও বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত। কোন অর্থ নাই। অথবা খলু ও অপি এই দুটি শব্দের সম্মিলিত অর্থও ধরা যেতে পারে। তাতে অর্থ হয় এই যে—বৈদিক শব্দও [প্রদর্শিত হচ্ছে]।

অথবা লোকে ভবঃ [ব্যবহৃতঃ] এইরূপ অর্থে লোক শব্দের উত্তর ঠিক প্রত্যয় করে লৌকিক শব্দ এখানে সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে—মানুষেরা যে শব্দ জানে বা ব্যবহার করে। অবশ্য এখানে অপভ্রংশকে বাদ দিয়ে মানুষের ব্যবহৃত সাধু অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাশব্দকেই মহাভাষ্যকার লৌকিক কথা ছাড়া যে বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে—শব্দানুশাসন মানে সাধু শব্দের জ্ঞাপন। লোকব্যবহারে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই সকল শব্দ লৌকিক শব্দ। আর যে সকল শব্দ কেবল বেদেই প্রযুক্ত হয় সেগুলি বৈদিক শব্দ। প্রশ্ন হতে পারে মহাভাষ্যকার প্রথমে “লৌকিকানাং” এই কথা বললেন কেন? বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ বলে গুরুত্ববশত বৈদিকশব্দের প্রথমে উল্লেখ করা উচিত ছিল? তাব উত্তর এই যে লৌকিক শব্দের ব্যবহার সর্বদা হয়, এই জ্ঞাত লৌকিক শব্দ আমাদের সুপরিচিত, আমাদের বুদ্ধিতে সন্নিহিত। এই সান্নিধ্যবশত প্রথমে লৌকিক শব্দের উল্লেখ করে পরে বৈদিক শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। লোকব্যবহারে যে সকল শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তার আত্মপূর্ণী অর্থাৎ ক্রমের নিয়ম নাই। যেমন ‘গৌরস্তি’ এও যেমন ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ “অস্তি গোঃ” এই রূপও ব্যবহৃত হয়। ঐ উভয় ব্যবহারই শুদ্ধ। এই জ্ঞাত লৌকিক শব্দের উদাহরণ দেখাতে গিয়ে ভাষ্যকার কতকগুলির পদের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে গো শব্দটি মঙ্গল বাচক এবং বহু অর্থের বোধক বলে প্রথমে “গোঃ” এই পদের উল্লেখ করেছেন। এইরূপ পরের উল্লেখ থেকে লৌকিক সংস্কৃত বাক্যকেও শব্দ বলে বুঝে নিতে হবে।

কিন্তু বেদে পদের আত্মপূর্ণী বা ক্রম নিয়ত বলে ‘অগ্নিমীলে পুরোহিতম্’ ইত্যাদিরূপে বাক্যের প্রয়োগ করেছেন। “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্” বললে এই বাক্যের যেমন বেদত্ব থাকে, ‘পুরোহিতম্ অগ্নিমীলে’ বললে কিন্তু ঐ বাক্যের আর বেদত্ব থাকে না। কারণ বৈদিক বাক্য নিয়তক্রম বিশিষ্ট। এইজন্ত ভাষ্যকার বৈদিক শব্দের উদাহরণ প্রদর্শনে নিয়তক্রমযুক্ত বেদবাক্যের উল্লেখ করেছেন, কেবল কতকগুলি বৈদিক পদের উল্লেখ করেন নাই। এথেকে বুঝা যায় যে পূর্ববর্তী গুরুশিষ্য পরম্পরায় যে ক্রমে বেদবাক্যের উচ্চারণ চলে আসছে ঠিক সেইরূপ উদাত্তাদি স্বরসংযুক্ত উচ্চারণেই বেদের বেদত্ব রক্ষিত হয়, অন্তথা হয় না। এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভি-

হতে পারে এই যে, ভাষ্যকার বৈদিকশব্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে বৈদিক মন্ত্রের উদাহরণ দিয়েছেন [বৈদিক] ব্রাহ্মণ বাক্যের উদাহরণ দিলেন না কেন? মন্ত্রেরও যেমন বেদস্থ আছে ব্রাহ্মণেরও সেইরূপ বেদস্থ আছে। আপত্ত্বয় বলেছেন—“মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো বেদনামধেয়ম্।” আর ভাষ্যকারও ব্রাহ্মণের বেদস্থ স্বীকার করেন। নতুবা তিনি “ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ বডভো বেদোহুধ্যোয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি।” এই ব্রাহ্মণবাক্যকে “আগমঃখৰ্ণপি” বলে উদাহরণরূপে উল্লেখিত করলেন কি করে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে মহাভাষ্যকারের মতে বেদ বিভিন্ন ঋষিপ্রণীত। তার মধ্যে মন্ত্রগুলিই আগে রচিত হয়েছে, পরে ব্রাহ্মণবাক্য রচিত হয়েছে। তাছাড়া যজ্ঞাদিতে মন্ত্রোচ্চারণ করেই অহুষ্ঠান হয়, ব্রাহ্মণ বাক্যের উচ্চারণ করে অহুষ্ঠান বা অর্থের স্বরণ করা হয় না। এইহেতু মন্ত্রের প্রামাণ্য অধিক। ব্রাহ্মণবাক্য সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দি বলে মন্ত্রের উপজীবক [আশ্রিত]। এই হেতু ভাষ্যকার মন্ত্রেরই উদাহরণ বলেছেন। আর বেদকে যারা অপৌরুষেয় বলে স্বীকার করেন তাঁদের মতে যদিও বেদ নিত্য তথাপি মানুষের মাঝে প্রথমে মন্ত্রগুলি অভিব্যক্ত হয়েছে, তারপর ব্রাহ্মণের অভিব্যক্তি। এই হিসাবে এবং যজ্ঞাদিতে মন্ত্রের প্রাধান্যবলে মন্ত্রবাক্যই বৈদিকশব্দের উদাহরণরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আর একটা প্রশ্ন স্বতই উদিত হয় এই যে—সর্বত্র বেদের ক্রমে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এইভাবে উল্লিখিত হয়। মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে উক্ত ক্রমই দেখা যায়। ভাষ্যকার সেই ক্রমকে পরিত্যাগ করে বৈদিক শব্দের উদাহরণ প্রদর্শনে অথর্ব, যজুঃ, ঋক্ ও সাম—এই ক্রম দেখিয়েছেন কেন? এর উত্তরে বৈয়াকরণগণ বলেন যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যজ্ঞ দুই প্রকার—শ্রৌত ও স্মার্ত। বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে যজ্ঞের বিধি নির্দেশ করা হয় তার নাম শ্রৌতযজ্ঞ। গৃহসূত্রে বিহিত যজ্ঞের নাম স্মার্তযজ্ঞ। যজ্ঞীয় অগ্নি আবার প্রধানভাবে তিনপ্রকার—আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণায়ি। এই তিন অগ্নিকে ত্রেতা বলে। যিনি বেদবিধি অনুসারে ত্রেতাগ্নির আধান করেন তিনি শ্রৌতযজ্ঞের অধিকারী হন। যিনি লৌকিক অগ্নি অর্থাৎ গৃহসূত্রপ্রতিপাদিত স্মার্ত অগ্নির আধান করেন তিনি শ্রৌতযজ্ঞে অধিকারী হন না কিন্তু স্মার্তযজ্ঞে অধিকারী হন। শ্রৌতযজ্ঞে যজুঃ, ঋক্ ও সামবেদের উপযোগিতা আছে, অথর্ববেদের কোন উপযোগিতা নাই। কিন্তু শ্রৌতযজ্ঞের উপযোগিতা

অগ্নিকুণ্ড, বেদি প্রভৃতির নির্মাণের পূর্বে অথর্ববেদের উপযোগিতা আছে। অগ্নিকুণ্ড, বেদি এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋষিগণের উপবেশনের স্থান—এই সকলকে যাজিক পরিভাষায় বিহার বলে। আবার অথর্ববেদে অভিচার শাস্তি প্রভৃতি কর্মেরও বিধান আছে। বিহার নির্মাণের পূর্বে ব্রাহ্মস গিশাচ প্রভৃতি ষে কে বে যজ্ঞের বিঘ্ন হয়, সেই সকল বিঘ্ন দূর করবার জন্য শাস্তিকর্ম করতে হয়। যজ্ঞ আরম্ভ করবার পূর্বে যজ্ঞের উপযোগী বিহারনির্মাণ করতে, হয়। বিহার নির্মাণের পূর্বে শাস্তিকর্ম করতে হয়। এই শাস্তিকর্মের জন্য অথর্ববেদেব প্রয়োজন। অতএব যজ্ঞাঙ্কুরান্নের পূর্বেই অথর্ববেদের উপযোগিতা আছে বলে মহাভাষ্যকার প্রথমে অথর্ববেদের মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। যজুর্বেদে আধ্বষ্যব অর্থাৎ অধ্বযুর কর্তব্য বলা হয়েছে। অধ্বযু'ই প্রথমে যজমানকে দীক্ষিত করেন। “অধ্বযু'র্গৃহপতিং দীক্ষয়িত্বা” ইত্যাদি বেদে অধ্বযু'র যজ্ঞে, প্রথম কর্তব্যতার কথা বলা আছে। এই অধ্বযু'র কর্ম যজ্ঞে প্রধান ব্যাপার। আধ্বষ্যব যজুর্বেদে বিহিত হয়েছে। আবার নিত্য কর্তব্য অগ্নিহোত্রহোম কেবল যজুর্বেদের [মন্ত্রের] দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই হেতু ভাষ্যকার অথর্ববেদের উল্লেখের পর ঋক্ ও সামের পূর্বে যজুর্বেদের উল্লেখ করেছেন। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি ইষ্টিতে [ঐষবিদ্যাক যাগবিশেষ] আধ্বযবের সঙ্গে হোত্রকর্মেরও সমাবেশ আছে, এই হোত্রকর্ম ঋগ্বেদের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয় বলে যজুর্বেদের পর ভাষ্যকার ঋগ্বেদের উল্লেখ করেছেন। অগ্নিষ্টোম জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি সোমযাগে আধ্বষ্যব ও হোত্রের সঙ্গে ঐদগাত্রকর্ম অর্থাৎ সামবেদের কর্মও বিহিত হয়েছে। এইজন্য ঋগ্বেদের পর সামবেদের উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষ্যকার এইরূপ গূঢ় অভিপ্রায়বশতই প্রসিদ্ধ ক্রমঃ পরিত্যাগ করে এইরূপ ক্রমের উল্লেখ করেছেন। কুমারিল ভট্ট তত্ত্ববর্তিকের অথর্ববেদের বেদত্ব অস্বীকার করেছেন। এটা ভট্টপাদের প্রৌচিবাদ বলে মনে হয়। নতুবা ভট্টপাদের মত এতবড় আন্তিক কি করে বললেন। বেদেই সর্বত্র অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। আর অথর্ববেদের মহাবাক্য “অমমাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য মাণ্ডুক্যোপনিষদের ব্যাখ্যা করে সেই মহাবাক্যের কথা বলেছেন। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট শব্দপ্রকরণে কুমারিলের উক্ত মত খণ্ডন করে অথর্ববেদের বেদত্বের উল্লেখ করেছেন। মহাভাষ্যকার প্রথমেই অথর্ববেদের উল্লেখ করে এখানে তার বেদত্বের স্বীকার করেছেন। ৩৥

মূল

অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ ? কিং বস্তুং সান্নালান্দূল-

ককুদধুব্রবিষাণ্যর্করূপং স শব্দঃ । নেত্যাহ ।

দ্রব্যং নাম তৎ । বস্তুর্হি তদ্বিস্তৃতং চেষ্টিতং

নিমিষিতমিতি স শব্দঃ ? নেত্যাহ । ক্রিয়া

নাম সা । বস্তুর্হি তচ্ছূক্লো নীলঃ কপিলঃ

কপোত ইতি স শব্দঃ ? নেত্যাহ । গুণো নাম

সঃ । বস্তুর্হি তন্ত্বিন্নেষভিন্নং ছিন্নেষচ্ছিন্নং সামান্য-

ভূতং স শব্দঃ ? নেত্যাহ । আকৃতির্নাম সা । ৩ ॥

অনুবাদ—“গৌঃ” এই স্থলে কোনটি শব্দ ? যে বস্তুর সান্না [গলকষল] লান্দূল [লেজ] ককুদ [কুঁড়ি] খুব ও বিষণ [শিং] আছে সেই বস্তুটি কি শব্দ ? না । এই উত্তর বলছেন । সে বস্তুটি দ্রব্য । তা হলে কি যা, ইন্দিত [ইসারা] চেষ্টিত, [চেষ্টা] এবং নিমিষিত [নিমেষ] তাই শব্দ ? না । এই উত্তর বলছেন । সেগুলির প্রত্যেকটি ক্রিয়া । তা হলে যা শুক্ল নীল, কপিল, কপোত তাই শব্দ ? না । এই উত্তর বলছেন । সেগুলি গুণ । তাহলে কি বিভিন্ন গরুতে অভিন্ন, গোর বিনাশ হলেও যার বিনাশ হয় না, সকল গরুতে সামান্যরূপে অর্থাৎ সাধারণভাবে অবস্থিত তাই শব্দ ? না । এই উত্তর বলছেন । সেটি আকৃতি [জাতি] ॥ ৩ ॥

শব্দার্থ—“অথ গৌঃ” ইত্যাদি মূলের “অথ” শব্দটির অর্থ অনন্তর । অথবা এখানে প্রশ্ন বুঝাবার জন্য অথ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে । অথ এই অব্যয়টি প্রশ্নের দ্ব্যোতক । উহার এখানে কোন বাচ্য অর্থ নাই । বাক্যে প্রযুক্ত হলে প্রশ্ন বুঝায় । লৌকিক শব্দের মধ্যে ভাষ্যকার প্রথমেই “গৌঃ” শব্দের উচ্চারণ করেছেন বলে তারই উল্লেখ এখানে করেছেন । তার মানে “গৌঃ” এই নির্দিষ্ট শব্দ নয় । কিন্তু শব্দ বলতে কাকে বুঝায়—এই অভিপ্রায়েই উহা উল্লিখিত হয়েছে ।

সান্না = গরুর গঁতার নীচে লম্বমান মাংসখণ্ড, যাকে গলকষল বলা হয় ।
ককুদ = গরুর কাঁধের উপর যে মাংসপিণ্ড থাকে তাই, লৌকিক ভাষায় কুঁড়ি
বিষণ = শিং । নেত্যাহ = না, এই কথা বলছেন । কে বলছেন ? ভাষ্য-

কায়ই বলছেন, তবে তিনি “আমি বলছি” এইরূপ না বলে নিজেকে প্রথম পুরুষরূপে পরোক্ষভাবে বলছেন; বৈয়াকরণের সিদ্ধান্তরূপে। প্রত্যেক প্রক্ষেপে ভাষ্যকার যে “যৎ” শব্দের নপুংসকে প্রয়োগ করেছেন— সেটা সামান্যে অর্থাৎ সামান্য ভাবে কোন অর্থ বুঝাতে শব্দ নপুংসকলিঙ্গ হয় এই নিয়মে নপুংসকের প্রয়োগ করেছেন। স গুণঃ, সা ক্রিয়া ইত্যাদি উত্তরবাক্যে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে তৎ শব্দের লিঙ্গের প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইঙ্গিতম্=যার দ্বারা মনের অভিপ্রায় সূচিত হয় এরূপ শরীরব্যাপারকে ইঙ্গিত বলে।

চেষ্টিতম্=শরীরের সাধারণ ক্রিয়ার নাম চেষ্টা। নিমিষিতম্=চক্ষুর পলক ফেলা প্রভৃতি ব্যাপারের নাম নিমিষিত বা নিমেষ। কপিল=পিঙ্গল বর্ণ।

কপোত=চিহ্ন বর্ণ। ছিন্নেষু=(এখানে) বিনষ্ট হলে।

অঙ্গিন্নম্=অবিনষ্ট।

সামান্যভূতম্=সমানত্বপ্রাপ্ত। আকৃতিঃ=(এখানে) জাতি।

মীমাংসাদর্শনে ভাষ্যে ও বার্তিকপ্রভৃতি গ্রন্থে আকৃতি শব্দটি জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “আক্ৰিয়তে অভিব্যক্তে অসৌ” এইরূপ কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার প্রত্যয় করে অবয়ব সংযোগাদি দ্বারা যা অভিব্যক্ত হয় তা আকৃতি। অবয়ব সন্নিবেশদ্বারা জাতি অভিব্যক্ত হয় -। অতএব গোষাদি জাতিকে মীমাংসা-দর্শনে আকৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়। ত্রায়দর্শনে “জাত্যাংকৃতিব্যক্ত্যঃ পদার্থঃ” [ত্রাঃসূঃ ২।২।৬৮] আকৃতি শব্দের অর্থ কয়ী হয়েছে সংস্থান=অবয়বসন্নিবেশ অর্থাৎ অবয়বসম্বন্ধ। [শব্দশক্তিপ্রকাশিকা-২৩ কারিকা] “জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ” [পাঃ সূঃ ৪।১।৬৩] এই সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি “আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ” বলে আকৃতিশব্দের আকার অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশ অর্থ করেছেন। তবে মহাভাষ্যের অন্তর্গত অধিকাংশস্থলেই মহাভাষ্যকার জাতি অর্থে আকৃতি শব্দের প্রয়োগ করেছেন ॥ ৩ ॥

বিকৃতি—“গৌরিত্যজ কঃ শব্দঃ” “গৌঃ” এই স্থলে কোন্টি শব্দ? এই প্রশ্ন উঠিয়েছেন ভাষ্যকার। এই প্রশ্নটি কেবল “গৌঃ” এই অক্ষর সমূহকে অবলম্বন করে হয় নাই। কেবলমাত্র অক্ষরসমূহই যদি প্রশ্নের বিষয় হতো, তাহলে সেই অক্ষর গুলি শ্রোত্রেগ্রন্থদ্বারা প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তার সঙ্গে অন্য বস্তু

জ্ঞান না থাকায় কোন সন্দেহ হোতো না, সন্দেহ না হলে জিজ্ঞাসা হতো না। জিজ্ঞাসা না হলে প্রশ্নও হতে পারতো না। এই জন্ত স্বীকার করতে হবে যে প্রশ্নটি—অক্ষরসমূহকে লক্ষ্য করে করা হয় নাই। কিন্তু “গৌঃ” শব্দ উচ্চারণ করলে আমাদের বুদ্ধিতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান তিনটি পদার্থ অবিবিক্তরূপে [বেন মিশ্রিত ভাবে] ভাসমান হয়।

আবার অর্থটিও পরিত্যক্ত ভাবে সাধারণের প্রতীত হয় না। গোপদার্থটি দ্রব্য বলে তাতে গুণ, ক্রিয়া ও জ্ঞাতি বিद्यমান থাকে। দ্রব্যের জ্ঞান হতে গেলেই তাতে বিদ্যমান রূপাদি গুণ, ইঙ্গিত প্রভৃতি ক্রিয়া এবং সেই দ্রব্যে বিद्यমান জ্ঞাতিকে, নিয়েই দ্রব্যের জ্ঞান হবে। গুণ প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে দ্রব্যের জ্ঞান হয় না। মহাভাষ্যকারের মতে শব্দের দ্বারা দ্রব্যের প্রতীতি হলেই দ্রব্যের সঙ্গে গুণাদির অভেদ থাকায় দ্রব্যের জ্ঞানের সময় কেবল দ্রব্যের জ্ঞান হয় না কিন্তু গুণাদি দ্বারা সন্নিশ্চিত রূপেই দ্রব্যের জ্ঞান হয়। এরূপে দ্রব্যের জ্ঞানের সঙ্গে দ্রব্যের বাচক শব্দও জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে—ইহা মহাভাষ্যকার প্রভৃতি বৈয়াকরণ আচার্যদের মত। গুণাদির সহিত দ্রব্যের যেমন অভেদ আছে সেইরূপ বাচকশব্দের সহিতও দ্রব্যের অভেদ আছে। অবশ্য বাচকশব্দের সহিতও গুণাদিরূপ অর্থের [দ্রব্যের] সহিত পরস্পর ভেদাভেদ আছে—ইহা মহাভাষ্যকারা হুদায়ী বৈয়াকরণগণের মত। সূত্ররাং গুণ, ক্রিয়া, জ্ঞাতি ও বাচক শব্দের সহিত দ্রব্যের ভেদাভেদ থাকায় গোশব্দ উচ্চারণ করলে অর্থের জ্ঞান, জ্ঞাতি, গুণ, ক্রিয়া ও শব্দের সহিত দ্রব্যের জ্ঞান হয়। এগুলিকে পরিত্যাগ করে কেবল দ্রব্যের জ্ঞান হয় না। একটি গ্রাম বা যুক্তি আছে “তদভিন্নাভিন্নস্য তদভিন্নত্বম্।” ইহার অর্থ হচ্ছে দুই বা তাহার অধিক বস্তু যদি কোন এক বস্তুর সহিত অভিন্ন হয়, তাহলে ঐ দুই বা অধিক বস্তুগুলিও পরস্পর অভিন্ন হবে। গোশব্দের দ্বারা যেখানে দ্রব্যের প্রতীতি হয়, সেখানে গুণ, ক্রিয়া, জ্ঞাতি ও শব্দ উক্ত প্রতীতির বিষয় হওয়ায়, দ্রব্যের সঙ্গে গুণাদির অভেদ থাকায় গুণ, ক্রিয়া, জ্ঞাতি ও শব্দের পরস্পর অভেদ প্রাপ্তি হয়ে যায়। সূত্ররাং গুণ, ক্রিয়া, জ্ঞাতি, শব্দ ও দ্রব্য এগুলি পরস্পর অভিন্ন ভাবে একটি জ্ঞানের বিষয় হয়ে যাওয়ায় তাহাদের মধ্য থেকে শব্দকে সুহসা পৃথক করা যায় না। মহাভাষ্যকার কেবল শব্দটিকে গুণাদি থেকে পৃথক করে বুঝাবার জন্ত—“গৌরিত্যজ্জ কঃ শব্দঃ” এই রূপে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে বা বলা হয়েছে, তা আলোচনা করলেও উক্তসিদ্ধান্তই সূচিত হয়। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, “দ্রব্যং নাম তৎ” সেটি দ্রব্য। মীমাংসকের মতে শব্দ দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত। যদিও শব্দের দ্রব্যত্বমতটি কুমারিলের সম্প্রদায়েই এখন প্রচলিত তথাপি পূর্বেও মীমাংসকদের মধ্যে এই মত প্রচলিত ছিল। এই মতের অস্তিত্ব স্বীকার করলে, শব্দপদার্থটি দ্রব্য হওয়ায় “দ্রব্যং নাম তৎ” এই উত্তরের দ্বারা সাম্রালাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট বস্তুর শব্দই নিষিদ্ধ হতে পারে না। কারণ শব্দও দ্রব্য বলে সেই সাম্রাদিবিশিষ্টবস্তুর শব্দ হবে না, এর কোন হেতু নাই। ত্রায় ও বৈশেষিক মতে শব্দকে গুণ স্বীকার করা হয় বলে ‘গুণো নাম সঃ’ সেটিগুণ এই উত্তরের দ্বারা শব্দ গুণাদি রূপ গুণ নয় = এইভাবে নিষেধ করা সঙ্গত হয় না। কেবল ত্রায় বৈশেষিক মতেই যে শব্দ গুণ তা নয়। মহাভাষ্যকারের মতেও শব্দ ‘গুণ। মহাভাষ্যকার “তস্ম ভাবস্তুতলো” [৫।১।১১০] সূত্রে বলেছেন—“শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাণ্ডাঃ” শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এগুলি গুণ। সূত্রাং গুণ হলেও শব্দ হতে পারে, বেহেতু শব্দ গুণ হতে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ নয়। অতএব ভাষ্যকারের—উক্ত উত্তর দুটি সঙ্গত হচ্ছে না। এর উত্তরে বলা যায় = ভাষ্যকার কোন স্থলেই শব্দকে দ্রব্য বলে উল্লেখ করেন নি। সূত্রাং তাঁর মতে শব্দ দ্রব্য নয়। তা হলে ‘দ্রব্যং নাম তৎ’ সেটি দ্রব্য—এই কথায় = সাম্রালাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট বস্তুর শব্দের আশঙ্কা থাকে না। এইভাবে = প্রথম উত্তর সঙ্গত হয়। কিন্তু “গুণো নাম সঃ” সেটি গুণ = এই উত্তরের দ্বারা গুণাদিরূপের শব্দই নিবারণিত হয় না। এইজন্য ‘গুণো নাম সঃ’ এই অংশের পূর্বে “ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহঃ” পদটির অধ্যাহার করে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাতে সমগ্র উত্তর বাক্যটি হবে—“ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহো গুণো নাম সঃ” সেটি [গুণাদি] ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহ গুণ, কিন্তু শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ গুণ। গুণাদি রূপ গুণ হলেও চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ। শব্দটি শ্রোত্রেগ্রাহ। অতএব গুণাদিরূপ শব্দ হতে পারে না। যদি শব্দকে দ্রব্য বলে মনে করা হয় তা হলে প্রথম উত্তরেরও পূর্বে অর্থাৎ “দ্রব্যং নাম তৎ” এর পূর্বে “ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহম্” পদের অধ্যাহার করে উত্তর দিতে হবে। তাতে উত্তরটি হবে এইরূপ সাম্রালাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট পদার্থটি চক্ষু বা স্বরূপ ভিন্ন ইন্দ্রিয় গ্রাহ দ্রব্য। শব্দটি কিন্তু শ্রোত্রেগ্রাহ দ্রব্য। সূত্রাং, শব্দ দ্রব্য হলেও সাম্রাদি বিশিষ্ট বস্তু হতে পারে না।

তৃতীয় উত্তরে ‘ক্রিয়া নাম স্য’ সেটি ক্রিয়া এই অংশে অস্থাপপত্তি নাই। ইঙ্গিত প্রভৃতি ক্রিয়া। কিন্তু শব্দ ক্রিয়া একথা কেউই বলেন না। স্তত্রাং ইঙ্গিত প্রভৃতি ক্রিয়া শব্দ হতে পারে না।

চতুর্থ উত্তরে শব্দের জাতিই নিবেদন করা হয়েছে। শব্দকে কেউ জাতি বলেন না। চতুর্থ প্রশ্নে “সামান্তভূতম্” শব্দটি আছে। কৈয়ট মহাভাষ্য প্রদীপে তার অর্থ করেছেন ‘সামান্তসদৃশ’। আর তার ব্যাখ্যায় বলেছেন—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিনপদার্থে সত্তা জাতি থাকে। সত্তা জাতি গোত্রাদি সকল জাতির ব্যাপক। এই হেতু এই সত্তা কেবল সামান্ত [জাতি] নয়, কিন্তু মহাসামান্ত বা মহাজাতি। এই সত্তা জাতিটি ভাষ্যের প্রশ্নে গোত্রাদি জাতির উপমান রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। সামান্তভূতম্ = সামান্তমিব [সত্তারূপ] সামান্তসদৃশ [গোত্রজাতি]। কিন্তু নগেশ ভট্ট কৈয়টের এই ব্যাখ্যা অস্বীকার করে বলেছেন—এখানে [সামান্তভূতম্‌স্থলে] উপমান-উপমেয় ভাব কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নাই। রুদ্রিরদৈচ [১।১।১] স্তত্রের মহাভাষ্যে “প্রমাণভূত” প্রয়োগ আছে। সেখানে কৈয়ট প্রমাণ শব্দকে ভাব প্রধান রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। প্রমাণ শব্দের প্রামাণ্য অর্থ গ্রহণ করে—ভূত শব্দটিকে প্রাপ্ত্যর্থক চুরাদিগণীয় ভূধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ান্ত রূপে সিদ্ধ করে—প্রমাণ ভূত শব্দের অর্থ করেছেন প্রামাণ্যপ্রাপ্ত। (১২)]। সেখানকার মত ‘সামান্তভূত’ শব্দটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সমান শব্দটিকে “চাতুর্বর্ণ্যাদি” আকৃতিগণের মধ্যে ধরে তার উত্তর স্বার্থে ‘ষ্যঞ’ [৫।১।২৪ স্তত্রের ১ সংখ্যক বার্তিক ও তার কৈয়ট এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভাবতদ্বিত প্রকরণ] করলেও সামান্ত শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয় ‘সমান’। তারপর “সামান্তভূত” স্থলে সমানার্থক সামান্ত শব্দটিকে ভাবপ্রধান নির্দেশ করে, ‘ভূত’ শব্দের সহিত বিত্তীয়াতৎপুরুষ বা স্থপস্থপা সমাস করে—সামান্তভূত শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। তার অর্থ হয় সমানত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ সাধারণত্বপ্রাপ্ত। গোত্রজাতিটি তার সকল আশ্রয়ে [গরুতে] একভাবে থাকে বলে তাকে সমানত্ব প্রাপ্ত বলায় কোন বাধা নাই। এখানে সমান শব্দের উত্তর ভাবে ষ্যঞ প্রত্যয় করলেও সামান্ত শব্দ সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাতে সামান্ত শব্দটি বিশেষ্য হয়ে বাবে। কিন্তু এখানে

(১২) প্রমাণভূত ইতি। প্রামাণ্যঃ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। চূপ্রাপ্ত্যভিভাষ্য আধ্বাব্যেতি নিভ্ভাব্য শব্দে রূপম্। বৃত্তিবিবরে চ প্রমাণশব্দঃ প্রামাণ্যে বর্ততে। মহাভাষ্যপ্রদীপঃ ১।১।১।

সামান্য শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সমান শব্দের স্বার্থে ণ্ড প্রত্যয় করলে তার বিশেষণত্বটি রক্ষিত হয়। অবশ্য ভাবে ষাণ্ড প্রত্যয় করেও সমান্তর ভূত শব্দ র সামান্যপ্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ করা যায়। (৩)।

এখানে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে এই যে, ভাষাকার শব্দের স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে শব্দের দ্রব্যত্ব, ক্রিয়াত্ব, গুণত্ব ও জাতিত্ব ক্রমে ক্রমে নিবারণ করেছেন। কিন্তু এই ক্রমে নিষেধ না করে অতঃপর করে কি হানি হোতো? এর উত্তরে বলা যায় গুণ, ক্রিয়া ও জাতির আশ্রয় হচ্ছে দ্রব্য। এইজন্য গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির অপেক্ষা দ্রব্যের প্রাধান্য আছে (১৪)। অতএব প্রথমে শব্দের দ্রব্যত্বের আশঙ্কা করা হয়েছে। তারপর শব্দ স্পর্শাদি যে সকল গুণ জন্ত পদার্থ ক্রিয়া তাদের একটি কারণ। কার্যের অপেক্ষা কারণের পূর্ববর্তিতা থাকায় দ্রব্যের পরে অথচ গুণের পূর্বে শব্দের ক্রিয়াত্বের আশঙ্কা করা হয়েছে। ক্রিয়ার পর গুণের আশঙ্কা করে শেষে জাতির আশঙ্কার হেতু এই যে জাতি দ্রব্য ক্রিয়া ও গুণ এই তিনে আশ্রিত। এই জন্ত পূর্বে জাতির আশ্রয় বলে তারপর জাতির কথা বলা হয়েছে। “কিং যন্তং” ইত্যাদিস্থলে “যন্তং” এই দুই শব্দকে মিলিত ভাবে শব্দের সমানার্থকরূপে ব্যাখ্যা করতে হবে। অথবা ‘তং’ শব্দটিকে।

স্বতন্ত্র ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এখানে প্রসিদ্ধ অর্থে তৎশব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নগুলিতেও অনুরূপ অভিপ্রায় বুঝতে হবে। “কিং যন্তং.....” এই স্থলে প্রশ্নবাক্যে প্রথমে ক্রীবাঙ্কুরের দ্বারা নির্দেশ করে পরে “স শব্দঃ” এইভাবে পুংলিঙ্গের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমে যৎশব্দের দ্বারা যে বস্তুকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে পরবর্তিস্থলে তৎশব্দের দ্বারা সেই বস্তুকে নির্দিষ্ট করায়, এই দুটি ‘যৎ’ তৎ শব্দের সমান লিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। অথচ তা না করিয়ে ভাষ্যে ভিন্নলিঙ্গের নির্দেশের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে—যৎ, তৎ প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ উদ্দেশ্যও বিধেয়ের একত্ব প্রতিপাদন করে। এইজন্য ঐ সকল সর্বনাম শব্দ

(১০) গুণবচনত্রয়াদিভ্যঃ কথঞ্চিৎ ৫।১।১২৪।

(১৪) গুণবচনত্রয়াদিভ্যঃ কথঞ্চিৎ ৫।১।১২৪। গুণানামাত্রয়ো এব্যমিতার্থঃ। ৫৫৮

উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের লিঙ্গকে গ্রহণ কর্তে সমর্থ। বক্তার ইচ্ছানুসারে কোন স্থলে উদ্দেশ্যের এবং কোন স্থলে বিধেয়ের লিঙ্গে উহাদের প্রয়োগ হয় (১৫)। সুতরাং একস্থলে উদ্দেশ্যের প্রাধান্ত্য বিবক্ষায় নপুংসকলিঙ্গের এবং অন্যস্থলে বিধেয়ের প্রাধান্ত্য বিবক্ষায় পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের নির্দেশ করা হয়েছে ॥ ৩ ॥

মূল

কস্ত্বি শব্দঃ ? যেনোচ্চারিতেন সান্নালাঙ্গুল-

কক্‌দধুরবিষাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তা হলে কোনটি শব্দ ? যাহা উচ্চারিত [অভিব্যক্ত] হলে, সান্না, লাঙ্গুল, কক্‌দ, ধুর ও শৃঙ্গ বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাই শব্দ ॥ ৪ ॥

বিশৃতি—এখানে ভাষ্যকার যে ভাবে বলেছেন, তাতে সহজে মনে হয় যে বর্ণসমূহই শব্দ। কারণ লোকে বর্ণকে উচ্চারণ করে। যাহা উচ্চারিত হলে সান্নালাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয় তাহা শব্দ। “গ্, ঙ্,” উচ্চারিত হলে সান্নাদিবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়। সুতরাং গকার ঙকার ও বিসর্গ এই বর্ণগুলিই শব্দ, এইরূপ অর্থ সহজেই প্রতীত হয়।

কিন্তু মহাভাষ্যকার “তপস্বত্‌কালস্ত” [১।১।২—৭০] শব্দে স্ফোটকেই শব্দস্বরূপ বলেছেন। ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে ভাষ্যের মত ব্যাখ্যা করে শব্দের স্ফোটস্বরূপতা প্রতিপাদন করেছেন। সুতরাং “যেন উচ্চারিতেন” এর সহজ অর্থ, যা উচ্চারিত হলে—এরূপ অর্থ গৃহীত হতে পারে না। এইজন্য এর ব্যাখ্যায় কৈয়ট বলেছেন “প্রকাশিতেন” যাহা প্রকাশিত হলে। ‘অভিব্যক্তির’ অর্থ জ্ঞান, অভিব্যক্তের অর্থ জ্ঞানবিষয়তা—। জ্ঞানবিষয়তাপ্রাপ্ত-আর প্রকাশিত একই অর্থ। কৈয়ট বলেছেন—(১৬)

(১৫) উদ্ভিগ্‌মান প্রতিনির্দিষ্টাণামন্যৈরেকত্বমাণায়ত্তি সর্বনামানি পর্ধায়েণ তন্নিজ-
নুপাদত ইতি কামচরতঃ স শব্দ ইতি পুংলিঙ্গেন নির্দেশঃ। কৈয়ট। উদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ-
য়ৈরেকামাণায়ত্তং সর্বনাম পর্ধায়েণ তন্নিজভাক্ [লঘুশব্দেনুশেধর অসেকি প্রকৃতি ভাব
প্রকরণ]।

(১৬) “বৈরাগ্যবর্ণাতিবিক্রম্য পদস্য বাচকস্য বা বাচকমিচ্ছন্তি। বর্ণনায় প্রত্যেকং
বাচকেষু দ্বিতীয়াদিবর্ণোচ্চারণানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। উপপত্তিপক্ষে যোগপক্ষে ন্যায়পত্ত্যভাবাৎ
অভিব্যক্তিপক্ষে ক্রমৈবৈবাতিব্যক্ত্য। সমুদায়ভাবাৎকস্মদুপায়াচ্চানান্য বাচকেষু সরোরস
ইত্যন্যাবর্ণপ্রতিগর্ত্যবিশেষপ্রসঙ্গাত্যভাবিরূপঃ স্ফোটো নাভ্যভিব্যক্তৌ বাচকৌ বিস্তরেণ বাক্য
প দ্বায়ে বাবস্থাপিতঃ। উচ্চারিতেন প্রকাশিতেমন্তর্যঃ ॥

বৈয়াকরণের বর্ণব্যতিরিক্ত পদ বা বাক্যকে বাচক স্বাকার করেন। বর্ণকে অর্থের বাচক বললে প্রত্যেকে বর্ণ অর্থের বাচক অথবা বর্ণ সমুদায় অর্থের বাচক [এইরূপ বিকল্প হলে], যদি প্রত্যেক বর্ণকে বাচক বলা হয় তা হলে, প্রথম বর্ণ থেকেই অর্থের জ্ঞান সম্ভব হওয়ায় দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি বর্ণের আনর্থক্য হয়। আর সমস্ত বর্ণকে বাচক বললে - বর্ণের উৎপত্তিপক্ষে একসঙ্গে সব বর্ণের উৎপত্তি হতে পারে না বলে একসঙ্গে সমুদায় বর্ণের অবস্থানের অভাবে অর্থের জ্ঞান অল্পপন্ন হয়। আর বর্ণের অভিব্যক্তি স্বীকার করলেও অভিব্যক্তি ক্রমে ক্রমে হওয়ায় যুগপৎ সকল বর্ণের উপস্থিতির অভাবে অর্থজ্ঞান হতে পারে না। প্রথমে বর্ণগুলির ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্তি হয়, তারপর সমুদায় বর্ণ একটি স্থিতির বিষয় হয়ে যুগপৎ অর্থবোধ জন্মায় এই কথা বললে 'সর' 'রস' এইরূপ বিপরীত ক্রমে জ্ঞাত বর্ণ সমুদায় হতে একত্বপ অর্থের জ্ঞানের আপত্তি হয়ে যাবে। এই হেতু বর্ণ থেকে অতিরিক্ত নাদ বা ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্তি ফোটাকেই শব্দস্বরূপ বলতে হবে। সেই ফোটেই অর্থের বাচক হয়। নাপেশ ভট্ট প্রদীপোদ্যোতে মহাভাষ্যের "উচ্চারিতেন" পদের অর্থ করেছেন শরীরের ভিতর হতে অর্থঃ মূল্যধার বা নাভি হতে যে বায়ু উঠে সেই বায়ুর অভিঘাত নামক সংযোগ হলে সেই বায়ুসংযুক্ত কণ্ঠস্থান প্রভৃতির দ্বারা অবয়বক্রমে অভিব্যক্ত হয় যে বস্তু [ফোট] তার দ্বারা (১৭)। স্মৃতরাং উক্ত মহাভাষ্য পংক্তির অর্থ হচ্ছে যা অভিব্যক্ত হলে সান্নালাঙ্গুলাদি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি হয় তাহাই শব্দ।

শব্দ হতে কি ভাবে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হচ্ছে। অপর ব্যক্তির অর্থজ্ঞানের জ্ঞাত আমরা শব্দপ্রয়োগ করে থাকি। সেই শব্দ থেকে অঙ্গুরের অর্থজ্ঞান হয়। এই অর্থজ্ঞান কি ভাবে জন্মে—সে বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তন্মধ্যে ভ্রায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতাহুয়ারী পণ্ডিতগণ মনে করেন—অকার প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। উচ্চারণ প্রযত্নের দ্বারা অকারাদি বর্ণ উৎপন্ন হয়, তারপর দ্বিতীয়ক্ষেণে তাদের স্থিতি আর তৃতীয়ক্ষেণে তাদের বিনাশ হয় (১৮)। এইরূপ

(১৭) 'উচ্চারিতেনতি'—শরীরমারতাহিতকণ্ঠাদিহাসৈঃবয়বদ্বারাভিব্যক্তেন যেনেভাঃ। গম্পশাহিক মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত।

(১৮) যে সকল প্রাচীন বৈয়াকর জারমান শব্দকে শাব্দবোধের কারণ স্বীকার করতেন তাঁদের মতে শব্দ তিনক্ষণস্থায়ী। এঁদের মতে প্রথম ক্ষণে শব্দের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে শব্দের প্রত্যাক ও শব্দের শক্তিস্বরূপ [সমুহালব্ধরূপ] একসঙ্গে হয়ে থাকে, তৃতীয় ক্ষণে শব্দ হতে শব্দবোধের উপযোগী গণ্যার্থের স্মরণ এবং শাব্দবোধে সহকারী আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান, যোগভ্রাতাজ্ঞান ও তৎসংজ্ঞান একসঙ্গে [সমুহালব্ধরূপে] হয়। চতুর্থক্ষেণে শব্দের নীশ ও শাব্দবোধ যুগপৎ হয়। এই মতের অভাস ভ্রায় সিদ্ধান্তমুতাবলীতে দেখতে পাওয়া যায়।

উৎপত্তি বিনাশগণ বর্ণসমূহায়ই পদ এবং এইরূপ পদ সমূহায়ই বাক্য। এই
 গায় বৈশেষিক সিদ্ধান্তে সমূহায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক থেকে সমূহায় ভিন্ন নয় বলে
 পদ বা বাক্য, বর্ণ হতে কোন অতিরিক্ত বস্তু নয়। এদের মতে অ-কার প্রভৃতি
 সব বর্ণই অসংখ্য।

জৈমিনির মতাবলম্বী অধ্বরমীমাংসকগণ অকার প্রভৃতি বর্ণের অসংখ্যতা
 স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অকার প্রভৃতি সব বর্ণের প্রত্যেকটি নিত্য
 এক ও বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপী। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানগুলিতে বায়ুর
 বিচিত্র সংযোগবশতঃ এই সকল বর্ণের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না।
 অভিব্যক্তিবিশিষ্ট বর্ণের যে সমূহায় তাহাই পদ এবং এইরূপ
 পদের যে সমূহায় তাহাই বাক্য। অবশ্য বাক্য হতে অর্থের জ্ঞান
 হয় এ বিষয়ে সকলের একমত আছে। গায় ও বৈশেষিক মতে
 দ্বিতীয় বর্ণের স্থিতিকালে প্রথম বর্ণের ধ্বংস হয়ে যায়। এইরূপ তৃতীয়
 বর্ণের স্থিতিকালে দ্বিতীয় বর্ণের ধ্বংস হয়। 'ঘট' এই শব্দে ঘ • অ • ট +
 অ এই চারটি বর্ণ আছে। 'ঘট' শব্দের অন্তিম অকারের স্থিতিকালে পরবর্তী
 তিনটি বর্ণই নষ্ট হয়ে যায়। এরপ অবস্থায় চারটি বর্ণের এককালে স্থিতির
 সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বর্ণসমূহায়ের এককালে স্থিতি না হওয়ায় চারটি
 বর্ণের যুগপৎ প্রত্যক্ষ হতে পারে না। পরবর্তী বর্ণগুলির ক্রমিক প্রত্যক্ষ হয়ে,
 সেই প্রত্যক্ষ থেকে সংস্কার উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানজনিত ঐ সংস্কারের
 সহিত অন্তিম বর্ণের যে প্রত্যক্ষ সেইটি পদের প্রত্যক্ষ। এইরূপে পদের জ্ঞান
 হয়ে থাকে। যে পদ যে যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থের সহিত সেই
 পদের একটি সম্বন্ধ আছে ইহা অবশ্যই বলতে হবে। 'ঘট' শব্দের
 সহিত ঘট পদার্থেরই এই সম্বন্ধ আছে, পট পদার্থের সহিত ঘট শব্দের
 অর্থজ্ঞানজনক সম্বন্ধ নাই। এই জন্য ঘট শব্দ থেকে ঘটের জ্ঞান হয়
 পটের জ্ঞান হয় না। শব্দ ও অর্থের এই সম্বন্ধকে শক্তি বলে। যে ব্যক্তির
 এই শক্তিজ্ঞান আছে তার পূর্বোক্তরূপে শব্দজ্ঞান হওয়ায় অর্থের উপস্থিতি হয়।
 যে দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকে—সেই সম্বন্ধের জ্ঞান থাকলে একটি
 বস্তুর জ্ঞান হলে অপর বস্তুর স্বরণ হয়। যেমন হাতীকে দেখলে মাছের
 স্বরণ হয়। এই দ্রীতিতে শব্দ থেকে অর্থের স্বরণ হয়।

মীমাংসকমতে বর্ণ নিত্য হলেও বর্ণের জ্ঞান সর্বদা থাকে না। যেমন
 ঘট বস্তুটি পূর্ব হতে বিদ্যমান থাকলেও অন্ধকারে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না। ঘটের

সহিত আলোকের সম্বন্ধ হলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। এই আলোক ঘটের অভিযাজক। এইরূপ নিত্য বর্ণগুলি সর্বদা বিজ্ঞমান থাকলেও আমাদের শ্রোত্রদেশে বাহ্যবায়ুর দ্বারা বর্ণগুলি আবৃত থাকে। যখন কোন ব্যক্তি উচ্চারণ করে তখন তার শরীরের ভিতর থেকে বায়ু উঠে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে অভিযুক্ত [সংযুক্ত] হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আদে। সেই মুখনির্গত বায়ুর সংযোগ বিভাগগুলি শ্রোত্রদেশস্থ বাহ্য বায়ুকে অপসৃত করে দেয়। তখন বর্ণ বা বর্ণসমূহাত্মক পদ বা বাক্য অভিযুক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। *এই বায়বীয় সংযোগ বিভাগরূপ অভিযাজক যখন থাকে না তখন বর্ণের অভিযুক্তি হয় না অর্থাৎ জ্ঞান হয় না। অভিযুক্তি হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান দ্বিকণস্থায়ী পদার্থ। প্রথমক্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি দ্বিতীয়ক্ষেণে স্থিতি ও তৃতীয়ক্ষেণে বিনাশ হয়। সুতরাং বর্ণ নিত্য হলেও অভিযুক্তিবিশিষ্ট বর্ণের স্থায়িত্ব দুইক্ষণ। এইজন্য পূর্বসমীক্ষাসকমতে ও বর্ণসমূহাত্মক পদের সকল বর্ণ এককালে না থাকায় (অজ্ঞাত থাকায়) যুগপৎ সকল বর্ণের প্রত্যক্ষ হতে পারে না। *সুতরাং ইহাদের মতেও একটি শব্দের [পদের] অন্তর্গত পূর্ববর্তি বর্ণগুলির অমুদ্রব থেকে যে সংস্কার জন্মে সেই সংস্কার সহিত যে অন্তিম বর্ণের জ্ঞান তাহাই পদজ্ঞান। এই পদজ্ঞান থেকে অর্থের জ্ঞান হয়। এদের মতে পদের সহিত পদার্থের প্রত্যক্ষ প্রত্যায়ক সম্বন্ধ থাকে বলে—পদের জ্ঞান হতে সম্বন্ধজ্ঞান থাকলে পদার্থের উপস্থিতি হয়। পদ প্রত্যায়ক = অর্থের বোধক। অর্থ = প্রত্যায়্য = পদের দ্বারা জ্ঞেয়।

বৈয়াকরণগণ—এই দুই মতই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন পূর্ব বর্ণের সংস্কার সহিত অন্তিম বর্ণের জ্ঞানকে পদজ্ঞান বলে স্বীকার করলে যেখানে এক একটি বর্ণের উচ্চারণ করে মধ্যে বিরাম দিয়ে পরে অন্তিম বর্ণের উচ্চারণ করা হয় সেখানেও পদজ্ঞান হতে পারে। সুতরাং সে স্থলেও অর্থজ্ঞান অনিবার্হ হয়ে পড়ে। কিন্তু এরূপ স্থলে ঐভাবে উচ্চারিত বর্ণ থেকে অর্থপ্রতীতি হয় এরূপ কেহ স্বীকার করেন না। আমাদের সেরূপ অমুদ্রবও ঐরূপ অর্থজ্ঞানের সমর্থন করে না। এইজন্য বর্ণসমূহাত্মক থেকে বৈয়াকরণেরা অর্থপ্রতীতি স্বীকার করেন না।

বৈয়াকরণ সম্প্রদায় “ফোন্ট” স্বীকার করেন। যা থেকে অর্থের জ্ঞান হয় তার নাম ফোন্ট। ফোন্ট শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থ পদটীকায় প্রদত্ত

হলো (১২)। এই ‘শ্বেট’ শব্দটি ঠিক যৌগিক শব্দ নহ্ন কিন্তু পঞ্চ প্রভৃতি শব্দের মত এটি যৌগরূপ শব্দ (২০)। বৈয়াকরণ মনীষিগণ প্রথমতঃ আটপ্রকার শ্বেট স্বীকার করেছেন। যথা—(১) বর্ণশ্বেট, (২) পদশ্বেট (সখণ্ডপদশ্বেট। (৩) বাক্যশ্বেট (সখণ্ডবাক্যশ্বেট)। (৪) অখণ্ডপদশ্বেট। (৫) অখণ্ডবাক্যশ্বেট। (৬) বর্ণজাতিশ্বেট। (৭) পদজাতিশ্বেট। (৮) বাক্যজাতিশ্বেট। এইসব শ্বেটই যে পারমাণ্বিক তা নয়। বাক্যশ্বেটকে বুঝাবার জন্য পূর্ববর্তী শ্বেটগুলি কল্পিত হয়েছে।

পচতি এই পদে ‘পচ’ ধাতু এবং ‘তি’ প্রত্যয় আছে। এদের মধ্যে ‘শপ্’ [অ] প্রত্যয় হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যবর্তী একপ প্রত্যয়কে ব্যাকরণের ভাষায় ‘বিকরণ’ বলে। বৈয়াকরণের বিকরণের ১। বর্ণশ্বেট। কোন অর্থ স্বীকার করেন না। প্রকৃতি ও প্রত্যয় মিলিতভাবে যে অর্থ প্রকাশ রূপ কার্য করে, বিকরণ সেই অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে, স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থপ্রকাশ করে না। যার [যে শব্দের] অর্থপ্রকাশ করবার শক্তি আছে অর্থাৎ যার বাচকতা আছে “শ্বেট” শব্দে তাহাদিগকে অভিহিত করা হয়। ক্রমিকবর্ণসমূহ থেকে অর্থপ্রতীতি হয় বলে ক্রমিক বর্ণসমূহ শ্বেট শব্দের বাচ্য। ইহাই হলো

(১২) স্মৃতি প্রকশেতে অর্থো অস্মাদিতি শ্বেটো বাচক ইতি যাবৎ—বৈয়াকরণভূষণসার— ৬১। স্মৃতি অভিযাত্তীভবতি অর্থোহস্মাদিতি শ্বেটো। নামান্বায়ক শব্দঃ, বহুলবাদপাদানে ঘঞ্ [বৈয়াকরণভূষণসারদর্পণটীকা]। বা থেকে অর্থ অভিযাত্ত হয়, তার নাম শ্বেট। স্মৃতি ধাতুর উত্তর অপাদানে ঘঞ্। এখানে দর্পণকার বাহুল্যবাদপাদানে ঘঞ্ বলেছেন। তবে অকর্তৃরি। চ কারকে গজ্ঞায়াম্, [‘পাঃ ২২ ৩৩ ১২’] এই সূত্র দ্বারা ঘঞ্ প্রত্যয় বললে ভালো হয়।

(২০) স্মৃতি অর্থো অস্মাদিতি বৃণশ্চ। পঞ্চজানিবদ্ যোগরূপঃ শ্বেটশব্দঃ। শ্বে টঃ স্মৃতি। যে সকল শব্দ থেকে কেবল প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থের প্রতীতি হয় তার নাম যৌগিক শব্দ। যেমন পাচক, পাঠক প্রভৃতি শব্দ। এই সব স্থলে ধাতুর অর্থ পাক, পাঠ প্রভৃতি। এবং প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা—এই দুই অর্থেরই বোধ হয়। যে সকল শব্দ থেকে প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থের সহিত মিলিতভাবে আর একটি স্বতন্ত্র অর্থের প্রতীতি হয়, তাহের নাম যৌগরূপ। যেমন পঞ্চ শব্দ। এখানে পঞ্চ+জন+ড। পঞ্চ শব্দের উত্তর জন ধাতু, তারপর ড প্রত্যয় আছে। এই প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ বাহ্যিকভাবে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এখানে কেবল যে এইটুকু বুঝায় তা নয়। পঞ্চ শব্দ থেকে কৰ্ম্মণে উৎপন্ন পদের প্রতীতি হয়। কৰ্ম্মণে উৎপন্ন শৈবাল, কুম্ভ প্রভৃতির প্রতীতি হয় না।

বর্ণফোন্টের ত্যাগপর্ষ। এই পক্ষটি নৈয়ায়িক ও মীমাংসকদের অভিমত হলেও বৈয়াকরণগণ ইহা স্বীকার করেন নি—একথা পূর্বে আমরা বলেছি।

একটি পদে যতগুলি বর্ণ আছে, সেই বর্ণসমূহের কোন্ অংশের দ্বারা কতটুকু অর্থ প্রকাশিত হয়, তা বলা কঠিন। যে হেতু ২। পদফোন্ট। ব্যবহার ক্ষেত্রে কেবল প্রকৃতি বা কেবল প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় না। সূত্রাং প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ কল্পনা করে তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে এরূপ নির্দেশ করা একটা কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নয়। “পচতি” “দেবদত্তঃ” প্রভৃতি পদে যে প্রকৃতি ও প্রত্যয় কল্পিত হয়—তাদের স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থ নাই। কিন্তু এই সকল পদ হতে যে অর্থের প্রতীতি হয় তা সমগ্র পদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। পদই ব্যবহার ক্ষেত্রে আমাদের অর্থ জ্ঞানের উপায়। সূত্রাং অর্থ প্রকাশের শক্তি [সামর্থ্য] পদে আছে বলে বর্ণসমূহাত্মক পদই ‘ফোন্ট’ [বাচক]। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বাচকতা নাই। ইহাই পদফোন্ট পক্ষ।

প্রত্যেক পদকে পৃথগ্ভাবে প্রয়োগ করলে তা থেকে লোকের ব্যবহারোপযোগী কোন অর্থের জ্ঞান হয় না। *আমরা নিজের অভিমত বিষয় অপরকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে কেবল পদের প্রয়োগ না ৩। বাক্যফোন্ট। করে বাক্যের প্রয়োগ করে থাকি। অত্যা ব্যক্তিও আমাদের অভিমত বিষয় বাক্য হতে বুঝে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যই অর্থজ্ঞানের সাধন। সূত্রাং অর্থজ্ঞানের অমুকুল শক্তি বাক্যেই আছে, পদে নাই। এই বাক্য ক্রমিক বর্ণের সমষ্টিমাত্র। এইটি বাক্যফোন্ট পক্ষ।

উপরে যে তিনটি পক্ষ দেখান হলো, সেই সব পক্ষেই ঐর্ষ্যের সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। অতএব প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ এবং বাক্যের বর্ণরূপ অবয়ব আছে বলে সেই প্রকৃতি, প্রত্যয়, প্রভৃতি সখণ্ড।

পদের কোন অবয়ব নাই। বর্ণবাদীরা যেমন বর্ণের কোন অবয়ব স্বীকার করেন না—বর্ণকে নিরবয়ব-অখণ্ড বলে ৪। অখণ্ড পদফোন্ট। স্বীকার করেন। সেইরূপ অখণ্ডপদফোন্টবাদীরাও পদকে অখণ্ড বস্তু বলেন। এই অখণ্ড পদ থেকেই আমাদের অর্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সূত্রাং অখণ্ড পদেই অর্থ প্রকাশের

শক্তি আছে। অতএব অখণ্ডপদই বাচক [ফোট]। ইহাই অখণ্ড-
পদফোটপক্ষ।

পদের যেমন কোন অবয়ব নাই, সেক্ষেপ বাক্যেরও কোন অবয়ব নাই।
বাক্যের অর্থ জানের সুবিধার জন্য পদগুলিকে
৫। অখণ্ড বাক্যফোট। বাক্যের অবয়বরূপে কল্পনা করা হয়। পদের
কোন পারমাণ্বিক সত্তা নাই। অখণ্ডবাক্যই অর্থ
প্রতীতির অমুকুশলশক্তি আছে। অতএব অখণ্ডবাক্যই বাচক [ফোট],
ইহাই অখণ্ড বাক্যফোট পক্ষ।

উপরে যে পাঁচ প্রকার ফোটের বিবরণ দেওয়া হয়েছে—এই পাঁচপ্রকার
ফোটকে সাধারণভাবে 'ব্যক্তিফোট' নামে অভিহিত করা হয়। (২১)

মহর্ষি, জৈমিনির অনুযায়ী পূর্বমীমাংসকগণ জাতিশক্তিবাদী। তাঁরা ঘট
প্রভৃতি ব্যক্তিকে স্রুত প্রভৃতি শব্দেরবাচ্য বলে স্বীকার
৬। বর্ণজাতিফোট। করেন না, কিন্তু ঘটত্ব, পটত্ব জাতিকেই ঘটাদি
শব্দের বাচ্য বলেন। মীমাংসকদের মতের অনুকরণ
করে জাতিফোটবাদিগণ সিদ্ধান্ত করেছেন—যেভাবে ঘটাদি পদার্থনিষ্ঠ জাতি
বাচ্যরূপে স্বীকৃত হয়, সেইভাবে শব্দনিষ্ঠ জাতিরও বাচকতা সমর্থিত হয়।
অতএব প্রকৃতি ও প্রত্যয়, অর্থের বাচক নয় কিন্তু প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত জাতিই
অর্থের বাচক। এই প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত জাতির বাচকতা যে মতে স্বীকৃত
হয়, সেইমতই বর্ণজাতিফোটপক্ষ। এই পক্ষের সংক্ষেপে অভিপ্রায় এই—
প্রকৃতি ও প্রত্যয়নিষ্ঠ জাতিই বাচক [ফোট]। এখানে বর্ণ বলতে প্রকৃতি ও
প্রত্যয়কে বুঝতে হবে।

একটি পদে যে প্রকৃতি প্রত্যয়ের সমষ্টি থাকে, সেই সমষ্টির অন্তর্গত প্রকৃতি ও
প্রত্যয়ের প্রত্যেকে যে বিভিন্ন জাতি বিद्यমান
৭। পদজাতিফোট। তাদের বাচকতা নাই। তাদের অর্থবোধের
অমুকুল কোন শক্তি নাই। প্রকৃতিপ্রত্যয়ের সমষ্টি
যে পদ, সেই সমগ্র পদে যে 'একটি জাতি বিद्यমান, সেই জাতিই অর্থের বাচক
[ফোট]। ইহাই পদজাতিফোটপক্ষ।

ব্যবহারক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পদের পৃথগ্ভাবে প্রয়োগ করা হয় না। নিম্নের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে অস্ত্রের নিকট প্রকাশ করবার ৮। বাক্যজাতিফোট। জন্ম আমরা শব্দ প্রয়োগ করি। ইহাকে শব্দব্যবহার বা ব্যবহারশব্দে অভিহিত করা হয়। বাক্যের দ্বারা আমাদের এই ব্যবহার সম্পন্ন হয়। যদি কেবল এক একটি পদ থেকে অস্ত্রের অর্থজ্ঞান হোত, তা হলে আমরা অপরের জ্ঞানের জন্ম কেবল এক একটি পদেরই প্রয়োগ করতাম, বাক্যের প্রয়োগ করতাম না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কেবল পদ থেকে ব্যবহার ক্ষেত্রে অর্থের জ্ঞান হয় না, বাক্যের দ্বারাই অর্থপ্রতীতি হয়। এই বাক্যের অর্থপ্রকাশ করার সামর্থ্য—ইহা বাক্যে নাই। সমান আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন বাক্যে একটি জাতি আছে। বাক্যানিষ্ঠ সেই জাতিই অর্থের বাচক [ফোট]। বাক্য অর্থের বাচক নয়। ইহাই বাক্যজাতিফোটপক্ষ।

যারা জাতিফোটবাদী তাঁদের মধ্যে শব্দনিষ্ঠ জাতির আধারভূত, প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ ও বাক্যের বহুত্ব স্বীকৃত হয়েছে—ইহা অবশ্যই বলতে হবে। অনেক পদার্থে একাকার জ্ঞানের কারণরূপেই জাতি স্বীকৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন রং এর ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার গোব্যক্তিসমূহ গোত্বজাতি স্বীকৃত হয়। যদি কোন বস্তুর একটুট স্বাভাবিক হয়, তা হলে সেখানে জাতিস্বীকার করা হয় না। সমান আকারের অনেক বস্তুতে একটি জাতি থাকে—এইরূপ নিয়ম দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জাতিফোটবাদীর মতে তাঁদের স্বীকৃত শব্দনিষ্ঠ জাতিগুলির প্রত্যেকের আশ্রয় শব্দের অনেকই অনিবার্হ। অতএব ইহাদের সিদ্ধান্তে প্রত্যেক জাতির আধারভূত প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি অনন্ত। এইটা লক্ষ্য করেই আচার্য ভট্টহরি জাতিফোটপক্ষের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন -

“অনেকব্যাক্যভিব্যঙ্গ্য জাতিঃ ফোট ইতি স্মৃতা।

কৈশিদ্ ব্যক্তয় এবাস্তা ধ্বনিষ্চৈন প্রকল্পিতাঃ ॥

[বাক্যপদীয় ১।২৩]

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, গোত্বাদি জাতি যেমন সমানাকার অনেক গবাদি ব্যক্তিদ্বারা অভিব্যঙ্গ্য সেইরূপ সমানাকার অনেক শব্দের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য যে শব্দনিষ্ঠ জাত উহাই ফোট [বাচক]। ফোটের অভিব্যক্তির কারণকে ধ্বনি বলা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে জাতিরূপ ফোটের অভিব্যক্তির কারণ যে শব্দব্যক্তি সেই শব্দব্যক্তিগুলিই ধ্বনিরূপে প্রিকল্পিত হয়। এই জাতিফোট

পক্ষ ভৰ্তৃহরির নিজের সিদ্ধান্ত নয় (২১)। ভৰ্তৃহরি এই সিদ্ধান্তকে কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত রূপে উল্লেখ করেছেন এবং বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ একে মতান্তর বলে নির্দেশ করেছেন। ভৰ্তৃহরি অথগু বাক্যফোট স্বীকার করতেন।

পদে ন বর্ণা বিত্তন্তে বর্ণেষবয়বা ইব।

বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং এবিবেকো ন কশ্চন ॥ [বাক্যপদীয় ৭।৭৩]

ঋ, ৯, এ, ও, ঐ, ঔ এই সকল বর্ণের মধ্যে যথাক্রমে র, ল, অ + ই, অ + উ, অ + এ, অ + ও এই সকল বর্ণ আছে—ইহা আমাদের নিকট আপাতত প্রতীত হলেও বস্তুত এই সকল বর্ণের [ঋ ৯ এ, ও ঐ ঔ] কোন অবয়ব নাই, ইহারা নিরবয়ব, অথগু বর্ণ ইহা মীমাংসক প্রভৃতি বর্ণবাদী দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। বর্ণবাদীর মতে বর্ণগুলি যেমন অথগু, ফোটবাদীর মতে সেইরূপ বাক্য অথগু, অবয়বশূন্য। বাক্য থেকে পদের কোনরূপ ভেদ নাই। বাক্যে পদের সত্তা প্রতীয়মান হলেও বস্তুতঃ পদের কোনরূপ পৃথক সত্তা নাই। বুঝাবার সুবিধার জন্য বাক্যে পদের অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়। এ কথা ভৰ্তৃহরি নিজেরই স্পষ্টভাবে বলেছেন—

‘যথা পদে বিভজ্যন্তে প্রকৃতি প্রত্যাদয়ঃ।

অপোদ্ধারস্তথা বাক্যে পদানামুপবর্ণ্যতে ॥ [বাক্যপদীয় ২।১০]

পদগুলি অথগু বলে তাতে বস্তুতঃ প্রকৃতি ও প্রত্যয়রূপ অবয়ব নাই। কেবল অস্ত্রব্যক্তির সহজ উপায়ে জ্ঞানের জন্য পদে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের কল্পনা করা হয়। এইরূপ বাক্যেও বস্তুত পদ না থাকলেও বাক্যে পদের অপোদ্ধার অর্থাৎ কল্পনা করা হয়।

এই অথগু বাক্যফোটই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে তার পূর্ববর্তী বর্ণফোট প্রভৃতি স্বীকার করবার অমূল্য কোন প্রমাণ নাই। এই সকল নিম্নমাণ পক্ষ স্বীকারের পক্ষে কোন সমুচিত যুক্তিও দেখা যায় না। এই

(২২) প্রাচীনকালে কোন সম্প্রদায় এই জ্ঞাতিফোটপক্ষ স্বীকার করতেন তা জানা যায় না। বাক্যপদীয় গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখে আমরা কেবল অনুমান করতে পারি—এই সিদ্ধান্ত ভৰ্তৃহরির পূর্ববর্তী কোন সম্প্রদায়ের ছিল। পরবর্তীকালে বোপদেব এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করতেন—ইহা শব্দকৌস্তভের পশ্চাৎগামী এবং বৈয়াকরণভূষণের ফোটনির্ণয় প্রকরণের ৭১ ব্যাক্যিকার অবতরণিকাতে জানা যায়। বোপদেব কোন গ্রন্থে জ্ঞাতিফোটের কথা বলেছেন—তা জানা যায় না।

অবস্থায় অথও বাক্যফোট ব্যতীত অপর ফোটগুলির অস্তিত্ব কেন স্বীকার করা হয়েছে তা চিন্তা করে দেখা আবশ্যিক। কিন্তু পূর্বাচার্ধগণ আমাদের চিন্তার অবকাশ দেওয়ার জন্য কোন বিষয়ই উপেক্ষা করেন নি। তাঁরা বলেছেন— অথও বাক্যফোট বস্তুটিই পারমাণবিক—এটা সত্য। এই পারমাণবিক বস্তুকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে তার পূর্ববর্তী ফোটগুলি কল্লিত হয়েছে, তাদের কোন পারমাণবিক সত্তা নাই।

এখানে একবার পুনরায় উল্লেখ করা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না যে, জাতিফোট পক্ষ ভূতৃহরির সম্মত নয়। উহা ভূতৃহরি অপর বাদীদের মতরূপে উল্লেখ করেছেন। অথও বাক্যফোটের—জ্ঞানের জন্য এই জাতিফোট কল্লিত হয় নাই। এটা একটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

ফোটবাদী আচার্ধগণের মতে বাক্ [শব্দ], জ্ঞান থেকে পৃথক্ বস্তু নয়। জ্ঞান বা চৈতন্ত্যে এই বাগ্‌রূপতা থাকে। স্তবরাং জ্ঞান ও বাক্ এই দুইটি অভিন্ন বস্তু—

বাগ্‌রূপতা চেতুৎক্রামেদববোধন্ত শাখতী।

ন প্রকাশঃ প্রকাশ্যেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী ॥

[বাক্যপদীয় ১।১২৫]

জ্ঞানে বাগ্‌রূপতা যদি না থাকত, তা হলে সেই জ্ঞান কখনও প্রকাশিত হতে পারতো না। যেহেতু জ্ঞানের এই যে বাগ্‌রূপতা—ইহাই জ্ঞানের প্রকাশক। বৈয়াকরণ সম্প্রদায় সকল জ্ঞানকেই সবিকল্পক বলে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে জ্ঞানের এই সবিকল্পক অবস্থা, তার বাগ্‌রূপতা থেকেই সম্পাদিত হয়।

বর্ধ তালু প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা (২৩ অথবা সেই ব্যাপার থেকে বর্ণের উচ্চারণ স্থানে যে বায়ুসংযোগ হয় সেই বায়ু সংযোগ দ্বারা ফোটের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না।

(২৩) “অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানাম্বরঃ বর্ধঃ শিরন্তথা।

জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠী চ তালু চ ॥ [পাণিনিয় শিক্ষা ১৩]

বর্ণের উচ্চারণ স্থান আটটি উরঃ হৃদয়ঃ, বর্ধ, শিরঃ [মূর্ধা]। জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু।

ফোটের অভিব্যক্তিকে ‘ধ্বনি’ বলা হয় ; আবার বর্ণকেও ফোটের অভিব্যক্তক বলা হয় । বাস্তবিক পক্ষে বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তে ফোটই বর্ণরূপে প্রতিভাত হয় (২৪) ।

মহাভাগ্যকারের পরবর্তী বৈয়াকরণগণ প্রাচীন ও নবীন দুইভাগে বিভক্ত । নাগেশভট্টের পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ প্রাচীন বিভাগের অন্তর্গত । নাগেশভট্ট এবং তাঁর পরবর্তী বৈয়াকরণগণ নবীন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত । প্রাচীন বৈয়াকরণগণ বলেছেন—কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে বায়ুর যে অভিঘাত [সংযোগ-বিশেষ] হয় তারই কলে প্রথমে ধ্বনি উৎপন্ন হয় । সেই ধ্বনি থেকে ফোটের অভিব্যক্তি হয় । এই বিষয়ে তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন—বর্ণ উচ্চারণের উদ্দেশ্যে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির ব্যাপার করলে যখন প্রমাদবশত জিহ্বার ঠিকস্থানে সংযোগ না হয়ে যদি একটু ব্যাবধানে সংযোগ হয় তখন বর্ণের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ধ্বনির উপলব্ধি হয়ে থাকে । এতে বুঝা যায় কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ ধ্বনির উৎপত্তির প্রতি কারণ । যে স্থলে ফোটের অভিব্যক্তি হয়, সেখানেও ধ্বনির উৎপত্তি অবশ্যই হয় । যদি সেক্ষেপ স্থলে ধ্বনির উৎপত্তি স্বীকার না করা হয়, তা হলে বলতে হবে যে ফোটের উৎপত্তির প্রতি যাহা কারণ তাহা ধ্বনির উৎপত্তির প্রতিবন্ধক । এক্ষেপ প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করলে কল্পনাগৌরব হয় । এইজন্য বলতে হবে যে স্থলে ফোটের অভিব্যক্তি হয়, সে স্থলেও কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির ব্যাপার থেকে ধ্বনির উৎপত্তি হয়ে ফোটের অভিব্যক্তি হয় । কিন্তু এক্ষেপ স্বীকার করলে একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয় । যেখানে ঘট শব্দের উচ্চারণের অন্ত কণ্ঠাদির ব্যাপার করা হয়, সেখানে “ঘট” এই শব্দের জ্ঞান হয় । এই “ঘট” জ্ঞানটি ফোটের অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু নয় । এস্থলে ‘ঘট’ শব্দ ভিন্ন ধ্বনির কোন উপলব্ধি হয় ইহা বুঝা যায় না । যদি ধ্বনি থেকে ফোটের অভিব্যক্তি হয়—ইহা স্বীকার করা যায়, তা হলে যে যে স্থলে ফোটের অভিব্যক্তি হয়, সেই সকল স্থলেই ধ্বনি বিद्यমান থাকায় ধ্বনির উপলব্ধি হওয়া উচিত ; কিন্তু তা হয় না । সুতরাং ধ্বনি থেকে ফোটের অভিব্যক্তি হয় এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয় ।

(২৪) বাঙ্গলাধ্বনিবিশেষোপহিতঃ ফোট এব ককারাগ্রাস্ত্বা বাবহ্রিতে ইত্যুপগমাৎ । ভাট্টমতে ত্যাহো ন্যোপকার ইতি নদ্যন্তে চিহ্নান্তে বিবর্তনবদ্ধব্রহ্মবৃত্তিবিচিরোণ বাক্যেব্রহ্মব্রহ্ম বৈচিত্র্যবচ । অতএব বাচস্পি-বিশ্রান্তব্রহ্মো বক্ততঃ ককারাগ্রতিরিয়মানমূর্ত্তেঃ পকারস্যাত্যাবাৎ ইতি ফোটবাহিত্যত্বে পশ্যত্বং । [শব্দকৌস্তভ ১]

এর উত্তর বাক্যপদীয়ে বর্ণিত হয়েছে। যে স্থলে ফোটের অভিব্যক্তি হয়, সে স্থলে ভূহরি ধ্বনি সম্বন্ধে তিনপ্রকার মতের উল্লেখ করেছেন—

ফোটরূপাবিভাগেন ধ্বনেগ্রহণমিষ্যতে।

কৈশিচ্ ধ্বনিসংবেদ্যঃ স্বতন্ত্রোহনৈঃ প্রকাশকঃ ॥

[বাক্যপদীয় ১৮২]

কোন আচাৰ্যের মতে ফোটের সহিত অভিন্নভাবে ধ্বনির প্রতীতি হয়, স্বতন্ত্রভাবে ধ্বনির প্রতীতি হয় না। অত্ৰ আচাৰ্যের মতে ধ্বনি অসংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের অযোগ্য। চক্ষুঃ, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়ের উপলব্ধির হেতু। কিন্তু চক্ষুঃ বা তার রূপ আমাদের উপলব্ধির যোগ্য নয়। এইরূপ রসেন্দ্রিয় বা তার রস আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। সব ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই নিয়ম; ইন্দ্রিয় কিংবা তার, গুণ জ্ঞানের যোগ্য নয়। যে ইন্দ্রিয়ে যে গুণ থাকে, সেই ইন্দ্রিয় সেই গুণকেই গ্রহণ করতে পারে। চক্ষু রূপকেই গ্রহণ করতে পারে, রস বা গন্ধকে গ্রহণ করতে পারে না। চক্ষুঃ ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু যে দ্রব্য রূপ থাকে, চক্ষুঃ তাকেই গ্রহণ করতে পারে, রূপহীন দ্রব্যকে গ্রহণ করতে পারে না। ঘটের রূপ আছে, চক্ষুঃ তাকে গ্রহণ করে। বায়ুর রূপ নাই, চক্ষুঃ তাকে গ্রহণ করতে পারে না। এইভাবে যে দ্রব্য স্পর্শ থাকে ত্বগিন্দ্রিয় তাকে গ্রহণ করে, স্পর্শহীন দ্রব্যকে গ্রহণ করতে পারে না। ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শবিশিষ্ট বৃক্ষ, জল ও বায়ুকে প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু আলোকের বা সুৰাদিতৈজের প্রভাবে স্পর্শ থাকে না বলে ত্বগিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অবশিষ্ট রসনা, ভ্রাণ ও শ্রোত্র নামক তিনটি ইন্দ্রিয়, রস গন্ধ ও শব্দ—এই তিনটি গুণকেই যথাক্রমে প্রত্যক্ষ করে। দ্রব্যকে গ্রহণ করতে পারে না। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের গুণ স্বয়ং জ্ঞানের অযোগ্য হয়েও যেমন অন্নের জ্ঞানের কারণ হয়, সেইরূপ এই মতে ধ্বনিও নিজ জ্ঞানের অযোগ্য হয়েও ফোটের অভিব্যক্তির কারণ হয়।

অপর বৈয়াকরণ সম্প্রদায় মতে ফোট থেকে ধ্বনির সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। এইজন্য দ্রব্যাদিদোষবশতঃ যে স্থলে আমাদের ফোটের জ্ঞান হয় না, সে স্থলে কেবল ধ্বনির প্রতীতি হতে পারে। ফোটের জ্ঞানকালে ধ্বনি ও ফোটের মিলিত ভাবে জ্ঞান হয় বলে, আমরা ধ্বনিকে স্বতন্ত্র ভাবে উপলব্ধি

করতে পারি না। কিন্তু সে স্থলেও ধ্বনির সত্তা থাকে এবং তার প্রতীতি হয়। যেমন দুধও জল মিলিত হলে স্বতন্ত্রভাবে জলের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ ধ্বনি ও স্ফোটের মিলিত ভাবে প্রতীতি স্থলে স্বতন্ত্র ভাবে আমরা ধ্বনির নিশ্চয় করতে পারি না।

বর্ণসমুদায় থেকে অর্থের জ্ঞান হয়—স্বাধ্বৈশেষিক ও মীমাংসার এই মত বৈয়াকরণেরা স্বীকার করেন নাই এবং বর্ণ থেকে অর্থজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই ইহা তাঁরা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করেছেন। আবার ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়—বৈয়াকরণদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও পূর্বোক্ত দার্শনিকগণ অনেক যুক্তি প্রদান করেছেন। বর্ণবাদীরা বলেছেন যদি বর্ণসমুদায় থেকে অর্থের জ্ঞান অসম্ভব হয়, তা হলে ধ্বনি সমুদায় থেকেও স্ফোটের অভিব্যক্তি অসম্ভব। প্রত্যেক বর্ণ ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় যেমন তাদের সকলের এককালে অবস্থিতি হতে পারে না, এইজন্ত বর্ণের একটি সমুদায় কোন কালেই হতে পারে না, সেইরূপ প্রত্যেক ধ্বনিও ক্ষণস্থায়ী বলে, তাদের কোন একটি সমুদায় সম্ভাবিত হয় না। আর প্রত্যেক ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয় এরূপ স্বীকার করা যায় না। কারণ এরূপ স্বীকার করলে প্রথম ধ্বনি থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়ে যায় বলে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি অত্র ধ্বনিগুলি বৃথা হয়ে যায়। এইজন্ত স্ফোটবাদীকেও বলতে হবে ধ্বনিসমুদায় থেকেই স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এরূপ বললে ধ্বনির সমুদায় কোন কালেই সম্ভাবিত না হওয়ায় স্ফোটের অভিব্যক্তি সম্ভব হবে না। সুতরাং যে যুক্তির দ্বারা স্ফোটবাদিগণ বর্ণবাদীর মত খণ্ডন করেন, তাঁদের সেই যুক্তির দ্বারাই স্ফোটের খণ্ডন হয়ে যায়। অতএব স্ফোটবাদীরা বর্ণবাদীর উপর যে দোষ দিয়েছেন সে দোষ তাঁদের পক্ষেও আছে! যে দোষ উভয়পক্ষেই থাকে, সে দোষ একজন অপরের সিদ্ধান্ত বিষয়ে উদ্ভাবন করতে পারেন না (২৫)।

স্ফোটবাদিগণ এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—ধ্বনিসমুদায় থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয় ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রত্যেকটি ধ্বনিই স্ফোটের অভিব্যক্তক। প্রথম ধ্বনি থেকে অস্পষ্টভাবে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়, দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি ধ্বনি থেকে পূর্ণাঙ্গ স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। অতএব স্ফোটের প্রকাশিত হয়। চরম ধ্বনির দ্বারা অস্পষ্টরূপে স্ফোট অভিব্যক্ত হয়। অস্পষ্টভাবে

(২৫) 'বহোত্তরোঃ সো দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ নৈকঃ পৰ্ব্বমুখোক্তব্যক্তাদৃগৰ্খবিচারণে।'

[স্পষ্টত্ববর্ণনাসংহিতার মহাধরভাষ্যে উদ্ধৃত]

অভিব্যক্ত স্ফোট থেকেই অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অল্প পূর্ববর্তী ধ্বনিগুলি থেকে স্ফোটের কিছু কিছু অভিব্যক্তি হলেও সে সময়, স্থম্পষ্টরূপে স্ফোটের অভিব্যক্তি না হওয়ায় অর্থপ্রতীতি হয় না। বৈয়াকরণগণ স্ফোট ভিন্ন অল্প কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ধ্বনি স্বারা এই স্ফোট অভিব্যক্ত হয়ে অর্থজ্ঞানের কারণ হয়। এই স্ফোটই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়ে জাগতিক সমস্ত ব্যবহারের বিষয় হয়ে থাকে।

শব্দকৌস্তভকার স্ফোট সম্বন্ধে অল্প মতের কথা বলেছেন। শব্দকৌস্তভে বলা হয়েছে—স্ফোট অবিচ্ছিন্নত পদার্থ। স্ফোট অবিচ্ছিন্নত পদার্থ হলে তার অধিষ্ঠানরূপে একটি অকল্পিত বস্তু স্বীকার করতে হবে। কল্পনার মূলে কোন অকল্পিত বস্তু স্বীকার না করলে কল্পনা দাঁড়াতে পারে না। কল্পিত পদার্থ শূন্যে অবস্থান করে না। বৈয়াকরণগণ নিজেদের শূন্যবাদী বলে স্বীকার করেন না। সুতরাং শব্দকৌস্তভমতে অকল্পিত ব্রহ্মবস্তু স্বতন্ত্র পদার্থ, তাতে অবিচ্ছিন্ন স্ফোটের কল্পনা করেছে—ইহা স্বীকার করতে হয়। বৈয়াকরণ পরমাচার্য ভট্টহরির এই মত নয়। তিনি স্ফোটকেই ব্রহ্মরূপে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে উৎপত্তি বিনাশরহিত, অবিকারী, সর্বব্যাপী, স্ফোটরূপ শব্দ ব্রহ্ম থেকে জগতের সৃষ্টি হয়েছে (২৬)।

ভট্টহরির সিদ্ধান্ত অমূল্য করে কোণ্ডভট্ট বৈয়াকরণ ভূষণগ্রন্থে স্ফোটকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করেছেন (২৭)।

তিনি বলেছেন অবিচ্ছিন্নকে অবলম্বন করে জাতিস্ফোটির কল্পনা করা হয়েছে। •

(২৬) 'অনা'বিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্,

বিবর্ততেত্বভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ ॥ [বাস্যপদ্য ১১১]

জগৎ ও বিনাশ শূন্য শব্দতত্ত্বরূপ যে অক্ষর ব্রহ্ম, তিনি পরার্থরূপে বিবর্তিত হন, যা থেকে জগতের সৃষ্টি প্রসূতি হয়।

(২৭) কোণ্ডভট্ট সিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রৌঢ়মনোরমা শব্দকৌস্তভ প্রসূতির প্রাণেতা ভট্টোজ্জীৱীকিতের প্রাণত্পন্ন ছিলেন এবং নিজেও মল্লীপতিত ছিলেন—

বাগদেবী যন্ত জিহ্বাগ্রে নরীতি সদা মুদা।

ভট্টোজ্জীৱীকিতঃ পিতৃগ্যঃ নোমি সিদ্ধয়ে ॥ [বৈয়াকরণ ভূষণ গ্রন্থ মোক]

শ্রীমদ্ভেদগ্রাহকরূপে অভিব্যক্তিকে বৈথরী এবং অন্তঃকরণের গ্রাহকরূপে অভিব্যক্তিকে মধ্যমা বল্য হয়—এরূপ বললে কোন দোষ হয় না। প্রত্যভিজ্ঞানদর্শনে এবং শান্তিসম্প্রদায়ে ‘পশুস্তী’ থেকেও সূক্ষ্মতর অবস্থা স্বীকার করা হয়েছে এবং সেই অবস্থাতেই বাক্যকে “পর্য” সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে। তত্ৰ্হিত পশুস্তী থেকে কোন সূক্ষ্মতর অবস্থা স্বীকার করেন নি। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্তে পশুস্তীই “পর্য বাক্য”।

মহাভাষ্যকার ধ্বনি ও ফোটের উল্লেখ করেছেন (৩২)। তবে তিনি ফোটকেই শব্দের স্বরূপ এবং ধ্বনিকে তার ব্যঞ্জক বলেছেন। মহাভাষ্যকার ও বার্তিককার উভয়েই শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেছেন (৩৩)। কিন্তু তাঁরা ফোট সম্পর্কে কোনরূপ সূক্ষ্ম বিচার প্রদর্শন করেন নাই। মহাভাষ্যকারের পদার্থ অনুসরণ করে আচার্য তত্ৰ্হি ফোট সম্পর্কে বহু সূক্ষ্ম বিচার প্রদর্শন করেছেন। ফোট সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হলে বাক্যপদীয়, শব্দকৌশল, বৈয়াকরণ ভূষণ, লঘুমঞ্জবা, ফোটচন্দ্রিকা, ফোটসিদ্ধি, শারদাতিলক ও তার টীকা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুশীলন করতে হবে। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অবৈদিক দার্শনিকগণ ফোট স্বীকার করেন নাই। মীমাংসক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি বৈদিক দার্শনিকগণও ফোটের খণ্ডন করেছেন। ভগবান্ শঙ্করাচাৰ্য এবং তাঁর অনুগামী বাচস্পতি মিশ্র, অমলানন্দ প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্যগণও ফোট স্বীকার করেন নাই (৩৪)। শ্রীমুগেন্দ্রাগমের বৃত্তিকার ভট্টনারায়ণ কঠোর

(৩২) অথবা উভয়তঃ ফোটমাত্রঃ নির্দিষ্টতে। মহাভাষ্য ১।১।২৩,৪১ এবং তত্র ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ।—ফোটজ্ঞানেনৈব ভবতি। ধ্বনিকৃত্য বৃদ্ধিঃ।

ধ্বনিঃ ফোটচ শব্দানাং ধ্বনিত্বং লক্ষ্যতে।

অন্যো মহাশব্দ কেবালিহুভবঃ তৎস্বভাবতঃ ॥ [মহাভাষ্য ১।১।২।৭]

শব্দগুণ-ইতি। শব্দস্ত গুণ উপকারকো ব্যঞ্জকবৈশেষ্যতঃ।

উভয়মিতি। ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জকস্ত প্রমাণেন স্বভাবতঃ

স্বরূপেন সিদ্ধাবিত্যর্থঃ। কেবালিকিঞ্চিৎ—ব্যত্পনামুভবঃ

গৃহ্যতে অব্যক্তানাং তু ধ্বনিরেষঃ—কৈটব।

(৩৩) সিদ্ধান্তু নির্জ্ঞানলক্ষণং। [কাতারন স্ততিত্ব]...নিহ্যাঃ লক্ষ্যঃ। মহাভাষ্য—১।১।৩।১
শব্দের নিত্যতার কথা মহাভাষ্যে আরও অনেক স্থলে বলা হয়েছে।

(৩৪) ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থরত্নাবলী—কলকাত্তপরিষদ। দ্বৈতভাষিকরণ ১৩, ৩৮।

পুত্র ভট্টরামকণ্ঠ তাঁর “নাদকারিকা” গ্রন্থে ফোটে’র খণ্ডন করে, তার পরিবর্তে নাদকেই অর্থ জ্ঞানের সাধনরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এই “নাদকারিকার” টীকাকার অঘোর শিবাচার্য এই নাদের অর্থবোধক স্বীকার করেছেন ৩৫)। আচার্য মণ্ডন মিশ্র মীমাংসক হলেও ফোটে’ স্বীকার করেছেন এবং ফোটে’সিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করে ফোটে’ সমর্থন প্রসঙ্গে কুমারিলভট্ট প্রভৃতির ফোটে’বিরোধী যুক্তির খণ্ডন করেছেন। এই মণ্ডন মিশ্র তাঁর “ব্রহ্মসিদ্ধি” নামক বেদান্ত গ্রন্থে ব্রহ্মকে শব্দাত্মক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন [ব্রহ্মসিদ্ধি জ্ঞানকাণ্ড ১ম স্কন্ধের অক্ষর পদের ব্যাখ্যা]।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে—যে যে স্থলে অর্থের জ্ঞান জন্মে, সেই সকল স্থলেই বৈয়াকরণেরা ফোটে’ স্বীকার করেন। শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, অপভ্রংশ শব্দ এবং স্লেচ্ছদের ব্যবহৃত শব্দ—এই সকল স্থলেই ফোটে’র অভিব্যক্তি হয়; তারপর অর্থের জ্ঞান হয়—ইহা বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্ত। তবে এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে শব্দানুশাসন শাস্ত্র কিন্তু সাধু [সংস্কৃত] শব্দের অনুশাসন—অপভ্রংশ বা স্লেচ্ছসম্প্রদায়ে ব্যবহৃত শব্দের অনুশাসন নয় ॥ ৪ ॥

মূল

অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইতি
উচ্যতে। তদ্ব্যথা—শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্যোঃ,
শব্দ কার্যায়ং মাণবক ইতি ধ্বনিং কুর্বন্নেবমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ধ্বনিঃ শব্দঃ ॥৫॥

অনুবাদ—অথবা “শব্দ” এই শব্দটি প্রসিদ্ধার্থক। লোকে ধ্বনিকে শব্দ বলা হয়। যেমন—‘শব্দ কর’ ‘শব্দ করো না’ ‘এই মাণবক [ব্রহ্মচারী বা বালক] শব্দকারী’ যে ধ্বনি করে তাকে একরূপ বলা হয়। [সূত্রায়ং] সেইহেতু ধ্বনি [ই] শব্দ ॥ ৫ ॥

পদার্থবর্ণনা—প্রতীতপদার্থকঃ—প্রতীতঃ [জ্ঞাত] পদার্থঃ [অর্থ] যন্ত [বাহার—যে শব্দ এই শব্দের], এইভাবে বহুব্রীহি সমাসে—যায় অর্থ প্রতীত অর্থাৎ প্রসিদ্ধ লোকে জ্ঞাত।—এইরূপ অর্থে “প্রতীতপদার্থকঃ” শব্দটি নিষ্কার। বহুব্রীহি সমাসে ‘ক’ আগম হয়েছে।

অথবা—পদার্থ এবং পদার্থক—এইরূপ স্বার্থে কন্ প্রত্যয় করে পদার্থক শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তারপর প্রত্যয়: পদার্থক: এইরূপ কর্মধারয় সমাস করে জ্ঞাত পদার্থ এইরূপ অর্থও পাওয়া যায়। লোকে জ্ঞাতপদার্থ ধ্বনি শব্দ বলে কথিত হয়। মাণবক—ব্রহ্মচারী বা বালক। ধ্বনি—[এখানে] বর্ণসমূহকে ধ্বনি বলে উল্লিখিত করা হয়েছে ॥ ৫ ॥

বিবৃতি—বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্তে ফোটেই শব্দস্বরূপ, ধ্বনি সেই ফোন্টের অভিব্যঞ্জক, ফোন্ট থেকে ধ্বনি ভিন্ন পদার্থ—ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়েছি। বৈয়াকরণগণ ধ্বনিকে অর্থবোধক স্বীকার করেন নি। ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত ফোন্টকেই অর্থবোধক বলে স্বীকার করেছেন। পূর্বে যেরূপ দেখা গেছে তাতে জ্ঞানী যায়, ব্যাকরণে অর্থবোধক শব্দেরই নিরূপণ করা হয়েছে। এই অবস্থায় এখানে মহাভাষ্যকার ধ্বনিকে শব্দ বলে নির্দেশ করায় ধ্বনি ও ফোন্টের অভেদ প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু ধ্বনি ও ফোন্টের অভেদ বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এইরূপ একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে কৈয়ট বলেছেন—মহাভাষ্যের পূর্বে ব্যাভিপ্রণীত ‘সংগ্রহ’ নামক বৈয়াকরণদের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক এক গ্রন্থ ছিল। তাব পঠন পাঠন মহাভাষ্যের রচনার পূর্বে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই গ্রন্থে ধ্বনি ও ফোন্ট বিভিন্ন পদার্থ ইহা সমর্থিত হইবেছিল এবং “তপরন্তংকালস্ত” [১।১। ২।৭০] শব্দের মহাভাষ্যেও ধ্বনি ও ফোন্টের ভিন্নপদার্থতা উক্ত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোক মনে করে ধ্বনি থেকেই তাদের অর্থের জ্ঞান হয়, তারা ধ্বনি ও ফোন্টের পার্থক্য অন্বেষণ করে না। সুতরাং ধ্বনি ও ফোন্টের ভিন্নতা লোকের বুদ্ধির বিষয় হয় না। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সেই লোকবুদ্ধির অনুসরণ করে এখানে ধ্বনি ও ফোন্টের অভেদ আরোপ করে শব্দস্বরূপ বুঝাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। লোকে আপাতত শব্দস্বরূপ বুঝুক; পরে তারা প্রজ্ঞাশীল হলে—ফোন্টকে শব্দস্বরূপ বলে বুঝতে পারবে। লোকে যাতে দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জ্ঞাতি—এগুলিকে শব্দস্বরূপ বলে না বুঝে। এই অভিপ্রায়ে ধ্বনিকে শব্দ বলেছেন। ধ্বনি ও ফোন্টের অভেদ পতঞ্জলির অভিপ্রেত নয়। এইরূপ অভেদ তাঁর অভিপ্রেত এইরূপ কল্পনা করলে পতঞ্জলির পূর্বাপর গ্রন্থের বিরোধ উপস্থিত হবে। “তপরন্তং-কালস্ত” এই শব্দের ভাষ্যের সঙ্গে এখানকার ভাষ্যের সামঞ্জস্য থাকবে না।

হুতরাং বলতে হরে যে “শক্” শ্রব্য, শৃণ, ক্রিয়া ও জ্ঞাপ্তি থেকে ভিন্ন বস্তু—
কেবল এইটুকু বুঝান এখানে পতঞ্জলির অভিপ্রায় (৩৬) ।

এখানে আর একটি আশঙ্কা উঠে এই যে—বিধি ও নিষেধ অনারম্ভ কার্যেই
প্রবৃত্ত হয়। লোকে যে কার্য করতে জানে না এবং যে কার্যে প্রবৃত্ত হয় নাই
বিধি লোককে সেই কার্য করতে হবে—এইটা জানিয়ে দেয়। আর লোকে কোন
অনিষ্টসাধন কার্যে প্রবৃত্ত হবে বা প্রবৃত্ত হচ্ছে; নিষেধ সেই লোককে সেই
কার্য থেকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু যে কার্য অস্বপ্নিত হচ্ছে তাতে প্রবৃত্তির জন্ত
যে রূপ বিধি নিরর্থক, সেইরূপ তা থেকে নিবৃত্ত হবার জন্ত নিষেধও নিরর্থক।
সে কার্য তো অস্বপ্নিত হচ্ছেই। এখানে ভাষ্যকার বলছেন—যে ব্যক্তি ধ্বনি
করছে [ধ্বনিং কুর্ব] তাকে শব্দ কর [শব্দং কুরু] শব্দ করো না [মা শব্দং
কার্যীঃ] এইরূপ বলা হয়। কিন্তু যে শব্দ করছে, তাকে শব্দ কর—এই কথা
বলে শব্দ করতে প্রবৃত্ত করা যায় না। অপ্রাপ্তেরই প্রবর্তনা হয়। কিন্তু যে
ব্যক্তি যে কার্যে প্রবৃত্ত তাফে সেই কার্যে প্রবৃত্ত করার কোন আবশ্যকতা
নাই। যে শব্দ করছে, সে তো শব্দ করেছেই, তাকে নিষেধ করাও বৃথা।
যে ব্যক্তি কোন অনিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার উপক্রম করছে, এখনও প্রবৃত্ত হয়
নাই, সেই ব্যক্তিকে নিষেধ করলে, সে নিষেধ সার্থক হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু
নিষেধও নিরর্থক। কারণ মাণবক [বালক] তো শব্দ করছে। হুতরাং
দেখা যাচ্ছে এখানে ভাষ্যকারের গ্রন্থ অসঙ্গত। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য—
যে ঋতিমধুর মনোরম শব্দ করছে, তার সেই কার্য থেকে বিরতির সম্ভাবনা
দেখে, বিরামের নিবৃত্তির জন্ত “শব্দ কর” [শব্দং কুরু] এরূপ বলা যায়।
আবার যে ব্যক্তি কঠোর অশ্রাব্য শব্দের উচ্চারণ করে শ্রোতার বিরক্তি
উৎপাদন করছে, তাকে সেই শব্দের উচ্চারণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্ত “শব্দ
করো না” [মা শব্দং কার্যীঃ] এরূপ বলা যায়। এইরূপ স্বলকে লক্ষ্য করেই
মহাভাষ্যকার এখানে—“শব্দং কুরু” এই বিধি এবং “মা শব্দং কার্যীঃ” এই
নিষেধের উল্লেখ করেছেন। হুতরাং ভাষ্যকারের কোন অসঙ্গতি এখানে হয়
নাই ॥ ৫ ॥

(৩৬) অন্তর্য্যাক্ষরোক্তোবাধ্যনিত্ত্বাদিহাভ্যেৎসে বাবৃত্তরেহপি ন দোষঃ। অবাধ্যনো
ন শব্দশব্দভাষ্যে ইত্যর্য্য তদ্ব্যপারঃ।—কৈটভ।

অন্তর্য্যাক্ষরোক্তোবাধ্যনিত্ত্বাদিহাভ্যেৎসে বাবৃত্তরেহপি ন দোষঃ। মহাভাষ্যগ্রন্থপাদ্যোক্তঃ।

মূল

কানি পুনঃ শব্দানুশাসনস্ত প্রয়োজনানি ? ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শব্দানুশাসনের [ব্যাকরণশাস্ত্রের] প্রয়োজন [কল] কি কি ? ৬ ॥

বিরূতি—ভাষ্যকার শব্দানুশাসন অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন বিষয়ে প্রশ্ন নিজেই উঠিয়েছেন—এর একটা অভিপ্রায় আছে। অভিপ্রায় হচ্ছে এই যে—ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্য কর্ম অথবা কাম্য কর্ম—ইহা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া। যে কর্মের অনুষ্ঠান না করলে প্রত্যবার [পাপ] হয় সেই কর্ম নিত্য কর্ম। যেমন বিজ্ঞাতির [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য] পক্ষে সন্যাসবন্দনা প্রভৃতি। যে কর্মের অনুষ্ঠান না করলে কোন প্রত্যবার হয় না অথচ করলে কোন একটি অভীষ্ট ফললাভ হয়, তাকে কাম্য কর্ম বলে। যেমন দর্শপূর্ণমাসযাগ, জ্যোতিষ্টোম যাগ ইত্যাদি। এইগুলির অনুষ্ঠান করলে বর্গ হয়, সেদে বর্ণিত আছে—“দর্শপূর্ণমাসাত্যঃ বর্গকামো বভেতঃ” [শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৬।৪।১৭] ইত্যাদি। ব্যাকরণের অধ্যয়ন সন্যাসবন্দনার মত অবশ্য কর্তব্য নিত্য কর্ম অথবা কোন কাম্য ফলের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ? ইহাই পতঞ্জলির প্রশ্নের অভিপ্রায়। এর উত্তরে বা বলা হয়েছে—তার তাৎপৰ্য এই যে—ব্রাহ্মণের পক্ষে বডদসহিত বেদ অবশ্য অধ্যয়নীয়। এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিনের উপলক্ষণ। ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ বলে তার অধ্যয়নও অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্য কর্ম। আবার বেদরক্ষা প্রভৃতি ফলের কথা পরেই বলছেন। সুতরাং ব্যাকরণাধ্যয়ন কাম্যকর্মও বটে ॥ ৬ ॥

মূল

রক্ষোহাগমলক্ষ্যসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্। রক্ষার্থং

বেদানামধোরং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণ-বিকারভেদে

হি সমাগ্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতীতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—[বেদের] রক্ষা, উহ, আগম, লঘু [লাক্ষ্য] ও অসন্দেহ [সন্দেহাভাব] এইগুলি ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন। বেদের রক্ষার জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। লোপ, আগম এবং বর্ণবিকারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি

বেদের সম্যক পরিপালন [রক্ষা] করবেন—এই জ্ঞাত [ব্যাকরণাধ্যয়ন কর্তব্য] ॥ ৭ ॥

শকার্থবর্জন : - রক্ষা = বেদের রক্ষা । উহঃ = সম্ভূতার্থকপদের কল্পনা । আগমঃ = শ্রুতি । লঘু = লাঘব—সহজ উপায় । অসন্দেহঃ = সন্দেহের নিরাস্তি । প্রয়োজনম্ = ফল, [ব্যাকরণাধ্যয়নের ফল] হি = যেহেতু । লোপঃ = জ্ঞাত বর্ণের অদর্শন । আগমঃ = অতিরিক্ত বর্ণের উপস্থিতি । বর্ণবিকারঃ = একবর্ণের অত্যাধিক্য ॥ ৭ ॥

বিবৃতি—ভাষ্যের আরম্ভেই “অং শকাশাসন” এই কথা বলে সাধু [শুদ্ধ-সংস্কৃত] শব্দের জ্ঞান ব্যাকরণের অর্থাৎ ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রয়োজন [সাক্ষাৎ]—ইহা স্মৃতিত হয়েচে । এখন এই সাধু শব্দের জ্ঞানের প্রয়োজন [প্রয়োজনের প্রয়োজন] বেদরক্ষা প্রভৃতি—ইহাই দৃশ্য হচ্ছে । আমরা যে সংস্কৃত ভাষা সাধারণভাবে ব্যবহার করি, কাব্য, নাটক, পুরাণ প্রভৃতি যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাকে লৌকিক সংস্কৃত বলে । বেদের সংস্কৃতকে বৈদিক সংস্কৃত বলা হয় । যে সকল কার্য লৌকিক সংস্কৃতে দেখা যায় না । সেইরূপ অনেক কার্য বৈদিক সংস্কৃতে দেখা যায় । যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তারা লৌকিক ও বৈদিক সংস্কৃতে যে সকলস্থলে ভিন্ন ভিন্ন আকার হয় তাহা অনায়াসে বুঝতে পারেন । কিন্তু যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে নাই, তারা ভাষার ব্যবহার থেকেই ভাষা শিক্ষা করে—ইহাই তাহাদের পক্ষে সম্ভব । এইরূপ ক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তি লৌকিক সংস্কৃতে ব্যবহার ক্ষেত্রে যে সকল পদেই প্রয়োগ দেখে, সেই সকল পদকেই শুদ্ধ বলে নিশ্চয় করে । লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয় না, অথচ বেদে তাহাদের বহুল প্রয়োগ হয়, এরূপ বহুপদ আছে । যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে নাই, সেই সকল ব্যক্তি, সেই বৈদিক শব্দকে শুদ্ধ বলে মনে করে, শুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হবে । বৈদিক মাত্র প্রভৃতিতে সেই সেই বৈদিক শব্দের স্থলে, উহাদের সমানার্থক ও অনেকাংশে সমানাকার লৌকিক সংস্কৃত শব্দের সন্নিবেশ করতে পশ্চাৎপদ হবে না । তাতে বেদ বাক্যের আশুপূর্ব্ব [ক্রমবদ্ধ সন্নিবেশের] পরিবর্তন হওয়ায় সেই বাক্যের বেদত্বই থাকবে না । বৈদিক গ্রন্থে যে শব্দ যে আকারে ও যে ক্রমে পণ্ডিত হয়ে আসছে—ঠিক সেই আকারে ও সেই ক্রমে পণ্ডিত হলেই সেটি বেদ হবে । যদি কোন প্রকারে বৈদিক

বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের মধ্যে কোন একটি পদ বা পদাংশের উদাত্তাদি স্বর এবং অকারাদি বর্ণের ব্যত্যয় অথবা অন্তরূপে পরিবর্তন করা হয়, কিম্বা গুরু পরম্পরাক্রমে যে ক্রমে বেদবাক্য পঠিত হয়ে আসছে, সেই ক্রমের সূক্ষ্ম ব্যতিক্রমও করা হয়, তাহলে সেন্সলে সেই বাক্য বেদ বাক্যরূপে পরিগণিত হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হবে। পূর্বেও একথা বলা হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, কোন অনৈয়াকবণ নিজের ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাৱ বশতঃ বেদ বাক্যের অন্তর্গত কোন শব্দে কোন প্রকার পরিবর্তন করলেই সেই বাক্যের বেদত্ব নষ্ট হবে। এই কারণে বেদের যথাযথ রক্ষার জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

লৌকিক সংস্কৃতে তুহ্ ধাতুর লটের [অনদাতন অতীতের] আত্মনে পদের প্রথম পুরুষের বহুবচনে “অতুহত” এইরূপ পদ হয়। কিন্তু বেদে “অতুহু” এই প্রকার কণেরও প্রয়োগ হয়।* দেবশব্দের প্রথমার বহুবচনে লৌকিক সংস্কৃতে “দেবাঃ” এই প্রকার রূপ হয়, কিন্তু বেদে “দেবাসঃ” এই প্রকার প্রয়োগও হয়ে থাকে। আত্মন্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে লৌকিক সংস্কৃতে “আত্মানা” এইরূপ আকার হয়, বেদে একপস্থলে “অনা” এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। লৌকিক সংস্কৃতে গ্রহ্ ধাতুর লটের [বর্তমানার] উত্তম পুরুষের একবচনে “গৃহ্মামি” এইরূপ প্রয়োগ হয়; বেদে একপস্থলে “গৃভ্ণামি” এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। বেদে ‘স্র’ ধাতুর লিটের প্রথমপুরুষের একবচনে “জভার” এইরূপ প্রয়োগ হয়; লৌকিক সংস্কৃতে একপস্থলে “জহার” প্রয়োগ হয়।

এখন অনায়াসেই ইহা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে যাদের ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান নাই, তাদের হাতে পড়লে বেদের কিরূপ ছন্দশা হতে পারে। পূর্বোক্ত স্থলগুলিতে এবং এরূপ আরও অনেকস্থলে তারা বৈদিক প্রয়োগগুলিকে অশুদ্ধ মনে করে, তাদের সংশোধনের চেষ্টা যদি করে তা হলে আর বেদের বেদত্ব থাকবে না। অতএব বেদের যথার্থ স্বরূপ রক্ষার জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন যে অবশ্য কর্তব্য তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে বেদরক্ষার পানিনি ব্যাকরণই অধ্যাতব্য। বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণের দ্বারা বেদরক্ষা হবে না। অতএব সেইসব ব্যাকরণ অবৈদিক ॥৭॥

মূল

উঃ ঋষি । ন সৰ্বৈর্নিগ্ধৈন'চ সৰ্বাতিবিভক্তিভিঃ

বেদে মজ্জা নিগদিতাশ্চে চাবশ্যং পুরুষেণ বজ্জ

'গতেন যথাবশং বিপরিণময়িতব্যঃ । তান্নাবৈয়্য-

করণঃ শক্ৰোতি যথাবশং বিপরিণময়িত্বম্ ।

তস্মাদব্যোয়ং ব্যাকরণম্ ॥৮॥

অনুবাদ—উহ [বলা হচ্ছে] বেদে সমস্ত লিঙ্গ এবং সমস্ত বিভক্তির দ্বারা মজ্জা পণ্ডিত হয় নাই । যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত মানুষ্যকে সেই সকল মন্ত্রের যথার্থ বিপরিণাম [পরিবর্তন] করতে হবে । যে বৈয়াকরণ নয়, সে ব্যক্তি ঠিকঠিক ভাবে সেই সকল মন্ত্রের বিপরিণাম করতে সমর্থ হয় না । সেই হেতু ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ৮ ॥

বিকৃতি—বেদের বিহিত যজ্ঞকর্ম দুই প্রকার, প্রকৃতি যাগ ও বিকৃতি যাগ । প্রত্যেক যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপযোগী পদার্থগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অঙ্গ ও প্রধান । বাহ্য স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির হেতু অর্থাৎ করণরূপে বেদে বিহিত হয়েছে তাকে 'প্রধান' বলা হয় । স্বর্গাদি ফলের উৎপাদনে ব্যাপ্ত প্রধানের সহায়ক রূপে যেগুলি বেদে 'বর্ণিত' হয়েছে, সেগুলিকে অঙ্গ বলে । এই অঙ্গগুলির প্রতি লক্ষ্য করে যজ্ঞক্রিয়ার প্রকৃতিবিকৃতিভাব বুঝতে হবে । যজ্ঞক্রিয়ার বিভিন্নতার হেতু হচ্ছে তার অন্তর্গত প্রধান কর্মের বিভিন্নতা । অঙ্গগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য থাকলেও যদি প্রধান কর্মের ভেদ হয়, তা হলে যজ্ঞকর্মের ভেদ হয়ে থাকে । কেনে কতকগুলি কর্ম এরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই সকল কর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপযোগী অঙ্গগুলিও সাক্ষাৎভাবে উপদিষ্ট হয়েছে । এই সকল কর্মকে প্রকৃতি [যাগ] বলে । বৈদিক যজ্ঞগুলির অন্তপ্রকার অবান্তর ভেদ আছে । এই যজ্ঞগুলির মধ্যে কতকগুলিকে হোম বলে । জুহোত্যাদি-পদে পণ্ডিত হুধাতুর উচ্চারণের দ্বারা যে সকল কর্মের বিধান করা হয়েছে সেগুলি হোম । 'ত্বাতস্ময়ন জোতস্ময়ে হোমের লক্ষণ বলা হয়েছে (৩৭) ।

যে সকল যজ্ঞক্রিয়ার উপবিষ্ট অবস্থায় আহুতি দেওয়া হয় এবং যাতে “স্বাহা” শব্দের উচ্চারণ করে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের ত্যাগ করতে হয় তাদের নাম হোম। বেদে অনেক প্রকার হোম বিহিত হয়েছে। যে যজ্ঞক্রিয়ায় দণ্ডাধমান অবস্থায় অগ্নিতে মন্ত্রপূত আহুতি প্রক্ষেপ করা হয়, যাতে “বৌষট্” শব্দের উচ্চারণপূর্বক দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের ত্যাগ করা হয় এবং যাতে বেদোক্ত “বাজ্যা” ও “পুরোহুত্বাক্য” (৩৮) নামক মন্ত্রের উচ্চারণ বিহিত হয়েছে সেই সকল ক্রিয়ার নাম বাগ। এই বাগের লক্ষণও কাভ্যায়ন শ্রোত যজ্ঞে উক্ত হয়েছে। যে সকল বাগ বা হোমে কোন অঙ্গের উপদেশ করা হয় নাই, অথবা আবশ্যক অঙ্গগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র অঙ্গ উপদিষ্ট হয়েছে, অল্প অঙ্গগুলি অপর বাগ বা হোম থেকে গৃহীত হয়ে থাকে এইরূপ বাগ বা হোমকে বিকৃতি বলা হয়। মীমাংসাকগণ বলেছেন “প্রকৃতিবদ্বিকৃতিঃ কৰ্তব্য্যা” প্রকৃতির ন্যায় বিকৃতি করবে। যার দ্বারা একের ধর্ম অপরে বোধিত হয়, তার নাম অতিদেশ। সুতরাং “প্রকৃতিবদ্বিকৃতিঃ কৰ্তব্য্যা” এটাও একটা অতিদেশ। মীমাংসাদর্শনেন পঞ্চমাধ্যায়ে সামান্য অতিদেশ ও অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষ অতিদেশের বিচার করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে উহের বিচার করা হয়েছে। এখানে পতঞ্জলি বলছেন - উহের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা আবশ্যিক। উহ বিতর্কে—যাতু + ঘঞ প্রত্যয় করে উহ শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হলো কল্পনা। প্রকৃতির মত বিকৃতির অনুষ্ঠান করবে, এরূপ অতিদেশের দ্বারা প্রকৃতিবদ্বিকৃতি প্রকার অঙ্গই বিকৃতিতে অতিদ্বিষ্ট [বোধিত] হয়। মন্ত্রও অতিদ্বিষ্ট হয়। প্রকৃতিঘাণের যে মন্ত্র অতিদেশবশত বিকৃতিতে প্রাপ্ত হয়,

(৩৮) ‘বাজ্যা’ “বেষজামঃ” এই বাক্য উচ্চারণ পূর্বক বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার হোতা যে মন্ত্র পাঠকরে থাকেন, যে মন্ত্রের সমাপ্তিতে “বৌষট্” শব্দ উচ্চারিত হয়, দেবতার উদ্দেশ্যে হুবি: পরি-
ত্যাগের সময় এইরূপ যে মন্ত্র পাঠিত হয় তার নাম বাজ্যা। [শ্রোতপদার্থনির্ধন ইষ্টিপ্রকরণ : ৩৩। কাভ্যায়নশ্রোতযজ্ঞ কৰ্ত্তব্যঃ - ১৮৪]

পুরোহুত্বাক্য = দেবতার আবাহনের উদ্দেশ্যে অঙ্গমূর দ্বারা প্রেরিত হয়ে হোতা একত্র-
বসযোগে ইষ্টিনামক যজ্ঞে যে যন্ত্রমন্ত্র পাঠ করেন এবং সোমবাগে অঙ্গমূর প্রেরিত মৈত্রাবকণ নামক
বক্তৃক দেবতার আবাহনের জন্য যে বক্তৃ পাঠ করেন তার নাম “পুরোহুত্বাক্য” বা “অনুবাভ্যা”
[শ্রোতপদার্থনির্ধন—ইষ্টিপ্রকরণ এবং উক্ত কৰ্ত্তব্যঃ।]

ব্যক্তিকগণ সাধারণত “বৌষট্” শব্দকে “বষট্কার” শব্দের দ্বারা উদ্বেষ্ট করেন। পিত্তোষ্টিতে
‘বধাননঃ’ এই মন্ত্রকে বষট্কার বলা হয়। [শ্রোতপদার্থনির্ধন ইষ্টিপ্রকরণ ২৩১, ২৩২]

বিকৃতি যাগে স্থলবিশেষে তার কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি ও বিকৃতির দেবতা স্বভাবতঃ ভিন্ন হয়। প্রকৃতিতে দেবতার প্রকাশের নিমিত্ত যে মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, বিকৃতিতে সেই মন্ত্র অবিকল প্রযুক্ত হতে পারে না। বিকৃতির দেবতার প্রকাশের জন্য বিকৃতিতে প্রয়োগকালে সেই মন্ত্রের দেবতাবাচক পদের পরিবর্তন করা আবশ্যিক হয়। তা না হলে, সেই মন্ত্রের দ্বারা বিকৃতির দেবতার প্রকাশ বা জ্ঞান হতে পারে না। দর্শও পৌণমাস যাগের একটি দেবতা হচ্ছে অগ্নি। এই অগ্নির উদ্দেশ্যে যে যাগ করা হয় তাকে আগ্নেয় যাগ বলে। এই আগ্নেয়যাগের বিকৃতি হচ্ছে সৌর্যযাগ। শ্রুতিতে আছে ‘সৌর্যং চক্ষুঃ নির্বপেন্দ ব্রহ্মবর্চসকামঃ’ অর্থাৎ যে ব্রহ্মতেজ কামনা করে সে সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে চক্ষু নির্বাপন করবে। এখানে নির্বাপনকেই মুখ্য অর্থের সঙ্গতি নাই বলে লক্ষণাস্বীকার করে যাগ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। (৩২)।

যাগের অন্ত হচ্ছে নির্বাপ। প্রকৃতি যাগে [‘আগ্নেয়যাগে’] মন্ত্র পঠিত আছে “অগ্নয়ে স্বা জুষ্টং নির্বপামি।” [বাস্কল সংহিতা ১১৩]

“অগ্নিদেবতা তোমাকে সেবিত পদার্থ প্রদান করি।” প্রকৃতি যাগে অগ্নিদেবতা বশে মন্ত্রে অগ্নিবোধক “অগ্নয়ে” পদ আছে। বিকৃতি যাগে সূর্য দেবতা হওয়ায়, অগ্নিপদের স্থানে সূর্যপদের প্রক্ষেপ করতে হবে এবং প্রকৃতি যাগে দেবতা বোধক পদের উত্তর যে বিভক্তি আছে, সূর্যপদের উত্তরও সেই বিভক্তির প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ “অগ্নয়ে” পদের স্থানে “সূর্যায়” এই পদের প্রয়োগ করতে হবে। একেই মন্ত্রের উহ বলে। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করলে একুপ “উহ” করতে পারা যায় না। এইজন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন আবশ্যিক। যদিও উহ করলে বেদের বেদত্ব থাকে না বলে মন্ত্রের মন্ত্রত্ব থাকে না, তথাপি মন্ত্রে অনেক পদ থাকায়, তার মধ্যে একটা পদের পরিবর্তন করলেও ‘সেই মন্ত্র’ বলে প্রতিভিজ্ঞা হয়। স্ততরাং সেই উহ অর্থাৎ পরিবর্তিত পদঘটিত বাক্যকে মন্ত্র বলে ব্যবহার করা হয় এবং তার দ্বারা

(৩২) শকটাবস্থাপিতরীহিসজ্বাগ্নিঃ। বৃষ্টিভৃষ্টপরিমিতানাং রীহীণাং শূর্ণে প্রক্ষেপো নিবাপ-পদ্ব্যপূর্বকো যাগোহত্র নির্বাপেনাপোলক্যতে [ঐত্তরেয়ব্রাহ্মণ সাধনভাষ্য ১১১]।

শকটে অবস্থিত রীহিসমূহ [ধান] হতে নিদাশন পূর্বক চারমুঠো রীহিস শূর্ণে [কুলাতে] প্রক্ষেপের নাম নির্বাপ। সেই নির্বাপ পূর্বক যে যাগ তাকে এখানে নির্বাপ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে।

যাগের অঙ্গ সম্পাদিত হয়। উহ তিন প্রকার—যজ্ঞের অঙ্গরূপ সংস্কার নামক উহ (১) সামমন্ত্রোহ (২)। মন্ত্রের উহ (৩)। এই তিন প্রকার উহের মধ্যে এখানে শেষোক্ত “মন্ত্রোহের” কথাই বলা হয়েছে। এই মন্ত্রের উহেই ব্যাকরণজ্ঞানের প্রয়োজন। পূর্বোক্ত দুটি উহে ব্যাকরণের অপেক্ষা নাই। মীমাংসা দর্শনের নবম অধ্যায়ে উহ বিষয়ে বিশদ বিচার আছে ॥ ৮ ॥

মূল

আগমঃ খলু পি। “ব্রাহ্মণেন নিষ্করণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো

বেদোহধ্যায়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানং চ ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্।

প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আগমও [শ্রুতি বা স্মৃতি] (ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটি প্রয়োজন)। ব্রাহ্মণের পক্ষে ঈষৎ অঙ্গের (৪০) সহিত বেদের অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান কর্তব্য—ইহা নিষ্কারণ ধর্ম। ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান। প্রধানে যত্ন করলে, সেই যত্ন, সফল হবে থাকে। [এইজন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত] ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—“ব্রাহ্মণেন নিষ্করণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধ্যায়ো জ্ঞেয়শ্চেতি।” এটি একটি শাস্ত্রবাক্য। পদমঞ্জরীকার হরদত্তপ্রভৃতি বৈষাকরণগণ বলেন এই বাক্যটি শ্রুতি বাক্য। কুমারিলভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকগণ বলেন—ইহা শ্রুতি নয় কিন্তু ইহা স্মৃতিবাক্য (৪১)।

এই উদ্ধৃত আগমবাক্যে যে বেদ শব্দ আছে, তার অর্থ সমগ্র বেদ নয়, কিন্তু নিজ নিজ শাখামাত্র—ইহা মহাভাষ্য প্রদীপোদ্ভোত গ্রন্থে বলা হয়েছে। নাগেশ ভট্ট “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ [ঐতিহাসিক আরণ্যক ২।১৫।১] এই শ্রুতি-বাক্যের সঙ্গে মহাভাষ্য প্রদর্শিত উক্ত আগমবাক্যের একবাক্যতার প্রতি লক্ষ্য

(৪০) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকট, জ্যোতিষ ও ছন্দঃশাস্ত্র এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। [এই বইর ৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে]

(৪১) শ্রুতিরূপেই হরদত্তাদয়ঃ। স্মৃতিরূপে হু কট্যচাৰ্ধ্যাঃ। তত্র যদি স্মৃতিরূপেই প্রাণাণিকম্ তর্হি “আগমঃ খলু পীতি” ভাষ্যোহপি আগমমূলকত্বাদাগমঃ স্মৃতিরূপেই ব্যাখ্যায়ম্।। [সং-কৌস্তভ ১।১।১] আগমপদেন শ্রুতিঃ। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্ভোত ১।১।১]

ইং ৫ শ্রুতিঃ, আগমপদন্তু বেদে স্মৃতিবাদিহি শাস্ত্রিকাঃ। স্মৃতিরূপে মীমাংসকাঃ। [বিখ্যাত পণ্ডিতকৃত ব্যাকরণসিদ্ধান্ত সুধানিধি ১।১।১]

“নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্ছাত্রাত্তরশ্চাম্” [১।২।৬২]। অর্থাৎ অনপুংসক-
লিঙ্গ শব্দের সহিত প্রয়োগে নপুংসকলিঙ্গ শব্দের শেষ [অত্র শব্দের নিবৃত্তি
পূর্বক স্থিতি হয় এবং বিকল্পে উহার একবদ্ভাব অর্থাৎ একবচন হয়। অতএব
“রক্ষোহাগমলঘনসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্” এই স্থলে বিশেষ্যপদে পুংলিঙ্গ বহুবচন
থাকলেও “প্রয়োজনম্” এই বিশেষণ পদে নপুংসকলিঙ্গ একবচন অঙ্গুপন্ন নয়।

বেদের ৬টি অঙ্গ পূর্বে বলা হয়েছে—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিক্কত, জ্যোতিঃ-
শাস্ত্র ও ছন্দঃশাস্ত্র। ইহাদের সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে—

(১) যে শাস্ত্রের সাহায্যে উদাত্ত, অহুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বরযুক্ত বেদ-
মন্ত্রের শুদ্ধভাবে উচ্চারণপ্রণালী জানতে পারা যায়, সেই শাস্ত্রের নাম শিক্ষা।
তৈত্তিরীয় উপনিষদের আরম্ভে এবং গোপথ ব্রাহ্মণে (৪৩) শিক্ষার সূচনা দেওয়া
হয়েছে। পাণিনি প্রণী শিক্ষা সাধারণভাবে সকল বেদের উপযোগী হওয়ায়
ইহাকে সর্ববেদ-সাধারণী শিক্ষা বলা যায়। পাণিনি ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ,
লোমশ প্রভৃতি অনেক ঋষি শিক্ষা শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। সেই সকল শিক্ষার
ভিন্ন ভিন্ন বেদের বর্ণোচ্চারণের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। সেগুলি সর্ববেদ
সাধারণ শিক্ষা নয়। শৌনক, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত “প্রাতিশাখ্য”
নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহও শিক্ষার মধ্যে পরিগণিত। এই সকল প্রাতিশাখ্য
গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখার উপযোগী উদাত্তাদি স্বরের ব্যবস্থা ও উচ্চারণ
পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এই জন্যই এই গ্রন্থসমূহকে প্রাতিশাখ্য নামে অভিহিত
করা হয়।

(২) আখ্যায়ন, আপস্তম্ব, বোধায়ন, সাংখ্যায়ন, লাট্যায়ন প্রভৃতি
ঋষিগণের প্রণীত সূত্রগ্রন্থকে “কল্প” বলা হয়। পূর্বমীমাংসার শব্দর ভাষ্যে
মাশক, হাডিক, কোণ্ডিক এই তিনটি কল্পসূত্রের নাম দেখা যায়। ইহাদের
মধ্যে মাশক কল্পসূত্র কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত
অবস্থায় আছে—বলে শোনা যায়। শব্দর স্বামী আখ্যায়ন শ্রীতসূত্র প্রভৃতি
প্রচলিত কল্পসূত্রের উল্লেখ করেন নাই। এই সকল কল্পসূত্রে স্বাধীনভাবে
কোন প্রকার অমুঠান পদ্ধতি বলা হয় নাই। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞের
অমুঠান পদ্ধতি বিকিপ্তভাবে বর্ণিত আছে। আখ্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ

ব্রাহ্মণ ভাগ থেকে সেই সকল ঋতিবাক্য আহরণ করে এবং তাদের অভিপ্রায় মীমাংসাদর্শন প্রদর্শিত বিচার পদ্ধতির দ্বারা স্থির করে কল্পস্থত্রে যজ্ঞের অমুষ্ঠান পদ্ধতির উপদেশ করেছেন।

(৩) যে শাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দ্বারা সাধু [শুদ্ধ সংস্কৃত] শব্দের উপদেশ করা হয়, সেই শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ। বৈদিক যুগ থেকেই এই ব্যাকরণ শাস্ত্রের আরম্ভ হয়েছিল—এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় (৪৪)। ঋষি-যুগের সূত্রকার বৈয়াকরণগণের মধ্যে পাণিনি সকলের অস্টিম। পাণিনির পূর্বে আপিশলি, গার্গ্য, শাকল্য, সেনক, ফোটারন, চাক্রবর্মণ, গালব, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন [ইনি ঋষি শাকটায়ন জৈন শাকটায়ন নয়] প্রভৃতি বৈয়াকরণ ঋষি ছিলেন। বর্তমানে ইহাদের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এই সকল বৈয়াকরণের নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে (৪৫)। পাণিনি ইহাদের গ্রন্থ পর্যালোচনা করে অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেছেন। পাণিনির পরে চুর্গসিংহ, চন্দ্রগোমৌ প্রভৃতি আরও অনেকে ব্যাকরণের সূত্রপ্রণয়ন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সূত্রগ্রন্থ পাণিনির মত আদরলাভ করতে পারে নাই। পুরুষোত্তম দেব (৪৬) জিনেন্দ্রবুদ্ধি (৪৭) প্রভৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ বৈয়াকরণগণ পাণিনি সূত্রের উপদেশতা লক্ষ্য করে পাণিনি ব্যাকরণেরই ব্যাখ্যা লিখে গেছেন। শোনা যায় বৌদ্ধবহুল তিব্বত দেশেও তিব্বতীভাষায় পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যা লিখিত হয়েছিল। পাণিনির পরে কাত্যায়ন পাণিনি ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতা পরিহারের উদ্দেশ্যে পাণিনি সূত্রের উপর প্রায় ৪০০০ বার্তিক রচনা করেছেন। এই বার্তিকের পরেও যে অসম্পূর্ণতা ছিল,

(৪৪) তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৫।২; এখানে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণপ্রতিপাদিত বিভক্তির উল্লেখ আছে। গোপথব্রাহ্মণেও ব্যাকরণের প্রসঙ্গ আছে। গোপথব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১।২৪, ২৬, ২৭, এতদ্বািতীত বেদের অষ্টাঙ্গ ব্রাহ্মণগ্রন্থেও বৃক্ষবিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা হয়েছে— দেখা যায়।

(৪৫) পাণিনির সূত্রে বৈয়াকরণের নামের কয়েকটির উল্লেখ করা হলো আপিশলি ৬।১।২২। গার্গ্য ৭।৩।২২, ৮।৩।২০, ৮।৪।৬৭। শাকল্য ১।১।১৬, ৬।১।১২৭, ৮।৩।১২, ৮।৪।৫১। সেনক ৫।৪।১২২। ফোটারন ৬।১।১২৩। চাক্রবর্মণ ৬।১।১৩০। গালব ৬।৩।৬১। ভারদ্বাজ ৭।২।৬৩। শাকটায়ন ৮।৩।১৮, ৮।৪।৫০ ইত্যাদি।

(৪৬) পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাকার। (৪৭) কালিকার-ব্যাখ্যাসংস্কার।

তার নিষাকরণের জন্ত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি স্বতন্ত্র ভাবে কতকগুলি বিধি নিবেদন প্রবর্তিত করে গেছেন। ব্যাখ্যা রচনা ভাষ্যকারের কর্তব্য হলেও পতঞ্জলির দৃষ্টিতে পাণিনীর ব্যাকরণে যে সকল ক্রটি লক্ষিত হয়েছিল তিনি তার সমাধানে উপেক্ষা করেন নাই (৪৮) ভাষ্যকারের প্রবর্তিত এই সকল বিধি ও নিষেধের নাম “ইষ্টি”।

(৪) নিরুক্ত—নিরুক্তকে স্বতন্ত্র বেদান্তরূপে বর্ণনা করলেও, নিরুক্তশাস্ত্রে ব্যাকরণের অপেক্ষা অতিশয় থাকায় নিরুক্তকে ব্যাকরণের পরিশিষ্ট বললে কোন দোষ হয় না। পদের সাধনের জন্ত ব্যাকরণ শাস্ত্রে স্বতন্ত্ররচনা করা হয়েছে। ব্যাকরণের সূত্রে যে সকল পদের সম্পৃষ্টভাবে সাধন প্রণালী বলা হয় নাই, অথচ পদসাধনের সূচনা করা আছে, নিরুক্তে অনেকক্ষেত্রে সেই সকল শব্দের সাধন প্রণালী দেখানো হয়েছে (৪৯) এই জন্ত নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন এই নিরুক্তশাস্ত্র ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতা পরিহার করে তার পূর্ণতা সম্পাদন করেছে (৫০)। যার ব্যাকরণজ্ঞান নাই, তার নিরুক্তে ব্যুৎপত্তি হবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই কারণে যাস্ক অবৈয়াকরণকে নিরুক্তের উপদেশের অযোগ্য বলেছেন (৫১)।

যদিও ব্যাকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে নিরুক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তথাপি ব্যাকরণশাস্ত্রের সহিত নিরুক্তের কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই, একথা বলা যায় না। এই বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে যাস্ক বলেছেন নিরুক্ত শাস্ত্রের স্বতন্ত্ররূপেও প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনটি যাস্ক স্পষ্টভাবে

(৪৮) পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র বলেছেন

ষড়বিম্বতমদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তৎস্মৃৎম।

বাক্যকারো ব্রহ্মীত্যং তেনাদৃষ্টং চ ভাষ্যকৃৎ ॥

সূত্রকার বা বিম্বত হয়েছেন বা লক্ষ্য করেন নি, ব্যতিক্রমকার [পদমঞ্জরী ১১] তা বলেছেন, ব্যতিক্রমকার বা লক্ষ্য করেন নি ভাষ্যকার তা বলেছেন।

(৪৯) নিরুক্তং তু ব্যাকরণস্যৈব পরিশিষ্টপ্রাচ্যম্। বাহুল্যাদিসাধ্যানাং লোপাগমবিকারাদীনাং প্রায়শস্ত্র সংগ্রহাৎ। [শব্দকৌশল ১।১।১]

(৫০) তদ্বিদং বিদ্যাহীনং ব্যাকরণস্য কাংগ্রাম্। [নিরুক্ত ১।১৫।১] পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র যাস্কের এই উক্তির সমর্থন করেছেন—নিরুক্তং ব্যাকরণস্তৈব কাংগ্রাম্। পদমঞ্জরী ১।১।

(৫১) “বাবৈয়াকরণায়” [নিরুক্ত ২।৩।৫]

যন্তাবদবৈয়াকরণং তস্মৈ ন নিষক্তবোধ্যং সমায় যঃ, ন হুসাবলক্ষণজ্ঞানং ব্যুৎপত্তি মানমেতন্ বুধ্যাত, ততো বার্থ এব অমঃ সাধিত্তি। হুগাঁঠাটীকা।

বলেম নাই। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য স্পষ্টভাবে বলেছেন—নিরুক্ত শাস্ত্রে পদগম্যুহের অর্থ স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। ব্যাকরণে কেবল সূত্র আছে, সেই সূত্রের ইঙ্গিত থেকে পদের অর্থ জাগিত হলেও প্রত্যেক পদকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে স্পষ্টভাবে তার অর্থ প্রদর্শন করা হয় নাই। ব্যাকরণশাস্ত্র সূত্র প্রধান। কিন্তু নিরুক্তশাস্ত্র সেরূপ নয়। এইটুকুই ব্যাকরণ থেকে নিরুক্তের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্তই নিরুক্ত শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণনা করা হয়। পাণিনির পূর্বে আপিশলি প্রভৃতি বৈয়াকরণ ছিলেন এবং তাঁদের গ্রন্থ অবলম্বন করে পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেছেন। এইরূপ যাস্কের পূর্বেও শাকপুণি, ঔর্ণনাভ, ক্রৌষ্টিকি, প্রচর্মশিরা প্রভৃতি নিরুক্তকার ছিলেন। যাস্ক তাঁদের অনুসরণ করে নিজের গ্রন্থরচনা করেছেন। সেই সকল ঋষির গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। যাস্কের নিরুক্তের অনেক স্থলে এঁদের মত উদ্ধৃত হয়েছে (৫২)।

(৫) জ্যোতিষ [জ্যোতিব]। বেদের অধ্যয়ন কাল এবং বেদবিহিত ক্রিয়ার অমুষ্ঠানের কালের নির্ণয়ের জন্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। এই জ্যোতিঃশাস্ত্রও প্রথমে ঋষিরা রচনা করেছিলেন। পরবর্তিকালে এর অনেক বিস্তার সাধিত হয়েছে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ এবং যজুর্বেদের অঙ্গ জ্যোতিষের কথা এখন পর্যন্ত জানা গেছে।

(৬) চন্দঃ—বেদে তিনপ্রকার মন্ত্র আছে—ঋক্, যজুঃ এবং সাম। বেদে সকল মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ তাদের নাম ঋক্। যে সকল মন্ত্রের চন্দঃ নাই গজকপে পঠিত, তাদের নাম যজুঃ। যে সকল মন্ত্র ঋক্ ও যজুঃ হাতে ভিন্নজাতীয়, গানরূপে উচ্চারিত হয়, তাদের নাম সাম। এই সামমন্ত্রগুলি ঋক্‌মন্ত্রেরই গানরূপে পরিবর্তিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ঋগ্‌ মন্ত্রের ছন্দোজ্ঞানের জন্ত চন্দঃ শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। অধুনা অল্প ঋষি প্রণীত চন্দঃ শাস্ত্র দেখা যায় না। কেবল পিজলের চন্দঃ শাস্ত্র এখন প্রচলিত।

এই ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই বেদের প্রধান অঙ্গ। পাণিনির শিক্ষায়

(৫২) নিরুক্ত—শাকপুণি ৩।১।২, ৮।১।৩। ঔর্ণনাভ ২।২৬।১, ১২।১।৪। ক্রৌষ্টিকি ৮।২।১। প্রচর্মশিরা ৩।১০০।১। ওতরাঙ্গীত আশ্রয়ণ, উত্তরায়ণ, কোংস, কাংকা প্রভৃতি পূর্ববর্তী বহু নৈরুক্ত আচার্যের উল্লেখ যাস্কের নিরুক্তে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে শাকপুণির নাম অধিকস্থলে উল্লিখিত।

আছে—

(৫৩) ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্ত হন্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে ।

জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥

শিক্ষা ভ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্ ॥ [পাঃশি ৪০— ৪২]

‘ছন্দঃশাস্ত্র বেদের পদব্ধয়, কল্প অর্থাৎ শ্রোত্র স্মৃত বেদের হস্তব্ধয়, জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদের চক্ষুঃ, নিরুক্ত বেদের শ্রোত্র, শিক্ষা বেদের ভ্রাণেন্দ্রিয়, ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ। মাহুষের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মুখ প্রধান অঙ্গ, সকল অঙ্গ থেকে মুখ না থাকলে আহার কার্য অনিষ্ট হয় হতো; আহার কার্য অনিষ্ট হলে শরীর রক্ষা সম্ভব হতো না এবং শরীরে বলও থাকতো না। বল না থাকলে হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুঃশ্রোত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মক্ষম হতো না। তাদের সত্তা নিরর্থক হোত। এইরূপ ব্যাকরণ শাস্ত্র না থাকলে বেদের কোনরূপ অর্থজ্ঞান সম্ভব হোত না। অর্থজ্ঞান না হলে বেদের দ্বারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সিদ্ধ হোত না। তাতে বেদ ব্যর্থ হয়ে যেত।’ ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা আমরা বেদের অর্থজ্ঞান করতে পারি ও সেই অর্থজ্ঞান থেকে যজ্ঞাদি কর্মে যথাযথ ভাবে বেদের উপযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হই। অতএব ব্যাকরণই বেদের প্রধান অঙ্গ। বেদান্তের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান হওয়ায় “ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ” ইত্যাদি আগম [শাস্ত্র] অনুসারে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। কারণ প্রধান বিষয় যে যত সম্পাদিত হয়, সেই যতই ফলের জনক হয়ে থাকে। এখানে “ফলবান্” এই শব্দের অঙ্গগত “ফল” শব্দটির অর্থ বাক্যার্থজ্ঞান। এই ব্যাকরণ শাস্ত্র পদ ও পদের অর্থজ্ঞান-দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞানের উপযোগী। অতএব বেদের প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণের অধ্যয়ন থেকে বাক্যের অর্থজ্ঞানরূপ ফললাভ হয়ে থাকে।

(৫৩) শব্দ কোস্তভের পশ্চাৎক্ষিপ্ত এই অংশের পাঠ্যভঙ্গুর গৃহীত হয়েছ—

মুখঃ ব্যাকরণঃ তস্য জ্যোতিষং নেত্রমুচ্যতে ।

নিরুক্তং শ্রোত্রমুদ্বিষ্টং ছন্দঃ বিচিতিঃ পথঃ ॥

শিক্ষা ভ্রাণং তু বেদস্য হন্তৌ কল্পান্ প্রচক্রে ॥

বিবেচন পণ্ডিত প্রণীত ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত স্থাননিধিতেও এইরূপ পাঠ্য গৃহীত হয়েছে। শব্দ-কোস্তভকার ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন অঙ্গ বেদন অঙ্গীর উপকার করে থাকে, সেইরূপ ব্যাকরণ প্রভৃতি ছয়টি শাস্ত্র বেদের উপকারীক হওয়ার উদাহরণকে বেদের অঙ্গ বলি হয়। উপকারকতায়—
পাল্লভ্য (শব্দকোস্তভ ১।১।১)

“ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ বডনো বেদোহধ্যোয়ো জ্যেষ্ঠ”। এই আগম-বাক্যের অন্তর্গত “নিষ্কারণো ধর্মঃ” এই অংশের দ্বারা ‘ইহা’ই অভিযুক্ত হয়েছে যে, কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেই ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন ও তার অর্থজ্ঞান অবশ্য কর্তব্য (৫৪)

মীমাংসকেরা শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহকে নিত্য ও কাম্য ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যে সকল কর্মের অমুষ্ঠান না করলে সেই কর্মের অধিকারীর প্রত্যাবায় [পাপ] হয়, সেইগুলিকে নিত্য কর্ম বলে। আর যে সকল কর্মের অমুষ্ঠান না করলে সেই কর্মের অধিকারীর কোনরূপ প্রত্যাবায় হয় না, কিন্তু অমুষ্ঠান করলে কোন কাম্যফলের লাভ হয় তাদের নাম কাম্য কর্ম। উপনীত বিজ্ঞাতি সন্ধ্যা বন্দনাদি না করলে পাপ হয় বলে সন্ধ্যাবন্দনাদি বিজ্ঞাতির নিত্য কর্ম। এইরূপ আরও যে সকল কর্ম যে সকল আধিকারীর জন্ত শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে, যাদের অমুষ্ঠানে কোন ফল নাই, কিন্তু না করলে অধিকারীর পাপ হয় সেই সমস্ত কর্মও নিত্যকর্মের অন্তর্গত। “বাক্যপেয় যজ্ঞ” প্রভৃতির অমুষ্ঠান না করলে যারা এসকল কর্মের অধিকারী তাদের কোন পাপ হয় না কিন্তু অমুষ্ঠান করলে বিশিষ্টফললাভ হয়; এইজন্ত এই শ্রেণীর কর্মসমূহ ‘কাম্য’ কর্মের অন্তর্গত।

শাস্ত্রে এরূপ অনেক কর্মের, বিধান আছে, যে সকল কর্মের অমুষ্ঠান না করলে, যারা সেই সব কর্মের অধিকারী তাদের পাপ হয়, অথচ অমুষ্ঠান করলে বিশিষ্টফললাভ হয়, এই সকল কর্ম একাধারে নিত্য এবং কাম্য উভয়ই। ব্রাহ্মণের পক্ষে বড়নবেদের অধ্যয়ন ফলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে করা উচিত— এইরূপ উপদেশ থাকার বুঝা যাচ্ছে যে বড়নসহিত বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম। ব্যাকরণ বেদের একটি অঙ্গ বলে তার অধ্যয়নও ব্রাহ্মণের নিত্যকর্মরূপে বিহিত হয়েছে। ব্যাকরণাধ্যয়নের সাধুশিক্ষাজ্ঞান ও বেদরক্ষাদি ফল আছে বলায় উহা যে কাম্যকর্ম তাও বলা হয়ে গেছে।

“ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ বডনো বেদোহধ্যোয়ো জ্যেষ্ঠ” এই আগম বাক্যের দ্বারা বেদের অধ্যয়নের মত ব্যাকরণের অধ্যয়নও ব্রাহ্মণের পক্ষে

(৫৪) উক্ত বাক্যের অন্তর্গত “কারণঃ” শব্দটির অর্থ ফল। ‘কারণধনঃ ফলগরঃ (মহাভাগ্য প্রদীপোদ্যোত) কারণভেদঃ করণগুণাঃ প্রবৃত্তিজনকৈচ্ছাবিবরণস্বভাৱেন প্রবৃত্তিজনকস্য ফলস্য কারণপদেন লভ্যং। [ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত স্থানানি]

নিত্য কর্মরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায়, এর অস্থান না করলে ব্রাহ্মণেব প্রত্যবায় হবে—ইহা স্মৃতিত হইয়া গেছে। অতএব এইরূপ প্রত্যবায় যাতে না জন্মে তাঁর জন্ত ব্যাকরণাধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য—ইহাই মহাভাষ্যকার উক্ত আগম উদ্ধৃত করে প্রতিপাদন করেছেন। যদিও “ব্রাহ্মণেন নিকারণঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ছয়টি বেদান্তেরই অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে, তথাপি মহাভাষ্যকার অত্রাণ্ড অঙ্গের অধ্যয়ন অপেক্ষা ব্যাকরণেব অধ্যয়ন অতিশয় আবশ্যক—ইহা প্রতিপাদন করবার জন্ত তার মুক্তিমুক্ততা প্রদর্শন করেছেন—

“প্রধানং চক্ষটম্বেষু ব্যাকরণম্। প্রধানেন চ ক্রতো যতঃ ফলবান্ ভবতি।”
বেদের ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান। প্রধান বিষয়ে যে যত্ন করা হয়, সেই যত্ন ফলবান [সফল] হয়। এখানে মহাভাষ্যকারের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় ব্যাকরণেব অধ্যয়ন না করলে দুটি দোষ হয়। (১) ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যাকরণাধ্যয়ন যে অবশ্য কর্তব্য, তা না করলে একটি কর্তব্যের অস্থান করা হয় না। (২) ব্যাকরণের অধ্যয়ন না করায়, বেদের অর্থজ্ঞান বা ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য তাহাও হয় না ॥ ২ ॥

মূল

লঘবর্ধং চাধ্যয়ং ব্যাকরণম্। ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শক্য

জ্ঞেয়া ইতি। ন চাস্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন

শক্যঃ শক্য জ্ঞাতুম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—লঘুর [লাঘবের] নিমিত্ত ব্যাকরণেব অধ্যয়ন কর্তব্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দসমূহ [সাধু সংস্কৃত শব্দ] অবশ্য জ্ঞাতব্য। ব্যাকরণ ব্যতীত লঘুউপায়ের দ্বারা শব্দ সমূহ জানিতে পারা যায় না ॥ ১০ ॥

শব্দার্থ বর্ণনা :—মহাভাষ্যকার এখানে ‘লঘবর্ধম্’ পদের অন্তর্গত লঘু শব্দটির অর্থ লাঘব। সাধারণত “লঘু” এই শব্দের দ্বারা যে বস্তু, লাঘববিশিষ্ট তাকেই বোঝায়; কেবল লাঘব অর্থ বুঝায় না। যেমন ‘ঘট’ শব্দের দ্বারা ঘটবিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়, কেবল ঘটকে বুঝায় না। এখানে “লঘু” শব্দটি নিজের স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ করে “লাঘব” অর্থে বুঝাচ্ছে। এক্ষণে প্রয়োগকে ভাবপ্রধান নির্দেশ করে। [ভাবপ্রধানঃ নির্দেশঃ]। এক্ষণে বলার অভিপ্রায় এই; যে শব্দটি ধর্মবিশিষ্টের [ধর্মীর] বাচক, সেই শব্দটিকে লাঘব

মুখ্যঅৰ্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। তার মুখ্য অর্থ ধর্মী; সেই মুখ্যঅর্থটিকে পরিভাগ করে “ধর্ম” রূপ অর্থে তার লক্ষণা প্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষণে হলে একটিমাত্র বস্তু [ধর্ম] ই প্রকারতঃ [বিশেষণতা] ও বিশেষ্যতা এই উভয়রূপে প্রতীয়মান হয় [নাগেশভট্ট লঘুমঞ্জুবা ফোটি প্রকরণ] ॥ ১ ॥

বিরুদ্ধি :—ব্রাহ্মণের একটি বৃত্তি [জীবিকা] অধ্যাপনা। যার শব্দজ্ঞান নাই ছাত্রগণ তাকে অবুৎপন্ন মনে করে, তার নিকট অধ্যয়নের অল্প উপস্থিত হয় না। ছাত্র উপস্থিত না হলে অধ্যাপনা কার্য সম্পন্ন হয় না। এই অল্প ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দজ্ঞান অবশ্য কর্তব্য। ব্যাকরণ ব্যতীত শব্দজ্ঞানের অত্বকোন রূপ লাঘব বিশিষ্ট উপায় নাই। এই অল্প ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দজ্ঞানার্থ ব্যাকরণের অধ্যয়ন অবশ্য করণীয়। (৫৫)

এখানে একটি আশঙ্কা উত্থিত হয়;—এখানে লাঘবকে ব্যাকরণাধ্যয়নের একটি ফল বলা হয়েছে। কিন্তু লাঘব ব্যাকরণাধ্যয়নের ফল হতে পারে না। যেহেতু ব্যাকরণের সূত্রগুলি লোকব্যবহারে অজ্ঞাত নানা প্রকার সংজ্ঞা, পরিভাষা অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। সেই সব সংজ্ঞা ও পরিভাষার অর্থজ্ঞান সহজসাধ্য নয়। ব্যাকরণে যে সকল বার্তিক সন্নিবিষ্ট আছে, তাদের অর্থও অত্যন্ত গভীর বলে সেই সকল বার্তিকের তাৎপর্ষ্য অবগত হওয়া সাধারণ বুদ্ধির মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই সকল সূত্র ও বার্তিকের অর্থজ্ঞানের অতি প্রাচীন কাল থেকে ঋষিগণ যে সকল ভাষ্যাঙ্কি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই সকল গ্রন্থের অর্থও অত্যন্ত গভীর। এই হেতু ব্যাকরণের দ্বারা শব্দজ্ঞানে কোন লাঘব দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যয়ন করে যদি শব্দজ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা হলে তাতে অত্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে,—এতে সন্দেহ নাই। তা হলে দেখা যাচ্ছে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের অধ্যয়নে যে লাঘব প্রদর্শন করেছেন তা বস্তুতঃ গৌরবে পৰ্ববসিত হয়েছে।

এর উত্তরে বস্তুব্যা - শব্দগান্ধ বা শব্দগান্ধি অনন্ত। সেই শব্দগান্ধির প্রত্যেক শব্দকে, পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করে যদি সমস্ত শব্দের জ্ঞানলাভ করতে হয়— তাহলে তা একেবারে অসম্ভব হবে। আর এইভাবে পঠিত প্রত্যেক শব্দকে পৃথকভাবে মনে কারও সমগ্র ভাষার ব্যুৎপত্তি হবে ইহাও অসম্ভব। বহু-

পরিশ্রম করলে অনন্তশব্দরাশির কতকগুলি শব্দের জ্ঞান হতে পারে এইপর্যন্ত। ব্যাকরণের সাহায্যে শব্দজ্ঞান করতে যত্ন করলে অত্যন্ত লাভব দেখা যায়। সামান্তশূত্র [উৎসর্গ শাস্ত্র] এবং সামান্ত শূত্রের বাধক বিশেষশূত্রের [অপবাদ শাস্ত্রের] সাহায্যে অনন্ত অনন্ত শব্দরাশির জ্ঞানলাভ কিছু আয়াসসাধ্য হলেও অসাধ্য বা অত্যন্ত দুঃসাধ্য নয়। মহাভাষ্যকার এই ছেতু ব্যাকরণে বলেছেন, ব্যাকরণ ব্যতীত লঘু উপায়ে শব্দজ্ঞান সম্পাদিত হতে পারে না [‘ন চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শাক্য জাতুম্’] ॥ ১০ ॥

মূল

অসংস্কার্হাৰ্হং চাধোয়ং ব্যাকরণম্ । বাজিক্কাঃ পঠন্তি
 “স্থলপৃষতীমাগ্নিবাক্ণীমনড্ৰাহীমালভত” ইতি ।
 তন্ত্ৰাং সন্দেহঃ, স্থলা চাসৌ পৃষতীচ স্থলপৃষতী,
 স্থলানি বা পৃষন্তি যন্ত্ৰাঃ সেদং স্থলপৃষতী ।
 তাং নানৈয়াকরণঃ স্বরতোহধ্যবস্ততি । যদি পূৰ্বপদ-
 প্রকৃতিস্বরং ততো বহুব্রীহিঃ । অথাস্তোদাত্তং
 ততন্তংপুরুষ ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—সন্দেহের অভাবের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। বাজিকের পাঠ করেন [স্থলপৃষতীম্ আগ্নিবাক্ণীম্ অনড্ৰাহীম্ আলভেত] অগ্নি ও বরুণ দেবতার উদ্দেশে স্থলপৃষতী [যার স্থল বিন্দু আছে] অনড্ৰাহী [স্ত্রী গোকে] কে আলস্তন [বধ] করবে। তাহাতে [স্থলপৃষতী এই স্থলে] সন্দেহ [হয়] যে• স্থলা সেই পৃষতী স্থলপৃষতী [স্থলা চাসৌ পৃষতী চ] (এইরূপ বিগ্রহে কর্মধারয় নামক তৎপুরুষসমাস) অথবা স্থল পৃষৎ [বিন্দু] সমূহ যার [গারে] সেই স্থল পৃষতী [স্থলানি বা পৃষন্তি যন্ত্ৰাং সেদং স্থলপৃষতী] (এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাস) ? যিনি নৈয়াকরণ নন, তিনি তাকে [স্থলপৃষতীকে] [উদাত্তাদি] স্বরের দ্বারা নিশ্চিত রূপে জানতে পারেন না। যদি পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর হয় [“বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্” ৬২। এই শূত্র অনুসারে পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর হয়], তাহলে বহুব্রীহি [বৃদ্ধিতে হবে] যদি [সমাসনিমিত্ত] অস্তোদাত্ত [সমাসস্ত ৬১।২২০ এই শূত্র অনুসারে সমস্ত

* ‘অথ সমাসাস্তোদাত্তং’ এই পাঠটির অনেক পুস্তকে দেখা যায়

পদটির অন্ত্য স্বর উদাত্ত] হয়, তা হলে তৎপুরুষ [কর্মধারয় নামক তৎপুরুষ] (বুঝতে হবে) ॥ ১১ ॥

বিরূতি :—পৃথং শব্দের অর্থ দুইপ্রকার—(১) বিন্দু, (২) শ্বেতবিন্দুযুক্ত ৫৬। শ্বেতবিন্দুযুক্ত এই অর্থে পৃথং শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে “উগিতশ্চ” [৪।১।৬ এইমূত্রের দ্বারা জীপ্ প্রত্যয় করলে “পৃথতী” শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয়, শ্বেতবিন্দুযুক্ত স্ত্রী। তার পর ‘স্থলা চাসৌ পৃথতী চ’ এরূপ বিগ্রহবাক্যে কর্মধারয় সমাস করলে “স্থলপৃথতী” শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয় এই, যে নিজে স্থল এবং যার শরীরে শ্বেতবিন্দু বিদ্যমান। স্থলানি পৃথস্তি যন্তাঃ” এরূপবিগ্রহ বাক্যে বহুব্রীহি সমাস করলে “স্থলপৃথং” শব্দসিদ্ধ হয়। তার পর সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে “উগিতশ্চ” [৪।১।১] মূত্রানুসারে জীপ্ প্রত্যয় করলে স্থলপৃথতী পদসিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয় যার শরীরে স্থল/বিন্দু সকল বিদ্যমান আছে। এখানে কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের অর্থভেদ অনুসন্ধান। কর্মধারয় সমাসে “স্থলপৃথতী” শব্দের অর্থ হচ্ছে যে গাভী, সে নিজে স্থলা হবে, তার গায়ে যে বিন্দু গুলি থাকে সেই বিন্দু স্থল [বড়] হবে কি মৃক [ছোট] হবে তার কোন নিয়ম নাই। গাভীটি স্থলা হবে এবং সে [গায়ে] শ্বেতবিন্দুযুক্ত হবে। আর বহুব্রীহি সমাসে সেই গাভীর শরীর স্থল হবে কি কৃশ হবে তার কোন নিয়ম বুঝায় না। কিন্তু তার শরীরে যে বিন্দুগুলি থাকে সেগুলি স্থল [বড়] হবে। যার যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাদের পক্ষে কর্মটিকে যথাযথ ভাবে নিষ্পাদিত করার জন্য “স্থলপৃথতী” শব্দটির অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। এখানে কর্মধারয়ে ও বহুব্রীহি সমাসে উভয় ক্ষেত্রে “স্থলপৃথতী” এই আকারটি সমানভাবে থাকে বলে উদাত্তাদি স্বরের (৫৭) দ্বারাই তার অর্থের নিশ্চয় করতে হয়।

(৫৬) ‘পৃথতন্ত মূগে বিকৌসরোহিতে। অমরকোষ বাহিষর্গ’ ৬ শ্বেতবিন্দুযুক্ত ইহি সাং— [ভামুজীদীক্ষিতের টীকায় উক্ত উৎসকোষ।

(৫৭) সমাসস্য [৬।১।২০] সমাসস্যাস্ত উদাত্তো ভবতি। কাশিকা। সমাসের অন্ত উদাত্ত হয়। এই মূত্রটি সাধারণ মূত্র। কোন বিশেষ মূত্র না থাকলে এই মূত্রের প্রবৃত্তি হবে। সমাস স্থলে সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের ভিন্ন ভিন্ন স্বর হয় না, কিন্তু সমূহাণের অসামান্য উদাত্ত হয়। ইহাই এই মূত্রের তাৎপৰ্য। ‘স্বরবিধৌ বঙ্গনমবিদ্যমানং’ স্বরবিধিতে বঙ্গন অবিদ্যমানের ভ্রত—এই পরিভাষা অনুসারে সমাসযুক্ত পদটি হলন্ত হলেও তার স্বরের মধ্যে যেটি অন্ত্য স্বর সেটি উদাত্ত হবে। তাই সেই সমাসের অন্ত ২লে ধরতে হবে।

এখানে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই—যদি কোন পদের কোন একটি স্বর উদাত্ত অথবা স্বরিত হয়, তাহলে সেই পদের অংশটি সমস্ত স্বর অনুদাত্ত হয়ে যায়। “অমুদাত্তঃ পদমেকবর্জন্” [৬।১।৫৮] “পরিভাষাঃ স্বরবিধিবিবরণ। ব্রাহ্মঃ স্বর উদাত্তঃ স্বরিতে বা বিধীরতে তত্র অমুদাত্তঃ পদমেকং বর্জয়িত্ব। ভবতীভোত্তরপস্থিতঃ জটায়ম্। অমুদাত্তাচ্চকমমুদাত্তম্। কঃ পুনরেকো বর্জ্যত ই বসাপসৌ স্বরো গীর্নতে।” কাশিকা। [স্বর গুণাঃ পাটীকা জটায়]

মোট কথা—মহাভাষ্যের উক্ত উক্তির তাৎপৰ্য হুচ্ছে—যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে নাই তারা উদাত্তাদিশ্বরের সহায়তায় একপ সন্ধিঙ্গস্থলে শব্দের অর্থনির্ণয় করতে পারে না। অথচ বেদের এই সকল সন্ধিঙ্গ শব্দের অর্থ নির্ণয় না হলে যাগাদির অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। এই সকল সন্ধিঙ্গ শব্দের উদাত্তাদি স্বরের দ্বারা অর্থ নির্ণয়ে নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। অতএব ইহাও [স্বরদ্বারা অর্থনির্ণয়] ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটি প্রয়োজন। এখানে পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর অর্থাৎ সমাসের পূর্বে যে স্বর ছিল সেইস্বর থাকায় “স্থূলপৃথতী” এই শব্দটির বহুব্রীহি সমাস অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায় [যে গাভীর শরীরে স্থূল বিন্দু সকল আছে] সেই অর্থটি গ্রহণ করতে হবে। এখানে “স্থূল” শব্দটির অন্ত্যস্বর সমাসের পূর্বে উদাত্ত ছিল। এখন সমাস হওয়ার পরেও তাহাই থাকবে।

এইজ্ঞা এটি বহুব্রীহি সমাস বলে বুঝতে হবে। *

এখানে কৈয়ট বলেছেন মহাভাষ্যের ‘অসন্দেহ’ শব্দটি সন্দেহের অভাব অর্থ বুঝাচ্ছে। কিন্তু এই অভাবটি সন্দেহের ধ্বংসাত্মক নয়। সন্দেহ উৎপন্ন হলে তবে তার ধ্বংস হয়। এখন যে বৈয়াকরণ তার যদি সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তা হলে তাকে বৈয়াকরণ বলা যায় না। অন্ততঃ যে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয় সেই পদাদি বিষয়ে সে বৈয়াকরণ নয়। এইজ্ঞা এখানে সন্দেহের প্রাগভাবই অসন্দেহ শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। বৈয়াকরণের সন্দেহের প্রাগভাব থাকতে

[(৫৭) টীকার শেবাংশ] এই নিয়ম ত্রিণীতে [অষ্টাধর্মীর ঋতম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠ থেকে চতুর্থ পাঠ পর্যন্ত অংশ] যে সকল স্বর বিহিত আছে তাদের বিষয়ে প্রবৃত্ত হবে না। বধাঃ—“উদাত্তাদিশ্বরভিতঃ” [৮।৪।৬৬] এই স্বরের দ্বারা বিহিত যে স্বরিত, সেই স্বরিত স্বর হলে, “অনুদাত্তঃ পদমেকবজ্রম্” এই পূর্বোক্ত শাস্ত্র অনুসারে পদের অন্তর্গত অন্ত্য স্বরের হানে অনুদাত্ত স্বর হবে না।

বহুব্রীহি স্থলে সমাসের পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর হওয়ার সূত্র বধাঃ—“বহুব্রীহৌ প্রকৃত্য পূর্বপদম্” [৬।১।১]। বহুব্রীহি সমাস হওয়ার পূর্বে পূর্বপদটির যে স্বর ছিল বহুব্রীহি সমাস হওয়ার পরেও সেই স্বরই থাকে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। পূর্বপদের এই প্রকৃতিস্বর হলেও পূর্বোক্ত “অনুদাত্তঃ পদমেকবজ্রম্” এই স্বত্রের দ্বারা সমস্ত সমাস পদটির অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত হবে। এখানে সূত্রস্থিত ‘পূর্বপদ’ শব্দের দ্বারা উদাত্ত অথবা স্বরিত স্বরযুক্ত পূর্বপদ বুঝতে হবে অর্থাৎ যেখানে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে উদাত্ত বা স্বরিত স্বর থাকবে সেখানেই বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হবে। যদি পূর্বপদের সমস্ত স্বর অনুদাত্ত হয়, তাহলে সেসব স্থলে এই স্বত্রের প্রযুক্তি হবে না। সেখানে পূর্বোক্ত “সমাসত” এই সমাস্ত্র সূত্রানুসারে সমস্ত সমাসের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হবে। [মহাভাষ্য ৬৩ কালিকা উক্তব্য]

* পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরবহুব্রীহি স্বরভাব ইত্যর্থঃ [মহাভাষ্যপ্রণীত]।

পারে। উৎপত্তিশীল বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে প্রাগভাব থাকে। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে কপালে প্রাগভাব থাকে। সেইরূপ সন্দেহের উপাদান কারণ অন্তঃকরণ বলে বৈয়াকরণের অন্তঃকরণে সন্দেহের প্রাগভাব থাকে। প্রাগভাব থেকে বস্তুর উৎপত্তি হয়। বৈয়াকরণের অন্তঃকরণে সন্দেহের প্রাগভাব থাকায়, কোনদিন সন্দেহেব উৎপত্তি হতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা হতে পারে না। কারণ বৈয়াকরণের শব্দবিষয়ে ব্যুৎপত্তি থাকায় ঐ ব্যুৎপত্তিই সন্দেহের প্রাগভাবকে সর্বদা রক্ষা করে থাকে অর্থাৎ সন্দেহকে উৎপন্ন হতে দেয় না।

মহাভাষ্যে একটি বাক্য আছে—“যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।” এখানকার “যাজ্ঞিকাঃ” শব্দের সোজাশুজি অর্থ যজ্ঞানুষ্ঠানকারীরা। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন তাঁরা “হুলপৃথতীম্” ইত্যাদি বেদভাগটি পাঠ করেন অর্থাৎ ঐ বেদভাগের সৃষ্টি করেন—এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। তাতে দোষ হয় এই যে “বেদ-যজ্ঞ-কারী ঋষিগণ কর্তৃক রচিত” ইহাই প্রতিপাদিত হওয়ার বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা নিত্যত্ব ব্যাহত হয়ে যায়। মীমাংসক প্রভৃতি বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। এইজন্য নাপেশভট্ট “যাজ্ঞিকাঃ” শব্দের অর্থ বলেছেন “যজ্ঞকাণ্ডভাঃ শব্দাঃ যাজ্ঞিকাঃ”। অর্থাৎ যজ্ঞকাণ্ডে = যজ্ঞপ্রকরণে অবস্থিত যে সকল শব্দ সেই শব্দ সকল জ্ঞাপন করছে—“হুলপৃথতীম্” ইত্যাদি। শব্দ জ্ঞাপন করে অর্থ। সুতরাং বৈদিকশব্দ কারও দ্বারা রচিত বলে আর বুঝা গেল না। অতএব “বেদ নিত্য” এই সিদ্ধান্তের হানি হলো না। তবে মহাভাষ্যকার “ভেন প্রোক্তম্” [৪।৩।১০] এই শব্দে সিদ্ধান্ত করেছেন বেদের প্রতিপাত্ত অর্থরূপ বস্তু নিত্য হলেও তার শব্দ রচনার কর্তা হচ্ছেন ঋষিগণ। সুতরাং “যাজ্ঞিকাঃ” শব্দের অর্থ যজ্ঞকর্মের জ্ঞাতি বা যজ্ঞকর্মের উপদেষ্টা ঋষিগণ বলে এখানে কোন অসঙ্গতি হয় না। আর এজন্য কষ্টকল্পনা করে “যজ্ঞকাণ্ডে স্থিত শব্দ” এই অর্থ করবারও আবশ্যিকতা থাকে না। “হুলপৃথতী” শব্দটি এখানে বহুব্রীহি সমাস নিম্নর [৫৮]। ১১ ॥

(৫৮) কৈরটের উক্তি থেকে বুঝা যায় “হুলপৃথতী” শব্দটি উক্ত বেদভাগে বহুব্রীহি সমাস নিম্নর।

“পূর্বপদপ্রকৃতিবরাহব্রীহীর্থবসার” ইত্যর্থঃ। [মহাভাষ্যপ্রবীণ]

“কিবোহন্ত উদাত্তঃ” [কিট্র ১।১]। “প্রাতিপদিকঃ কিট্র, তস্যাত্তঃ উদাত্তঃ স্যাম্ [সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যসপ্রকরণ]। প্রাতিপদিকের অন্ত্যের উদাত্ত হয়। এই সূত্রানুসারে হুল শব্দটি প্রাতিপদিক হওয়ার তার অন্ত্যের উদাত্ত হয়ে থাকে। সমাস হওয়ার পরও এই হুল শব্দের অন্ত্যের উদাত্ত থাকবে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে “হুলপৃথতী” শব্দটি বহুব্রীহি সমাসে নিম্নর হয়েছে।

‘তত্র লকারাকারে উদাত্তত্বং দৃষ্টে। পূর্বপদপ্রকৃতিবরণে বহুব্রীহিঃ বৈয়াকরণো নিশ্চিত্যন্তি’ [শব্দকৌমুদী-পম্পনামিক]। উক্ত পূর্বপদপ্রকৃতিবরণঃ দৃষ্টে। পূর্বপদপ্রকৃতিবরণে বহুব্রীহি নিশ্চিতঃ। [ব্যাকরণসিদ্ধান্তস্থানিধি পম্পনামিক]

মূল

ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্ত প্রয়োজনানি ।

- (১) “তেহস্বরাঃ”, (২) “দুঃ শব্দঃ”, (৩) “বদধীতম্”,
(৪) “বস্ত প্রবৃক্তে”, (৫) “অবিদ্বাসঃ” (৬) “বিভক্তিং
কুৰ্ব্ভি”, (৭) “যো বা ইমাম্”, (৮) “চত্বারি”, (৯) “উত স্বঃ”,
(১০) “সক্তুমিব”, (১১) “সারস্বতীম্”, (১২) “দশম্যাং পুত্রস্ত”,
(১৩) “স্বদেবো অসি বরুণ”, ইতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এইগুলি পুনরায় শব্দানুশাসনের [ব্যাকরণের] প্রয়োজন ।
“তেহস্বরাঃ”, “দুঃ শব্দঃ”, “বদধীতম্”, বস্ত প্রবৃক্তে”, “অবিদ্বাসঃ”,
“বিভক্তিং কুৰ্ব্ভি”, “যো বা ইমাম্”, “চত্বারি”, “উত স্বঃ”, “সক্তুমিব”,
“সারস্বতীম্”, “দশম্যাং পুত্রস্ত”, “স্বদেবো অসি বরুণ”, ॥ ১২ ॥

বিবৃতি—এখানে মহাভাষ্যে ‘ভূয়ঃ’ শব্দটির অর্থ পুনঃ । (৫২) । মহাভাষ্য-
কার ‘অথ শব্দানুশাসনম্’—এইরূপে ভাষ্যের আরম্ভ করে সাধু শব্দই ব্যাকরণ
শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ইহা স্মৃতিত করেছেন । তা থেকে আরও স্মৃতিত হয়েছে
যে—অসাধু [অন্তঃ, অপভ্রংশ ইত্যাদি] শব্দ থেকে পৃথগ্ভাবে সাধু [শুদ্ধ]
শব্দের জ্ঞান ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন । তারপর ‘রক্ষোহাগমলঘন-
সন্ধেহাঃ প্রয়োজনম্’ এই বাক্যের দ্বারা সাধুশব্দের জ্ঞানের যা ফল তা বলা
হয়েছে । আর ঐ “রক্ষোহাগমলঘনসন্ধেহাঃ” বাক্যে আগম অর্থাৎ শাস্ত্রকে
ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রেরক বলা হয়েছে । ব্রাহ্মণের পক্ষে
সম্ভাবনাদির মত ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্যকর্ম, ইহা “ব্রাহ্মণেন নিত্যরপো
ধর্মঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে । এখন অপর কতকগুলি
শাস্ত্র বাক্য প্রদর্শন করে মহাভাষ্যকার ব্যাকরণাধ্যয়নের কর্তব্যতা প্রতিপাদন
করছেন ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে ভাষ্যকার পূর্বে যখন “রক্ষোহাগম” ইত্যাদি বাক্যে
ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন যে শব্দজ্ঞান—সেইশব্দজ্ঞানের প্রয়োজনরূপে বেদ-
রক্ষা প্রভৃতির কথা বলেছিলেন—তখন আগমের ব্যাখ্যাকালে “ব্রাহ্মণেন”
ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করেছিলেন, যে শাস্ত্রবাক্য ব্যাকরণ অধ্যয়নের

প্রবর্তক। সেই শাস্ত্র বাক্যের সঙ্গে এই “তেহস্মরাঃ” ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যাগুলি প্রদর্শন করলে বলার লাঘব এবং শাস্ত্রবাক্য প্রদর্শন রূপ একটা প্রকরণও রক্ষিত হতো। তা না বলে ভাষ্যকার এই শাস্ত্রবাক্যাগুলিকে পৃথগ্ভাবে পরে বর্ণনা করেছেন কেন ?

এর উত্তরে কৈরট বলেছেন পূর্বোক্ত বেদরক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি প্রয়োজন প্রধান প্রয়োজন, আর “তেহস্মরাঃ” ইত্যাদি প্রয়োজনগুলি আত্মবঙ্গিক প্রয়োজন। এই হেতু প্রথমে প্রধান প্রয়োজনের কথা বলে ভাষ্যকার পশ্চাৎ আত্মবঙ্গিক প্রয়োজনগুলির উল্লেখ করেছেন। এখানে “প্রধান” ও “আত্মবঙ্গিক” এর ভেদ উল্লিখিত হচ্ছে। যা কারও অধীন নয় স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান তাকে প্রধান বলে। প্রধানের উদ্দেশ্যে কার্য করলে, যেগুলি অন্যায়সে সিদ্ধ হয়ে যায় তাকে আত্মবঙ্গিক বলে। এখানে “শকাহ্মশাসন” এই সার্থক নাম থেকে—সাধুশব্দের জ্ঞানই ব্যাকরণ অধ্যয়নের সাক্ষাৎ প্রয়োজন ইহা সূচিত হয়েছে। সেই সাধু শব্দের জ্ঞানের ফল হচ্ছে, বেদরক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি। এই বেদরক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি ফলের উদ্দেশ্যে সাধুশব্দের জ্ঞানের জ্ঞাত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করলে তার সঙ্গে যে ফলগুলি সিদ্ধ হয় তাহাই আত্মবঙ্গিক ফল। তাহলে দেখা গেল যে—লোকে যার উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেটি তার মুখ্যফল বা প্রধান প্রয়োজন। আর সেই প্রধান ফলের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ফল সিদ্ধ হয় সেগুলি আত্মবঙ্গিক ফল বা প্রয়োজন। যেমন কেহ যদি কৃষিকর্মের উদ্দেশ্যে কৃপ বা খাল খনন করে সেইকৃপ বা খাল খননের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে কৃষি আর সেই কৃপ বা খালের জলের দ্বারা যে স্নান পানাদি প্রয়োজন সাধিত হয়, সেই স্নান পানাদি কৃপাদি খননের আত্মবঙ্গিক প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত ভাষ্যকার যে “ব্রাহ্মণেন” ইত্যাদি শ্রুতি প্রথমবারে উদ্ধৃত করে তার সঙ্গে “তেহস্মরাঃ” ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ না করে দ্বিতীয়স্তরে এইশ্রুতি গুলি উদ্ধৃত করলেন তার আরও অভিপ্রায় আছে। যথা:—পূর্বের “ব্রাহ্মণেন” ইত্যাদি আগমবাক্য দ্বারা ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্যকর্ম ইহা প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই বেদবাক্যাটি বেদরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। আর ঐ বেদবাক্যাটি ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন মানে প্রবর্তক [পূর্বে ইহা বলা হয়েছে]। বেদরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে “ব্রাহ্মণেন”

ইত্যাদি প্রবর্তক শাস্ত্র বাক্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্ত যদি “তেহসুৱা,” ইত্যাদি শাস্ত্র উল্লেখ করে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হোত তা হলে—“বেদরক্ষা” প্রভৃতি অন্ত প্রয়োজনগুলি বুঝতে অসুবিধা হোত। এইজন্য মহাভাষ্যকার বেদরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনের বর্ণনার সঙ্গে “ব্রাহ্মণেন” ইত্যাদি শাস্ত্রকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বেদরক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি প্রয়োজনবর্ণনের সমাপ্তি করে ঐ “ব্রাহ্মণেন” ইত্যাদি শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যার জন্ত পরে “তেহসুৱাঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রের কথা বলেছেন। “ব্রাহ্মণেন নিকারণো” ইত্যাদি বাক্যও আগম আর “তেহসুৱাঃ” ইত্যাদি বাক্যও আগম। সুতরাং “ব্রাহ্মণেন” ইত্যাদি শাস্ত্র যেমন ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজনঅর্থাৎ প্রবর্তক সেইরূপ “তেহসুৱাঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রও ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রবর্তক। অতএব এই শাস্ত্রগুলি “ব্রাহ্মণেন” ইত্যাদি শাস্ত্রের সমধর্মী এবং “ব্রাহ্মণেন” ইত্যাদি শাস্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং “ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দাশুশাসনশ্চ প্রয়োজনানি” এর অর্থ হলে ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রবর্তক আরও এই শাস্ত্রগুলি আছে। সেই শাস্ত্রগুলির প্রত্যেকটির প্রথম অংশ উদ্ধৃত করে ভাষ্যকার তাদের সমগ্র অংশের সূচনা করছেন। পরে সেই সমগ্র অংশের উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন ॥ ১২ ॥

মূল

“তেহসুৱাঃ”। তেহসুৱা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূ-
বুস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন শ্লেক্ষিতবৈ নাপভাষিতবৈ শ্লেক্ষো হ বা ঐষ
ষদপশব্দঃ শ্লেক্ষো মা ভূমেতাধোয়ং ব্যাকরণম্ “তেহসুৱাঃ” ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—“তেহসুৱাঃ”, [এই প্রতীকের (সমগ্রবস্তুর একাংশকে প্রতীক বলা যায়) দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছিল, তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]। সেই অনুরেরা ‘হেলয়ঃ’ হেলয়ঃ এইরূপ উচ্চারণ করে পরাবভূত [পরাজিত] হয়েছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মণ শ্লেক্ষন করবে না। অপভাষা প্রয়োগ করবে না। বা অপশব্দ [অশুদ্ধ শব্দ] তাই শ্লেক্ষে। আমরা যেন শ্লেক্ষ না হই এই হেতু [শ্লেক্ষ না হওয়ার জন্ত] ব্যাকরণ অধ্যয়ন কর্তব্য। তেহসুৱাঃ [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছিল তা সমাপ্ত হলো] ॥ ১৩ ॥

নিবৃতি - “তেহসুৱাঃ” ইত্যাদি বাক্য বেদের ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত কোন গ্রন্থ থেকে ভাষ্যকার উদ্ধৃত করেছেন। কালবশে বেদের অনেক অংশ লুপ্ত

দদাতি পুরাস্য সংবৎসরাদ্ গৃহে রুদন্তি।” যে কুশসাধ্যাধাণে রজত দক্ষিণা দেয় একবৎসরের পূর্বেই তার গৃহে রোদন আরম্ভ হয়।

প্রশংসা যে অর্থবাদ কাহারও প্রশংসার উদ্দেশ্যে প্রকৃত হয় তার নাম প্রশংসা অর্থবাদ। যেমন—‘যজ্ঞমানো বৈ প্রস্তবঃ’ [তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ৬।৭] বর্ষ-পূর্ণমাসাদি যাগে বেদিতে আন্তীর্ণ প্রস্তব নামক কৃশকে যজ্ঞমানের সন্দেশ বলে প্রশংসা করা হয়েছে।

পরকৃতি—যে অর্থবাদ এমন এক উপাখ্যানকে অবলম্বন করে বর্ণিত হয় যে উপাখ্যানে বর্ণিত কৰ্তা একজন মাত্র তাকে পরকৃতি বলে [তন্ত্রবৃত্তিক ২।১।৩৩]। পুরাকল্প—যে উপাখ্যানের বর্ণিত ঘটনার কৰ্তা এক নয় কিন্তু অনেক,— এইরূপ উপাখ্যানের প্রতিপাদক অর্থবাদকে পুরাকল্প বলে। [তন্ত্রবৃত্তিক ২।১।৩] আপত্ত্যবজ্ঞপরিভাষানুজ্ঞের কপদিস্বামী প্রণীত ভাষ্যে [১। ৫-৩৬] পরকৃতি ও পুরাকল্প নামক শোষণকৃত অর্থবাদের সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখ যায়। কপদিস্বামী বলেছেন—কেহ কেহ মনে করেন যে উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার কৰ্তা বহুসংখ্যক ব্যক্তি, সেইরূপ উপাখ্যানের প্রতিপাদক অর্থবাদের নাম পুরাকল্প। এখানে লক্ষণীয় এই—তন্ত্রবৃত্তিকে “অনেক কৰ্তার” মানে একের আধক অর্থাৎ দুইজন কৰ্তা হলেও পুরাকল্প হতে পারে। কিন্তু কপদিস্বামীর উক্তিভেদে বুঝা যায়, যে ঘটনার কৰ্তা দুই সেই ঘটনার প্রতিপাদক বৈদিক উপাখ্যানকে পুরাকল্প বলা চলে না। কপদিস্বামীর মতে যে উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার কৰ্তা নির্দিষ্ট নাই, সেইরূপ উপাখ্যানের প্রতিপাদক অর্থবাদকে পুরাকল্প বলে। তিনি এই পুরাকল্পের উদাহরণ দিয়েছেন—“আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীং” সৃষ্টির পূর্বে এই অগৎ জলাকারে ছিল। এই চার-প্রকার অর্থবাদ ব্যতীত অন্তপ্রকার অর্থবাদও আছে। যজ্ঞাদিকর্মের বিধি ও অর্থবাদ ভেদে ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তার মধ্যে “তেঃসূত্রঃ” ইত্যাদি অর্থবাদ একাধারে নিন্দা ও পুরাকল্প [মতান্তরে পরকৃতি]। বৃহদারণ্য-কোপনিষদ্ ভাষ্যবৃত্তিকে অর্থবাদের অন্তরূপ তিন প্রকার ভেদ দেখা যায় (৬০)।

(৬০) বিরোধে গুণবাদঃ স্যাননুবাচোঃবধাদিতে।

ভূতার্থবৎসন্যানাং অর্থবাদত্রিধাঃ মন্তঃ ॥

[বৃহদারণ্যক ভাষ্য বৃত্তিক, সম্বন্ধ বৃত্তিক ৬৭]

(১) যে স্থলে অল্প প্রমাণের সঙ্গে অর্থবাদ বাক্যের আপাততঃ বিরোধ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পর্যবসানে তাহা স্বতীক্ৰুপে পরিণত হয়, সেই স্থলে সেই অর্থবাদ 'গুণবাদ' নামে কথিত হয়। যথা "যজমানো বৈ প্রস্তরঃ [তাঃ ব্রাঃ ৬।৭]। এখানে যজ্ঞের কর্তা যজমানের সহিত (৬১) কুশমুষ্টির অভিন্নতা বুঝানো হয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা কুশমুষ্টি যজমান থেকেই ভিন্ন প্রতীত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে অর্থবাদের আপাততঃ বিরোধ বুঝা গেল। কিন্তু উক্ত অর্থবাদের তাৎপৰ্য হচ্ছে কুশমুষ্টির প্রশংসা। যজমান যেরূপ যাগক্রিয়ার নির্বাহক হয়, এই কুশমুষ্টিও সেইরূপ যাগক্রিয়ার নির্বাহক। এইভাবে প্রস্তরের [কুশমুষ্টিতে] যজমানের সাদৃশ্য বলায় বিরোধ দূরীভূত হয় বলে উক্ত অর্থবাদটি গুণবাদ।

(২) যে অর্থবাদ অল্পপ্রমাণদ্বারা জ্ঞাত কোন বস্তুকে প্রকাশিত করে তাকে অনুবাদ বলে। যেমন "অগ্নিহিমন্তু ভেষজম্" ৬২ অগ্নি শীতের ঔষধ অর্থাৎ বিনাশক। অগ্নি যে শীতের নিবারক তা সকলে প্রত্যক্ষের দ্বারা জানে। অতএব সকলের জ্ঞাত এই বস্তুকে উক্ত অর্থবাদ প্রকাশিত করছে বলে এইজন্য উহা অনুবাদ নামক অর্থবাদ।

(৩) যে অর্থবাদের প্রতিপাত্ত পদার্থ, অল্পপ্রমাণের দ্বারা বিরোধ প্রাপ্ত হয় না বা অল্পপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতও নয়, সেই অর্থবাদ ভূতার্থবাদ নামে কথিত হয়। যথা :—"ইন্দ্রো হ যজ বৃজ্ঞায় বজ্রং প্রজহার, স প্রহতশ্চতুর্ধা হৈভবৎ" [শতপথ ব্রাহ্মণ ১।২।২।১] ইন্দ্র যে সমগ্র বৃত্তকে বজ্রের দ্বারা প্রহার করে ছিলেন, তখন সেই বজ্র বৃত্তের শরীরে অভিহিত হয়ে চারভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

(৬১) তত্র প্রকৃতীকৌচতমো বর্ভমুষ্টিবহিঃস্থঃ, প্রথম বর্ভমুষ্টিবহিঃস্থঃ সংস্কৃত। বেদ্যং জুহুয়াম্যঃ নিধীয়তে। বিশ্বতিসংজ্ঞকরোক্তপন্থয়ো বর্ভমৌকপরিষাচ প্রাগ্রা হাপিতা ভবতি। সা প্রস্তর ইভ্যুগতে। [কৌতপদার্থনির্ঘণ্ট ইতি প্রকরণ ৮৭]। প্রকৃতি ইতি [বনপূর্ণ বাস বাসে] চার মুষ্টি কুল কেদন করা হয়। তার মধ্যে বনপূর্ণ প্রথম কুশমুষ্টি প্রস্তর নামে অভিহিত হয়। যজ্ঞের বেদির যে স্থানে জুহু নামক তোষণাত্র হাপন করা হয়, সেই স্থানকে প্রথমে বনপূর্ণ প্রথম কুশমুষ্টির দ্বারা আচ্ছাদিত করে তার উপর জুহুকে রাখা হয় এবং বিশ্বতি নামক উত্তরাগ্র কুশমুষ্টি বা বাগবেদির উপরে থাকে, তার উপরেও এই প্রস্তর নামক কুশমুষ্টি হাপন করা হয়। বাগদমাস্তির কিছু পূর্বে এই প্রস্তরকে আহবনীয়াগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়।

(৬২) কঃখিন্দকাকৌচরতি কউষিক্কাগতে পুনঃ। কঃখিন্দমস্য ভেষজং কিংবিশ্বাবপনং মহৎ। পূর্বা একাকৌচরতি চৈবম্ ভায়তে পুনঃ। অগ্নিহিমস্য ভেষজং ত্বিরাবপনং মহৎ॥

[ভৈঃ সঃ ৭ ৪।১২।]

অন্তপ্রমাণের দ্বারা এই ইন্দ্র বৃত্তান্তের ঘটনা জানা যায় না বলে অন্ত প্রমাণের সঙ্গে বিরোধও হয় না এবং অন্তপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতও নয়। এইজন্য এই অর্থবাদ ভূতার্থবাদ নামে কল্পিত। মহাভাষ্যকারের প্রদর্শিত—“তেহস্বরঃ হেলয়ো হেলয়ঃ” ইত্যাদি অর্থবাদটিকে ভূতার্থবাদের মধ্যে ধরা যায়। “তেহস্বরঃ” ইত্যাদি বাক্যের সার অর্থ এই যে—কোন একদময় অস্বরেরা যুদ্ধে দেবতাদের নিকট পরাজিত হয়ে দেবতাদের পরাজয়ের উদ্দেশ্যে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অস্বরেরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে—‘হে অরয়ঃ’ ‘হে অরয়ঃ’ [হে শক্রগণ, হে শক্রগণ] এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করতে গিয়ে ‘অরয়ঃ’ শব্দের ‘র’স্থানে ল উচ্চারণ করে। যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে এরূপ অন্তশব্দের প্রয়োগের ফলে অস্বরগণ দেবতাদিগের নিকট পরাজিত হয়েছিল। এইজন্য ব্রাহ্মণ স্লেচ্ছন অর্থাৎ অন্তশব্দের প্রয়োগ করবে না। অপশব্দ বা অন্তশব্দ শব্দ এখানে স্লেচ্ছ বলে অভিহিত হয়েছে। আমরা যাতে স্লেচ্ছ অর্থাৎ অপশব্দ প্রয়োগকারী না হই এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। “হেহলয়ঃ” এই প্রয়োগের কোন অংশে অন্তশব্দ দোষ আছে এই বিষয়ে, নানাজনের নানামত। এই হেতু এখানে একটু বিচার করা যাচ্ছে। কেহ কেহ বলেন “হে অলয়ঃ” এইখানে “হেহে প্রয়োগে হেহয়োঃ” (৬৩)। এই সূত্রানুসারে পুতস্বর হওয়া উচিত ছিল। পুতস্বর হলে এখানে প্রকৃতিভাব হতো (৬৪)। তাতে সন্ধি হতো না, কিন্তু এখানে আকার হতো “হে অলয়ঃ”। স্তবরাং এখানে এই পুতজনিত প্রকৃতিভাব না করে সন্ধি করায় “হেহলয়ঃ” “হেলয়ঃ” এইখানে অন্তশব্দদোষ ঘটেছে।

(৬৩) “হেহে প্রয়োগে হেহয়োঃ” [পাঃ নং ৮২৮৫]। হেহে প্রয়োগে দুর্বাক্যে বদ্য বাণ্য বর্ততে তত্র হেহয়োঃ পুতভবতি। [কাশিকা] দুই থেকে সন্ধ্যোনের নির্মিত যে বাক্যের প্রমাণ করা হয়, সেই বাক্য যদি ‘হে’ বা ‘হে’ শব্দ থাকে, তাহলে সেই ‘হে’ এবং ‘হে’ শব্দের পুত হবে। [অন্তের অর্থৎ বাক্যের টি ভাগের পুত হবে না]। যেমন—‘হে দেবগণ’ এই বাক্যে ‘হে’ শব্দের পুত হয়। ‘দেবগণ’ ‘হে’। এই বাক্যে হে শব্দের পুত হয়। এখানে পুত বুঝবার উদ্দেশ্যে হে ও হে শব্দের পর ‘ও’ এই অক্ষরটি যোগ করা হয়েছে। পুতস্বরের তিন সাত্তা বলে ‘ও’ অক্ষরটি পুত বুঝবার উদ্দেশ্যে স্বরের পর ব্যবহৃত হয়।

(৬৪) “পুতপ্রগুণা অচি নিত্যান্” [৬১১১২৫] অচ, [স্বরবর্ণ] পশ্চ, থাকলে পুতস্বরও প্রগুণ নামক স্বরের প্রকৃতি ভাব হয়, সন্ধি হয় না।

অপরে বলেন “অগ্নীংপ্রেষণে পরশ্চ চ” [পা: সূ: ৮।২।২২] এই সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলেছেন সমস্ত পদুতই বিকল্পে প্লুত হয়। এইহেতু এখানে পদুত্বের না করায় প্লুত প্রযুক্ত প্রকৃতিত্বাব না হওয়ায় কোন দোষ হয় নাই(৬৫)। এঁরা বলেন বীপ্সা অর্থে পদের দ্বিত্ব হয় ৬৬)। এখানে “হেহ্লয়ঃ হেহ্লয়ঃ” পদসমুদায়াক বাক্যের দ্বিত্ব করায় অন্তর্গত দোষ ঘটেছে।

অন্ত কেহ কেহ বলেন—এখানে বস্তার ইচ্ছামুসাবে পদসমুদায়ের দুইবার উচ্চারণ করা হয়েছে (৬৭)। বীপ্সা অর্থে দ্বিত্ব করা হয় নাই অর্থাৎ কোন সূত্র-মুসারে দ্বিত্ব করা হয় নাই। সূত্ররাং দ্বিত্ব করার যে দোষ সে দোষ এখানে প্রসক্ত হয় না। কিন্তু ‘অরয়ঃ’ এই শব্দের অন্তর্গত ‘র’ স্থানে ‘ল’ উচ্চারণ করে ‘অলয়ঃ’ এইরূপ বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। ইহাই এই বাক্যের অন্তর্গত। এই শৈবোক্ত মতটি সমীচীন মনে হয়।

“শ্লেচ্ছা মা কুমেত্যধ্যোয়ং ব্যাকরণম্”—এইস্থলে ‘শ্লেচ্ছ’ শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থের সঙ্গতি হয় না। ‘শ্লেচ্ছ’ শব্দের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ। একঅর্থ—দেশবিশেষ (৬৮)। অপর অর্থ মলুগুজ্ঞাতিবিশেষ (৬৯)। এই দুই অর্থের যে অর্থই এখানে গ্রহণ করা

(৬২) “সর্বঃপ্লুতঃ সাহসমনিচ্ছতা বিভাধা বক্তব্যঃ” [মহাভাষ্য] পল্লাশাঙ্গিকের উল্লেখাতীকা। এবঃ প্রকৃতিত্বাবপ্রকরণের প্রোটনোরমার “বক্তব্যঃ” স্থলে “কর্তব্যঃ” এইরূপ পাঠ আছে। উক্ত ভাষ্যের অর্থ হচ্ছে—সর্বঃ সাহস ইচ্ছাক্রমে না অর্থাৎ শাশ্বতাগ করতে ইচ্ছ করেন না তাঁরা সমস্ত পদুত্বস্থলে বিকল্প প্লুতের প্রয়োগ করতে পারেন। তাতে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের লঙ্ঘন জনিত দোষ হয় না।

(৬৬) “নিতাবীপ্সয়োঃ” [পা: সূ: ৮।১।৫]। জাতীক্যে বীপ্সায়াং চ ভোক্ত্যে পদস্য দ্বির্বচনং সাং। [সিদ্ধান্ত কৌমুদী বিকল্প প্রক্রিয়া] পোনঃপ্লুত ও ব্যাপ্তি অর্থে পদের দ্বিত্ব হয়। “হেহ্লয়ঃ” এইটি পদ নয়, কিন্তু ‘হে’ ও ‘অলয়ঃ’ পদের সম্মিলনরূপ বাক্য। এইজন্য এখানে এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হতে পারে না।

(৬৭) বাক্যের এইরূপ ঐচ্ছিক দ্বিত্ব “অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ” [ত্রঃ সূ: ৪।৪।২২] ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়।

(৬৮) “কুলসারস্তু চরতি যুগো যত্র স্বভাবতঃ।

স স্তৈরো বজ্রিতো দেশো শ্লেচ্ছদেশততঃ পরঃ ॥

[মনুসংহিতা ২।২৩]

“প্রত্যন্তো শ্লেচ্ছদেশঃসাং” [অমর কোষ ভূমিবর্গ]

চাতুর্বর্ণ্যাবস্থানং বসিন্ দেশে ন বিভাতে।

তং শ্লেচ্ছবিধয়ং প্রাংঃ” [বহুব্রয় শ্রুতী অমর: কাব্য (ভূমিবর্গ—৭) বিবেকটাকার উদ্ধৃত]

“(৬৯) “ভেদাঃ কিতাতশবরপুলিনা শ্লেচ্ছজাতয়ঃ”।

[অমর কোষ শূদ্রবর্গ ২০

হোক না কেন, তাতে বাক্যের অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। এইজন্য এখানে ‘স্নেহ’ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করে যোগার্থ গ্রহণ করতে হবে। নিন্দার্থক স্নেহ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ‘যঞ্’ প্রত্যয় (৭০) করে ‘স্নেহ’ শব্দ সাধন করতে হবে। অতএব ‘স্নেহ’ শব্দের এখানে অর্থ হবে নিন্দনীয়; দেশবিশেষ বা মনুষ্যজাতিবিশেষ নয়। ব্যাকরণশাস্ত্রনিষ্পন্ন শব্দের উচ্চারণ না করে যজ্ঞাদিকর্মে তার বিপরীত শব্দের উচ্চারণ করলে উচ্চারণকারীর পাপ হয়। এইজন্য এইরূপ অন্তর্ক উচ্চারণের বলে উচ্চারণ কর্তা নিন্দনীয় হয় (৭১)। “তেহস্মরা হেহলয়ো হেহলয়ঃ” ইত্যাদি বাক্য প্রচলিত কোন ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। মাধ্যম্নিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে “হেহলবো হেহলবঃ” এইরূপ পাঠ দেখা যায় এবং উপ-সংহারে “তন্মাদ ব্রাহ্মণো ন স্নেহেৎ” এইরূপ পাঠ আছে। এখানে “অরয়ঃ” এই শব্দের ‘র’ স্থানে ‘ল’ এবং ‘য়’ স্থানে ‘ব’ করা হয়েছে। ইহাই শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত বাক্যে অন্তর্কি ॥ (৭২) ॥ ১৩ ॥

মূল

“হৃষ্টঃ শবঃ।” হৃষ্টঃ শবঃ স্বরতো বর্ণতো বা,

মিথ্যাশ্রয়ন্তো ন তমর্থমাহ।

স বাথস্ত্রো যজমানঃ হিনস্তি,

যথেন্দ্রশক্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ ॥ ইতি ॥

হৃষ্টাঙ্কান্ মা শ্রয়ন্তমহি ইত্যধোয়ং ব্যাকরণম্। “হৃষ্টঃ শবঃ” ॥ ১৪ ॥

(৭০) ‘অকর্তৃরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্’ [পাং:হু: ৩৩১৯] এই সূত্রে অনুসারে “স্নেহ” স্থলে যঞ্ প্রত্যয় করা হয়েছে।

এখানে ‘স্নেহ’ শব্দ বৌদ্ধিক হওয়ার সূত্রের অন্তর্গত ‘সংজ্ঞায়াম্’ এই অংশের সহিত বিরোধের আশঙ্কা উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু এই সূত্রের মহাভাষ্যে ‘সংজ্ঞায়াম্’ এই অংশটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার উক্ত আশঙ্কার অবকাশ হয় না।

(৭১) ‘স্নেহা নিন্দ্যা: শাস্ত্রবোধিতবিপরীতাহৃষ্টানাবিত্তি ভাবঃ।’ [শব্দকৌস্তভ] স্নেহা ইতি কর্মণি যঞ্ [মহাভাষ্য প্রদীপ ।]

“নসু স্নেহো নাম পুরুষবিশেষো দেশবিশেষো বা স কথমপশবঃ অত আহ—‘বক্রিত’। নিন্দা-বন্দাদ্ স্নেহদ্ব্যন্তোরিত্তি ভাবঃ। নিন্দা চ শাস্ত্রবোধিতবিপরীতোচ্চারণেন পাপসাধনভাৎ। এবং চ স্নেহো বক্তব্য নিন্দ্যা ইত্যর্থ ইতি দিক্” [মহাভাষ্য প্রদীপৌদ্ভ্যোক্ত]

(৭২) “ইহং ভাষ্যবিশু প্রসিদ্ধং প্রতিপাঠমসুহৃদা ব্যাখ্যাতম্। অত্র চ পাঠঃ কচ্ছিত্বায়া-মবেষণীয়ঃ। মাধ্যম্নিনানাং শতপথব্রাহ্মণে তু ‘হেলবো হেলবঃ’ ইতি পাঠা। তন্মাদ ব্রাহ্মণো ন স্নেহেদিত্তি পাঠো। তত্র যকারস্থানে বকারোহপরাধ ইতি স্পষ্টমেব। [শব্দকৌস্তভ]

অনুবাদ :- “দুঃ শব্দঃ”। [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সৃষ্টিত হয়েছে তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে] [উদাত্ত প্রভৃতি] স্বর ও [অকারাদি] বর্ণের [অন্তপ্রকার] উচ্চারণ নিমিত্ত [যে] শব্দ দুঃ [হয়] [সে শব্দ] মিথ্যা প্রযুক্ত [হওয়ার] [উচ্চারণকারীর তাৎপর্য বিষয়ীভূত যে অর্থ] সে অর্থকে প্রকাশিত করে না। সেই বাক্যরূপ বস্তু বজ্রমানের [যজ্ঞকর্তার] হিংসা করে থাকে। [উদাহরণ যথা] যেমন “ইন্দ্রশক্র” [এই শব্দটি] [উদাত্তাদি] স্বরের [অন্ত-প্রকার উচ্চারণের] নিমিত্ত [যে অপরাধ অর্থাৎ দোষ, সেই] অপরাধে যজ্ঞ কর্তাকে হিংসা করেছিল। [অনিষ্ট ফল উৎপাদন করেছিল]। আমরা [যেন] দুঃ শব্দের প্রয়োগ না করি—এইজন্ত ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। ‘দুঃ শব্দঃ’ [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সৃষ্টিত হয়েছিল, তাহা সমাপ্ত হলো] ॥ ১৪ ॥

বিবৃতি—ইন্দ্র ঋষির পুত্র বিশ্বরূপের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে, বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন। তাতে ঋষি দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত বৃদ্ধ নামক নিজের পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞটি অভিচার কর্মরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অপরের হিংসার জন্ত যে যজ্ঞ করা হয় তাকে অভিচার কর্ম বলে। সেই যজ্ঞে “স্বাহে ইন্দ্রশক্রবধং” এই বাক্যের দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়েছিল। এই বাক্যের ‘শক্র’ শব্দটি প্রসিদ্ধ বিদ্রোহকারী [অমিত্র] অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু বৌগিকরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। শদ-শাতনে অর্থাৎ মরণ অর্থে শব্দ ধাতুর উত্তর গিচ্ করে, তার উত্তর ঔগাদিক ক্রুন্ প্রত্যয় করে এখানে ‘শক্র’ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। শব্দধাতুর উত্তর গিচ্ করায় ‘শ্’ এর পর অকারের বৃদ্ধি হয়ে ‘শাক্র’ এইরূপ শব্দটি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞাদিগণে [৫।৪।৩৮] ‘শক্র’ এই প্রকার অকারযুক্ত ‘শক্র’ শব্দের পাঠ করা হয়েছে বলে নিপাতনে (৭৩) ‘শক্র’ শব্দটি সাধু হয়েছে (৭৪)।

(৭৩) “নিপাতন নামান্তরাণ্যে প্রয়োগে প্রাপ্তেহন্তাদৃশপ্রয়োগকরণম্” [পতিভাষ্যশেখর ১১৭ পরিভাষা]। ব্যাকরণের সূত্রানুসারে বৈকল্প প্রয়োগ হওয়া উচিত, সেক্ষেপ প্রয়োগ না করে, অন্তপ্রকার প্রয়োগ করার নাম নিপাতন। এখানে ব্যাকরণ সূত্রানুসারে ‘শক্র’ এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পানিনি প্রজ্ঞাদিগণে ‘শাক্র’ এইরূপ পাঠ না করে, ‘শক্র’ এইরূপ পাঠ করেছেন। পানিনির ‘শক্র’ এইরূপ প্রয়োগ করার কালে ‘শাক্র’ প্রয়োগটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। শক্র প্রয়োগই শুদ্ধ হয়েছে।

(৭৪) ‘শব্’ ধাতুর উত্তর গিচ্ প্রত্যয় করলে ‘সিতাহ্রসঃ’ [৬।৪।২২] সূত্রানুসারে অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণের দীর্ঘত্ব হ্রস্ব হয়ে যায়। এই হ্রস্বের জন্ত কোন কলনা করতে হয় না। শিঙ্গলেশব্’ ধাতুর [শনি] উত্তর ক্রুন্ [উপাধিক] প্রত্যয় করে প্রজ্ঞাদিগণে ‘শক্র’ এইরূপ উকারযুক্ত পাঠ থাকায় নিপাতনে ‘ব’ স্থানে ‘ত’ আবেশ করলেও ‘শক্র’ শব্দ সিদ্ধ হতে পারে। তার অর্থ হবে শত্রুতা। ইন্দ্রের শত্রুতা। আর শব্দধাতু থেকে ‘শক্র’ শব্দ সিদ্ধ করলে অর্থ হবে ইন্দ্রের শত্রুতামিত্য অর্থাৎ বাতক।

(৭৭) “অথ শিক্ষাঃ প্রবক্ষ্যামি পাণ্ডিত্যমতঃ যথা” [পাণ্ডিত্য শিক্ষা] পাণ্ডিত্য শিক্ষাতে যে সকল রকম আছে তার অনেকগুলি রকম ‘নারদীয় শিক্ষা’ প্রভৃতি শিক্ষাগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিনি পাণ্ডিত্য শিক্ষাকে বর্তমান রূপ দিয়েছেন তাঁকে এই পাণ্ডিত্য শিক্ষার রচয়িতা। না বলে সম্বলন কর্তা বলাই সমীচীন।

মন্ত্র বলে যে উচ্চারণ করা হয়েছিল, সেটি বাস্তবিক পক্ষে মন্ত্র নয়। প্রামাণিক বেদজ্ঞগণ পূর্বপরাম্পরাক্রমে যে সকল বেদভাগকে মন্ত্র, বলে ব্যবহার করে থাকেন, সেই গুলিই মন্ত্র। ‘ইন্দ্রশত্রুর্বন্ধু’ বা ‘স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বন্ধু’ ইহা বেদে পঠিত থাকলেও ষষ্ঠীর কল্পিত বাক্যের অঙ্গকরণরূপেই পঠিত আছে। ইহাকে বৈদিক শিষ্টসম্প্রদায় মন্ত্র বলে গ্রহণ করেন নাই। অতএব এখানে “মন্ত্ৰো হীনঃ” এই রূপ পাঠের সঙ্গতি নাই সেবে ভাব্যকার তার পরিবর্তে “দ্রুটঃ শব্দঃ” এই রূপ পাঠ গ্রহণ করেছেন। এটা মন্ত্র না হলেও ‘উহ’ স্থলে যেমন মন্ত্র না থেকেও [সূর্যায় স্বা হ্রুটঃ নির্বপামি স্বাহা] ঐ বাক্য উচ্চারণ হতে যজ্ঞের ফল হয়, সেইরূপ “ইন্দ্রশত্রুর্বন্ধু” এই বাক্যপ্রয়োগের ফলেও [শুদ্ধ উচ্চারণ যদি হোত] অসীষ্ট ফল হোত। যজ্ঞাদিকর্মে মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত উচ্চারণ করলেও যেমন প্রত্যবায় হয়, সেইরূপ অপভ্রংশাদিশব্দের উচ্চারণে বা লৌকিক সংস্কৃত বাক্যের স্বরবর্ণাদি দ্রুট উচ্চারণেও প্রত্যবায় হয়। ষষ্ঠীর তাই ঋত্বিগ্ণোষে হয়েছিল। এইজন্য ভাব্যকার “দ্রুটঃ শব্দঃ” এইরূপ পাঠ করেছেন। পাবিনীয় শিক্ষাদিতে ‘মন্ত্ৰঃ’ শব্দের উল্লেখ থাকলেও সেই ‘মন্ত্ৰঃ’ শব্দের অর্থ ‘বাক্য’ এইরূপ বুঝতে হবে। ইহাই সেখানকার তাৎপৰ্য। কেহ কেহ মনে করেন “স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বন্ধু” ইহা যে মন্ত্র নয় তদ্বিসয়ে কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞকর্মে মন্ত্রের একশ্রুতি স্বরের বিধান আছে (৭৮)। “ইন্দ্রশত্রুর্বন্ধু” স্থলে একশ্রুতি স্বরের উচ্চারণ করা উচিত ছিল। তা না করে, ঋত্বিক্ যে ইন্দ্রশত্রুশব্দটির আদিস্বর উদাস্তরূপে উচ্চারণ করেছিল তাতেই “স্বরপরাধ”-তথাৎ স্বরদোষ (৭৯) হয়েছিল। সেই দ্রুট শব্দ উচ্চারণের কালে ষষ্ঠীর যজ্ঞের ফল বিপরীত হয়েছিল।

(৭৮) উদাস্ত, অনুদাস্ত ও বরিত—এইগুলির মধ্যে প্রত্যেক স্বরকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করতে হয়। যেখানে পৃথক পৃথকভাবে উদাস্তাদির উচ্চারণ না করে সামান্তভাবে অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, সেইখানে “একশ্রুতি” স্বর উচ্চারণিত হয় ইহাই বুঝতে হবে। সাচ ‘স্বাঃবিঃপাঃ’ [ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত স্বাঃবিঃপাঃ]। এই একশ্রুতির অপর নাম “প্রচর”। কাত্যায়ন প্রণীত ‘শ্রুত-বজ্জুঃ প্রাতিশাখ্যে’ একশ্রুতিস্বরকে ‘ভান’ স্বর বলে নির্দেশ করা হয়েছে। মণ্ডাভাব্যকার এই একশ্রুতিকে “স্বর-সর্বনাম শব্দে অভিহিত করেছেন। “একশ্রুতিঃ স্বরসর্বনাম” [মহাভাষ্য ৬।৪।১৭৪]। যেখানে উদাস্ত অনুদাস্ত ও বরিত স্বরের মধ্যে কোন একটি স্বরকে পৃথকভাবে উচ্চারণ না করে, তাদের বৈলক্ষণ্য বিবক্ষা না করে সামান্তভাবে স্বরবর্ণের উচ্চারণ করা হয় তাহাই “একশ্রুতি”। মণ্ডাভাষ্য ও কৈরটে [৬।৪।১৭৪ সূত্রের] বিশেষ বিবরণ আছে।

(৭৯) “যজ্ঞকর্ষণজন্য সামহ” [১।২।৪]। যজ্ঞকর্ষণ মন্ত্র একশ্রুতিভাষ্যপাদীন বজ্জুঃস্ব” [সিদ্ধান্তকৌমুদী সাধারণস্বর প্রকরণ] “বদি বা একশ্রুতভাবাবেত্র প্রভাষাঃ” [পদমঞ্জরী ১।১] “কেচিৎ, একশ্রুতিপ্রসঙ্গতপুদান্তে চারণাদেবেজ্ঞশ্রুতস্ব দ্রুত্বমিতিভাঃ” [ব্যাকরণসিদ্ধান্ত-স্বাঃবিঃপাঃ ১।১]

এই উদান্ত, অহুদান্ত স্বরিত এবং একত্রিতি স্বরের প্রয়োগ বেদে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। লৌকিক সংস্কৃতে স্বরের ব্যবহার নাই একথা বলা যায় না। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে বৈদিক প্রয়োগের জন্ত যে সকল সূত্রের রচনা করা হয়েছে তাতে বিশেষভাবে বেদের কথা উল্লিখিত আছে (৮০)। যে সকল বৈদিক প্রয়োগ কেবল বেদের মন্ত্রভাগে কিংবা কেবল ব্রাহ্মণ ভাগেই হয়ে থাকে, সেই সকল প্রয়োগ সিদ্ধির জন্ত যে সকল সূত্র রচিত হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে “মন্ত্র” অথবা “ব্রাহ্মণ” শব্দের উল্লেখ আছে (৮১)। স্বরের মধ্যে যে সকল স্বর কেবল বেদেই হয়ে থাকে তাদের জন্তও বিশেষসূত্র প্রণয়ন করা হয়েছে (৮২)। লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় যদি স্বরের ব্যবহার না থাকতো তা হলে পাণিনির এসকল সূত্রে “মন্ত্র” “ব্রাহ্মণ” শব্দের উল্লেখ করা এবং বিশেষ সূত্রপ্রণয়ন করার আবশ্যকতা থাকতো না। কাব্যপ্রকাশকার মন্মট ভট্ট, সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকগণের মতে উদান্ত, অহুদান্ত ও স্বরিত প্রভৃতিস্বর বেদেই বিশেষ অর্থের প্রত্যায়ক হয়, লৌকিক সংস্কৃতে এসকল স্বরের দ্বারা কোন অর্থের বৈলক্ষ্য্য হয় না (৮৩)। বৈদ্যাকরণগণ আনুষ্ঠানিকগণের এইমত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে লৌকিক সংস্কৃতেও উদাত্তাদিস্বরের অর্থবিশেষ প্রতীতিজনক আছে। পূর্বেই এই বিষয় দেখান হয়েছে।

(৮০) “হ্রস্বসি পুনর্ব্যবহারকবচনম্” [১২।৬১]। “হ্রস্বসি সহঃ” [৩২।৬৭] “নেতরাঙ্কসি” [৭।১২৬] ইত্যাদি।

(৮১) “মন্ত্রে ঘসহস্রংগণবৃনহাঙ্কুচকুপমিভমিভোঃ লেঃ” [২।৪৮০]। “মন্ত্রে বৃবেষণচেনবিধ-ভুবীরা উদান্তঃ” [৩।৩২৬]। “মন্ত্রে স্বাভাভেদাঙ্কনঃ” [৬।১৪১] ইত্যাদি। “বিতীরা ব্রাহ্মণে” [২।৩৬০]।

(৮২) “আদ্রাভাস্তং ষ্যচ হ্রস্বসি” [৬।১১১]। “বিতীরাঙ্কসি” [২।১১৬৪] “পরাধিহ্রস্বসি বহুলম্” [৬।১১১২]

‘স্বরবিধৌচ্ছলোহবিধিকারাভাণং’ [শব্দকৌস্তভ ১।১]। “ন চ স্বরস্ত বেদমাত্রবিধরকবাস্তত্ত্ব [লৌকিকে] তৎপ্রযুক্তগণ্যবায়োনঃ প্রাক্তিরিতি বাচ্যম্। তদ্বিধৌচ্ছলসীজনবিধিকারাণাং” [বাণরশিদ্ধান্তত্বনিধি]। “এতেন ভাবাণাং স্বরা নাভ্যোবতি জামান্তঃ পুরাত্নাঃ, স্বরবিধৌচ্ছলোহবিধিকারাভাণাচ্চ”। [‘বিতীরাঙ্কসি’ সূত্রের লঘুগলেনুগ্ধে স্বর, সাধারণস্বর প্রকরণ]

(৮৩) ‘ইত্র একত্রিতিত্যৌ বেদ এব ন কাব্যে স্বরো বিশেষপ্রতীতিকৃৎ’ [কাব্যপ্রকাশ ২।১২]। “কাব্যমার্গে স্বরো ন গণ্যতে ইতি চ নরে” [কাব্যপ্রকাশ ২।৪৪]।

“স্বরভেদেব এব বিশেষকৃৎ, ন কাব্যো” [সাহিত্যদর্পণ ২।২৬]

আর একটা কথা এই—অনেকে বলেন বঙ্গদেশের লোকেরা বেদপাঠ সর্বপ্রকারে অন্তর্ভুক্ত ভাবেই করে থাকে। তাঁদের এই কথা সমীচীন মনে হয় না। কারণ উদাত্ত, অহুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের বিশেষভাবে উচ্চারণ ব্যতীতও বেদের একশ্রুতি স্বরের একপ্রকার পাঠ আছে। উদাত্ত প্রভৃতি বিশেষ স্বর উচ্চারণ না করে অকার প্রভৃতি বর্ণের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদির যথাযথ উচ্চারণ করলে একশ্রুতিস্বর উচ্চারিত হয়। তাতে কোন দোষ হয় না। ইহা পাণিনিমুদ্রা ও তার ব্যাখ্যাদি থেকে জানা (৮৪)। যায়। তবে, উদাত্তাদিস্বরের উচ্চারণে অধিকফল হয়, একশ্রুতি স্বরযোগে উচ্চারণে সেই অধিক ফল হয় না (৮৫)। মহর্ষি পাণিনি কতকগুলিস্থল ব্যতীত যজ্ঞকালে পঠিত মন্ত্রের ‘একশ্রুতিস্বরের’ বিধান করেছেন (৮৬)। ঔকারযুক্তরূপে মন্ত্রের পাঠ করলে মন্ত্রের উচ্চারণে যে সকল ত্রুটি, দোষ হয় তার পরিহার হয় (৮৭)। বঙ্গদেশে সবমন্ত্রই ঔকারযুক্ত করে পাঠ করা হয় ॥ ১৪ ॥

মূল

“বদধীতম্।”

“বদধীতম্ বিজ্ঞাতং নিগদেদৈব শব্দ্যতে।

অনগ্ণাবিব শুক্লেধো ন তজ্জলভি কঠিচিং।”

ভস্মাদনর্ধকং মাধির্গান্মহীত্যায়োঃ ব্যাকরণম্। “বদধীতম্।”

॥ ১৫ ॥

অনুবাদ :—“বদধীতম্” [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য স্মৃতিত হইতেছে তা প্রদর্শন করা হইছে]। যাহা অধীত অর্থাৎ পঠিত হয়, অথচ [উদাত্তাদি

(৮৪) কাশিকা [১২।৩৬]

(৮৫) লঘুশব্দেন্দ্রপেখর—সাধারণস্বর প্রকরণ—“বিভাবান্ধবনি” ইত্য।

(৮৬) “বজ্রকর্ণপাদপদ্যসামহ” (১২।৩৪)

(৮৭) “বদ্যবক্যতিবিক্রমঃ ৫ বহিঃস্বরঃ বদ্যবিক্রমঃ।

বদ্যবিক্রমঃ ৫ বহিঃস্বরঃ ৫ বদ্যবিক্রমঃ।

ভদ্রোকারঃ পুনরুভেদে ন সর্বং চ্যবিক্রমঃ ভবেৎ।

(যোগিসংস্কৃত)

স্বরের সম্বন্ধে ব্যাকরণ শাস্ত্রীয় সংস্কারের জ্ঞান না থাকায় বা অর্থজ্ঞান না থাকায়] বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত না হয়ে, কেবল পাঠের দ্বারা উচ্চারিত হয়, অগ্নি ভিন্ন [ভস্মাদিতে] পদার্থে শুষ্ক ইন্ধন যেমন প্রজ্জলিত হয় না, সেইরূপ সেই অধ্যয়ন কোন কার্যকরী হয় না অর্থাৎ নিষ্ফল হয়। আমরা নিষ্ফল অধ্যয়ন না করি, এই অন্ত্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ১৫ ॥

বিবৃতি :—শব্দের উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের জ্ঞান ব্যাকরণদ্বারা সম্ভব হতে পারে। প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতির জ্ঞান ব্যাকরণের দ্বারাই হয়। শব্দের অর্থজ্ঞানও ব্যাকরণের অধীন। বেদ অধ্যয়ন করে বেদের অক্ষরগুলির গ্রহণ অর্থাৎ কণ্ঠস্থ করা হয়। বেদ কণ্ঠস্থ করে যদি তার অর্থজ্ঞান না করা হয়, তাহলে শুকপাখী প্রভৃতি যেমন বুলি শিক্ষা করে আবৃত্তি করে সেইরূপ অর্থজ্ঞানশূন্য বেদাধ্যায়ী বা অন্ত্যশাস্ত্রাধ্যায়ী যখন সেই সব শাস্ত্র উচ্চারণ করে, তখন তার সেই উচ্চারিত শাস্ত্র বাক্য কোন কাজে লাগে না; ভ্রমে ঘৃতাভূতির মত তা নিষ্ফল হয়। মন্ত্রাদির অর্থজ্ঞান পূর্বক যজ্ঞাদিতে প্রয়োগ করা হয়। অর্থজ্ঞান না থাকলে অহুষ্ঠান করা যায় না। বেদের অর্থজ্ঞানের অভাবে আত্মজ্ঞানও সমুদিত হয় না। ফলত অর্থজ্ঞানের অভাবে কর্মকাণ্ডাত্মক বেদ থেকেও অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না এবং উপনিষদ্ থেকেও জ্ঞান হয় না। সুতরাং বেদ থেকে ফল পেতে হলে অর্থজ্ঞান আবশ্যিক। এই অর্থজ্ঞান ব্যাকরণ থেকেই হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাকরণাধ্যয়ন না করলে বেদ বা অন্ত্য শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল হয়ে যায় বলে, যাতে সেই অধ্যয়ন নিষ্ফল না হয় তজ্জন্ত্য ব্যাকরণাধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। ১১২৩ নিরুক্তেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। এই শ্লোকটি নিরুক্তকার বা মহাভাষ্যকার কোন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা জানা যায় না। নিরুক্তে উদ্ধৃত এই শ্লোকের একটু পাঠান্তর আছে। মহাভাষ্যে যেখানে ‘যদধীতম্’ এইরূপ পাঠ দেখা যায় সেখানে নিরুক্তে “যদগৃহীতম্” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। নিরুক্ত অনুসারে এই শ্লোকটির পূর্বাধ এইরূপ হয়—“যদগৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।” এর অর্থ, যাহা শব্দমাত্রে গৃহীত হয়েছে যার অর্থাংশ অপরিজ্ঞাত, যাহা কেবল পাঠের দ্বারা উচ্চারিত হয় (৮০ নিগদেন = পাঠের দ্বারা)।

(৮৮) “গৃহীতঃ শব্দতঃ, অবিজ্ঞাতঃ তু অর্থতঃ”—শব্দকৌমুদ ১১১।

“তন্ন গৃহীতঃ শব্দতঃ, অবিজ্ঞাতমর্থঃ ইতি বোধ্যম্। [মহাভাষ্যপ্রদীপ উদ্যোত ১১১]

“গৃহীতঃ শব্দতঃ। অবিজ্ঞাতমর্থতঃ প্রকৃত্যাদিবিভ্যাসেন চেত্যর্থঃ। [ব্যাকরণসিদ্ধান্তসংগ্রহানিধি

নিরুক্তে এই শ্লোকের পূর্বে জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা করা হয়েছে (৮২)। মহাভাষ্যকার জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দার জন্য নিরুক্তোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। তবে মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত পরবর্তী “বদগৃহীতম্” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছে। “হ্যগুরয়ং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হয়েছে, পরবর্তী “বদগৃহীতম্” শ্লোকে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এইজন্য মহাভাষ্যকার পরবর্তী শ্লোকের প্রদর্শনই লাঘবের অহুরোধে সমীচীন মনে করেছেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, নিরুক্তকার যাক এবং মহাভাষ্যকার পাতঞ্জলি— এই উভয়ের মতে অর্থজ্ঞানশূন্য বেদের অধ্যয়ন নিফল। পূর্বমীমাংসাদর্শনের মঞ্জলিপ্রাধিকরণে [মীমাংসাদর্শন ১।২।৩১-৫৭ সূত্র] যজ্ঞকর্মে অর্থস্বরূপ করে মন্ত্রের প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। তাতে বুঝা যায়, যার অর্থজ্ঞান নাই তার উচ্চারিত মন্ত্রের কোন ফল হয় না। সেই ব্যক্তির উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা অহুষ্ঠিত ক্রিয়াও নিফল হয়।

কিন্তু বাগবজ্রাদি কর্মে এবং বর্তমানের স্মৃতি কর্মেও দেখা যায় অনেক বাহ্যিক কর্মকারী ব্যক্তি যজ্ঞাদির অর্থ না জেনেও কর্ম করেন বা করান। তাথেকেও ফল হতেও দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে ব্রহ্মভেজের কামনা

(৮৩) “হ্যগুরয়ং ভারহরঃ কিলানুৎ, অখীতা বেদঃ ন জানাতি বোহর্ষম্। বোহর্ষজ ইৎ সকলঃ ভবনমুদেত, নাকমেতি জ্ঞানমিথুতপাপনা ॥” যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে তার অর্থে অনভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি শুক্লবৃকের মত [এখানে শুক্ল কাষ্ঠের শুভের মত] কেবলমাত্র ভারেরই বাহক” বিনি অর্থে অভিজ্ঞ, তিনি ইহলোকে সমস্ত কল্যাণের ভাগী হন এবং জ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করে পরলোকে স্বর্গের অধিকারী হন ॥

হস্তসংহিতায় এইরূপ একটি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়—

“যথা খরশ্চন্দনহারবাহী, ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।

এবং হি শাস্ত্রাণি বহুত্ববীভা, চার্বেষু দুঢ়াঃ খরবৎ বহন্তি ॥”

যেমন গর্দভ চন্দনকাঠ বহন করে, ভারের জ্ঞান তার থাকে কিন্তু চন্দনের জ্ঞান তার থাকে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি অনেকশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও তার অর্থে অনভিজ্ঞ, সে ব্যক্তি গর্দভের মত কেবল বহন করে অর্থাৎ তাঁর অধ্যয়ন বার্থ হয়, সেই অধ্যয়নের দ্বারা সেই ব্যক্তির কোন লাভ হয় না।

করে পঞ্চম বর্ষীয় বালকের উপনয়ন দেওয়ার বিধান আছে (২০)। পঞ্চমবর্ষের বালকের উপনয়ন হলে তার পক্ষে সঙ্ঘ্যাবন্দনার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পঞ্চমবর্ষের বালকের গায়ত্রী বা সঙ্ঘ্যাবন্দনার মন্ত্রের অর্থজ্ঞান সম্ভব নয়। অথচ পঞ্চমবর্ষের বালকের যখন উপনয়নের বিধান আছে, তখন বুঝা যাচ্ছে সঙ্ঘ্যাবন্দনার মন্ত্রের অর্থজ্ঞান না থাকলেও সেই বালকের কেবল মন্ত্রোচ্চারণ থেকেও ফললাভ হবে। এ থেকে বুঝা যায় অবস্থা বিশেষে অর্থজ্ঞান না থাকলেও মন্ত্রের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ভাবে নিফল হয় না। তবে অর্থজ্ঞান থাকলে অধিক ফললাভ হয়, অর্থজ্ঞান ভাবে সামান্য ফল হয়। মহাভাগ্যে বা নিকট্টে যে অর্থজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির মন্ত্রোচ্চারণ নিফল বলা হয়েছে সে নিফলের অর্থ ফলবিশেষের অভাব। ইহাই বুঝতে হবে। পূর্বমীমাংসার মন্তলিঙ্গাধিকরণে অর্থের স্বাকরূপে মন্ত্রের উপযোগিতা স্বীকৃত হলেও স্থলবিশেষে অর্থের প্রকাশ না হলেও মন্ত্রের ব্যর্থতা স্বীকৃত হয় নাই। অদৃষ্টের জনকরূপেও স্থলবিশেষে মন্ত্রের উপযোগিতা আছে (২১) ইহা স্বীকৃত হয়েছে। অতএব অর্থজ্ঞান না থাকলেও মন্ত্রের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না, কিন্তু অর্থজ্ঞান সযে মন্ত্রের উচ্চারণ থেকে যেরূপ বিশিষ্ট ফললাভ হয়, অর্থজ্ঞানভাবে সেরূপ বিশিষ্ট ফললাভ হয় না ॥ ১৫ ॥

মূল

“বস্তু প্রযুক্তোক্তে।”

বস্তু প্রযুক্তোক্তে কুশলো বিশেষে
শকান্ বধাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোহনস্তমাপ্নোতি জয়ং পরজ
বাগ্ বোগবিদ্ ভূত্যাতি চাপশনৈঃ ॥

কঃ ? বাগ্ বোগবিদেব। কুত এতৎ ? যো হি শকাঙ্ জ্ঞানাত্য-
পশকানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব হি শকজ্ঞানে ধর্ম এবমপশকজ্ঞানেহ
প্যধর্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোহপশকা অসৌ-
য়াংসঃ শকা ইতি। একৈকস্য হি শকস্য বহবোহপভ্রংশাঃ। তদ্-

(২০) ব্রহ্মবচসকারীয়া কার্যবিপ্রাণা পঞ্চমে। [মহাসংহিতা ২।৩৭]

(২১) ভাট্টবীণিকা [১ম অধ্যায় ২য় পাদ ৪র্থ অধিকরণ]

যথা—গৌরিতাসা শব্দস্য গাবী গোণী গোতা-গোপোতলিকৈভ্যেব-
মানয়ো বঃবোহপভ্রাঃ। অথ বোহবাগ্যোগবিদ্, অজ্ঞানং তস্য
শরণম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—“যন্ত প্রযুক্তে” [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রমাণ বাক্য স্থচিত
হয়েছে তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]। যে নিপুণ [ব্যক্তি] শব্দ প্রয়োগের সময়,
[অর্থ] বিশেষে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করেন, সেই বাগ্যোগবিদ্ [শব্দতত্ত্বজ্ঞ]
পরলোকে অনন্ত জয় [অর্থাৎ অভ্যুদয়] প্রাপ্ত হন এবং অপশব্দ অর্থাৎ অন্ত-
শব্দের দ্বারা দূষিত হন কে [অপশব্দের—অর্থাৎ অন্তশব্দের দ্বারা দূষিত
হন]? [যিনি] বাগ্যোগবিৎ [শব্দতত্ত্বজ্ঞ] [তিনি] ই। কেন ইহা
[হয়]? যিনি শব্দ [শুদ্ধ শব্দ] জ্ঞানেন, তিনি অপশব্দও [অন্ত
শব্দও] জ্ঞানেন। যেমন [শুদ্ধ] শব্দের জ্ঞানে ধর্ম [হয়], এইরূপ অপশব্দের
[অন্তশব্দের] জ্ঞানেও অধর্ম [হয়]। অথবা [অপশব্দের জ্ঞানে] অধিক
অধর্মের প্রাপ্তি হয়। যেহেতু অপশব্দ অধিক, [সাধু] শব্দ [অপশব্দের অপেক্ষা]
অল্প। যেহেতু এক একটি [সাধু বা শুদ্ধ] শব্দের বহু অপভ্রংশ। যেমন ‘গৌঃ’
এই [সাধু] শব্দের ‘গাবী’ ‘গোণী’ ‘গোতা’ ‘গোপোতলিকা’ ইত্যাদিরূপ বহু
অপভ্রংশ [আছে]। আর যিনি অবাগ্যোগবিদ্ [শব্দতত্ত্বজ্ঞানশূন্য] অজ্ঞান
তার শরণ ॥ ১৬ ॥

বিরুক্তি—ব্যাকরণে যে শব্দ যে অর্থে প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতির দ্বারা ব্যুৎপা-
দিত হয় সেইশব্দ সেই অর্থে সাধু বা শুদ্ধ শব্দ। সেই অর্থের পরিত্যাগ করলে
এবং অন্য অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ করলে ব্যাকরণ ব্যুৎপাদিত হলেও, ব্যাক-
রণের অনভিপ্রেত সেইরূপ অর্থে সেই শব্দ অপশব্দ অর্থাৎ অন্ত শব্দ। বর্তমানে
প্রথম পুঙ্খবধে একবচনে ‘ভবতি’ পদ ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত হয়েছে। ‘ভবতী’
এই ক্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তির একবচনেও ‘ভবতি’ এই, রূপ
ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত। ব্যাকরণ স্মৃত এই অর্থকে পরিত্যাগ করে কেহ যদি
অন্ত অর্থে ‘ভবতি’ এই শব্দটির প্রয়োগ করে, তাহলে সেইশব্দ অপশব্দ হবে।
যেমন কেহ যদি ‘স্বং ভবসি’ এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্তে “স্বং ভবতি” এইরূপ
প্রয়োগ করে তাহলে অন্ত হবেই। ‘ব’ শব্দের একটি অর্থ ধন। যার ধন
নাই [অবিদ্যমানংসংযন্ত] এই অর্থে “অব” শব্দ সাধু [শুদ্ধ]। কিন্তু অব
[ঘোড়া] অর্থে ‘অব’ শব্দ অন্ত। অধিকে ‘নির্ধন’ এই অর্থে বুঝাবার অভি-

প্রায়ে ‘অস্থ’ শব্দের প্রয়োগ করলে তা শুদ্ধ হবেই। পশুজাতিবিশেষ বুঝাবার অভিপ্রায়ে অস্থ ‘অস্থ’ শব্দের প্রয়োগ করলে সেই ‘অস্থ’ শব্দটি অশুদ্ধ হবে। কোন বিশেষ দেশে গরুকে বুঝাবার জ্ঞাত “গোণী” এই অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার করা হোত। ‘গো’ অর্থে এই “গোণী” শব্দ অশুদ্ধ। কিন্তু পাত্রবিশেষ বুঝাবার অভিপ্রায়ে যদি ‘গোণী’ শব্দের ব্যবহার করা হয়, তা হলে সেখানে “গোণী” শব্দটিকে সংস্কৃত সাধু [শুদ্ধ] শব্দ বলে বুঝতে হবে। এইভাবে সর্বত্র অর্থ বিশেষ অবলম্বন করে শব্দের সাধুত্ব [শুদ্ধতা] এবং অসাধুত্ব [অশুদ্ধতা] ব্যবস্থাপিত হয়েছে (৯০)।

যিনি বিশেষ নিপুণ, তিনিই অর্থবিশেষ বুঝাতে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেন, অন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়। শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে এই যে নিপুণতা তা ব্যাকরণের অধ্যয়নের দ্বারাই অর্জন করতে হয়, অন্য প্রকারে তা সম্ভব নয়। এই শ্লোকে যে “বাগ্যোগবিদ” শব্দটি আছে, তার অর্থ—“বাক্ = শব্দ; তার যোগ = অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধ; বিদ = তার [শব্দার্থ সম্বন্ধের] জ্ঞাতা; অর্থবিশেষের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধ, তাহা যিনি জানেন তিনি ‘বাগ্যোগবিৎ’। এইরূপ অর্থগ্রহণ করলে ‘বাগ্যোগবিদ’ শব্দ থেকে “বৈয়াকরণ” এই অর্থ পাওয়া যায়।

“বাগ্যোগবিদ” শব্দের অন্তর্গত ‘যোগ’ শব্দের অর্থ যদি “চিন্তাবৃত্তিরোধ” গ্রহণ করা হয়, তাহলে তার অর্থ অত্যরূপ হবে। বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্তে শব্দের দুই প্রকার স্বরূপ আছে। কার্য ও নিত্য। ইহাদের মধ্যে শব্দের কার্য স্বরূপটি ব্যাবহারিক। যে সকল শব্দের দ্বারা আমরা লৌকিক ব্যবহার ক্ষেত্রে মনের ভাব প্রকাশ করি, সেই সকল শব্দ ব্যাবহারিক। ইহা শব্দের কল্পিত স্বরূপ। শব্দের বাহ্য নিত্যস্বরূপ তাহা পারমার্থিক। ব্যাবহারিকশব্দে বর্ণের পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রম আছে, এইক্রম বাস্তবিক পক্ষে শব্দে নাই, কিন্তু বাস্তব শব্দের

(৯০) “অস্থগোণাদয়ঃ শব্দাঃ সাধবো বিষয়স্তরে।

নিমিত্তভেদাৎ সর্বত্র সাধুত্বং সমবস্থিতম্।।” [ব্যাকপদী ১।১০০]

“আধ্বপনে গোণীতি স্বয়োগাভিধানে চ অস্থ ইতি সাধবো” [পুণ্যরাজটীকা]

“স এষ শব্দঃ কচিদৰ্থে কেনচিৎনিমিত্তেন প্রযুক্তঃ সাধুত্বাৎসাধুত্বাৎ বখাৎস্বয়ংবখনো বখাতার-
নিমিত্তঃ সাধুত্বাৎনিমিত্তিকোৎসাধুত্বাৎ। সবি চ গোণীশব্দঃ সাধুত্বাৎপ্রযুক্তঃ সাধুত্বাৎনিমিত্ত-
কোৎসাধুত্বাৎ। [মহাত্মাভাষ্যদীপ ১।১]

অভিব্যক্তক ধ্বনির যে ক্রম সেই ক্রম শব্দে আরোপিত হয়ে কার্শন্যরূপে প্রতীত হয়। নিত্য ফোটরূপ শব্দ এই আরোপিতক্রমের দ্বারা যুক্ত হয়ে ব্যাবহারিক অবস্থায় উপস্থি হয়। শব্দের যে নিত্যস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য ফোটাত্মক যে শব্দ তাহাই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্তকারণ। যিনি বাগ্-যোগবিদ, যিনি এই নিত্যচৈতন্যস্বরূপ শব্দব্রহ্মে চিন্তের বৃত্তির নিরোধের সম্পাদনে অভিজ্ঞ তিনি অজ্ঞানবন্ধন অতিক্রম করে এইশব্দ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হন [বাক্যপদীয় পুণ্যরাজটীকা ১।১৩২]। এই বিষয়টি পরিস্ফুট করবার জন্য পুণ্যরাজ বাক্যপদীয়ের [১।১৩৩] টীকায় কোন অজ্ঞাত গ্রন্থ থেকে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :—

প্রাণবৃত্তিমতিক্রান্তে বাচন্তেষু ব্যবস্থিতঃ ।

ক্রমসংহারযোগেন সংকৃত্যাত্মানমাশ্বনি ॥

বাচঃ 'সংস্কারমাধায় বাচং জ্ঞানে নিবেশ্ত চ ।

বিভজ্য বন্ধনান্তস্তাঃ কৃষা তাং ছিন্নবন্ধনাম ॥

জ্যোতিরাস্তরমাসাচ্ছিন্নগ্রন্থিপরিত্রহম্ ।

পরেণ জ্যোতির্বিবকস্বং ছিদ্দা গ্রন্থীন্ প্রপণ্ডতে ॥

বাক্ অর্থাৎ শব্দের যে বথার্থ স্বরূপ, তাহা প্রাণবায়ুর ব্যাপারের অতীত। সুতরাং প্রাণবায়ুর ব্যাপারকে প্রাণায়ামের দ্বারা নিরুদ্ধ করতে না পারলে, শব্দব্রহ্মের বথার্থ স্বরূপের অনুসন্ধান করা যায় না। যিনি বাক্তত্বের উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক, তাঁকে প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা 'কুন্তক' করে প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার রোধ করতে হবে। এই অবস্থায় তিনি বাক্তত্বে অবস্থিত হতে পারেন অর্থাৎ তাঁর শব্দব্রহ্ম বিষয়ক সবিকল্প সমাধিলাভ হবে। তারপরে যে যোগে [সমাধিতে] ক্রমের অবভাস হয় না, সেই অক্রম অর্থাৎ নির্বিকল্পক সমাধির সহায়ে আত্মাকে আত্মাতেই সংকৃত করতে হবে অর্থাৎ নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইরূপ সমাধি লাভ হলে বাক্তস্বরূপ শব্দব্রহ্মে যে সকল অজ্ঞান কল্পিত মল সংস্ট হইবে আছে, তা থেকে সেই বাক্তত্বের শুদ্ধি সাধিত হয়। নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় চিন্তের পূর্ণ স্ফূর্তি সাধিত হওয়ায়, বথার্থ বস্তুর গ্রহণে চিন্তের যে সামর্থ্য অভিব্যক্ত হয়, তার প্রভাবে শব্দব্রহ্মের বথার্থ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। এই অবস্থায় বাক্তত্বের সহিত স্বরূপ চৈতন্যের যে স্বাভাবিক অভেদ বিদ্যমান, তা সেই যোগীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত।

হয়ে যায়। চৈতন্যময় যে ‘বাক্তত্ব’ তার থেকে অজ্ঞানকল্পিত মনের বিয়োগ হলে, সেই বাক্তত্ব অজ্ঞান সম্বন্ধশূন্য হয়ে যায়। সর্বপ্রকার অজ্ঞানকল্পিত বন্ধন থেকে বিমুক্ত যে বাক্তত্ব তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম। যিনি ‘বাগ্‌যোগ্‌বিদ্’ তিনি এই পরম জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান শব্দব্রহ্মের সহিত ঐক্যলাভ করেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। বৈয়াকরণগণ এই ‘বাক্ত-ত্ব’ ও উপনিষৎপ্রতিপাদ্য স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। অতএব বৈয়াকরণ সম্প্রদায়মতে যিনি বাক্তত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন তিনিই ব্রহ্মত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন।

এইভাবে দেখা গেল ‘বাগ্‌যোগবিদ্’ শব্দের যে অর্থটি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ সেই অর্থটিই এখানে গ্রহণ করলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যিনি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি ব্যবহারকালে অর্থবিশেষে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করতে সমর্থ। স্মৃতরাং এখানে পতঞ্জলি ‘বাগ্‌যোগবিদ্’ শব্দের দ্বারা তাঁকেই লক্ষ্য করেছেন, অতএব দেখা যাচ্ছে এখানে বাগযোগবিদ্ শব্দটির বৈয়াকরণ অর্থে প্রয়োগ হয়েছে (২৩)।

“বস্তু প্রযুক্তো কুশলো বিশেষে” ইত্যাদি শ্লোকের শেষভাগে “দু্যতি চাপ-শব্দৈঃ” এই বাক্যটি আছে। “দু্যতি” অর্থাৎ ‘দুষ্ট হয়’ এই ক্রিয়াপদের কোন কর্তার নির্দেশ নাই। যদিও “বাগ্‌যোগবিৎ” এই পদটি “দু্যতি” এই ক্রিয়া-পদের নিকটে উচ্চারিত হয়েছে তথাপি সেই “বাগ্‌যোগবিৎ” পদের সম্বন্ধ “দু্যতি” এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে আছে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্ত মহাভাষ্যকার “দু্যতি” ক্রিয়ার কর্তা কে—এই বিষয়ে লিচারের অবতারণা করেছেন।

(২৩) নাগেশভট্ট এখানে বৈয়াকরণ অর্থেই “বাগ্‌যোগবিৎ” শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—“বাগো যোগঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগেন অর্থবিশেষণত্বেন, ২বতীতি বাগ্‌যোগবিৎ”। (মহাভাষ্য প্রদীপোদ্যোত) বাক্ অর্থাৎ শব্দের, যোগ—প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগের দ্বারা অর্থবিশেষের প্রতিপাদনসামর্থ্য—ইহা যিনি জানেন তিনি বাগ্‌যোগবিৎ। শব্দবি শব্দের সহিত অর্থবিশেষের সম্বন্ধ আছে বলগেই, কোন বিশেষ শব্দের দ্বারা কোন বিশেষ অর্থের প্রতীতি হয়। শব্দের এবং অর্থের এই যে পরস্পর সম্বন্ধ, ইহা প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগদ্বারা জানতে পারা যায়। অতএব যিনি বাগ্‌যোগবিদ্ অর্থাৎ বৈয়াকরণ, তিনি প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগের দ্বারাই শব্দের অর্থবিশেষ প্রতিপাদনের যে যোগ্যতা তাহা জানতে পারেন। বাক্=শব্দ, যোগ=সম্বন্ধ, বিৎ=জ্ঞাত। এই সমস্ত পদটির আক্ষরিক অর্থ—শব্দের যে (অর্থের সহিত) সম্বন্ধ, তার যিনি জ্ঞাত অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের যে পরস্পর সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ যিনি জানেন।

এখানে ভাষ্যকার পূর্বপক্ষরূপে বলেছেন—যিনি বৈয়াকরণ তিনি অশুদ্ধ শব্দ-
 থেকে পৃথগ্ভাবে শুদ্ধ শব্দকে জানেন বলে অশুদ্ধ শব্দেরও তাঁর জ্ঞান আছে।
 তিনি যেমন শুদ্ধ শব্দ জানেন, তেমনি অশুদ্ধ শব্দও জানেন। শুদ্ধশব্দের জ্ঞান
 থেকে বৈয়াকরণের ন্যেয় ধর্মলাভ হয় সেই ধর্মের ফলে ঐহিক ও পারলৌকিক
 অত্যাশ্রয় [কল্যাণ] লাভ হয়, সেইরূপ অশুদ্ধশব্দের জ্ঞানের ফলে তাঁর অধর্মের
 প্রাপ্তি অবশ্যস্বাবী। স্নেহের জনক স্নিগ্ধবস্তুর ভোজন করলে তা থেকে শৈথিল্য
 রোগ উৎপন্ন হয় এবং তার বিপরীত রুদ্ধবস্তুর আহার করলে সেই শৈথিল্য
 রোগ দূরীভূত হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে—পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বিভিন্ন বস্তু
 থেকে যে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলও পরস্পর বিপরীত স্বভাবের হয়ে
 থাকে। স্তূতগাং বৈয়াকরণের সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যেমন ধর্মলাভ হয়, সেইরূপ
 অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মের প্রাপ্তি হবেই। ভাষ্যকার এই কথা বলে পরে
 আর একটা কথা বলেছেন—অথবা বৈয়াকরণের ধর্ম অপেক্ষা অধর্ম বেশী হবে।
 কারণ সাধুশব্দের অপেক্ষা অসাধু শব্দ সংখ্যায় অনেক বেশী। এক একটি সাধু
 শব্দ যে অর্থের বোধক হয়, সেই অর্থের বোধক অসাধু শব্দ অনেক। যেমন
 দৃষ্টান্ত হিসাবে বলেছেন “গৌঃ” এই একটি সাধুশব্দের অপভ্রংশ [অশুদ্ধ] গাবী,
 গোণী ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে। সাধুশব্দের জ্ঞান করতে গেলে অসাধু
 শব্দের জ্ঞান অবশ্যস্বাবী। যে বৈয়াকরণ নয়, সে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতাই অবৈয়াক-
 রণের অধর্ম থেকে অব্যাহতিলাভের একমাত্র হেতু। যে অজ্ঞ, শাস্ত্রের দৃষ্টি-
 তেও সে ক্ষমাহ’। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুর ব্রাহ্মণ হত্যাदि নিষিদ্ধ
 আচরণ থেকে কোন পাপ হয় না। এইরূপ মানুষের মধ্যে যারা অজ্ঞ, তারা
 পশুর সমান। তাদের পক্ষে অশুদ্ধশব্দের উচ্চারণ দোষজনক হতে পারে না।
 অতএব এখানে “দুশ্রুতি” ক্রিয়ার কর্তা—অন্ত কেউ নয় কিন্তু যিনি ‘বাগ্‌যোগ-
 বাদ’ অর্থাৎ বৈয়াকরণ তিনিই ইহার কর্তা। ইহাই—এই পূর্বপক্ষাত্মক ভাষ্যের
 সারাংশ ॥ ১৬ ॥

মূল।

বিষয় উপস্তাসঃ। নাত্যস্তায়াজ্ঞানং শরণং ভবিতুমহ’তি।

যো হজ্ঞানন্ বৈ ব্রাহ্মণং হস্তাং সূরাং বা পিবেৎ,

সোহপি মন্তে পতিতঃ স্তাৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—[এই] উপতাস [বাক্য] বিষম [অসঙ্গত] । অজ্ঞান অত্যন্ত শরণ হতে পারে না । যে না জেনে ব্রাহ্মণ বধ করে, অথবা স্ত্রী পান করে, সেও পতিত হয়—ইহা মনে করি ॥ ১৭ ॥

পদার্থজ্ঞান :—“অত্যন্তায়” এই পদটি একটি অব্যয়, অত্যন্ত শব্দের চতুর্থী নয়। অর্থ = অত্যন্ত । বিষমঃ = [এখানে] অসঙ্গত অর্থাৎ অযুক্ত । উপতাসঃ = বাক্য [“অজ্ঞানং শরণম্” এই বাক্য] ॥ ১৭ ॥

বিবৃতি—অশুদ্ধ শব্দের জ্ঞান থেকে বৈয়াকরণের পাপ হবে আর অবৈয়াকরণের অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ থেকেও পাপ হবে না—অজ্ঞানই অবৈয়াকরণের পাপ হতে অব্যাহতি পাবার হেতু—এই কথা পূর্বে পূর্বপক্ষী বলেছিল। পূর্বপক্ষীর বাধকরূপে এখন সিদ্ধান্তী বলেছেন—“বিষম উপতাসঃ”। অর্থাৎ ঐ পূর্বোক্ত কথা [বৈয়াকরণের পাপ, অবৈয়াকরণের অব্যাহতিলাভ ইত্যাদি] অসমীচীন। যারা শাস্ত্রে অধিকারী, তাদের শাস্ত্রানুশীলন যেমন অবশ্য কর্তব্য সেইরূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি ও নিষেধপরিপালনও অবশ্যকর্তব্য। যে অজ্ঞ সে দুইটি অপরাধে অপরাধী হয়। শাস্ত্রের অনুশীলন যাহা তার অবশ্যকর্তব্য তাহা না করার জন্ত এক অপরাধ। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায়, অজ্ঞব্যক্তি শাস্ত্রানুকূল আচরণের বর্জন এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচারের অনুষ্ঠান করে অপরাধভাগী হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি এইভাবে তার অজ্ঞানের জন্ত দ্বিগুণ পাপে পাপী হলেও তার অজ্ঞতাকে তার পাপ থেকে অব্যাহতিলাভের হেতুরূপে যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাহা কোনরূপে মুক্তির দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না। সুতরাং ইহা বিষম উপতাস। যদিও অজ্ঞানবশত পাপ, জ্ঞানীর পাপ অপেক্ষা লঘু পাপ, তথাপি সেই অজ্ঞান কিরূপ, কোথায়, তাহা বিচার্য। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণহত্যা, স্ত্রীপান, চৌর্ধ, মিথ্যাভাবণ প্রভৃতিকে পাপ কর্ম বলা হয়েছে। সেই সকলশাস্ত্র না জেনে যদি কেহ ব্রাহ্মণহত্যাदि কর্ম করে, তা হলে তার নিষেধশাস্ত্র না জানা হেতু যে পাপ লঘু হবে, এটা কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। এই সকল শাস্ত্রের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। যদি কেহ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে জেনে হত্যা করে, সে ক্ষেত্রে সেই ঘাতক ব্যক্তি ব্রাহ্মণহত্যার নিষেধশাস্ত্র না জানলেও তার সম্পূর্ণ পাপ হবে। তবে যদি কেহ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে না জেনে বধ করে বা স্ত্রীকে স্ত্রী বলে না জেনে জলভ্রমে স্ত্রীর পান করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার ব্রাহ্মণ হত্যার বা

স্বরাপানের সম্পূর্ণ পাপ হবে না। এইরূপ অজ্ঞানই তার পাপের অন্তর্য হেতু হবে। শাস্ত্রানুশীলন না করে যে শাস্ত্র বিবয়ক অজ্ঞান—তার দ্বারা পাপের অন্তর্য সম্পাদিত হবে না। এই যুক্তি অপশব্দের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যদি কেহ নিবেদনশাস্ত্র না জেনে যজ্ঞাদি কর্মে অপশব্দ প্রয়োগ করে, তাহলে তার সেক্ষেত্রে অন্তর্য শব্দ প্রয়োগ জন্ত যে পাপ, সে পাপ হবেই। অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাকরণজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির অজ্ঞান, পাপ থেকে অব্যাহতি লাভের হেতু হতে পারে না ॥ ১৭ ॥

মূল

এবং তর্হি “সোহ নন্তুমাশ্বোতি জয়ং পরজ

বাগ্‌যোগবিদ্‌ ছ্যাবতি চাপশকৈঃ” ।

কঃ ? অবাগ্‌যোগবিদেব । অথ যো বাগ্‌-

যোগবিদ্‌ বিজ্ঞানং তন্ত শরণম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তা হলে [বৈয়াকরণের পাপশব্দা হলে] সেই বাগ্‌যোগবিদ্‌ [বৈয়াকরণ] পরলোকে অনন্ত জয় প্রাপ্ত হয় এবং অপশব্দসমূহদ্বারা দূষিত হয়। কে ? [উত্তর] অবাগ্‌যোগবিদ্‌ [ব্যাকরণজ্ঞানহীন]। আর যিনি বাগ্‌যোগবিদ্‌, বিজ্ঞান তাঁর শরণ [পাপ থেকে অব্যাহতিলাভের হেতু] ॥ ১৮ ॥

বিশ্লেষ—পূর্বের ভাষ্যে বলা হয়েছে অবাগ্‌যোগবিদ্‌ অর্থাৎ অবৈয়াকরণ ব্যাকরণের অজ্ঞান বশত অসাধু শব্দের প্রয়োগ করে যে পাপ থেকে অব্যাহতি পাবেন তা হতে পারে না। সুতরাং পূর্বপক্ষী যে বলেছিল, “অজ্ঞানই শরণ অর্থাৎ পাপ থেকে অব্যাহতি পাবার হেতু” পূর্বপক্ষীর সেই কথা খণ্ডিত হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বপক্ষী যে আর একটি আশঙ্কা করেছিল “বৈয়াকরণের সাধু শব্দের জ্ঞান থেকে যেমন ধর্ম হবে, সেইরূপ অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হবে।” এই আশঙ্কার উত্তর তো দেওয়া হয়নি। তার উত্তর কি হবে ? তার উত্তর কি সিদ্ধান্তী এড়িয়ে গেলেন ? না। সেই উত্তর দিবার জন্ত এখন ভাষ্যকার “এবং তর্হি” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করেছেন ॥ সে অর্থাৎ বৈয়াকরণ পরলোকে অনন্ত জয় অর্থাৎ দীর্ঘকাল সুখভোগাদি প্রাপ্ত হয়। এই কথার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যিনি বৈয়াকরণ তিনি সাধুশব্দের জ্ঞান পূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করে, সেই সাধুশব্দের প্রয়োগ বশত ধর্মের লাভ করে স্বর্গাদিতে দীর্ঘকাল সুখভোগ করেন; সাধুশব্দের জ্ঞানমাত্রথেকে ধর্মলাভ পূর্বক স্বর্গাদি

লাভ করেন না। যদি সাধুশব্দের জ্ঞান থেকেই ধর্মলাভ হোত তা হলে অল্পরূপ ভাবে অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মও হোত। কিন্তু এখানে তো বৈয়াকরণের অধর্মফলের কথা ভাষ্যকার বলেননি। সুতরাং অনন্তজয়প্রাপ্তি যাত্রের কথা ভাষ্যকার কতৃক অভিহিত হওয়ায়, ভাষ্যকারের উক্ত অভিপ্রায়ই জানা যায়। আর শ্লোকের “দুঃখতি চাপশব্দৈঃ” এই অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বললেন “কে অপশব্দ দ্বারা দূষিত হয়? [উত্তরে] অবাগ্যোগবিদই।” ভাষ্যকারের এই কথায় স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, বৈয়াকরণ অপশব্দ দ্বারা দূষিত হয় না। তাহলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বৈয়াকরণ সাধুশব্দের ও অসাধুশব্দের পরিচয় জানেন বলে, অসাধুশব্দের প্রয়োগ না করে, সাধুশব্দের প্রয়োগ করেন, সেই প্রয়োগ থেকে তিনি ধর্মলাভ পূর্বক পরলোকে অনন্ত জয় প্রাপ্ত হন। আর অবৈয়াকরণের সাধু অসাধুশব্দের বিবেকজ্ঞান না থাকায় সে অসাধু শব্দেরও প্রয়োগ করে বলে, সেই অসাধুশব্দ প্রয়োগজনিত দূষিত অর্থাৎ পাপপ্রাপ্ত হয়। ইহাই ভাষ্যপর্যালোচনা থেকে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বলে বুঝা যায়। অপশব্দ অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রতিপাদিত যে শুদ্ধ শব্দ, সেই শুদ্ধশব্দ ব্যতীত অত্র যে সকল অশুদ্ধ শব্দ, সেই অশুদ্ধশব্দ সমূহ দ্বারা বৈয়াকরণ দূষিত হতে পারে না—ইহা উপরে বলা হলো। শুদ্ধ শব্দের জ্ঞান করতে গেলে, অশুদ্ধ শব্দের জ্ঞান অবর্জনীয়। একটি উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অমুকুল যত্ন থেকে আত্মমুখিকরূপে অবর্জনীয়রূপে যদি কিছু সিদ্ধ হয়ে যায়, তবে সেস্থলে আত্মমুখিকরূপে সিদ্ধ বস্তুর পৃথক ফল থাকে না। কোন বস্তুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে গেলে চক্ষুর উন্মীলন করতে হয়। চক্ষুর উন্মীলন ব্যতীত দর্শনব্যাপার নিষ্পন্ন হয় না। এখানে দর্শনব্যাপারের যা ফল [স্বপ্ন ইত্যাদি] চক্ষুর উন্মীলনেরও তাই ফল, অতীত ফল চক্ষুর উন্মীলনের সেখানে নাই। এইরূপ যিনি সাধুশব্দের জ্ঞান অর্জন করেন, তাঁকে অপশব্দ থেকে পৃথক্করে সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ করতে হয় বলে তাঁর পক্ষে অপশব্দ অর্থাৎ অসাধুশব্দের জ্ঞান অবর্জনীয় বলে সাধুশব্দের জ্ঞানের যা ফল আত্মমুখিকভাবে অসাধুশব্দের জ্ঞানেরও তাহাই ফল, পৃথক্ফল নাই। সুতরাং অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মরূপ পৃথক্ফল হতে পারে না। সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে সাধুশব্দের প্রয়োগ করে ধর্ম লাভ হয়, অসাধুশব্দের আত্মমুখিক জ্ঞানেরও সেই ধর্মলাভই ফল, অধর্ম নয়।

এইজন্য এখানে ভাষ্যকার বলেছেন—“অথ যো বাগ্‌যোগবিদ্‌ বিজ্ঞানং তস্ত শরণম্”—বিনি বৈয়াকরণ জ্ঞানই তাঁর পরিত্রাণের উপায় (২৪) ।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে—“সৌহনস্তমাপ্নোতি.....বাগ্‌যোগবিদ্‌ দুষ্যতি চাপশকৈঃ ।” এই শ্লোকে “অপশকৈঃ দুষ্যতি” চ’ অর্থাৎ ‘অপশক্ণের দ্বারা দূষিত হন’ এই দূষিত হওয়ার কৰ্তা কে? সন্নিধানে “বাগ্‌যোগবিদ্‌” শব্দ আছে। সুতরাং সেই “বাগ্‌যোগবিদ্‌” শব্দের অর্থ বৈয়াকরণেরই দূষিত ক্রিয়ার সহিত অদ্বয় হওয়া উচিত বলে—“বাগ্‌যোগবিদ্‌ই” অর্থাৎ বৈয়াকরণই অপশক্ণের দ্বারা দূষিত হবেন। অথচ ভাষ্যকার বলেন “কঃ? অবাগ্‌যোগবিদেব ।” কে’ অপশক্ণ দ্বারা দূষিত হয়? অবাগ্‌যোগবিদই ।” অবাগ্‌যোগবিদের অর্থাৎ অবৈয়াকরণের দূষিত হওয়া ক্রিয়াতে অদ্বয় কি করে হলো? এখানে তো শ্লোকে “অবাগ্‌যোগবিদ্‌” শব্দ নাই।

এর উত্তরে কৈয়ট বলেছেন—“দুষ্যতি চাপশকৈঃ” এই “দুষ্যতি” ক্রিয়াপদের সন্নিধানে “বাগ্‌যোগবিদ্‌” শব্দ থাকলেও বাগ্‌যোগবিদের সঙ্গে দুষ্যতি ক্রিয়ার অদ্বয়ের সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতা নাই। বাগ্‌যোগবিদ্‌ অর্থাৎ বৈয়াকরণ অপশক্ণের দ্বারা দূষিত হন না—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। বৈয়াকরণের অপশক্ণ দ্বারা দূষিতত্বটি বাধিত। অথবা অবাগ্‌যোগবিদেরই অপশক্ণদ্বারা দূষিত হওয়ার সামর্থ্য আছে বাগ্‌যোগবিদের নাই বলে অবাগ্‌যোগবিদ্‌ শব্দটি অধ্যাহার করে তার সঙ্গে দুষ্যতি শব্দের সম্বন্ধ করতে হবে। মীমাংসা দর্শনে—“প্রতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবাসে পারদৌৰ্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ” [মীমাংসাদর্শন তৃতীয়াধ্যায়, ৩য় পাদ-১৩] ইত্যাদি অধিকরণে লিঙ্গ অর্থাৎ সামর্থ্যকে বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা থেকে বলবস্তুর বলা হয়েছে। স্থানই এখানে সন্নিধি। কৈয়টে উক্ত প্রকরণ শব্দের অর্থ ‘সন্নিধি’ এই কথা বলেছেন নাগেশভট্ট (২৫) ॥ ৩৮ ॥

(২৪) মহাভাষ্যকার পরে এই পশ্পশাহিকাই—“জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেত্তথাহ ধর্মঃ” এই পূর্বপক্ষ-বাতিষ্কের সমাধানে পুনরায় এই বিষয়ের বিচারের অবতারণা করেছেন।

(২৫) “প্রকরণাঃ সামর্থ্যবলীহ ইত্যাহ—অবাগ্‌যোগবিদিতি ॥” [মহাভাষ্যপ্রবীণ ১১]

“প্রকরণাদিতি সন্নিধিরিত্যর্থঃ” [মহাভাষ্যপ্রবীণোদ্যোত ১১]

মূল

ক পুনরিদং পঠিতম্? ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ।

কিঞ্চ ভোঃ, শ্লোকো অপি প্রমাণম্? কিঞ্চাতঃ?

যদি শ্লোকা অপি প্রমাণম্, অয়মপি শ্লোকঃ

প্রাণং ভবিতুমহঁতি—

বহুত্বস্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।

পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎক্রতুগতং নয়েৎ।

ইতি। প্রমত্তগীত এব তত্রভবতঃ। বস্তু প্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্।

‘বস্তু প্রযুক্তং’ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ইহা [এইপদ্য] কোথায় পঠিত [আছে]? ভ্রাজা নামক শ্লোকসমূহ [আছে, তাহাদের মধ্যে এই পদ্য পঠিত আছে]। কি হে, শ্লোকও প্রমাণ? তাতে কি [শ্লোক সকল প্রমাণ হলে ক্ষতি কি?] শ্লোকসকল যদি প্রমাণ হয় [তা হলে] এই শ্লোকও প্রমাণ হতে পারে—তাত্রবর্ণ [স্বর] ঘটের বিপুল মণ্ডল [সমূহ] পীত হলেও [পান করলেও] [যদি তাহা] স্বর্গগমনের হেতু না হয়, বজ্রস্থিত তাহা [স্বর] কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্ত করাতে পারে? ইহা পুঙ্খের [বুদ্ধদেবের] প্রমত্তগীত [বেদ বিরোধ অবলম্বন করে উক্তি]। যাহা অপ্রমত্তগীত [বেদের অবিরোধে উক্তি] তাহা প্রমাণ। “বস্তু প্রযুক্তং” [এই প্রত্যয়ের দ্বারা যে প্রমাণবাক্য স্থিতিত হয়েছিল, তার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হোল] ॥ ১১ ॥

বিবৃতি—“বস্তু প্রযুক্তং” ইত্যাদি শ্লোক ভাষ্যকার প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেছেন। ইহা কোন্ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তাহা বলবার জন্য ভাষ্যকার নিজেরই প্রশ্ন উঠিয়েছেন—“ক পুনরিদং পঠিতম্?” কোথায় এই শ্লোক অর্থাৎ পদ্য পঠিত আছে? এই শ্লোকের প্রামাণ্যের সমর্থন অভিপ্রায়েই—এই প্রশ্নের উত্থাপন হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ‘ভ্রাজা’ ২৬)

(২৬) এই শ্লোকটি কতায়ন প্রণীত বলে বুঝা যায়। কারণ সকল ব্যাখ্যাকারিই ইহাকে কতায়ন প্রণীত বলেছেন। কতায়ন প্রণীত এইরূপ অনেক শ্লোক ছিল। এসব শ্লোকের নাম “ভ্রাজা” বলে অভিহিত হয়েছে। তবে “ভ্রাজাঃ” শব্দটি ভ্রাজ শব্দের বহুবচনান্তরূপ কিংবা “ভ্রাজা” শব্দের বহুবচনান্তরূপ তা আর এখন নিশ্চয় করা যায় না। ব্যাখ্যাকাররা “ভ্রাজাশ্লোকঃ” এইরূপ উল্লেখ করেছেন। কেউ পঠিতাবে “ভ্রাজা” এইরূপ অকারান্ত বলেই নাই বা অকারান্তও বলেন নাই। নাগেনভট বলেছেন “ভ্রাজা নাম কতায়ন প্রণীতাঃ শ্লোকা ইত্যাহঃ।”

নামক কতকগুলি শ্লোক আছে, তাদের রচয়িতা কাত্যারন। সেই শ্লোক সমূহের মধ্যে এই শ্লোকটি পঠিত। বেদবিশ্বাসী আন্তিকগণ শব্দ প্রমাণরূপে ঐতিকেই প্রধান বলেন। ঐতিভিন্ন ঐতির অমূল ও ঐতির অবিরোধী স্মৃতি সমূহকেও শব্দপ্রমাণরূপে বেদবিশ্বাসী আন্তিকগণ গ্রহণ করেছেন। যে কোন শ্লোককে প্রমাণ বলে গ্রহণ করলে অনেক প্রকার অব্যবহার সম্ভাবনা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেদবিরোধীরা বৈদিক অমূল্যতার নিন্দাসূচক অনেক শ্লোক রচনা করেছিলেন। শ্লোকমাত্রকে প্রমাণ স্বীকার করলে সেই সকল শ্লোকের প্রামাণ্যও অস্বীকৃত হতে পারবে না। সৌত্রামণি যাগে সুরার দ্বারা হোম করবার বিধান আছে (২৭)। সেই হোমের অবশিষ্ট সুরা পান করারও বিধি আছে। যজ্ঞে হোমাবশিষ্ট সুরার পান বেদবিহিত বলে ধর্ম, অধর্ম নয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ইহার নিন্দার জন্য সে কালে একটি শ্লোক প্রচলিত ছিল :—

“যত্বদ্বন্দ্ববর্ণনানাং ঘটনাং মণ্ডলং মহৎ।

পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ ॥”

এই শ্লোকটি কোন্ গ্রন্থে আছে তা জানা যায় না। মহাভাষ্যকার এই শ্লোকের প্রণেতার উদ্দেশ্যে “তত্র ভবতঃ” [পূজ্যন্ত] এইরূপ সম্মানসূচক নিশেষণ বলেছেন। ইহাতে অনেকে মনে করেন—বুদ্ধদেব স্বয়ং সৌত্রামণিযাগের ধর্মত্ব খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই শ্লোক রচনা করেছিলেন।

পূর্বে আমার ঘটে সুরা রাখার রীতি ছিল। সেইজন্য এই শ্লোকে বলা হয়েছে, তদ্বর্ণ ঘটের মহৎ মণ্ডলকেও [মহাসমুদায়ও] যদি কেহ পান করে অর্থাৎ যদি কেহ প্রচুর সুরাপান করে তা হলেও সেই সুরাপানকর্তা সুরাপানের ফলে স্বর্গলাভ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যজ্ঞে অল্পমাত্র সুরাপানের ফলে সেই যজ্ঞকর্তা স্বর্গে যাবেন—ইহা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। বেদবিরোধীরা এই ধরণের আরও অনেক শ্লোক রচনা করে গেছেন। শ্লোকমাত্রকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলে সেইসব শ্লোকও প্রমাণরূপে গৃহীত হবে। তাতে বেদবিহিত অনেক কর্মমূল্যের পরিভ্যাগের প্রসঙ্গ হবে। সুতরাং

(২৭) কলিঙ্গের সৌত্রামণিযাগে সুরার ব্যবহার বিবিধ। মাধবীচারণপ্রণীত পরাশরসংহিতা-ভাষ্য এবং নির্গণসিদ্ধির “কলিঙ্গজা” প্রकरणে উল্লিখিত।

শ্লোকমাত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা বেদবিশ্বাসী আন্তিকগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব বেদবিশ্বাসী আন্তিকগণের দৃষ্টিতে “যদুদ্ব্যবর্ণনাম্” ইত্যাদি শ্লোক অপ্রমাণ। আবার এই শ্লোকটি যদি অপ্রমাণ বলা হয়, তা হলে কাত্যায়ন প্রণীত পূর্বোক্ত “যন্ত প্রযুক্তে” ইত্যাদি শ্লোকেরও প্রমাণ্য সম্বন্ধিত হতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় ভাষ্যকারের এই “যন্ত” ইত্যাদি শ্লোককে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা উচিত হয় নাই। পূর্বপক্ষীদের ইহাই বক্তব্য।

তার উত্তরে ভাষ্যকার যা বলেছেন—তার তাৎপৰ্য হচ্ছে, কোন শ্লোকই স্বয়ং প্রমাণ হতে পারে না। বেদবিশ্বাসী আন্তিকগণ যে কোন শ্লোককে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে সম্মত না হলেও বেদমূলক শ্লোককে তাঁরা প্রমাণরূপে অবশ্যই গ্রহণ করে থাকেন। কাত্যায়ন প্রণীত “যন্ত প্রযুক্তে” ইত্যাদি শ্লোকের মূলরূপ একটি শ্রুতিবাক্য আছে—‘একঃ শব্দঃ সমাগ জাতঃ শাস্ত্রাশ্রিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে (৯৮) লোকে কামধুগ্ ভবতি’ ইহার-তাৎপৰ্য এই—একটি শব্দও যদি সমাগরূপে অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগের দ্বারা জাত হয়ে, শাস্ত্র প্রতিপাদিত সাধন প্রক্রিয়ার স্বরণপূর্বক যথাযথরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহলে সেই শব্দ প্রয়োগকারীর স্বর্গলোকে কামনার পূর্ণতা সম্পাদন করে। যথাযথভাবে শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা পারলৌকিক কল্যাণ হয়—ইহা এই শ্রুতি বাক্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই শ্রুতিবাক্যে যাহা প্রতিপাদিত হয়েছে কাত্যায়ন প্রণীত “যন্ত প্রযুক্তে” ইত্যাদি শ্লোকেরও তাহা বলা হয়েছে।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে কাত্যায়ন প্রণীত শ্লোকটি শ্রুতিমূলক। এইজন্য ইহা প্রমাণ (৯৯)। সৌত্রামণি যাগে সুরাপানের নিন্দাস্বচক শ্লোকটি বেদবিহিত অমুষ্ঠানের বিরুদ্ধবিষয়ক বলে প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে না।

(৯৭) “একঃ পূর্বপরয়োঃ” [৬।১।৮] এই সূত্রের মহাভাগে এই শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। এটি একটি ব্রাহ্মণগ্রন্থের বাক্য। যে গ্রন্থ থেকে এই বাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে, সে গ্রন্থ ভাষ্যকারের সমর্থ প্রচলিত ছিল, এখন নাই। এই বাক্যটি যে একটি শ্রুতিবাক্য তাহা কৈরসের মহাভাগ্য প্রবীণ, হরদত্তমিশ্রের পদমঞ্জরী, শব্দকৌমুদ, বিশেষভট্ট প্রণীত ব্যাকরণসিদ্ধান্ত সুধানিধি গ্রন্থ থেকে বুঝা যায়। নারায়ণভট্টের মতেও এটি শ্রুতিবাক্য। সাহিত্যতর্পণকার বিখ্যাত কবিরাঙ্গ ও ইহাকে শ্রুতিরূপে গ্রহণ কবেছেন।

(৯৯) পূর্বমীমাংসার্পণের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পুর্নিকের [শ্রুতিগানের ১] প্রথম ঐদিকরণে বেদমূলক সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধিত হয়েছে।

এইপ্রসঙ্গে একটা বিষয়ের আলোচনা এখানে করা যাচ্ছে। স্বরাপান অত্যন্ত অনর্থজনক। কোন অবস্থাতে উহার সমর্থন করা যায় না। সূত্ররাং বেদে সৌজামণি যাগে যে স্বরাপানের বিধান আছে, সেই স্বরা যতই অল্প হোক না কেন, কোনরূপেই তাঁর পান সমর্থনের যোগ্য হতে পারে না। এইরূপ একটি আশঙ্কা স্বভাবতই উথিত হয়।

এর উত্তরে বলা যায় যে— যারা বেদাদিশাস্ত্রবিশ্বাসী, তাঁরা মনে করেন শাস্ত্রই ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয়ের একমাত্র কারণ। শাস্ত্র ব্যতীত পাপ ও পুণ্য নির্ণয়ের অল্প উপায় নাই। শাস্ত্রবিশ্বাসী ভর্তৃহরি আচার্যও এই কথা (১০০) বলেছেন। যাঁরা মনে করেন যুক্তির দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের নির্ণয় করা যায়, তাঁদের কথায় ভর্তৃহরি কোনরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। কুমারিল ভট্টও তত্ত্ববর্তিকে [১২ মীমাংসা দর্শন] ধর্ম ও অধর্মের নির্ণয় শাস্ত্রমাত্রপ্রতিপাত্ত ইহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করেছেন। 'ধর্মাদর্শনির্ণয় যুক্তি দ্বারাই প্রতিপাত্ত এই কথা যাঁরা বলেন এইরূপ যুক্তিবাদী সম্প্রদায় যে কেবল অধুনিক যুগেই বর্তমান তা নয়। স্থপ্রাচীন কালেও বেদবিরোধী যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না। এইজন্য আচার্য ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয়ে ব্রহ্মকাণ্ডে এই যুক্তিবাদী বা অনুমানবাদী (১০১) সম্প্রদায়ের যুক্তি সমূহের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন। অনুমানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যেতে পারে না। এ বিষয়ে আচার্য ভর্তৃহরির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে, তাঁর সিদ্ধান্তের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে—

(১০০) “উদং পুণ্যমিহং পাপমিত্যভিঃ পদম্বরে।

আচাৰ্যমস্বযাপাণ সমঃশাস্ত্রপ্রযোজকম্ ॥ [বাক্যপদীর ১৪০]

এই কর্মট পুণ্য, এই কর্মটি পাপ এই দুটি বিষয়ের নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ভুলারূপে শাস্ত্রের অপেক্ষা আছে।

(১০১) ‘যুক্তিষ্ঠঃখাপত্তিরনুমানং বা।’ [ভাষ্যতী ১১১-]।

এখানে উক্ত্য এই যে,—অর্থাৎপত্তিপ্রমাণ মীমাংসক ও অবৈতবাণী বৈদ্যান্তিগণের সম্মত। বৌদ্ধ, জৈন, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, বৌদ্ধ প্রভৃতি দার্শনিকগণ অর্থাৎপত্তি প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। মহাত্মারকার পতঞ্জলি এবং তাঁর অনুগামী ভর্তৃহরি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। সূত্ররাং মীমাংসক ও অবৈতবাণী তির দার্শনিকদের দ্বারা ‘যুক্তি’ শব্দের অর্থ অনুমান। সূত্র শাস্ত্র ও বেদান্ত শাস্ত্রের টীকাবিত্তে অনেকের ‘তর্ককে’ও যুক্তি শব্দের অর্থরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

“হস্তস্পর্শাদিনাহঙ্কেন বিষমে পথি ধাবতা।

অহুমানপ্রধানেন বিনিপাতো ন দুলভঃ ॥” [বাক্যপদীর ১৮২]

কোন অঙ্ক পার্বত্য পথের কিয়দংশ হস্তস্পর্শের দ্বারা সমতল অহুভব করে, অহুমানের দ্বারা পার্বত্য পথের অত্র অংশেরও যদি সমতার নিশ্চয় পূর্বক পর্বতীয় বিষম পথে ধাবিত হয়, তাহলে তার যেমন বিষম দুর্গতি হয়; সেইরূপ শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল অহুমানের সাহায্যে যারা ধর্ম ও অধর্মের মত অতীন্দ্রিয় বস্তুর নির্ণয় করে, তার অহুসরণ করে, তারাও কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধের মত দুঃখভাগী হয় (১০২)।

এই হেতু আমাদের স্বীকার করতে হবে—শাস্ত্রই ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। শাস্ত্র যা কর্তব্য বলে নির্দেশ দেন, তা ধর্ম। সৌজামণি যাগে হোমাবশিষ্ট সুরাপানে শাস্ত্র নিষেধ করেন নাই, কিন্তু অহুজ্ঞা দিয়েছেন। এই হেতু সৌজামণিযাগে সুরাপান অধর্ম নয়, কিন্তু ধর্ম। যেখানে শাস্ত্র অহুজ্ঞা দেন নাই, কিন্তু নিষেধ করেছেন তাহা অধর্ম। সৌজামণিযাগভিন্ন স্থলে শাস্ত্র সুরাপানের নিষেধ করেছেন, অতএব অত্র সুরাপান অধর্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে সৌজামণিযাগের সুরাপান সম্বন্ধে অত্রপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—নারীর সম্বন্ধ, মাংসভক্ষণ এবং সুরাপান—এই সকল বিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক আসক্তি আছে। এই জ্ঞাত এই সকল বিষয়ে মানুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে কোন বিধান থাকতে পারে না। যে সকল বিষয়ে মানুষের জ্ঞাতপ্রকারে প্রবৃত্তি জন্মে না, কেবল সেই সকল বিষয়ে প্রবৃত্তি-উৎপাদনের জ্ঞাত বেদাদি শাস্ত্রের বিধি আছে। ঋতুকালে বিবাহিতা পত্নীর সম্পর্ক, যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহুতির অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ, সৌজামণিযাগে হোমের অবশিষ্ট সুরাপান—ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রে যে বিধি দেখা যায়—তার উদ্দেশ্য নিবৃত্তি। মাংসভক্ষণ, সুরাপান, স্ত্রীসম্পর্কে মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জ্ঞাত শাস্ত্রে অহুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই

(১০২) যথাহঙ্কেন' বিষমে গিরিমার্গে চক্ষুশ্চ নেতোরমন্তরণে স্বরস্মা গিরিপতনং ককিৎসে যানৈকদেহঃ হস্তস্পর্শনাংগম্যঃ সমতিক্রান্তভুংপ্রত্যাদপন্নমপি তথৈব গিরিপতনং বধা পতনং লভতে ভবদাগমচক্ষুঃ। বিনা তর্কানুপাতী কেন কেনাহুমানেন কচিৎবাহিতপ্রত্যাহোঃ দৃষ্টকলেনু করহ আগম-
ংক্রমা প্রবর্তমানো যজ্ঞতা প্রত্যাবারেন সংযুক্তা ইতীর্থঃ। —বাক্যপদীর পুণ্যরাজীকা।

অহঙ্কার উদ্দেশ্য—যারা নারীসম্পর্ক, মাংসভক্ষণ ও স্ত্রীরাপানের প্রতি আকৃষ্ট, তারা উপরে প্রদর্শিত তিনটি স্থল ব্যতীত অন্তর্জ মাংসভক্ষণ, নারীসম্পর্ক বা স্ত্রীরাপান করবে না। এইভাবে অন্তঃস্থল থেকে নিবৃত্ত করে তাদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে—উক্তশাস্ত্রের অভিপ্রায়। কিন্তু বাহার ঐসকল বিষয়ে কোন আকর্ষণ নাই, তাহাকে ঐসকল বিষয়ে প্রবৃত্ত করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। অতএব কেহ যদি সংসার ধর্মে প্রবৃত্ত না হয়ে ত্যাগের পথে যায়, কিংবা যজ্ঞ উপলক্ষে পশুহিংসা না করে, বা সৌজামণি যাগের অমুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞ হোমের অবশিষ্ট স্ত্রীরাপান না করে, তা হলে সে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অপরাধী হয় না (১০৩) ॥ ১২ ॥

মূল

“অবিদ্বাংসঃ”

অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নায়ে। যে ন প্নুতিং বিদ্বঃ।

কামং তেষু তু বিপ্রোহ্ম জীৱিষ্যামহং বদেৎ ॥

অভিবাদে জীৱন্যাত্মমেত্যাধোয়ং ব্যাকরণম্।

“অ‘বদ্বাংসঃ” ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—“অবিদ্বাংসঃ” [এই প্রতীকের (বাক্যের অবয়বের) দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হয়েছে, তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে] যে সকল অবিদ্বান্ [ব্যাকরণে অবিদ্বান্ অর্থাৎ অবৈয়াকরণ] প্রত্যভিবাদনে নামের প্নুতস্বর উচ্চারণ করার পদ্ধতি জানে না। প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করে [সেই সকল ব্যক্তিকে] খ্রীসকলে অভিবাদনের মত “অয়ম্ অহম্” [এই আমি এইরূপ] বলবে। [আমরা] অভিবাদনে নারীর মত [পরিগণিত] না হই, এইজন্ত ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। “অবিদ্বাংসঃ” [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র বাক্য সূচিত হয়েছিল, তাহা প্রদর্শিত হলো] ॥ ২০ ॥

(১০৩) লোকে বাগাধিযজ্ঞসেবা, নিত্যান্তজ্ঞানোন্নিতি তত্র চোদন।।

বাহবিতঃস্তু বিবাহযজ্ঞসেবায়ৈৱোহ্ম নিবৃত্তিঃ।।

[ঐশ্বর্যগবত ১১ ৫/১১]

বিবাহবিষয় এবং বাহার: কার্য: যজ্ঞ প্রথাধিযসেবা, সৌজামণ্যং স্ত্রীরাপান্ গৃহ্যতীতি প্রত্যভিবাদে
সম্পদেধেতি-ধিযস: ক্রিয়তে। আহ বাগাধিযজ্ঞসেবায়ৈৱোহ্ম নিবৃত্তিঃ।। অয়ং ভাষ: নারী
ধিযসবিধিরপি তু দিত্যপ্রাপ্তবাহ অতো নিবৃত্তি: পরিসংখ্যেব। [ঐশ্বর্যমাজিক।]

বিবৃতি :—অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদনের পদ্ধতি ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে । ‘অভিবাদন’ শব্দটি অভিউপসর্গ পূর্বক নিবৃত্ত ‘বদ’ ধাতুর উত্তর ‘ল্যুট্’ [অন] প্রত্যয় করে নিম্পন্ন । এর উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়দ্বারা লভ্য অর্থ হচ্ছে— অমুকুল ভাবে যে উক্তি, সেই উক্তি করবার প্রেরণা । যেখানে কেহ কোন গুরুজনকে অভিবাদন কবে, সেখানে গুরুজন তাকে আশীর্বাদ দেন অথবা তার কুশল প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন (১৪) । অভিবাদন না করলে, ‘সেই’ এইরূপ আশীর্বাদ বা কুশল প্রশ্ন করা হয় না । অতএব আশীর্বাদ প্রদানে অথবা কুশল প্রশ্নে গুরুজনের প্রেরণাই [গুরুজন যাতে আশীর্বাদ বা কুশল প্রশ্ন করেন—তার প্রবর্তনা] অভিবাদের [অভিবাদনের] অভিপ্রায় । অভিবাদন বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু বলেছেন ১০৫—

“অভিবাদাং পরং বিপ্রো জ্যায়াঃসমভিবাদয়ন ।

অসৌ নামাহমস্মীতি স্বং নাম পরিকীর্তয়েৎ ॥

ব্রাহ্মণ গুরুজনকে অভিবাদন করার পরে নিজের নাম কীর্তন করবে । যেমন—“অভিবাদয়ে দেবদত্তোহহম্”—আমি দেবদত্ত [আপনাকে] অভিবাদন করছি । এইরূপ নাম অথবা গোত্র উচ্চারণের দ্বারা অভিবাদন করলে, যাঁকে অভিবাদন করা হয়, সেইরূপ গুরুজনের কর্তব্য এই যে, তিনি অভিবাদনিতাকে আশীর্বাদ করবেন । এইরূপ স্থলে আশীর্বাদদাতার শেষভাগে প্রযুক্ত নাম অথবা গোত্রবাচক শব্দের যে স্বরবর্ণটি সকল স্বরের অপেক্ষা পরবর্তী সেই স্বর বর্ণটিকে উদাস্ত ও প্ৰত উচ্চারণ করতে হয়—

(১০৪) ইহারই নাম প্রত্যাভিবাদ বা প্রত্যাভিবাদন । নাগেন্দ্রভট্ট ৮২।৮৩ শ্লোকের মহাভাষ্য-প্রতীপোদ্ধোতে ইহা বলেছেন—

“অভিবাদনিতরি অমুগ্রহতোক্তকামাশীৰ্ণঃ কুশলাদিপ্রশ্নরূপঃ বা বাচ্যমাত্রঃ প্রত্যাভিবাদঃ ।”

(১০৫) মনুসংহিতা [মাণ্ডলিক সংস্করণ] ২।১০২ ।

এখানে মনুর লোকের যদিও ‘বিপ্রঃ’ এইরূপ আছে এবং তার অর্থ ব্রাহ্মণ, তথাপি এখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেও গ্রহণ করতে হবে । মেধাতিথি, কুব্জক প্রভৃতি বাখ্যাকাররা ইহা বলেছেন ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় অনুচিত হবে না । এই অভিবাদনের প্রকরণে মনুসংহিতার হুপ্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—পরিণত বয়স্ক পুত্রও অভিবাদনের যোগ্য—ইহা মনুর সম্মত বলে মনে হয় । [মনুসংহিতা, মেধাতিথিভাষ্য

“আয়ুমান্ ভব সৌম্যোতি বাচ্যোবিপ্রোহিভিবাদনে ।

অকারশ্চাস্ত্র নাগ্নোহস্তে বাচ্যঃ পূর্বাঙ্করঃ প্লুতঃ ॥”

[মঃসং ২।১২৫] মাণ্ডলিকসংস্করণ ।

যিনি গুরুজন তাঁকে অভিবাদন করলে, তিনি সেই অভিবাদয়িতা স্বাক্ষণকে বলবেন—“আয়ুমান্ ভব সৌম্য”

. [হে প্রিয়দর্শন ! তুমি দীর্ঘায়ু হও] ১০৬) এবং সেই অভিবাদয়িতার নামের অন্তে যে স্বরবর্ণ থাকে, তাহা প্লুত উচ্চারণ করবেন ।

এইরূপ স্থলে উদাস্ত এবং প্লুতস্বর করার জন্ত পাণিনি সূত্রে প্রণয়ন করেছেন ।

মহুর পূর্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি বলেছেন প্লুতস্বর করার বিষয়ে মহুর অপেক্ষা পাণিনির প্রামাণ্য অধিক । শব্দের সাধুত্ব প্রতিপাদনের জন্ত পাণিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন । এই জন্ত এবিষয়ে তাঁর প্রামাণ্য সর্বাপেক্ষা অধিক । সুতরাং পাণিনির সূত্র গ্রহণীয় (১০৭) প্রথমোক্ত ।

(১০৬) এখানে মেধাতিথি বলেছেন—গুরুজন উপরে প্রদর্শিত ‘আয়ুমান্ ভব সৌম্য’ কেবল যে এইরূপই বলবেন, এমন কোন নিয়ম নাই । এইরূপ শুভেচ্ছাধোতক অন্তঃপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করলেও তা অস্মৃতি হইবে না । মহুর উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা বিষয়ে কিছু মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যায় । যাঁরা মনুসংহিতার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের মতামুসারে উপরে ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে । পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র প্রথমে মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকারগণের মতামুসারে ব্যাখ্যা প্রদর্শন করে পরে নিজের মতামুসারে অপর একটি ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন । তিনি বলেছেন ন্যাট্যশাস্ত্রে যেখানে প্রসঙ্গক্রমে অভিবাদনের রীতি প্রদর্শিত হয়েছে,—তাতে নামের পর একটি স্বতন্ত্র অকার যুক্ত করা হয়েছে—ইহা দেখিতে পাওয়া যায় । সুতরাং এরূপক্ষেত্রে নামের স্বরবর্ণের মধ্যে অন্তিম স্বরবর্ণ প্লুত হবে এবং সেই নামের পর একটি স্বতন্ত্র অকারের প্রয়োগ করতে হবে । “আয়ুমান্ ভব সৌম্যেবদন্তঃ অ” এইরূপ প্রত্যভিবাদন বাক্যের আকার হবে । এখানে দেবদত্ত শব্দের পরে ‘ও’ [তিন] অক্ষরটি, অন্তিম স্বরবর্ণপ্লুত হওয়ায়, তার যে তিন মাত্রা হয়েছে—তাহা সৃষ্টি করার জন্ত ব্যবহৃত হয়েছে । হরদত্তআও বলেছেন প্রত্যভিবাদন বাক্যের অন্তর্গত নামের শেষে ‘শর্মন্’ ‘বর্মন্’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা উচিত নয় । ‘শর্মন্’ ব্রাহ্মণতোক্তঃ বর্মন্ ভক্ত্রিঃসো তু । গুপ্তবাস্ত্রকং নাম প্রশস্তং বৈশ্বশ্রুতয়োঃ” ॥ এই শ্লোকের দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিগণ তাঁদের নামের শেষে ‘শর্মন্’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করবেন, ইহা বলা হয়েছে । কিন্তু এই ‘শর্মন্’ প্রভৃতি শব্দ নামের অন্তর্গত ইহা মনে করার কোন কারণ নাই । [পদমঞ্জরী —৮।২।৮০]

(১০৭) প্রত্যভিবাদনসূত্রে [১ : সূ : ৮।২।৮০]

“প্রত্যভিবাদো নাম বক্তৃভিহ্মমানো গুরুতঃ শিষ্যৈঃ প্রযুক্তঃ ; তদুপাস্ত্রবিধয়ে যদ্ বাচ্যং বর্ততে, ততঃ টে প্লুত ইদান্তো ভবতি ।” [কাশিকা] ।

ব্যাকরণাধ্যয়নের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজন

এই অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের প্রসঙ্গে মনু বলেছেনঃ—

“নামধেয়স্য যে কেচিদ্ভিবাদং ন জানতে ।

তান্ প্রাজ্ঞোহমিতি ক্রয়াং ত্রিযঃ সৰ্বাস্তথৈব চ ॥১১ঃ সংঃ ১১ঃ৩]

যে সকল ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন বাক্যের অন্তর্গত নামের [অথবা গোত্রের] প্লুত করতে জানেন না, অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অভিবাদন কালে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করে অভিবাদন করবে না, কেবল “অহম্” এইরূপ বলবে অর্থাৎ “অহম্ভিবাদয়ে” [এই আমি অভিবাদন করছি] এইরূপ বলবে । শ্রীলোক সকলকেও [প্লুত করতে জাম্মন বা না জাম্মন] এইভাবে অভিবাদন করবে ।

মহাভাষ্যকারের কথায় বুঝা যাচ্ছে—যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি প্রত্যভিবাদন বাক্যে প্লুত করার রীতি জানেন না । সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে তাঁকে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করে অভিবাদন করা যায় না । শ্রীলোক সকলকেও ধর্মশাস্ত্রের আদেশ অনুসারে নাম অথবা গোত্র উচ্চারণ করে অভিবাদন করা যায় না । তাহলে দেখা যাচ্ছে যিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি অভিবাদন বিষয়ে নারীর তুল্য [নারীকে যে রূপ অভিবাদন করা হয় ব্যাকরণজ্ঞানহীন সেই পুরুষকে সেইরূপ অভিবাদন করতে হবে] । অভিবাদনে যাহাতে নারীর সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত না হতে হয়, সেইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য । মহাভাষ্যকারের উদ্ধৃত এই “অবিদ্যাংসঃ” ইত্যাদি শ্লোকটি যদিও কোন স্মৃতিগ্রন্থে দেখা যায় নাই, তথাপি এটি যে শাস্ত্রবাক্য, তাতে সন্দেহ নাই । কারণ ভাষ্যকার এর পূর্বে এবং পরে ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন দেখাতে গিয়ে শাস্ত্রবাক্যই উদ্ধৃত করেছেন । সুতরাং মধ্যবর্তী এই বাক্যটি শাস্ত্রবাক্য হলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় । আরও কথা এই যে এই শ্লোকে ‘বদেৎ’ এইরূপে বিধি প্রত্যয়ান্ত শব্দ আছে । সুতরাং একটি এটি শাস্ত্রবাক্যই হওয়া উচিত ॥২০॥

মূল

“বিভক্তিং কুর্বন্তি”

বিভক্তিকাঃ পঠন্তি প্রযাজ্জাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্ণা ইতি । ন

চাস্তুরেৎ ব্যাকরণং প্রযাজ্জাঃ সবিভক্তিকাঃ শব্দাঃ কতুর্ম,

“বিভক্তিং কুর্বন্তি” ॥২১॥’

অমুবাধ—“বিভক্তিং কুব্ধতি” [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সৃষ্টিত হয়েছে, তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, প্রবাজসমূহকে বিভক্তি যুক্ত করবে। ব্যাকরণ ব্যতীত প্রবাজসমূহকে বিভক্তি যুক্ত করতে পারা যায় না। “বিভক্তিং কুব্ধতি” [এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সৃষ্টিত হয়েছিল, তার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হলো] ॥২১॥

বিবৃতি :—ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি। ইহাদের বিবাহ হওয়ার পর অগ্নির আধান কর্তব্য বলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই আধান দুই প্রকার শ্রৌত আধান এবং স্মার্ত আধান। আধান একটি অমুষ্ঠান। এই অমুষ্ঠানের দ্বারা অগ্নির সংস্কার অর্থাৎ সংস্কৃত অগ্নি উৎপাদন করা হয়। বিবাহ সংস্কারের দ্বারা নারীতে ‘ভার্ঘ্য’ উৎপন্ন হয়। এই বিবাহিতা নারী বিবাহকারীর ভার্ঘ্য হয় বলে, তার সন্তান পবিত্র সন্তানরূপে পরিগণিত হয়। এই ভার্ঘ্য ধর্মকর্মে পতির সহকারিণী হয়। সেই জন্তু বিবাহিতা নারীকে তার পতির সহধর্মিণী বলা হয়। যে নারী বিবাহ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয় নাই, তাতে ভার্ঘ্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তার সন্তান শাস্ত্রদৃষ্টিতে পবিত্র বলে পরিগণিত হয় না এবং সে সহধর্মিণীপদে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। এই বিবাহ যেরূপ একটি সংস্কার, সেইরূপ আধানও একটি সংস্কার। বিবাহ সংস্কার দ্বারা যেমন নারীতে ভার্ঘ্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আধান সংস্কারের দ্বারা অগ্নিতে ‘আহবনীয়’ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। শ্রৌত আধানের দ্বারা তিনটি অগ্নির সংস্কার সম্পাদিত হয়। এই তিনটি অগ্নির নাম,—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। এই শ্রৌত আধানের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রভৃতি প্রদান করলেই দর্শপৌর্ণমাস, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি বৈদিক যাগ সিদ্ধ হয়। অসংস্কৃত কোন অগ্নিতে এই সকল যাগ করলে, তাহা অবৈধভাবে সম্পাদিত হওয়ায় সম্পূর্ণ বিফল হয়। শ্রৌত আধান বেদবিহিত।

স্মার্ত আধান বেদবিহিত নয়, উহা গৃহসূত্রের বিধানানুসারে সম্পাদিত হয়। গৃহসূত্র শ্রুতি নয়—স্মৃতি। এই জন্তু এই আধানেক স্মার্ত আধান বলা হয়। এই স্মার্ত আধানের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নির নাম ‘আবসখ্য’ বা ‘গৃহ’। এই আবসখ্য অগ্নিতে গৃহসূত্র বিহিত “পক্ষান্তেষ্টি” প্রভৃতিবাগের অমুষ্ঠান করার বিধান আছে। গৃহসূত্র বিহিত এই সকল যাগও অসংস্কৃত যে কোন অগ্নিতে অমুষ্ঠিত হতে পারে না; আবার বৈদিক যাগও আবসখ্য অগ্নিতে অমুষ্ঠিত হতে পারে না; এইরূপ

গৃহসূত্রবিহিত স্মার্তযাগসমূহ ও “আহবনীয়া” প্রভৃতি শ্রোত অগ্নিতে অহুষ্ঠিত হতে পারে না।

শ্রোত আধানের পর যদি একবৎসরের মধ্যে যজ্ঞমানের গৃহে কোন মহাবিপদ ঘটে কিংবা আধানের পর সেই যজ্ঞমান উদরব্যাধায় আক্রান্ত হয়, তা হলে সেই অবস্থায় প্রথমে যে অগ্নির আধান করা হয়েছিল, সেই অগ্নিকে উদ্বাসন [পরিত্যাগ] করে পুনরায় অত্র অগ্নির আধান করার বিধান আছে (১০৮)। আধান করতে হলে যেমন “পবমানেষ্ট্রি”র [যাগবিশেষের] অহুষ্ঠান করতে হয়, পুনরাধানের সময়ও “পুনরাধেষ্ট্রি”র অহুষ্ঠান করতে হয়। শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মেই অহুষ্ঠেয় পদার্থগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সমগ্র অহুষ্ঠেয় বস্তুগুলির মধ্যে কোনটি অঙ্গ এবং কোনটি প্রযাজ। প্রযাজ নামক যাগগুলি অঙ্গের অন্তর্গত (১০৯)। সমস্ত ইষ্টির প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস, অত্র সকল ইষ্টিই এই দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি (১১০)। যে সকল যাগের জব্য ও দেবতা প্রতিতে বিহিত আছে এবং যে সকল যাগে প্রাণিজ্রব্যের অপেক্ষা নাই, সেই সকল যাগের নাম “ইষ্টি” (১১১)। এই ইষ্টির অঙ্গের মধ্যে প্রযাজযাগও পরিগণিত আছে।

(১০৮) তৈত্তিরীয় সংহিতা—১৫; যদি আধানাদনন্তরং যজ্ঞমান উদরব্যাধায় স্যাদ্ যদি বা সংবৎসরমধ্যে তস্য মহতী বিপৎ স্যাৎ তদা নৈমিত্তিকো পুনরাধেষ্ট্রিঃ বিধায়ঃ [শব্দকোক্ত পম্পশাস্ত্রিক]। ব্যাংকরণসিদ্ধান্তস্থানিধিতেও এইরূপ বলা হয়েছে। বস্তু যজ্ঞমানস্য আধান-কালান্ধারভ্য সংবৎসরসমাপ্তেরবাক্ কস্যাচিৎ পদার্থস্য হানির্ভবতি, মহারোগো বা জার্মতে, অহানি বা অগ্নান্নগত্যাদীনি নিমিত্তানি ভবন্তি, স পুনরাধানং কৰোতি।—

[শ্রোতপদার্থনির্বাচন—ইষ্টিপ্রকরণ-৪২৫

(১০৯) প্রধানযাগাং পূর্বমিচ্ছাতে যৈন্তে প্রযাজাঃ, ইষ্টিবৃ পঞ্চ পশুযাগেদ্ব্যেকাদশ। প্রধান যাগের পূর্ব বাহাদেব দ্বারা যাগ করা হয়, তাহার প্রযাজ। সেই প্রযাজ ইষ্টি যাগে পাঁচটি, পশু-যাগে ১১টি।

(১১০) দর্শপূর্ণমাসাবিধানং প্রকৃতিঃ।—[আপস্তম্বব্রহ্মস্মরণিত্যাম্মু ৩।৩১]

দর্শপূর্ণমাসাবিধানং যেতিকর্তব্যতাংপ্রবচ্ছত্তাবুপবৃক্ততঃ।

[আপস্তম্বব্রহ্মস্মরণিত্যাম্মুত্রেরকপদ্বিধামীরভাষ্য]

(১১১) অত্রজব্যদেবতাকি অপ্রাণিজ্রব্যাকঃ কিম্বা ইষ্টয় ইত্যভিধীয়ন্তে ,

—[আপস্তম্বব্রহ্মস্মরণিত্যাম্মুত্রের হরদত্তাচার্যপ্রণীত ব্যাখ্যা ৩।৩১]

দর্শপূর্ণমাসে পাঁচটি প্রযাজ বিহিত। ‘পুনরাধেয়েষ্টি’ দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। এইজন্ত পুনরাধেয়েষ্টিতেও পাঁচটি প্রযাজের অনুষ্ঠান করতে হয় (১১২) এই পুনরাধেয়েষ্টির প্রযাজবাগের যে পাঁচটি মন্ত্র, সেই বিষয়ে বিধি আছে—

“প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্ধাঃ।”

ইহার অর্থ:—“প্রযাজমন্ত্রগুলিতে বিভক্তি যোগ করে দিবে। এখানে প্রনিধানযোগ্য বিষয় এই যে, কেবল বিভক্তির প্রয়োগ কোন স্থলেই হয় না। অতএব এস্থলেও বিভক্তির প্রয়োগ করতে গেলে, তার অনুযোজে প্রকৃতির প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে। যে কোন প্রকৃতির সহিত বিভক্তির প্রয়োগ করলে তার অর্থের সহিত প্রযাজের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই জন্ত প্রযাজবাগের যে দেবতা, সেই দেবতার বাচক যে শব্দ, সেই শব্দের সঙ্গে বিভক্তির প্রয়োগ করতে হবে—এইরূপ সিদ্ধান্তই এখানে সমীচীন।

প্রযাজ নামক যাগগুলি প্রধান যাগের অঙ্গ—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রধান যাগের পূর্বে এই প্রযাজবাগগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়। অমুযাজ নামক আরও তিনটি যাগ আছে। এই অমুযাজও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি ইষ্টির অঙ্গ। প্রধান যাগের অনুষ্ঠানের পর এই অমুযাজ যাগগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়।

এই প্রযাজ ও অমুযাজের দেবতাবিষয়ে যাক্ষের নিরুক্তের অষ্টম অধ্যায়ে বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, প্রযাজ এবং অমুযাজের দেবতা অগ্নি (১১৩)। তাহলে এখন স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, প্রযাজ মন্ত্রে বিভক্তি প্রয়োগ করতে হলে অগ্নি শব্দের সহিতই সেই বিভক্তির প্রয়োগ করতে হবে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১১৪) বলা হয়েছে, প্রথম আধানের দ্বারা যে অগ্নির আধান করা হয়, সেই অগ্নি যদি অধিক ভাগের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে বজ্রমাসের সন্তান এবং পশুর প্রতি উপদ্রব করে, তাহলে সেই অগ্নিকে ‘উদ্বাসন’ [পারিত্যাগ] করে,

(১১২) কোন বিকৃতি বাগে যদি কোন বিশেষবিধান থাকে, তাহলে পাঁচটির অধিক প্রযাজের অনুষ্ঠান করতে হয়। বিশেষ বিধান না থাকলে পাঁচটি প্রযাজই অনুষ্ঠেয়।

(১১৩) অথ কিং দেবতাঃ প্রযাজানুযাজাঃ? অগ্নেয়। ইতোকে।...হনোদেবতা ইত্যপন্ন।...ঋতুদেবতা ইত্যপন্ন।...পতুদেবতা ইত্যপন্ন।...প্রাণদেবতা ইত্যপন্ন।...আন্ধিদেবতা ইত্যপন্ন।...আগ্নেয়। ইতি তু হাতঃ। ভক্তিমাত্রমিতরং। [নিকৃষ্ট ৮২১-২২]

(১১৪) ভাগয়েঃ বা অগ্নিরাহিত ইচ্ছমানঃ প্রজাং পশুং বজ্রমানস্যোপদোজ্জাবোদ্বাস্য পুনরাধতী, ভাগয়েনৈবৈবনং সমর্জ্যত্যাগো শান্তিরেবাসৌবা। [তৈত্তিরীয়সংহিতা-১১২, ১]

প্রবাস্থানেনবাহিতোহাগ্নিরসাগরণভাগবাহ্মাংধিকোণজবঃ চকার, তচ্ছান্তিরনেন ভবতি। তদ্বাহ্মানেনেষ্য। পূর্বমিহবাস্য পুনরগ্নিমিহাধ্যায়।—সায়নভাষ্য।

পুনরায় আধান করবে। এতে অগ্নিকে অধিক ভাগের দ্বারা সম্বন্ধিত করা হয় অমুঠানই অগ্নির শান্তির উপায়।

অগ্নিকে ‘উবাসন’ [পরিত্যাগ] করতে হলে প্রথমে ‘উবাসনেটি’ নামক ইষ্টির অমুঠান করতে হয়। তারপর ‘পুনরাধেয়েটি’ নামক ইষ্টির অমুঠান করলে পুনরাধান সম্পন্ন হয়। এই ‘পুনরাধেয়েটিতে’ প্রবাজের অমুঠানে বে প্রবাজ মন্ত্র পঠিত হয়, তদ্বিষয়ে তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিশেষ বিধান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যিনি প্রথমে অগ্নির আধান করে, পরে সেই অগ্নিকে পরিত্যাগ করেন, তাঁর গৃহে বাক্ শুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। অন্তর্দ্ব শব্দের সহিত সেই যজমানের গৃহের বাক্ সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। সেই সাক্ষ্যবস্থা প্রাপ্ত বাক্, তার উচ্চারণের ফলে যজমানের পরাভবের কারণ হয়। যজমানের এই পরাভব যাতে না ঘটে, তার জন্য বিভক্তির প্রয়োগ করবে (১১৫)।

এই বিভক্তির প্রয়োগ কিভাবে করতে হবে, সে বিষয়ে আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

পূর্বে যে পাঁচটি প্রবাজের কথা বলা হয়েছে, তাদের নাম এবং মন্ত্র যথাক্রমে প্রদর্শিত হচ্ছে—(১১৬)

নাম	মন্ত্র
১। সমিধ্ [এই নামটি নিত্য বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়]	‘সমিধোহগ্ন আজ্যস্ত ব্যস্ত’। [তৈত্তিরীয় শাখায় ‘ব্যস্ত’ স্থানে ‘বিয়স্ত’ এইরূপ পাঠ করতে হবে।]
২। তনুপাৎ	‘তনুপাদগ্ন আজ্যস্ত বেতু’।
৩। ইড্ [এই নামটিও নিত্যবহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়।]	‘ইডোহগ্ন আজ্যস্ত ব্যস্ত’। [তৈত্তিরীয় শাখায় ‘ব্যস্ত’ স্থলে ‘বিয়স্ত’ পাঠ করতে হয়।]
৪। বর্হিঃ	‘বর্হিঃগ্ন আজ্যস্ত বেতু’।
৫। স্বাহা	‘স্বাহাগ্ন আজ্যস্ত বেতু’।

(১১৫) সং বা এতস্য গৃহে বাক্ স্ত্যক্তে যোহগ্নিমুদাসয়তে, স বাচঃ সংস্পৃষ্টাঃ যজমানঃ স্মরোহগ্নপরাভবিতোবিভক্তয়োঃ। ভবন্তি বাচো বিধৃত্যৈ যজমানস্যাপরাভবায়। [তৈত্তিরীয় সংহিতা—১।৫।২]

(১১৬) সমিধো যজতি, তনুপাতঃ যজতি, ইডো যজতি, বর্হিঃ যজতি, স্বাহা কায়ঃ যজতি।—তৈত্তিরীয়সংহিতা ২।৩।১

এই প্রবাক মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম চারিটি মন্ত্রে বিভক্তির যোগ করতে হয়। শেষের প্রবাকমন্ত্রে বিভক্তির যোগ করতে হয় না (১১৭)। এই সকল প্রবাক মন্ত্রে অগ্নিশব্দের সম্বোধনে একবচন বিভক্তির রূপের প্রয়োগ আছে। প্রথম চারিটি প্রবাক মন্ত্রে সম্বোধনান্ত অগ্নিশব্দের পূর্বে যথাক্রমে সম্বোধন, সপ্তমী, তৃতীয়া এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে অগ্নিশব্দের যে রূপ হয়, তার প্রয়োগ করতে হয় (১.৮)। তা হলে দেখা যাচ্ছে ‘পুনরাধেয়েষ্টি’তি প্রথম চারিটি প্রবাকমন্ত্রের পাঠ এইরূপ হবে (১১৯)।

১। সমিধ্ (যাগে)—“সমিধোহগ্নেহগ্নে আজ্যন্ত বিয়ন্ত” [কৃষ্ণ বজ্রবর্ষেদের তৈত্তিরীয়শাখার পাঠ ‘বিয়ন্ত’ অন্তশাখায় ‘বিয়ন্ত’ স্থলে ‘ব্যন্ত’ পাঠ হবে]

২। তনূনপাং (যাগে)—“তনূনপাদগ্নাবগ্ন আজ্যন্ত বেতু।”

৩। ইড (যাগে)—ইডোহগ্নিনাহগ্ন আজ্যন্ত বিয়ন্ত” [এখানেও তৈত্তিরীয় শাখার পাঠ “বিয়ন্ত” অন্তশাখার পাঠ ‘ব্যন্ত’ হবে]।

৪। বহিঃ (যাগে)—“বহিরগ্নিমগ্ন আজ্যন্ত বেতু।” পূর্বপ্রদর্শিত মন্ত্রের সঙ্গে এই পরবর্তী মন্ত্রগুলিকে লক্ষ্য করলে উহাদের পরস্পরের যে পার্থক্য তা বুঝা যাবে।

সায়ণ মন্ত্রগুলির যথাক্রমে সম্বোধনান্ত অগ্নি শব্দের পূর্বে সম্বুদ্ধি, সপ্তমী, তৃতীয়া ও দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত অগ্নি শব্দের প্রয়োগ করতে হবে বলেছেন। নাগেশভট্ট মহাভাষ্যপ্রবীণোদ্যোতে লিখেছেন—প্রবাকের পাঁচটি মন্ত্রেই সম্বোধনান্ত অগ্নিশব্দের পূর্বে যথাক্রমে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, বীজী ও সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত অগ্নিশব্দের প্রয়োগ করতে হবে (১২০)। কিন্তু আপত্ত্বশ্রোত সূত্রে

(১১৭) নোত্তরে।—আপত্ত্বশ্রোতসূত্র—৪।২৮।৭

(১১৮) “সমিধো অগ্ন আজ্যন্ত বিয়ন্ত, ইত্যাহিষ্ চতুর্ষু প্রবাকমন্ত্রেযু সম্বোধনান্তাঃসমিধোপূর্বঃ সম্বুদ্ধিসপ্তমীতৃতীয়া দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্তানামগ্নিশব্দানাং ত্রয়শ্চ প্রয়োগঃ বিধন্তে।... বিভক্তয়ঃ সূত্রে দর্শিতাঃ—অগ্নেহগ্নেহগ্নাবগ্নেহগ্নিনাহগ্নেহগ্নিমগ্নে ইতি চতুর্ষু প্রবাকেষু চতশ্রেণীভক্তীর্দধাতি। [তৈত্তিরীয়সংহিতা—(২।৪।২) সায়ণভাষ্য] সায়ণের উক্ত সূত্রটি আপত্ত্বশ্রোতসূত্রের পক্ষমন্ত্রের [২।৮।৬] অন্তর্গত।

(১১৯) আপত্ত্বশ্রোতসূত্রের ৫ম প্রস্তাবে এই অগ্নিশব্দের বিভক্তির যোগ করবার অন্ত দুইপ্রকার প্রণালী উল্লিখিত আছে।

(১২০) বিভক্তয়শ্চ প্রথমাদ্বিতীয়া তৃতীয়া বীজীসপ্তমী এবতি শ্রোতসম্প্রদায়ঃ। [মহাভাষ্য-প্রবীণোদ্যোদ্যোত—পশ্চাৎশ্লোক]

দেখা যাচ্ছে—অন্তিমপ্রযোজ্যে বিভক্তির যোগ হয় না। প্রথম চারিটি মত্রেই বিভক্তির যোগ হয়। নাগেশভট্ট যে পাঁচটি বিভক্তির উল্লেখ করেছেন—এ ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত আপভ্রমশ্রোতমত্রে—সম্বোধন, সপ্তমী, তৃতীয়া ও দ্বিতীয়া বিভক্তির কথা বলেছেন। নাগেশভট্ট সম্বোধন, বিভক্তির কথা বলেন নাই! নাগেশভট্টের উক্তিতে শ্রোতমত্রেবিরুদ্ধার্থ প্রকাশ পাচ্ছে।

এখানে প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব হচ্ছে—এই যে “পুনরাধেয়েষ্টি”তে প্রযোজ্য মত্রে বিভক্তি অর্থাৎ বিভক্ত্যন্ত শব্দের প্রয়োগ করতে হয়—যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি তো সেই বিভক্তি [বিভক্ত্যন্ত] যোগ করতে পারবেন না। না পারলে তাঁর পক্ষে ঐ “পুনরাধেয়েষ্টি” কর্ম করা সম্ভব হবে না। এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত। এই প্রযোজ্যে বিভক্তিযোগ করবার বিধি তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে। সেখানে বিধিবাক্যের আকার “বিভক্ত্যন্তো ভবন্তি” এইরূপ বর্ণিত আছে। মহাভাষ্যকার যে বিধি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন তার আকার “প্রযোজ্যঃ সবিভক্তিকাঃ কার্ধাঃ” এইরূপ। মহাভাষ্যকার অত্র কোন শাখা থেকে উক্ত বিধিবাক্য আহরণ করেছেন। এই বাক্য দেখে মনে হয় মহাভাষ্যকারের সময় অত্রকোন বেদশাখা প্রচলিত ছিল, যা এখন প্রচলিত নাই। তা থেকে মহাভাষ্যকার উহা উদ্ধৃত করেছেন ॥ ২১ ॥

মূল

*‘যো বা ইমাম্’

যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোহক্ষরশো বাচং

বিদধাতি স আর্হিজীনো ভবতি।

আর্হিজীনাঃ স্ত্রামেত্যধ্যোয়ং ব্যাকরণম্।

“যো বা ইমাম্।” ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যিনি বাক্ অর্থাৎ শব্দকে, প্রত্যেকপদ, প্রত্যেক স্বর, প্রত্যেক অক্ষর [দ্বারা] জানেন, তিনিই আর্হিজীন [ঋত্বিক্ কর্মের যোগ্য] হন। আমরা আর্হিজীন হতে পারি—এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ২২ ॥

পদার্থবর্ণনাঃ—পদশঃ—‘পদং পদং’ এইরূপ বীপ্সা অর্থে “সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্” [৫।৪।৪৩] সূত্রানুসারে ‘শস্’ প্রত্যয় হয়েছে। অর্থ—প্রত্যেক পদ।

* স্বরশোহক্ষরশব্দ বাচং” এইরূপ পাঠান্তর অনেক পুস্তকে আছে।

“স্বরশঃ” “অক্ষরশঃ”—এই দুই স্থলেও পূর্বের মত শস্ প্রত্যয়ঃ। অর্থ—প্রতিস্বর প্রতিঅক্ষর।

আত্মিজীনঃ = ঋত্বিজ্ শব্দের উত্তর ‘ঋত্বিক্কর্মাহতি’ এই অর্থে ‘যজ্ঞত্বিগ্ভ্যাং তৎকর্মাহতীত্বাপসংখ্যানম্’ [১।৭।১১] এই বার্তিক স্মৃত্তে ‘ঋঞ্’ প্রত্যয় করে ‘ঋত্বিক্’ অর্থে ‘আত্মিজীনঃ’ পদ সিদ্ধ হয়। আর ঋত্বিজমহতি অর্থাৎ ঋত্বিক্ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য যজমান এইরূপ অর্থে—“যজ্ঞত্বিগ্ভ্যাং যথঞৌ” [৫।১।৭।১] এই স্মৃত্তানুসারে ‘ঋঞ্’ প্রত্যয় করে = যজমান অর্থে উহা নিষ্পন্ন হয় ॥ ২২ ॥

বিবৃতি—“যো বা ইমাম্” এখানে ‘বৈ’ এই অব্যয়ের সন্ধি হয়ে ‘বা’ এইরূপ হয়েছে। ‘বৈ’ শব্দের অর্থ অবধারণ [নিশ্চয়]। ‘বৈ’ শব্দটি ‘যঃ’ শব্দের পর পঠিত হলেও উহার অম্বয় “সঃ” এই পরবর্তী শব্দের সঙ্গে হবে। এইজন্য এই ‘বৈ’ শব্দকে ‘সঃ’ শব্দের পর এনে অম্বয় করতে হবে। এইভাবে একস্থানে পঠিত শব্দকে যে অত্থানে নিয়ে অম্বয় করা হয়, সেরূপস্থলে এইরূপ শব্দকে ভিন্নক্রম বলা হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে স্থলে শব্দটি পঠিত হওয়া উচিত ছিল, সেস্থলে পঠিত হয় নাই। সুতরাং উক্ত বাক্যাটিকে অম্বয় করবার সময় এইভাবে পাঠ করতে হবে “গ ইমাং বাচং পদশঃ স্বরশঃ অক্ষরশঃ বিদধাতি সঃ বৈ আত্মিজীনঃ ভবতি।”

‘পদশঃ’—এস্থলে “সংখ্যাকবচনাচ্চ বীপস্যাম্” (১২১) এই স্মৃত্ত অনুসারে একবচনান্ত পদশব্দের উত্তর বীপা অর্থে ‘শস্’ প্রত্যয় হয়েছে। এখানে ‘পদ’ বলতে স্ববিভক্তি যুক্ত বা তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত শব্দকে বুঝতে হবে। ‘স্বর’ শব্দ এবং ‘অক্ষর’ শব্দের উত্তরও এইরূপ ‘শস্’ [তদ্ধিত] প্রত্যয় করে যথাক্রমে ‘স্বরশঃ’ ও ‘অক্ষরশঃ’ এই দুইটি পদ সিদ্ধ হয়েছে। এখানে ‘স্বর’ শব্দের দ্বারা উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং একশ্রুতি স্বর (১২২) বুঝতে হবে। স্বর শব্দের

(১২১) [অষ্টাধ্যায়ী ৫।৪।৪০]—সংখ্যাবাচিনাঃ প্রাতিপদিকেষু একবচনাচ্চ বীপায়াং চোত্যায়াং শস্ প্রত্যয়ে ভবত্যন্তরতাম্।—কাশিকা। সংখ্যাবাচক প্রাতিপদিকের উত্তর এবং একবচনান্ত শব্দের উত্তর বীপা অর্থে বিকল্পে শস্ প্রত্যয় হয়। “পদশঃ” এইস্থলে ‘পদম্, পদশ্’ এইরূপ বিগ্রহে বীপা অর্থে শস্। ‘স্বরশঃ’ এবং ‘অক্ষরশঃ’ এই দুই স্থলেও এইরূপ বুঝতে হবে। তিন-স্থলেই একবচনান্ত শব্দের উত্তর ‘শস্’ প্রত্যয় হয়েছে।

(১২২) স্বর উদাত্তাদিঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ এবং শব্দকৌস্তভ।

দ্বারা এখানে কেবল অকার, ইকার প্রভৃতি বর্ণকে বুঝানো হয় নাই। পরবর্তী অক্ষর শব্দের দ্বারাই অকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ প্রতিপাদিত হয়েছে। কারণ এখানে অক্ষর শব্দের অর্থ ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত স্বরবর্ণ (১২৩)।

পাণিনির পূর্ববর্তী কোন বৈয়াকরণ তাঁর ব্যাকরণে বর্ণমাত্রকে ‘অক্ষর’ নামে অভিহিত করেছিলেন—ইহা মহাভাষ্যকার প্রত্যাহার আক্ষিকের শেষে [১।১।২] বলেছেন। তদনুসারে এখানে, অক্ষর শব্দের দ্বারা সমস্ত বর্ণই গৃহীত হতে পারে (১২৪)। অক্ষর শব্দের দ্বারা সমস্ত বর্ণের গ্রহণ হওয়ায়, শেবোক্ত ব্যাখ্যাটি এখানে ভাল। এই ব্যাখ্যাটি পূর্বব্যাখ্যা থেকে ব্যাপক বলে ইহা আদরণীয় (১২৫)।

এখানে ‘বিদধাতি’ ক্রিয়াপদটি যদিও ‘করোতি’ [করে] এই ক্রিয়াপদের সমানার্থক তথাপি অর্থের সঙ্গতির জন্ত ‘জানাতি’ এই ক্রিয়াপদের অর্থে এখানে ব্যবহৃত। স্তত্রাং ইহার অর্থ ‘জানে’।

“আত্মিজীন” এই শব্দটি ‘ঋজিজ্’ শব্দের উত্তর “যজ্ঞজিগ্‌ভ্যাং ঘথঞো” এই সূত্রের দ্বারা ‘থঞ্’ প্রত্যয় করে সিদ্ধ হয়েছে। এই সূত্রে ‘তদহীতি’ [৫।১।৬৩] সূত্রের অনুবৃত্তি হয়। এই অনুবৃত্তির সহিত পূর্ব প্রদর্শিত সূত্রের অর্থ—তাহার যোগ্য এই অর্থে ‘যজ্ঞ’ ও ‘ঋজিজ্’ শব্দের উত্তর যথাক্রমে ‘ঘ’ ও ‘থঞ্’ প্রত্যয় হয়। ‘ঋজিজমহীতি’ এইরূপ বিগ্রহবাক্যে ঋজিজ্ শব্দের উত্তর থঞ্ প্রত্যয় হয়ে থাকে। এই ‘থঞ্’ প্রত্যয়ের ‘ঞ্’ ইৎসংজ্ঞক হওয়ায় তার লোপ হয়ে ‘থ’ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই ‘থ’ এর স্থানে “আয়নেয়ানীয়িঃ ফটথছঘাং প্রত্যয়াদীনাম্” [৭।১।২] এই সূত্র অনুসারে ‘ঈন’ আদেশ হয়। ‘থঞ্’

(১২৩) অক্ষরং ব্যঞ্জন সহিতোহ্চ,।—মহাভাষ্যাদীপ এবং শব্দকোষভ। শোনকপ্রণীত ঋকপ্রাতিশাখ্যে ব্যঞ্জনসহিত অথবা অনুস্বার সহিত স্বরবর্ণকে অক্ষর বলা হয়েছে, ব্যঞ্জনরহিত ও অনুস্বাররহিত স্বরবর্ণকেও অক্ষর বলা হয়েছে। “সব্যঞ্জনঃ সানুস্বারঃ শুকো বাহপি ঋরোহক্ষরম্” [১৮।২] ব্যঞ্জনেন যুক্তোহনুস্বারেণ সহিতোহথবাহনুস্বারব্যঞ্জনাত্যাং রহিতঃ স্বরঃ” অক্ষরসংজ্ঞকো ভবতি।—উদ্বট কৃত প্রাতিশাখ্য ভাষ্য।

(১২৪) “বর্ণং বাহঃ পূর্বসূত্রে” ইতি ভাষ্যাবর্ণমাত্রমিত্যন্তে।—মহাভাষ্য প্রণীপোদ্ধ্যাত।

(১২৫) বাস্তবের নিকটে ২।২৩, ২।২৪, ১।১৪১] অক্ষরশব্দের বাক্ ও জল, এই দুই অর্থ স্বীকৃত হয়েছে। এখানে এই দুই অর্থের একটি অর্থেরই সঙ্গতি নাই বলে—স্ত্রোত্রেণ একটি অর্থও গৃহীত হবার যোগ্য নয়।

প্রত্যয়টি 'ঐঃ' বলে তদ্ধিতে দৃচামাদেঃ, [৭২।১১৭] (১২৬) এই শূত্রে অমুসায়ে ঋত্বিজ্ শব্দের আদিশ্বর 'ঋ' কারের বৃদ্ধি [আর] হয়ে 'আত্বিজীন' শব্দটি সিদ্ধ হয়।

এই 'আত্বিজীন' শব্দের অর্থ যিনি ঋত্বিজ্ প্রাপ্ত হবার যোগ্য অর্থাৎ যজমান—যোগ্যকর্তা। তাহলে দেখা যাচ্ছে—যিনি পূর্বোক্তপ্রকারে শব্দের জ্ঞান অর্জন করেছেন, যিনি শব্দশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণ, তিনিই যজমান হবার যোগ্য অর্থাৎ যজ্ঞকর্মের অমুষ্ঠাতা হবার যোগ্য।

'আত্বিজীন' শব্দের আরও একটি অর্থ আছে। "যজ্ঞঐগ্ধ্যাং যথঞো" [৫।১।৭] এই শূত্রে একটি বার্তিক আছে—“যজ্ঞঐগ্ধ্যাং তৎকর্মাহতীতুপ-সংখ্যানম্” যজ্ঞকর্ম ও ঋত্বিজ্ কর্মের যোগ্য এই অর্থে—যথাক্রমে যজ্ঞ ও ঋত্বিজ্ শব্দের উত্তর যথাক্রমে 'য' এবং 'থঞ্' প্রত্যয় হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে—যিনি ঋত্বিকের কর্মে যোগ্য তাঁহাকেও 'আত্বিজীন' শব্দে অভিহিত করতে পারা যায়। পূর্বোক্ত বাক্যের 'আত্বিজীন' শব্দের দুটি অর্থ হলো,—যজমান এবং ঋত্বিকের কর্মে যোগ্য অর্থাৎ ঋত্বিজ্। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে—যিনি শব্দশাস্ত্রজ্ঞ—বৈয়াকরণ তিনিই স্বয়ং যাগের অমুষ্ঠাতা যজমান হতে পারেন এবং অন্য কতৃক যাগের অমুষ্ঠানে ঋত্বিজ্ হতে পারেন। মহাভাষ্যে উদ্ধৃত পূর্বোক্ত বাক্যের পর্ধবসিত অর্থ হচ্ছে—যিনি বিদ্বান্—বেদার্থে অভিজ্ঞ তিনিই যাগের অমুষ্ঠান করবেন এবং তিনিই ঋত্বিকের কার্যও করবেন (১২৭)। যার বেদার্থে অভিজ্ঞতা নাট হার যজমান হবার বা ঋত্বিজ্ হবার যোগ্যতাও নাই। বেদার্থে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব যিনি স্বর্গাদি ফলের কামনায় স্বয়ং যাগের অমুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক এবং যিনি অন্তের অমুষ্ঠিত যাগে দক্ষিণাদি লাভেচ্ছায় ঋত্বিজ্ হতে ইচ্ছুক—তাঁদের উভয়ের পক্ষেই ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ২২ ॥

(১২৬) তদ্ধিতে ঐতি নিতি চ প্রত্যয়ে পরতোহঙ্গজাচামাদেয়ঃ স্থানে বৃদ্ধির্ভবতি।—কাশিকা।

(১২৭) 'বিদ্বান্ যজ্ঞেত' 'বিদ্বান্ যজ্ঞেদি'তি যরোরপি বিদ্ববোরবিকারায়। [মহাভাষ্যপ্রদীপ] লক্ণং প্রযুক্তস্যাত্বিজীনশব্দস্যোত্তরপরম্বে বৃদ্ধিমাহ—বিদ্বানিতি—বেদার্থজ্ঞ ইত্যর্থঃ।—মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্ধোত। যজ্ঞেন যজ্ঞেন চ বিদ্বব এবাবিকার ইতি ভাস্যঃ।—শব্দকৌশল।

'ঋত্বিজ্ হতি' ইতি 'ঋত্বিজ্ কর্মাহতি' ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা আত্বিজীনপদং যাজ্ঞযাজ্ঞকোত্তরপরম্।
—ব্যাকরণসিদ্ধান্তহানিবি ১।১।১২।

মূল।

‘চৎচারি’*

চৎচারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অশ্ব পাদা

[ঋকসংহিতা

দে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অশ্ব ।

৪।৫৮।৩, বাঃ

সঃ ১৭।১৯,

ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি

মৈঃ সঃ ১।৬।২

মহো দেবো মর্ত্যো আবিবেশ ॥

কাঃ সঃ ৭০।৭]

‘চৎচারি শৃঙ্গাণি’ চৎচারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনি
পাতাশ্চ । ‘ত্রয়ো অশ্ব পাদাঃ’ ত্রয়ঃ কালো ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানাঃ ।

‘দে শীর্ষে’ ঘো শকাআনো নিত্যঃ কার্যশ্চ । ‘সপ্ত হস্তাসো অশ্ব’
সপ্ত বিভক্তয়ঃ । ‘ত্রিধা বদ্ধঃ’ ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে
শিরসীতি । ‘বৃষভো’ বর্ষণাৎ । ‘রোরবীতি’ শব্দং কৰোতি ।

কুত এতৎ ? রৌতিঃ শব্দকর্মা । মহো দেবো মর্ত্যো আবিবেশে’
তি মহান্ দেবঃ শব্দঃ । ‘মর্ত্যো’ মরণধর্মাণো মনুষ্যাত্মনাবিবেশ ।

মহতা দেবেন নঃ সামাং যথা স্তাদিত্যভ্যায়ং ব্যাকরণম্ ॥২৩॥

অনুবাদ—ইহার [শব্দের—শব্দ ব্রহ্মের] চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি পদ, ইহার
দুইটি মস্তক, সাতটি হাত । [এই] বৃষভ তিন প্রকারে বদ্ধ [হয়ে] রব
করছেন ; মহান্ দেবতা মর্ত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন ।

‘চারিটি শৃঙ্গ’ চার প্রকার পদসমূহ—নাম [হুব্ধবভক্তিয়ুক্তশব্দ (১২৮)]
[তিঃ বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়াপদ (১২৯)] উপসর্গ এবং নিপাত । ‘ইহার তিনটি

* বর্তমান সময়ে—প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভাগ প্রদর্শনের জন্য পুস্তকে ‘প্যারাগ্রাফ’ [para-
graph] ব্যবহার করা হয় । প্রাচীন কালে একপ প্যারাগ্রাফের ব্যবহার ছিল না-। এই জন্য
প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভাগ দেখাণার জন্য মহাত্মাভ্যাকার অনেকস্থলে এইরূপ প্রতীকের দ্বারা সেই সব
প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভাগ করেছেন । এইগ্রন্থে পূর্বে প্রত্যেক স্থলে এইরূপ প্রতীকের অভিপ্রায়
স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তারবারাই পাঠক ‘প্রতীক’ ব্যবহারের উদ্দেশ্য বুঝে নিবেন ।
অতএব প্রত্যেক স্থলে তার আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না ।

(১২৮) নামশব্দেন হুবন্তম্, নমত্যাখ্যাতার্থঃ প্রতি বিশেষণীভবতীতি ব্যাংগন্তেঃ [মহাত্মা-
প্রদীপোদ্যোত] ।

(১২৯) আখ্যাতম্,—তিঙন্তম্,।—মহাত্মাভ্যপ্রদীপোদ্যোত ।

পদ' তিন কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান। 'দুইটি মন্তক' শব্দের দুইটি স্বরূপ—নিত্য [উৎপত্তিবিনাশশূন্য] এবং কার্য [উৎপত্তিশীল]। 'ইহার সাতটি হস্ত'—সাতটি বিভক্তি। 'তিন প্রকারে বন্ধ'—তিন স্থানে বন্ধ—বন্ধঃস্থলে, কণ্ঠদেশে এবং মস্তকে। 'রোরবীতি' শব্দ করছেন। কি কারণে ইহা [হচ্ছে—এই অর্থ পাওয়া যাচ্ছে]? 'রু, ধাতুর অর্থ শব্দ করা [রব করা —বলা]।

'মহান্ দেবতা মর্ত্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, মহান্ দেব—শব্দ, [তিনি—সেই শব্দরূপী দেবতা] মর্তা-মরণশীল [যে] মনুষ্য, তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

মহান্ দেবের সহিত অমোদের যাতে সাম্য হতে পারে, এই [হেতু] ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ২৩ ॥

পদ পরিচয় :—এই উদ্ধৃত ঋক্টিতে তিনটি বৈদিক পদ আছে। — 'শৃঙ্গা' 'হস্তাসঃ' এবং মর্ত্য। (১) শৃঙ্গা—ক্লীবলিঙ্গ, শৃঙ্গ শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের বৈদিক রূপ (১৩০) লৌকিক প্রয়োগে এই স্থলে 'শৃঙ্গাণি' এইরূপ হয়।

(২) হস্তাসঃ—পুংলিঙ্গ হস্ত শব্দের প্রথমার বহুবচনের বৈদিক রূপ (১৩১); লৌকিক প্রয়োগে এই স্থলে 'হস্তাঃ' এইরূপ হয়।

(৩) 'মর্ত্য' আবিবেশ' এস্থলে 'মর্ত্য' এইরূপ বৈদিক সংস্কৃতেই হয়। লৌকিক সংস্কৃতে ইহার স্থলে 'মর্ত্যান্' এই প্রকার প্রয়োগ হয়। 'মর্ত্যান্ + আবিবেশ, এই অবস্থায় "দীর্ঘাদটি সমান পাদে" (১৬২) [৮।৩।২] এই সূত্র

(১৩০) 'শেষহ্‌লসি বহলম্' [৬।১।৭০]। শি ইতোত্যসি বহলং হ্‌লসি বিষয়ে লোপো ভবতি। —কাসিকা। উদাহরণ—'যা ক্বেত্রা' এখানে লৌকিক সংস্কৃতে 'বানি ক্বেত্রানি' এই রূপ হয়।

(১৩১) আজ্জসেরহ্‌ক্ [৭।১।১০০]। অবর্ণান্তাদিনা হ্রস্বরস্য জসে রহগাগমো ভবতি হ্‌লসি বিষয়ে। কাসিকা।

উদাহরণ—'ত্রাক্ষাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ', এখানে লৌকিক সংস্কৃতির নিয়ম অনুসারে 'ত্রাক্ষাসঃ' এইস্থলে 'ত্রাক্ষাঃ' এবং 'সোম্যাসঃ' এই স্থলে 'সোম্যাসঃ' এই প্রকার রূপ প্রাপ্ত হিঁস।

(১৩২) ন ইত্যনুভর্ততে। দীর্ঘাহ্রস্বরস্য পদান্তস্য নকারস্য রুভতি অটি পরতঃ, তৌ চেদ্রিমিত্ত-নৈমিত্তিনৌ সমান পাদে ভবতঃ। ককিতি [৮।৩।৮] প্রকৃত্যাদ্ বক্-পাদ ইহ গৃহ্যতে। কাসিকা।

অনুসারে ‘ন্’ স্থানে ‘ক্’ হয়। ‘ক্’র উকারের ইং সংজ্ঞা ও তার লোপ হওয়ার পর ‘ব্’ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তারপর “আতোহ্টি নিতাম্” [চা৩৩] ১৩৩। এই শূত্র অনুসারে ‘য’ কারের পরবর্তী আকার অনুমানিক হয়। তারপর ‘ভোভগো অঘো অপূর্বশ্চ যোহশি’ (১৩৭) [চা৩১৭] এই শূত্র অনুসারে ‘ক্’র ‘র’ স্থানে ‘য্’ হয়। তারপর ‘লোপঃ শাকল্যশ্চ’ [চা৩১৯] এই শূত্র অনুসারে ‘য’ লোপ হয়ে ‘মর্ত্য্য আবিবেশ’ এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

মহাভাষ্যকার এই শব্দের “মহো দেবঃ” এই অংশটিকে ‘মহান্ দেবঃ’ এই প্রতিশব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

‘মহান্ + দেবঃ’ এই অবস্থায় বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে ‘মহো দেবঃ’ এই প্রকার প্রয়োগ সিদ্ধ করা যেতে পারে। তাতে একটু কষ্ট কল্পনা করতে হয়। এই জ্ঞাত গুরুত্বজ্ঞেয়দের বাজসনেয়ি সংহিতার ভাষ্যকার মহীধর অন্তর্ভাবে এই প্রয়োগের সাধন করেছেন। তিনি বলেছেন ‘মহ’ এই অকারান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তির একবচনে ‘মহঃ’ এইরূপ যে পদ হয়, তার সঙ্গে ‘দেবঃ’ এই শব্দের সহযোগে সন্ধি হলে ‘মহোদেবঃ’ এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। ‘মহঃ’ শব্দটি ‘মহান্’ শব্দের সমানার্থক বলে ‘মহোদেবঃ’ এর অর্থ ‘মহান্ দেবঃ’ হয় (১৩৫) ॥ ২৩ ॥

(১৩৩) অটি পরতো রোঃ পূর্বসাকারস্য স্থানে নিত্যমনুনাসিকাদেশো ভবতি।—কাশিকা।

(১৩৪) ভো ভগো অঘো ইতোবং পূর্বস্য অবর্ণপূর্বস্যাচ রো রেকস্য যকারাদেশোভবতি, অপি পরতঃ।—কাশিকা।

(১৩৫) মহতি=পূজয়তি, মহতে বা জনৈরতি মহো মহান্।—বাজসনেয়িসংহিতার মহীধর-ভাষ্য [১৭৯১]। এখানে ‘মহতি’ ‘পূজয়তি’ এই বিগ্রহে ভূগ্নি মহতাতুর উত্তর কতৃবাচ্যে অচ, প্রত্যয় করে ‘মহ’ শব্দ সিদ্ধ হয়। যদিও ‘নন্দিগ্রহিণ্যচাভিভ্যো লুগিনাচঃ’ [৩১১৩৪] এই শূত্রে পচপ্রভৃতি ধাতুর উত্তর কতৃবাচ্যে ‘অচ,’ প্রত্যয়ের বিধান করা হয়েছে, তথাপি এই শব্দের মহাভাষ্যে একটি বার্তিক পণ্ডিত আছে—“অজ্জবিধিঃ সর্বধাতুভ্যঃ।” এই বার্তিকের দ্বারা সমস্তধাতুর উত্তর ‘অচ,’ প্রত্যয় বিহিত হয়েছে। সুতরাং এখানে ‘মহ’ ধাতুর উত্তর কতৃবাচ্যে ‘অচ,’ প্রত্যয় কর্তে কোন বাধা নাই। যখন ‘মহতি পূজয়তি’ এইরূপ বিগ্রহকরা হয়, সে সময় মহতাতুর ‘পূজা করা’ এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় না। কারণ তখন ধাতুর এরূপ অর্থগ্রহণ করলে ‘মহহ’ শব্দের অর্থের সঙ্গতি থাকে না। এই জ্ঞাত এই হলে ‘মহ’ ধাতুর ‘পূজিত হওয়া’ এইরূপ অর্থগ্রহণ করিতে হবে। তা হলে যিনি পূজিত হন, ‘মহ’ শব্দের দ্বারা তাঁকে বুঝাতে পারে। সুতরাং ‘মহ’ শব্দ এবং ‘মহান্’ শব্দ সমানার্থকরূপে পরিগণিত হইতে পারে। অথবা যিনি মহান্, তিনি সকলকে পূজা করেন, কাহারও অনাধর করেন ন—এইরূপ অর্থও এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে।^১ এতে কোন কষ্ট

বিবৃতি :—এই মন্ত্রে শব্দ ব্রহ্মকে বৃষভরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার—ইহাই প্রতিপাদন করেছেন। বৃষভরূপে বর্ণিত হলেও সাধারণ বৃষ অপেক্ষা শব্দব্রহ্মরূপ বৃষের কোন কোন বিষয়ে বৈলক্ষণ্যও প্রতিপাদিত হয়েছে। সাধারণ বৃষের দুইটি শৃঙ্গ, এই শব্দব্রহ্ম বৃষের শৃঙ্গ চারিটি। ইতর বৃষের পশ্চাভাগে দুইটি পদ, এই বৃষের পশ্চাতে তিনটি পদ। অস্ত্র বৃষের সম্মুখভাগে দুইটি হস্ত, এই বৃষের সম্মুখভাগে সাতটি হস্ত। এখানে একটি দ্রষ্টব্য এই যে—বৃষের হস্ত নাই, পদই আছে। এইজন্য শাণ্ডে যেখানে যেখানে ধর্মকে বৃষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল স্থলে বৃষকে চতুষ্পদরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উদ্ধৃত “চত্বারি শৃঙ্গা” ইত্যাদি মন্ত্রে বৃষের সম্মুখবর্তী পদকে হস্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ বৃষের একটি মস্তক, এই শব্দরূপী বৃষের দুইটি মস্তক। সাধারণ বৃষকে সাধারণতঃ একস্থানে বন্ধন করা হয়, এই বৃষ তিন স্থানে বন্ধ।

সাধারণত কোন বাক্যে যতগুলি শব্দ থাকে—সেইগুলিকে প্রাতিপদিক ও আখ্যাত—এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এস্থলে মহাভাষ্যকারের ব্যবহৃত ‘নাম’ শব্দ ‘প্রাতিপাদিক’ শব্দের সমানার্থক। বিভক্তি দুই প্রকার স্থপ্, বিভক্তি এবং তিঙ্/বিভক্তি ১৩৬)। যে সকল শব্দের উত্তর স্থপ্/বিভক্তির বিধান আছে, তারা ‘নাম’ অথবা ‘প্রাতিপদিক’। যে সকল শব্দের উত্তর তিঙ্/বিভক্তির বিধান আছে তাহাদিগকে ধাতু বলে। এই তিঙ্/বিভক্তি যুক্ত ধাতুঘটিত পদকে আখ্যাত বলে। এখানে মহাভাষ্যকার ‘নাম’ থেকে

কল্পনা করতে হয় না। অম্বর কোবের ভাষ্যজীদীক্ষিতের টীকায় স্বর্গবর্ণের শেষ লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ অচ্, প্রত্যয়ের দ্বারা ‘মহ’ শব্দ সিদ্ধ করা হয়েছে।

‘মহতে জনৈঃ’ এইরূপ বিগ্রহ করলে চূরাধি ‘মহ’ ধাতুর উত্তর ‘যঞ্’ প্রত্যয়ের দ্বারা ‘মহ’ শব্দ সিদ্ধ করা হয়েছে ইহা বুঝতে হবে। এই মহ ধাতু অদন্ত হওয়ায় যঞ্, প্রত্যয় করলে মকারের পরবর্তী অকারের স্থানে বৃদ্ধির প্রাপ্তি না থাকায় সেই অকারস্থানে আকার হবে না। এস্থলে “অকর্তৃরি চ কারকে সংজায়াম্,” [৩৩১২] এই সূত্র অনুসারে কর্ণবাচ্যে যঞ্, প্রত্যয় হয়েছে বুঝতে হবে। যদিও এই সূত্রে পাণিনি ‘সংজায়াম্,’ এই শব্দটির উপস্তাস করেছেন, তথাপি মহাভাষ্যকার সূত্রের ‘সংজায়াম্,’ এই অংশের প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে সংজা না বৃদ্ধালেও ‘যঞ্,’ প্রত্যয় হতে কোন বাধা হয় না।

(১৩৬) বিভক্তিচ [১৪১০৪]।

সপ্ততিষ্ঠো বিভক্তিসংজো ভঃ। সিদ্ধান্তকৌমুদী।

পৃথগ্ভাবে ‘উপসর্গ’ ও ‘নিপাতের’ উল্লেখ করেছেন। নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে যাক্ষ ও এইরূপ নাম থেকে পৃথগ্ভাবে ‘উপসর্গ’ ও ‘নিপাতের’ উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ ‘উপসর্গ’ ও ‘নিপাত’ নামেরই অন্তর্গত, নাম থেকে ভিন্ন জাতীয় শব্দ নয়। রাম, হরি নদী, প্রভৃতি ‘নাম’ থেকে উপসর্গ ও নিপাতের কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। ধাতুর সঙ্গেই উপসর্গের প্রয়োগ হয়। ধাতুর সঙ্গে মিলিত হয়েই উপসর্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। এইরূপ নিপাতের প্রয়োগও অন্তর্গতের সহিত হলেই নিপাত নিজের অর্থকে প্রকাশ করতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে নিপাত কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। রাম, হরি, ঘট, পট ইত্যাদি নামগুলি নিজের অর্থ প্রকাশ করতে অন্তের অপেক্ষা করে না। এই বিশেষত্বকে লক্ষ্য করে ‘নাম’ থেকে ‘উপসর্গ’ ও ‘নিপাতকে’ পৃথগ্ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘উপসর্গ’ যদিও ‘নিপাতের’ই অন্তর্গত, তথাপি অত্র নিপাত থেকে উপসর্গের বিশেষত্ব আছে। উপসর্গের প্রয়োগ ধাতুর সঙ্গেই হয়; নিপাতের প্রয়োগ অত্র শব্দের সঙ্গেও হয়ে থাকে। এইজন্য ‘নিপাত’ থেকে ‘উপসর্গ’ পৃথগ্ভাবে গৃহীত হয়েছে (১৩৭)।

(১৩৭) পদের ত্রৈণী বিভাগ সম্বন্ধে আচাৰ্যগণের মতভেদ দেখা যায়। পাণিনি হুবহু ও তিগুণভেদে পদসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—“স্থপ্.তিঃস্থঃ পদম্” [১।৪।১৪] হুবহু ও তিগুণকে পদসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। রাম, ঘট, পট ইত্যাদি শব্দের মত উপসর্গ ও নিপাতের উত্তরও স্থপ্. বিভক্তি হয় বলে পাণিনি তাদের অবান্তর বিশেষত্বকে উপেক্ষা করে পদসমূহকে দুই ত্রৈণীতেই ভাগ করেছেন। অবশ্য ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাম প্রভৃতি শব্দের উত্তর ‘স্থপ্.’ বিভক্তির সর্বত্র লোপ হয় না, কিন্তু উপসর্গ ও নিপাতের উত্তর বিহিত স্থপ্. বিভক্তিমায়েবই লোপ হয়।

নিরুক্তকার যাক্ষ, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, বৃহদেবতাকার শৌনক ‘উপসর্গ’ এবং নিপাতকে নামের অন্তর্গতরূপে গ্রহণ না করে, পৃথগ্ভাবে গ্রহণ করেছেন। এইজন্য ইহাদের মতে পদ চারপ্রকার।

অপব এক সম্ভাদায় পদসমূহকে পাঁচ ত্রৈণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের মতে—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এবং কংপ্রাচীন্যভেদে পদ পাঁচ প্রকার। যখন প্র, পরা, প্রভৃতি শব্দ, ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বিশেষিত বা পরিণতিত করে, তখন তাহাদিগকে উপসর্গ বলা হয়। আর যখন এই প্র, পরা প্রভৃতি শব্দ এই ভাবে সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু সম্বন্ধের দ্ব্যাতক হয়, সেই অবস্থায় তাদের কন্মুপ্রাচীন্য বলা হয়। [বাক্যপদীয় ২২.০৬]।

ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়ের তৃতীয় কাণ্ডে পদের ত্রৈণীবিভাগ সম্বন্ধে এই মতভেদের উল্লেখ করেছেন—

ব্যাকরণে যে সকল ক্রিয়াপদের সাধন করা হয়েছে, সেই ক্রিয়া পদগুলি বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত—এই তিন কালকে প্রকাশ করে। এই ভাবে শব্দ-শাস্ত্রের সহিত তিনটি কালের সম্বন্ধ আছে। এইহেতু শব্দব্যবহের বর্ণনায় তিন কালকে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাকরণ শাস্ত্র অনুসারে ক্রিয়াপদ না থাকলে কোন বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। ব্যাক্যের পূর্ণতা ক্রিয়াপদের উপর নির্ভর করে। এই ক্রিয়াপদ গুলি তিনটি কালের কোন একটি কালকে প্রকাশ করে থাকে। এইজন্য তিন কালকে শব্দব্যবহের পদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পদের সাহায্যে যেমন সমস্ত শরীরের গমনাগমনাদি ব্যাপার সম্পাদিত হয়, সেইরূপ কালপ্রতিপাদক ক্রিয়া পদের উপরই সমগ্র বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রতিপাদন ব্যাপার নির্ভর করে। তিন কালকে শব্দব্যবহের তিন পদরূপে বর্ণনা করার এই অভিপ্রায়।

‘ফোটা’ নামক যে অখণ্ডশব্দের বিষয়ে পূর্বে বলা হয়েছে, তাহাই শব্দের নিত্য স্বরূপ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে যে প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিভাগ প্রদর্শিত হয়েছে, তাহাই শব্দের কার্যস্বরূপ। যে ধনিকৈ বৈয়াকরণ সম্প্রদায় নিত্য ফোটারে অভিব্যক্তির কারণ স্বীকার কবেছেন তাকেও শব্দের কার্যস্বরূপ বলা যায় (১৩৮)।

বিধা কৈশিচৎ পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চদ্ব্যপি বা।

অপোদ্ধুতৌব বাক্যোভাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবৎ॥

বাক্য অখণ্ড বলে তার কোন অবয়ব নাই। হুতরাঃ এইরূপ পদের শ্রেণীবিভাগ পদেব অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিভাগের মত কার্যনিক।

(১৩৮) শব্দের দুইটি স্বরূপ—একটি ব্যঙ্গ্য এবং অপরটি ব্যঞ্জক। ইহাদের মধ্যে ব্যঙ্গ্য স্বরূপটি নিত্য এবং ব্যঞ্জক স্বরূপটি ক্তার্থ [অনিত্য]। কৈয়টের ব্যাখ্যা থেকে ইহা বুঝা যায়। কোনটি শব্দের ব্যঙ্গ্য স্বরূপ এবং কোনটি ব্যঞ্জক স্বরূপ, সে বিষয়ে কৈয়ট স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। মাধবাচাৰ্য্য সম্বদর্শন সংগ্রহের পানিনিদর্শনে এই মন্তব্য ব্যাখ্যাকালে কৈয়টের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও কোনটি ব্যঙ্গ্যস্বরূপ, কোনটি ব্যঞ্জক স্বরূপ সে বিষয়ে মৌনাবলম্বন করেছেন।

ব্যাকরণ সিদ্ধান্তস্থানিহিতে বলা হয়েছে—

“ব্যঞ্জকব্যঙ্গ্যভেদেন কার্ধনিত্যায়োর্বীখণ্ডফোটিস্বকরোদ্বয়ম্”

এর তাৎপৰ্য্য হচ্ছে—ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্যভেদে শব্দ দুই প্রকার। তার মধ্যে ব্যঞ্জকশব্দ কার্ধ এবং ব্যঙ্গ্যশব্দ নিত্য। বর্ণনাত্মক শব্দ কার্ধ এবং অখণ্ডফোটা নিত্য।

বর্ণনাত্মক শব্দ বলতে প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি বুঝায়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয়াদিবিভাগ-দ্বারা অখণ্ডফোটারই প্রতিপাদন করা হয়েছে। প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি নিত্য অখণ্ড ফোটার

শব্দের এই দুইটি বিভিন্ন স্বরূপকে শব্দবৃষভের মস্তক^১ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শরীরের মধ্যে মস্তকই প্রধান। হস্ত পদ, প্রভৃতির অভাবেও শরীরের কিছু কার্যকারিতা থাকে; মস্তকের অভাবে শরীরের কোন কার্যকারিতা থাকে না; সে অবস্থায় শরীর থাকলেও তার অবস্থা না থাকার মতই হয়। শব্দের এই দুইটি স্বরূপকে যদি পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে শব্দের ও কোন কিছু থাকে না। এইজন্তু নিত্য ও কার্য স্বরূপকে শব্দবৃষভের মস্তকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি সাতটি বিভক্তিকে শব্দবৃষভের হস্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। হস্ত না থাকলে শরীর বিকল হয়, শরীরের কার্যকারিতা অনেক অংশে নষ্ট হয়; এইরূপ সাতটি বিভক্তিকে ত্যাগ করলে বাক্যের অঙ্গ হানি ঘটে, বাক্যের অর্থপ্রকাশের সামর্থ্য অনেক অংশে নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে এই সাতটি বিভক্তিকে শব্দবৃষভের হস্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শব্দবৃষভ তিন স্থানে বদ্ধ; সাধারণ বৃষভকে গোশালায় বা গোষ্ঠে বন্ধন করা হয়। কিন্তু শব্দ বৃষভ হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তকে বদ্ধ। বর্ণের উচ্চারণ স্থান—এই তিনটি; এইজন্তু শব্দবৃষভকে এই তিন স্থানে বদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পানিনীয়শিক্ষায় বর্ণের উচ্চারণস্থান আটটি উল্লিখিত হয়েছে—

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।

জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ ॥

বর্ণের উচ্চারণস্থান আটটি—হৃদয়, কণ্ঠ, শির্ষ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু।

এতে দেখা যাচ্ছে—মহাভাষ্যের সহিত পানিনীয় শিক্ষার বিরোধ হচ্ছে। এই বিরোধের সমাধান করতে গেলে বলতে হয়—মহাভাষ্যে যে কণ্ঠস্থানের কথা

বাঞ্ছক। যাহা ফোন্টের অভিযাজ্ঞক তাকে বর্ণ বলে গ্রহণ করলে ফোন্টের অভিযাজ্ঞক ধ্বনিও কার্য-শব্দরূপে গৃহীত হতে পারে। বাক্যপন্যায় প্রভৃতি গ্রন্থে ধ্বনিকে ফোন্টের অভিযাজ্ঞক বলা হয়েছে। সুতরাং ধ্বনিকে শব্দের কার্যস্বরূপ বললেও কোন দোষ হয় না।

অর্থের অভিযাজ্ঞক অথওশব্দই ‘ফোন্ট’ নামে অভিহিত হয়—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। [১২ পৃষ্ঠার ১৯ নং ও ২০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য]। ফোন্ট শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ফোন্টশব্দের অভিযাজ্ঞক অর্থই প্রতিপাদিত হইবে। ফোন্ট যেমন অর্থের অভিযাজ্ঞক সেইরূপ ধ্বনির ও ব্যক্তি বটে। এই ব্যক্তি অর্থেও ফোন্ট শব্দের ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

“ফন্ট্যুতে বাজ্যতে বর্ণৈরিতি ফোন্টঃ”।

[কোনোপনিষদের শাস্ত্র বা ব্যাক্ত্যর্থের অনান্বয়গিরিটাক ১।৪

বল। হয়েছে, তার দ্বারা কঠের সন্নিহিত মুখের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের ‘কথাই’ সূচিত হয়েছে —(১৩৯)। সুতরাং মহাভাষ্যের সহিত পাণিনিয়শিক্ষার কোন বিরোধ নাই ॥

মহাভাষ্যে উক্ত এই “চত্বারি শৃঙ্গা” ইত্যাদিম্বয়ের তাৎপৰ্য্য অবলম্বন করে ভৰ্জহরি একটি শ্লোক রচনা করেছেন —

অপি প্রযোক্তদুরাত্মানং শব্দমন্তরবাস্তিতম্ ।

প্রাহর্যহাস্তমুশ্ণং যেন সাযুজ্যমশ্নুতে ॥ [বাক্যপদীয় : ১১৩২]

প্রযোক্তা অর্থাৎ উচ্চারণকর্তার আত্মরূপে অন্তরে অবস্থিত শব্দকে মহান্ বুধভরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যে শব্দব্রহ্ম, সাধক, নিজের সাধনায় ইহার সহিত সাযুজ্য লাভ করেন। মাধবাচার্য তাঁর সৰ্বদর্শন সংগ্রহের পাণিনিয়দর্শনে — এই মন্ত্র উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য মহাভাষ্য-কারের ব্যাখ্যা অমুসরণ করেছেন এবং এই মন্ত্রটি যে শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদক, তারও উল্লেখ করেছেন (১৪০)।

নিরুক্ত পরিশিষ্টে [নিরুক্তের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে] এই মন্ত্রটিকে যজ্ঞ প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চার বেদ, যজ্ঞরূপী বুধভের চারিটি শৃঙ্গ। প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিন সবন এবং তৃতীয় সবন এই তিনটি সবন (১৪১) যজ্ঞ-বুধভের তিনপদ। প্রায়শ্চীয ও উদয়নীয় (১৪২) এই দুইটি যজ্ঞবুধভের দুইটি

(১৩৯) ‘কঠ’ ইত্যনন মুখাস্তগতি কঠাঙ্ঘিহানমূলকাতো । [মহাভাষ্য প্রদীপোদ্যোত]

(১৪০) মহাভাষ্যকার এই মন্ত্রের ‘রোরবীতি’ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন — ‘শব্দং করোতি’ । মাধবাচার্য বলেছেন ‘শব্দ’ = যেন প্রপঞ্চে ‘বিবক্যতে’ । এখানে ‘শব্দ’ শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়প্রপঞ্চ । এর তাৎপৰ্য্য হচ্ছে — জগতে দুটি বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় — শব্দ ও অর্থ বা নাম ও রূপ । ইহাদের মধ্যে ঘট, পট বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দ [নাম] গুলি এক অর্থও শব্দের নানারূপে বিকাশ । এই সকল শব্দের [নামের] সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ রূপের [ঘট, পট প্রভৃতি অর্থের] উৎপত্তির কারণও সেই অধিতীয় অর্থও শব্দব্রহ্ম । মাধবাচার্য যেমন এই মন্ত্রটিকে শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন — সেইরূপ ভৰ্জহরির এই মতও তাঁর কারিকায় পাই ।

(১৪১) ‘সবন’ শব্দের অর্থ যজ্ঞ । অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সোমবাগে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন এবং সায়াংকালে ভিন্নভিন্ন পদ্ধতি ক্রমে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তার নাম ‘সবন’ ।

(১৪২) প্রায়শ্চীয এবং উদয়নীয় — এই দুইটি বিভিন্ন দুটি ইষ্টির [বাগবিশেষের] নাম । সোমবাগে এই দুইটি ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয় ।

মন্তক। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দঃ (১৪৩), এই যজুস্বভের সাতটি হস্ত। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং কল্প [যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি], এই তিনটির দ্বারা যজুস্বভ তিন ভাবে বদ্ধ। ঋগ্ মন্ত্র, যজুর্মন্ত্র এবং সামমন্ত্রের দ্বারা এই মহান্ দেব যজ্ঞ মনুস্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। এই শেষোক্ত বাক্যের দ্বারা মনুস্যেরই যে যজ্ঞে অধিকার তাহা স্মৃতিত হয়েছ (১৪৪)।

যদিও নিরুক্ত পরিশিষ্টে যজ্ঞের প্রতিপাদকরূপে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তথাপি এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে এই মন্ত্রের দ্বারা সকল যজ্ঞেরই প্রতিপাদন করা হয়েছে ইহা বলা যায় না। যে সকল পদার্থকে যজুস্বভের অবয়বরূপে কল্পনা করা হয়েছে সে সকল পদার্থ সোমযোগেই বিহিত আছে—ইহা দেখা যায়। সুতরাং নিরুক্ত পরিশিষ্টের এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই মন্ত্রটির তাৎপর্য সোমযোগেই পর্যবসিত হয়েছে।

মীমাংসাদর্শনের শাবর ভাষ্যেও [১।২।৪৬] এই মন্ত্রটি যজ্ঞের প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু নিরুক্ত পরিশিষ্টের ব্যাখ্যা অপেক্ষা শাবর ভাষ্যের ব্যাখ্যায় কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। নিরুক্ত পরিশিষ্টে চার বেদকে চারিশৃঙ্গরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শাবরভাষ্যে হোতা, অধ্বয়ু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই চারজন প্রধান ঋত্বিককে চার শৃঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নিরুক্ত পরিশিষ্টে প্রায়ণীয ও উদয়নীয় নামক ইষ্টিক্রয়কে শীর্ষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শাবরভাষ্যে যজমান এবং যজমানপত্নীকে যজুস্বভের শীর্ষ বলা হয়েছে। নিরুক্তপরিশিষ্টে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্প—এই তিনটি দ্বারা যজুস্বভকে বদ্ধ বলা হয়েছে; শাবরভাষ্যে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদের দ্বারা যজুস্বভকে বদ্ধ বলা হয়েছে। নিরুক্ত পরিশিষ্টে স্বভ শব্দের কোন অর্থ প্রদর্শিত হয় নাই। শাবরভাষ্যে কাম্যফলকে বর্ষণ করে বলে যজ্ঞকে স্বভ বলা হয়েছে। “রোরবীতি” এই অংশের কোন বিশেষ ব্যাখ্যা শাবরস্বামী করেন নাই, কেবল ‘রু’ ধাতুর অর্থ

(১৪৩) বৈদিক ছন্দঃ ৭টি—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টপ, ও জগতী।

(১৪৪) ‘চৎসরি শৃঙ্গেতি বেদা বা এত উক্তাঃ। ত্রয়োহস্য পাদাঃ সযনানি ত্রিণি। বে নীবে’ প্রায়ণীগোষণে। সপ্ত হস্তাসঃ সপ্ত ছন্দাংসি। ত্রিধা বদ্ধত্ৰিধা বদ্ধো মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈঃ। স্বভভো রোরবীতি সযনক্রমেণ প্ৰগুণ্ডিঃ বজ্জুতিঃ সামভির্ধ্বেনয়ুগতিঃ শংসন্তি যজুর্ভির্ধ্বন্তি সামভিঃ স্তবন্তি, অতোদেব ইত্যেব হি মহান দেবো যদ্বজ্জঃ। মর্ত্যু। আবিবেশেতি এব হি, মনুমানা বিশতি যজ্ঞনায়।

[নিরুক্তপরিশিষ্ট ১৩৭।১]

শব্দ করা (১৪৪) এইটুকু বলেছেন। ঋগ্বেদভাষ্যের উপোদ্ঘাতে যেখানে মীমাংসাসূত্রে উদ্ধৃত করে—মন্ত্রের অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য আছে ইহা সমর্থন করা হয়েছে—সেইখানে সাধারণ—এই মন্ত্রটির শব্দস্বামীর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন। শব্দস্বামী “রোরবীতি” এই অংশের কোন বিশেষ ব্যাখ্যা না করলেও সাধারণ ইহার ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ বলেছেন—যজ্ঞে যে স্তোত্র ও শস্ত্রাদির পাঠ করা হয় (১৪৬)। এই যজ্ঞবৃষভ পুনঃপুনঃ স্তোত্র ও শস্ত্রাদি শব্দ করে থাকেন (১৪৭)। এই মন্ত্রটি গুরু যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার ১৭ অধ্যায়ে ২১ সংখ্যক মন্ত্র। ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন—এই মন্ত্রের প্রতিপাশ্চ যজ্ঞপুরুষ। গুরু যজুর্বেদের দুইজন ভাষ্যকার প্রসিদ্ধ—উকট ও মহীধর। এঁরা উভয়েই প্রথমে এই মন্ত্রের প্রতিপাশ্চ যজ্ঞ পুরুষকে ব্যাখ্যা করে শেষে শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদকরূপে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। বিস্তার ভয়ে তাহা এখানে উল্লিখিত হলো না।

মীমাংসাশাস্ত্রে পরমাচার্য কুমারিল ভট্ট তন্ত্রবাতিকে এই মন্ত্রকে সূর্যের প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তন্ত্রবাতিকে প্রথমে শব্দস্বামীর ব্যাখ্যার তাৎপর্য প্রদর্শিত হয়েছে। তারপর ভট্টপাদ নিজের মতে ব্যাখ্যা করেছেন এই মন্ত্রকে। তিনি যা বলেছেন—তার তাৎপর্য এই—গবাময়ন নামক সত্ত্ব (১৪৮)

(১৪৫) চতস্রো হোত্রা শৃঙ্গাবীবাশ্চ। ত্রয়োহস্ত পাশাঃ সর্বনাভিপ্রায়ম্। বে শীর্ষে পশ্চাবজমানো। সপ্ত হস্তাস ইতি ছন্দাসি অভিপ্রোক্তা। ত্রিধা বন্ধ ইতি ত্রিভির্গোদৈঃ বন্ধঃ। বৃষভঃ কাশ্মান বর্গভীতি। রোরবীতি শব্দকর্মা। মহো দেবো মর্ত্যানাবিবেশ ইতি সমুখাধিকারাবিপ্রায়ম্। [মীমাংসা দর্শন শাবরভাষ্য ১১২৪৬]

(১৪৬) প্রগীতমন্ত্রসাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানং স্তোত্রম্। অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানং শস্ত্রম্। মীমাংসাদর্শন কুতুহলবৃত্তি ১১১১০। যে সকল মন্ত্র গানরূপ, তাদের দ্বারা গুণীবস্তুর [দেবতাদির] গুণেব কখনকে স্তোত্র বলে। যে সকল মন্ত্র গান নয়, তাদের দ্বারা গুণীর গুণ কীর্তনের নাম শস্ত্র। অর্থাৎ সাম মন্ত্রের দ্বারা স্তুতির নাম স্তোত্র। ঋগ্‌মন্ত্রের দ্বারা স্তুতির নাম শস্ত্র। ‘স্তোত্র’ শব্দে সাধারণভাবে স্তুতি বুঝালেও যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ে স্তোত্র শব্দ উক্তার্থক।

(১৪৭) রোরবীতি স্তোত্রশাস্ত্রাদিশব্দান্ পুনঃ পুনঃ কুরোতি। [ঋগ্বেদভাষ্যপদ্যাত সাধারণ]

(১৪৮) সোমবাগ বিশেষের নাম ‘সত্ত্ব’। ডোয়াতিষ্টোম প্রভৃতি অস্ত্রান্ত সোমবাগে বোলজন ঋষিকের প্রয়োজন হয়। এই বোলজন ঋষিকের মধ্যে—হোতা, অধ্বর্যু, উল্লাতা ও ব্রহ্মা—এই চারজন ঋষিকই প্রধান। এতব্যতীত মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রহ্লাজ, প্রমোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, আচ্ছাবাক, নেষ্টা, অস্মীধ, আব্রহ্মণ, উল্লাতা, ব্রহ্মণা, প্রতিহর্ষা এবং পোতা নামক বারজন সহকারী ঋষিক সোমবাগে বৃত্ত হয়ে থাকেন।

‘বিষুবৎ’ নামক একাধে (১৪২) এই মন্ত্রটির বিনিয়োগ হয়। এই ‘বিষুবৎ’ নামক একাধের দেবতা সূর্য। এই ‘বিষুবৎ’ নামক একাধে হোতার অমুষ্ঠেয় ‘আজ্য’ নামক স্তোত্রে এই মন্ত্রটির বিনিয়োগ আছে। এই স্তোত্রের দেবতা অগ্নি। যে মন্ত্রের যে কর্ণে বিনিয়োগ হয়, সেইমন্ত্র সেই সেই কর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট দেবতা বা দ্রব্য প্রভৃতির প্রতিপাদন করে। এস্থলে যেটি যাগ তার দেবতা সূর্য অথচ হোতার অমুষ্ঠেয় ‘আজ্য’ নামক স্তোত্রের দেবতা অগ্নি। এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ভট্টপাদ বলেছেন—এই মন্ত্রে বাগের দেবতা সূর্যের সহিত অভিন্নরূপে স্তোত্রের দেবতা অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে। অগ্নি ও আদিত্য উভয়ই তেজঃস্বরূপ হওয়ায় এই মন্ত্রে উভয়ের একা কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে (১৫০)। দিবসের চারিপ্রহর, এই আদিত্যরূপী বৃষভের চারি শৃঙ্গ। শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা—বৎসরের মধ্যে এই তিনটি ঋতু প্রধান। শীত ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ঋতু, গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু এবং বর্ষা ঋতুর মধ্যে শরৎ ঋতুকে অন্তর্ভুক্ত করলে তিন ঋতুতেই বৎসরের পর্যবসান হয়

কিন্তু ‘সত্রে’ এই ষোলজন ঋত্বিক-ব্রাতী ‘গৃহপতি’ নামক আর একজন ঋত্বিকের প্রয়োগন হয়। এইভাবে ‘সত্রে’ ১৭জন ঋত্বিকের আবশ্যকতা আছে। সত্রে আর একটি বিশেষত্ব আছে। জ্যোতিষোমাদি অল্প যাগে যিনি যজমান, তিনিই যজ্ঞের ফলভাগী হন। যারা ঋত্বিক, তাঁরা যজ্ঞে বৃত্ত হয়ে যজ্ঞের সহায়তা করেন এবং যজ্ঞান্তে দক্ষিণা প্রাপ্ত হন। অল্প সোমযাগে যারা ঋত্বিক, হন তাঁদের ‘আহিতাগ্নি’ অর্থাৎ অগ্নিও আশ্রয়ন করতে হবে একপ নিয়ম নাই। সত্রে যারা ঋত্বিক, হন তাঁদের প্রত্যেককে ‘আহিতাগ্নি’ হতে হবে। আর সত্রে যারা ঋত্বিক, হন তাঁরা যজমানও হন। এই সত্রে ঋত্বিক ও যজমানের কোন ভেদ নাই। সত্রে অমুষ্ঠানে সকলে নিজ নিজ অগ্নি মিলিত কবে একত্র নিজেরাই যজমান ও ঋত্বিক—এই উভয়ের কার্যের অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাগ্ন্যত্রক্ষণের সাধারণভাবের উপেক্ষাত, সোমাসাদর্শনের যষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম অধিকরণ এবং দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদের ১৪শ ও ১৫শ অধিকরণে ইহা বিশদভাবে বর্ণিত।

(১৪২) ‘একেনাঙ্ক হতাপরিসমাপ্তিস্তিষ্ঠ একাধাঃ

[আপস্তম্বযজ্ঞ পরিভাষাসূত্রের কপদিশ্রমী ব্যাখ্যা ৪১৩]

‘একেনাঙ্ক হতাপরিসমাপ্তির্ধেবাং তে একাধাঃ—’

[আপস্তম্বযজ্ঞ পরিভাষাসূত্রের হরদত্তকৃতব্যাখ্যা ৪১৩]

যে সকল সোমযাগে ‘হতার’ পরিসমাপ্তি একদিনে হয়, তাদের নাম একাধা সোমলতার রসের দ্বারা সোমযাগে আহুতি দিতে হয়। বস বাহির করবার জন্য বেদবিহিত পদ্ধতি অনুসারে সোমলতাকে কুটে হয়। ইহাঙ্ক ‘হত্যা’ বলে।

(১৫০) সোমাসাকৌস্তভ [১২।৩৮]

(১৫১)। এই তিনটি ঋতু আদিত্যরূপী বৃষভের তিনটি পদ। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুইটি অয়ন এই বৃষভের দুইটি শীর্ষ। আদিত্যের সপ্ত অক্ষ [সাতটি ঘোড়া বা সাতবর্ণের সাতটি কিরণ] এই বৃষভের সপ্ত হস্ত। আদিত্যের উদয়, আকাশের মধ্যভাগে অবস্থান এবং অন্তর্কে উপলক্ষ্য করে সৌম্যাগে তিনটি সর্বনের অস্থাপন করা হয়। এই তিনটি সর্বনে এই আদিত্য-রূপী বৃষভ বদ্ধ। ‘বৃষভ’ শব্দ বর্ণার্থক ‘বৃষ’ ধাতু থেকে নিম্পন্ন (১৫২)। সূর্য থেকে বৃষ্টি হয়। সূর্য বৃষ্টির হেতু। এইজন্য তাঁকে ‘বৃষভ’ রূপে স্তুতি করা হয়েছে। মেঘের দ্বারা এই আদিত্যরূপী বৃষভ শব্দ [গজ’ন] করে থাকেন। ইহার উদয়ে সকল মামুষ উৎসাহ সহকারে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই উৎসাহ সম্পাদন ব্যাপারে ইনি সকল পুরুষের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন (১৫৩)। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের তৃতীয় মন্ত্র। অগ্নি, সূর্য, অপ্ [জল] গো এবং ঘৃত ইহাদের অত্যন্তম (১৫৪)। এই শ্লোকের দেবতা বলে কীর্তিত হয়েছে। যিনি শ্লোকের প্রতিপাত্ত তিনিই শ্লোকের দেবতা। স্তবরাং এই মন্ত্রকে পাঁচ প্রকারে ব্যাখ্যা করা উচিত। সাধারণ তা না করে দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিরুক্তপরিশিষ্টের অনুসরণ করে যজ্ঞরূপী অগ্নির স্তুতিরূপে এই মন্ত্রের প্রথমে ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তন্ত্র-

(১৫১) ঋগ্বেদ সংহিতার ২য় অষ্টক ৩য় অধ্যায়ে ‘ঋতুসামী’ শ্লোকের দ্বিতীয় ঋকে তিনটি ঋতুর কথা বলা হয়েছে। ঋক এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বৎসরে যে তিনটি মাস ঋতু তাহা বলেছেন। [নিরুক্ত ৪১৭]। ঋকসংহিতায় [২।৩।১৬.৩] পাঁচটি ঋতুর কথাও আছে। সেখানে হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে একটি ঋতু বলে গ্রহণ করা হয়েছে।—ইহা সাধারণাচার্য এবং ঋক [৪।২৭ নিরুক্ত] বলেছেন। ঋকসংহিতার হলবিণেবে [২।৩।১৬।১২] ছয় ঋতুর কথাও বলা হয়েছে। মলমাস বা অধিক মাসকে একটি অতিরিক্ত ঋতুরূপে গ্রহণ করে বেদে [ঋকসংহিতা ২।৩।১৬।১৫ এবং অথর্ব-সংহিতা ৯।১৭।২৬] সাতটি ঋতুর কথাও বলা হয়েছে।

(১৫২) ঋষিবৃষভাং কিং [উপাধিসূত্র ৩.১২০] এই সূত্র অনুসারে বৃষ+অভচ্=‘বৃষভ’ শব্দ সিদ্ধ হয়। এই অভচ্, প্রত্যয় কিং হওয়ার এখানে ঋকারের গুণ হয় নাই।

(১৫৩) চত্বারি শ্লোকেতি রূপকধারণে যাগন্ততি: কর্মকালে উৎসাহং করোতি। হোত্রে ত্রয়ং বিবৃষতি হোতুরাঙ্গো বিনিবৃত্তঃ। তন্ত্র চ আগ্নেয়জ্ঞানরূপা দ্বিতীয়া ব্রহ্মবিশ্বব্রহ্মসংস্রবানাদিত্যরূপেণাগ্নিস্তুতি রূপবর্ণ্যতে। তত্র চত্বারি শ্লোকেতি বিবসমানাং গ্রহণম্। ত্রয়েঃ সা পান। ইতি নীতোকবর্ণাধালাঃ। যে শীর্ষে ইত্যয়নান্তিপ্রায়ম্। সপ্ত হস্তা ইত্যনন্তিঃ। ত্রিধা বদ্ধ ইতি সর্বনাতিপ্রায়ণে। বৃষভ ইতি বৃষ্টিহেতুত্বেন স্তুতিঃ। যোরবীতি স্তবসিদ্ধিঃ। সর্বলোকপ্রসিদ্ধেহানু দেবো বর্তমানাবি-
বেশেতি উৎসাহকরণোপকারেণ সর্বপুরুষকল্যানানুপ্রবেশাৎ। [তন্ত্রবর্তিক ১।২।৩৮]

(১৫৪) ‘অগ্নিহর্গাবগৌহতানামন্তনো দেবতা’ [সাময়তন্ত্র ৩।৮।১৩]

বাস্তবিকের অল্পসরণে স্বর্ষের স্তম্ভিকপে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সাধারণ উক্ত দুইটি গ্রন্থের অল্পসরণে ব্যাখ্যা করলেও সম্পূর্ণভাবে তাহাদের অল্পসরণ করেন নাই। কোন কোন অংশ তিনি নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছেন। সাধারণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—বৈয়াকরণ সম্প্রদায় এই মন্তকে শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করেছেন। অল্প কেহ কেহ এই মন্তকে অল্পভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (১৫৫)। সাধারণ এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাতার নাম এবং ব্যাখ্যাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

পণ্ডিতমন্ত কোন কোন ব্যক্তিকে বলতে শোনা গেছে একটা মন্তের বা বেদবাক্যের অনেক অর্থ-করলে কোন অর্থটা ঠিক [ভাষ্য] তা আমরা কিসের বুঝবো। আর কোন অর্থটাই বা আমরা গ্রহণ করবো ইত্যাদি। বেদের একটা অর্থই হওয়া উচিত। একটা বেদ বাক্যের যে অনেক অর্থ করা হয় সেটা পণ্ডিতদের ব্যাখ্যাকৌশল মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে একটি মন্তের বা একটি বেদবাক্যের একপ বিভিন্ন ভাবেব নানা অর্থে তাৎপর্য থাকতে পারে না। এর উত্তরে আমরা সেই সব প্রতীচ্যবিদ্যাভিমাত্রীদের বলবো আধুনিক যুগের অধ্যাত্ম সম্রাট্ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সাধনার দ্বারা বৈদিকযুগ থেকে আবিস্ত করে ব্রাহ্মধর্ম পর্যন্ত সকল ধর্মমতের প্রতিপাত্ত বস্তুসাক্ষাৎকার পূর্বক বলে গেছেন সমস্ত উপায়ের [পথের] দ্বারা সেই এক ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। অতএব দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, শিবাদ্বৈত, শিববিশিষ্টাদ্বৈত, শাক্তাদ্বৈত, কেবলাদ্বৈত, ইত্যাদি যত বাদ আছে সে সকলই সত্য, কোনটি মিথ্যা নয়। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও বলেছেন অনেক আচার্য বেদব্যাখ্যায় বিষম ভ্রমে পতিত হন তাঁরা নিজেদের মতটিকে সকল বেদবাক্যের অর্থরূপে গ্রহণ করেন। এথেকে বুঝা যাচ্ছে সব মতই বেদবাক্য থেকে নিজ নিজ অভিমত অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। বেদ একদেশীর শাস্ত্র নয়, কিন্তু কল্পতরু। অতএব বেদেব একপ্রকার অর্থ করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাষার মতুয়ার বুদ্ধি করা নিবুদ্ধিতার কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। একবস্তু কি করে নানা রূপ হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন ঈশ্বর সাকার, নিরাকার আবার সাকার

(১৫৫) শালিকান্ত শব্দকল্পপরতয়া চ্চারি শৃঙ্খলিত চ্চারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গ নিপাতান্তোক্তাদিনি ব্যাচকতে। অপরেতপরাধা [অর্থসংহিতা সাধারণভাষ্য ৩০৮, ৩০৯]

নিরাকারের পার কত কিছু। এর তাৎপর্য হচ্ছে জাগতিক বস্তুর দৃষ্টান্তে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে বুঝতে যাওয়া বা বুঝানো সম্ভব নয়। যে বস্তু মনবুদ্ধির অতীত তাকে শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারাও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। যিনি যেভাবে কথঞ্চিদ্ব জেনেছেন তিনি তাঁকে দ্বৈত অদ্বৈত ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। এক ঈশ্বর নানারূপ হতে পারেন এবিষয়ে তিনি দৃষ্টান্তও দিয়ে গেছেন বহুরূপীর। এবিষয়ে বহু বিচারের অবকাশ আছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীসমূহও আলোচ্য। সুতরাং এবিষয়ে আর কিছু না বলে মোনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করি। কেবল একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

প্রাচীন বেদ ব্যাখ্যাতা মহর্ষি যাস্ক স্থল বিশেষে এক একটি মন্ত্রের নানা-প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন (১৫৬)। পূর্বাচার্য-গণের এইরূপ একটি মন্ত্রের একাধিক ব্যাখ্যা অনভিমত নয়। সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের দেশের প্রাচীন পরম্পরাগত পদ্ধতি অল্পসারে শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতগণ কখনও অপ্রস্তুত ভাব আনতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

মূল

অপর আহ

“চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি

তানি বিদ্বজ্জ্ঞানীষা যে মনীষিণঃ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেক্সরন্তি

তুরীয়াং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥”

‘চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি।’ চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতো-

(১৫৬) নিক্কটের তৃতীয় অধ্যায়ে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে—

“বত্রা হপর্ণা অমৃতস্য ভাপমনিষেবঃ বিদ্বজ্জ্ঞানীষরন্তি।

ইনো বিদ্বন্ত্য ভুবনস্য গোপাঃ স বা ধীরঃ পাকমজ্জাবিবেশ।”

এই মন্ত্রটির আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ভেদে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এইরূপ নিক্কটের পঞ্চম অধ্যায়ে

“একম্ প্রাতিবা পিবং সাকং সরাংসি জিহেশম্,।

ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণ্ডকা”

এই মন্ত্রের বার্ত্তিক পক্ষে ও নৈকন্ত পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দুটি ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে।

পসর্গনিপাতাশ্চ ॥ ‘তানি বিহু ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।’ মনস ইষিণো মনীষিণঃ। ‘গুহা জীণি নিহিতা নেজয়ন্তি।’ গুহায়াং জীণি নিহিতানি নেজয়ন্তি ন চেষ্টন্তে। ন নিমিষন্ত্যর্থঃ ॥ ‘তুরীয়ং’ বাচোনমুগ্ধা বদন্তি, তুরীয়ং বা এতচ্চাচো যম্মমুখো বর্ততে চতুর্থমিত্যর্থঃ। চত্বারি ॥ ২৪ ॥ [ঋক্সংহিতা ১।১৬৪।৩৫]

অনুবাদ :—অপরে বলেন। শব্দের চার শ্রেণী পরিমিত [বিতক্ত] [শব্দের পরিষ্কৃত চার প্রকার পদ সমূহ]। যাহারা মনকে বশীভূত করেন [এরূপ] ব্রাহ্মণগণ [বৈয়াকরণগণ] সেইসকল [পদকে] কে জানেন। [অজ্ঞানরূপ] গুহায় অবস্থিত তিনটি [তিনপ্রকার] পদ স্পন্দিত হয় না [প্রকাশিত হয় না]। মমুখাসকল [অবৈয়াকরণগণ] শব্দের চতুর্থ [রূপটিকে] বলে। “চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি” [এই অংশের অর্থ] চার প্রকার পদসমূহ—নাম, অধ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত [এবং পরা, পশ্যন্তী, মধ্যম ও বৈথরী]। “তানি বিহু ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ” [এই অংশের অর্থ] = মনের বশীকরণকর্তৃগণ। “গুহা জীণি নিহিতা নেজয়ন্তি” [এই অংশের অর্থ] রূপরূপগুহায় এবং অজ্ঞানরূপগুহায় তিনটি [তিন প্রকার শব্দ] অবস্থিত [হয়ে] ইদন করে না—চেষ্টা করে না প্রকাশিত, হয় না ইহাই তাবার্থ। “তুরীয়ং বাচো মমুগ্ধা বদন্তি” [এই অংশের অর্থ] = শব্দের ইহা তুরীয় [রূপ] ই বাহা মমুগ্ধসমূহে [অজ্ঞমমুগ্ধসমূহে] অবস্থান করে—চতুর্থ [তুরীয় ইহার অর্থ চতুর্থ] ইহাই অর্থ। “চত্বারি” [এই প্রতীকের দ্বারা ঐ শাস্ত্র বাক্য নুচিত হইছিল তার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হল] ॥২৪॥

বিবৃতি :—‘চত্বারি’—এই প্রতীকের দ্বারা পূর্বে যে শাস্ত্র বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেই শাস্ত্র ‘শব্দব্রহ্ম’ অর্থের যেমন প্রতিপাদক সেইরূপ, বজ্র, বজ্রলুক্ক ইত্যাদিরও প্রতিপাদক। সুতরাং সেই পূর্বোক্ত “চত্বারি শৃঙ্গা” ইত্যাদি শাস্ত্র ঐকান্তিকভাবে ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রদর্শন করতে নাও পারে। অথচ এখানে ভাষ্যকার ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রদর্শন করবার জন্যই নানা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। ঐ প্রয়োজন প্রদর্শন করতে যে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে অন্তান্ত অনেক অর্থ প্রদর্শিত হওয়ায় একত প্রসঙ্গ থেকে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়ে গেছে। এইরূপ আশঙ্কা করে মহাভাষ্যকার ‘চত্বারি’ এই প্রতীকের দ্বারা অপর কেহ যে অন্য শাস্ত্র উদ্ধৃত করেন তাহা প্রদর্শন

করবার ক্ষমতা বলছেন ‘অপর আহ’ অপরে বলেন। এই অপর বলতে কে, সঠিকভাবে তাঁর নাম প্রভৃতি জানা যায় না। ভাষ্যকারও তাঁর নামের উল্লেখ করেন নাই। টীকাকারগণও এ বিষয়ে নীরব।

এই মন্ত্রে শব্দকেই বুঝানো হয়েছে। ইহাই অপরের বক্তব্য। ভাষ্যকারও এই অপরের মত মেনে নিয়েছেন, এটা ভাষ্যকারের বচনভঙ্গী থেকে বুঝা যায়। ‘চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি’ এখানকার ‘পদানি’ শব্দের অর্থ ‘শব্দ’ বলাই অভিপ্রেত। সূপ্তিঙস্তং পদম্ [১।১৪] এই সূত্রানুসারে সূব্ভিত্তিসম্বন্ধ ও তিঙ্ভিত্তিসম্বন্ধকে পদবলে গ্রহণ করলে এই মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অর্থের সম্ভাবনা হয় না। তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে বলা হয়েছে তিন প্রকার পদ অজ্ঞান গুহায় অবস্থিত হয়ে প্রকাশিত হয় না, মানুষ চতুর্থ পদকে বলে। এখানকার তিন প্রকার পদ বলতে যদি নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এই তিন প্রকার পদ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই তিন প্রকার পদ অবৈয়াকরণদের নিকট যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ চতুর্থ নামক ‘নিপাত’ও প্রকাশিত হয় না বলে তিনপ্রকার পদ প্রকাশিত হয় না—এই উক্তির সামঞ্জস্য থাকে না। এবং মানুষ চতুর্থ পদ বলে এই চতুর্থ বলতে যদি নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতের অন্ততমকে ধরা হয় তাহলেও অসঙ্গতি হয়। মানুষ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারপ্রকার সব শব্দইতো বলে অর্থ্যাৎ উচ্চারণ করে, এদের মধ্যে কেবল একটিকে উচ্চারণ করে এমন তো নয়। এইজন্য ‘পদানি’ এই শব্দের অর্থ শব্দ বলেই গ্রহণ করতে হবে। শব্দ বললে পরা, পশুস্তী মধ্যমা ও বৈথরী এই চারপ্রকার শব্দকে যেমন বুঝায় সেইরূপ নাম, আখ্যাত প্রভৃতিকেও বুঝাবে। এদের মধ্যে তিনপ্রকার শব্দ অর্থ্যাৎ পরা, পশুস্তী ও মধ্যমা এই তিন প্রকার শব্দ অজ্ঞানের নিকট প্রকাশিত হয় না—। মানুষ বৈথরীরূপ চতুর্থ শব্দই বলে—এই কথাটির সামঞ্জস্য সিদ্ধ হয়। মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোতকার নাগেশভট্ট বলেছেন নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারপ্রকার পদের প্রত্যেকেই চার অংশ বিশিষ্ট (১ঃ৭)। নাম—মধ্যমা—পশুস্তী—পর্য, আখ্যাত—মধ্যমা পশুস্তী—পর্য। উপসর্গ—মধ্যমা—পশুস্তী—পর্য। নিপাত—মধ্যমা—পশুস্তী—পর্য। ‘চত্বারি বাক্ পরিমিতা’ এখানে ‘বাক্’ শব্দটি পৃথক বা অসম্ভব নয়। কিন্তু ‘বাচঃ

(১ঃ৭) একৈকস্য নাম বিরূপস্য চতুর্থঃ ভাগঃ। একৈকস্য চতুরংশভাঃ। [মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্যোত—পপশাস্ত্রিক]

পরিমিতা, এইরূপ ভগ্নীতৎপুরুষ সমাসে—‘বাক্‌পরিমিতা’ শব্দটি নিম্পন্ন হয়েছে (১৫৮)। ‘পরিমিত’ শব্দের উত্তর নপুংসকলিকে প্রথমার বহুবচনে ‘জস্’ বিভক্তি করে বৈদিক প্রয়োগে ‘পরিমিতা’ পদ সিদ্ধ হয়েছে (১৫৯)। তার অর্থ হচ্ছে ‘পরিমিতানি’। তাহালে দেখা যাচ্ছে—“চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি” এই ঋক্‌পাদের [চতুর্থ-ভাগ] অর্থ হচ্ছে—“শব্দের চারটি পরিমিত পদ (সমূহ)।” ‘পরিমিত’ এর অর্থ হচ্ছে পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু শব্দের চারটি পদ পরিচ্ছিন্ন বললে অর্থের অসঙ্গতি হয়। পরিচ্ছিন্ন বলতে সীমাবিশিষ্ট বা সীমিত বুঝায়। শব্দের বৈখরী বা মধ্যমা পরিচ্ছিন্ন হলেও পশ্চাত্তী বা পরা তো পরিচ্ছিন্ন নয়। পশ্চাত্তী বা পরা বাক্‌ অনাদি ও অনন্ত (১৬) বলে অপরিচ্ছিন্ন। অতএব এখানে ‘পরিমিতা’ এর অর্থ হচ্ছে এই পরিমিত অর্থাৎ চারসংখ্যায় পরিমিত। পাঁচ প্রকার শব্দ নাই। সূত্রায় নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতরূপ শব্দের প্রত্যেকেব পরা, পশ্চাত্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারসংখ্যায় পরিমিত বা প্রত্যেকের এই চার চার অংশ আছে ইহাই “চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি” এই বাক্যের অর্থ।

“তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।” এই দ্বিতীয়পাদে ‘তানি’ এই সর্বনামপদটি প্রথম পাদোক্ত ‘পদানি’ কে বুঝাচ্ছে। সেই পদসকল অর্থাৎ শব্দ সকলকে [পদশব্দের ‘শব্দ’ অর্থ ইহা পূর্বেই বলা হয়েছে] ব্রাহ্মণেরা জানেন—যে ব্রাহ্মণেরা মনীষী। কিন্তু সেই শব্দ সকলকে ব্রাহ্মণেরা জানেন—ইহা অসঙ্গত। ক্ষত্রিয়েরা বা বৈশ্যেরাই বা সেই শব্দকে জানবেন না কেন? শব্দজ্ঞানের প্রতি ব্রাহ্মণত্ব জাতি তো প্রয়োজক নয়। এই জন্ত এখানে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদ জানেন যারা তাঁরা। এখানে ‘ব্রহ্মন্’ শব্দটি বেদার্থক ‘ব্রহ্ম [বেদ] বিদস্তি’ এইরূপ বিগ্রহে অণ্‌ প্রত্যয় হয়। “ব্রাহ্মোহজাতৌ” [৬।৪।১৭১] এই হৃজ্ঞানুসারে টি [ব্রহ্মন্ শব্দের অণ্‌] র লোপ না হওয়ায় আদিশ্বরের বৃদ্ধি করে ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এইজন্ত তার অর্থ হল বেদজ্ঞ। বেদজ্ঞ মাত্রই শব্দের সকল স্বরূপ জানতে পারেন না। এইজন্ত বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—“যে মনীষিণঃ”

(১৫৮) বাক্‌পরিমিতানাতি বগ্নীতৎ পুরুষঃ।—মহাভাব্যপ্রদীপোদ্যোত।

(১৫৯) পরিমিত+জস্—শেষদ্বয় বহুবচন, [৬।১.৭০] এই নুৎ—শির লোপ হয়েছে। লৌকিক প্রয়োগে ‘পরিমিতানি’ এইরূপ হয়। বৈদিক প্রয়োগে পরিমিতা।

(১৬০) যদনাদি অবন্তঃ চ পরঃ ব্রহ্ম চিহ্নঃ তদক্ষরং নিবিকারঃ

শব্দরূপঃ। সৈব পশ্চাত্তীসংজ্ঞা পরা বাক্‌ [শিবদৃষ্টি ২।২] ° •

যাঁরা মনীষী। মহাভাষ্যকার “মনীষীর” অর্থ বলেছেন “মনস ঈষিণঃ” মনের নিয়ন্ত্রণকারিগণ। ঈষ উল্লেখ অথবা ঈশ ঐশ্বৰ্যে [অদাদি] ঈষ্ বা ঈশ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ইনি প্রত্যয় করে ঈষিন্ শব্দ সিদ্ধ হয়। ঈশ্ ধাতুর ‘শ্’ স্থানে পূৰ্বোদ্রবাদিত্ব বশত ‘ব্’ হয়। যদিও এই দুটি ধাতুর অর্থের সঙ্গে এখানে নিয়ন্ত্রণকারিত্ব অর্থের সামঞ্জস্য হয় না। তথাপি “ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ” ধাতুর অনেক অর্থ হয় এই নিয়মে এখানে ঈষ ধাতুর বশীভূত করা রূপ অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং “মনীষিণঃ” এই শব্দের অর্থ হলো মনকে যাঁরা বশীভূত করেন তাঁরা। “মনসঃ” এই পদে কর্মে বস্তুবিভক্তি বুঝতে হবে। এখন মনকে বশীভূত করেন কাঁহার? এই প্রশ্নের উত্তরে নাগেশ বলেছেন বৈয়াকরণেরা (১৬১)। যাঁরা ব্যাকরণ জানেন তাঁরা বেদের অর্থ বুঝতে পারেন। তাঁরা বেদের অর্থ জানেন বলে বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে শুদ্ধচিত্ত হন। শুদ্ধচিত্ত হয়ে সেই বেদে চিত্ত [মন] জয়ের যে সকল উপায় বিহিত হয়েছে সেই উপায় অবলম্বন করে মনকে বশীভূত করেন। কিন্তু যাঁরা ব্যাকরণ জানে না। তারা বেদাদিশাস্ত্রের অর্থ জানতে পারে না। অর্থ না জানার ফলে মনকে বশীভূত করবার কৌশলও তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে ‘মনীষী’ হচ্ছেন বৈয়াকরণ। মনীষী বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্যক্তিই শব্দের সেই সকল রূপ জানেন—ইহাই “তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা, যে মনীষিণঃ।” এই দ্বিতীয় পাদের অর্থ।

“গুহা ত্রীণি নিহিতা নৈজয়ন্তি,” এই তৃতীয় পাদের অর্থ প্রকাশ করবার জন্য ভাষ্যকার বলেছেন “গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নৈজয়ন্তি, ন চেষ্টন্তে—ন নিষি-বস্তীত্যর্থঃ।”

ঋতিবাক্যে পাঠিত ‘গুহা’ এই শব্দটি সপ্তমীবিভক্তিসম্বন্ধে গুহা শব্দের বৈদিক রূপ। ‘গুহা’ শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি [ড়ি] করে ‘স্বপাং স্বলুক্’ স্বত্রানুসারে সেই সপ্তমী বিভক্তির লোপ করে ‘গুহা’ এই বৈদিক রূপ সিদ্ধ হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতে এর আকার হয় ‘গুহায়াম্’। এই জন্য ভাষ্যকার ব্যাখ্যাতে ‘গুহায়াম্’ বলেছেন। এই গুহা শব্দের অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কৈয়ট

(১৬১) চিত্তলঙ্ঘিকরণে বশীকর্তারো বিবয়াদ্বয়তো ব্যাবৃত্তা হিংসকা বা, তে চ বৈয়াকরণাঃ ।

বলেছেন “অজ্ঞানমেব গুহা” এখানে অজ্ঞানই হচ্ছে গুহা। নাগেশ বলেছেন—
 ‘অজ্ঞান এবং হৃদয়াদি। (১৬২) ‘হৃদয়াদি—’ এখানকার ‘আদি’ শব্দে নাভি, ও
 মূলধার বুঝতে হবে। শারদাতিলকের টীকায় এবং অন্ত্র আছে পরাবাক্
 মূলধারে অবস্থিত, পশ্চাতী নাভিচক্রে স্থিত আর মধ্যমা হৃদয়ে স্থিত। হৃতরাং
 হৃদয়, নাভি ও মূলধারে অজ্ঞানে আবৃত হয়ে মধ্যমা, পশ্চাতী ও পরা নামক
 তিনটি রূপ [শব্দের তিনটি রূপ] ‘নেজয়ন্তি—’ স্পন্দিত হয় না—চেঁটা করে না
 অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। উক্ত মন্ত্রের তৃতীয় পাদে অস্তর্গত যে ‘নিহিতা’ শব্দটি
 আছে, সেটি ‘নিহিত’ শব্দের নপুংসকলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনের রূপ। ‘নিহিত’
 শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচনে ‘জস্’ করে জস্‌শসোঃশিঃ [৭।১।২০] সূত্রে নপুংসক-
 লিঙ্গে ‘জসের’ স্থানে ‘শি’ করে ‘শেচ্ছন্দসি বহুলম্’ [১।১।৭০] সূত্রানুসারে ‘শি’র
 লোপ করে ‘নিহিতা’ এই রূপটি বৈদিক প্রয়োগে সিদ্ধ হয়েছে—। লৌকিক
 সংস্কৃতে তার রূপ হয় নিহিতানি’ অর্থাৎ অবস্থিত [হৃদয়াদি গুহাতে উক্ত তিন
 প্রকার শব্দ অবস্থিত]। ‘নেজয়ন্তি’ শব্দের অর্থ কবেছেন ভাষ্যকার ‘ন
 চেঁষ্টে’ চেঁটা করে না। শব্দের চেঁটাই সম্ভব নয়, অতএব চেঁটা না করা অর্থও
 অসঙ্গত হয়। এই জ্ঞান ভাষ্যকার বললেন “ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ” অর্থাৎ প্রকাশিত
 হয় না। উক্ত তিন প্রকার শব্দ হৃদয়াদিতে অজ্ঞানাবৃতরূপে অবস্থিত হয়ে
 প্রকাশিত হয় না—এই অর্থই “গুহা ত্রীণি নিহিতা নেজয়ন্তি।” এই তৃতীয়
 পাদ থেকে পাওয়া গেল। কিন্তু এই মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে বলা হয়েছে মনীষী
 ব্রাহ্মণেরা শব্দের চারিটি রূপ [স্বরূপ] জানেন। আর তৃতীয় পাদে বলা হলো
 শব্দের তিনটি স্বরূপ হৃদয়াদি গুহাতে অবস্থিত থেকেও প্রকাশিত হয় না।
 সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে অর্থের পরস্পর বিরোধের প্রসঙ্গ হলো। এই
 বিরোধের পরিহারের জন্য কৈষট বলেছেন “ব্যাকরণপ্রদীপেন তু তানি
 প্রকাশন্তে” ব্যাকরণরূপ প্রদীপের দ্বারা সেই তিনপ্রকার শব্দ প্রকাশিত হয়। এই
 কথা দ্বারা বুঝা গেল তৃতীয় পাদে যে বলা হয়েছে—শব্দের তিনটি রূপ গুহাতে
 অবস্থিত হয়েও প্রকাশিত হয় না। সেটা অবৈয়াকরণের নিকট। তৃতীয় পাদে
 ‘অবৈয়াকরণদেব বা অজ্ঞানদেব’ এইরূপ উল্লেখ না থাকলে ও অর্থাৎ সেটা বুঝিয়ে
 বাচ্ছে। অতএব তৃতীয় পাদে ‘অজ্ঞানাম্ বা অবৈয়াকরণানাম্’ এইরূপ পদে
 অধ্যাহার করতে হবে—। তাতে তৃতীয় পাদে সম্পূর্ণ অর্থ এইরূপ হবে—

“অজ্ঞগণের [অবৈয়াকরণগণের] হ্রস্বাদিগুহাতে অজ্ঞানাবৃত্ত তিনপ্রকার শব্দ প্রকাশিত হয় না।” এইরূপ অর্থগ্রহণ করলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অর্থের বিরোধ হয় না। এইজন্য নাগেশ তৃতীয় পাদের অর্থব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—বৈয়াকরণেরা শাস্ত্রজ্ঞানবলে এবং শাস্ত্রজ্ঞানজনিত যোগাভ্যাসবলে অজ্ঞানাক্রমকার বিদীর্ণ করে শব্দের সমস্ত স্বরূপ জানতে পারেন (১৬৩)। “তুরীয়া বাচো মনুষ্যা বদন্তি।” এই চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেছেন ‘তুরীয়া বা এতদ্বাচো মনুষ্মন্তেষু বর্ততে চতুর্থ মিত্যর্থঃ।’ শব্দের এই চতুর্থ রূপ যাহা মনুষ্যসকলে অবস্থান করে। চতুর্থ স্বরূপ হচ্ছে ‘বৈথরী’ যাহা আমরা উচ্চারণ করি বা ম্পষ্টভাবে শুনি। সেই বৈথরীরূপ শব্দের আশ্রয় হচ্ছে আকাশ। মহাভাষ্যকার “তস্ম ভাবস্বতলৌ [৫।১।১১২] স্মৃত্তে বৈথরী শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন। সুতরাং এই বৈথরী শব্দ মনুষ্যে থাকবে কি করে অর্থাৎ মানুষ তার আশ্রয় হবে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে নাগেশ বলেছেন “জ্ঞানবিষয়তয়া তদাচম্ভতুর্থমিত্যর্থঃ” [পম্পশাহিক মহাভাষ্য প্রদীপোদ্যাত]। জ্ঞানের বিষয়রূপে মানুষেতে অবস্থান করে যে শব্দ তাহা শব্দের চতুর্থ স্বরূপ এইরূপ অর্থ বুঝতে হবে। বৈথরী শব্দ সকল মানুষের জ্ঞানবিষয় হয় অর্থাৎ কি বৈয়াকরণ কি অবৈয়াকরণ সকলেরই জ্ঞানের বিষয়রূপে বৈথরীরূপ চতুর্থ শব্দ যাহা বিद्यমান [আকাশে] তাহা মনুষ্যসকল বলে—উচ্চারণ করে—বৈথরী শব্দবিষয়ক জ্ঞানবান্ মানুষ—ইহাই চতুর্থ পাদের অর্থ। নাম, আখ্যাত, উপসর্গ নিপাতের চতুর্থ অংশ বা রূপ বৈথরী শব্দ অবৈয়াকরণ ও উচ্চারণ করে। কৈয়টে বলা হয়েছে—অবৈয়াকরণ চতুর্থ শব্দ বলে। এখানে ‘অবৈয়াকরণ’ ইহা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ চতুর্থ বৈথরী শব্দ সকলেই [সকল মনুষ্য] বর্ধন বলেন তখন ‘অবৈয়াকরণ’ বলে কার ব্যাবৃতি করা হবে। সুতরাং চতুর্থ শব্দটি মানুষ উচ্চারণ করে অপর তিনটি উচ্চারণ করতে পারে না। বৈয়াকরণ সকল শব্দ জানতে পারেন, অবৈয়াকরণ তিনপ্রকার শব্দ জানে না। চতুর্থ শব্দকে কানের দ্বারা শুনে শুনে বলতে পারে কিন্তু চতুর্থশব্দকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকায় প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগেব জ্ঞান না থাকায় প্রকৃত পক্ষে জানতে পারে না। অবৈয়াকরণ এই বৈথরী

(১৬৩) বৈয়াকরণশাস্ত্র শাস্ত্রবলেন তললললললললল চ জ্ঞানাক্রমকারঃ বিদীর্ণ সর্বজ্ঞানাতীতি ভাবঃঃ
—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যাত পম্পশাহিক।

শব্দকে বললেও শুদ্ধভাবে বলতে পারে না—ইহাও এখানে না বলা থাকলেও বুঝে নিতে হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকলে সকল শব্দকে জানা যায় না, ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান থাকলে সকল শব্দ জানতে পারা যায়। অতএব সকলশব্দের জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন কর্তব্য। ইহাই—এই মন্ত্রের তাৎপর্য। ‘চত্বারি’ এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র সূচিত হয়েছিল সেই শাস্ত্রপ্রসঙ্গ সমাপ্ত হলো। [পূর্বমন্ত্রে সমাপ্ত হয় নাই কারণ এই শাস্ত্রও ‘চত্বারি’ দ্বারা বুঝা যায়] ॥২৪॥

মূল

উতত্বঃ

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচ

মৃত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যোমাম্।

উতো দ্বৈশ্ব তৎ বিসশ্রে

জান্নেব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ [ঋঃ সং-১০.৭১।৪]

‘উতত্বঃ’ অপি ধ্বজকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যন্তি বাচম্, অপি ধ্বজকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যোমামিত্যবিদ্বাংসমাহার্ষম্। ‘উতো দ্বৈশ্ব তৎ বিসশ্রে’ তত্ত্বং বিবৃণুতে। ‘জান্নেব পত্য উশতী সুবাসাঃ।’ তদ্ব যথা জান্না পত্যে কামন্নমানা স্বম্ স্বাঙ্গানং বিবৃণুতে, এবং বাগ্ বাগ্ বিদে স্বাঙ্গানং বিবৃণুতে। বাঙ্ নো বিবৃণুধাদাঙ্গানমিত্যধোয়ং ব্যাকরণম্ ॥ উতত্বঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ :- ‘উতত্বঃ’ [এই প্রতীকের দ্বারা সূচিত শাস্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে]। অপরে শব্দকে দেখেও দেখে না। আবার অতো ইহাকে [শব্দকে] শুনেও শোনে না। [পতির] কামনা করে উত্তম বস্ত্র পরিহিতা জ্ঞায়া [পত্নী] যেমন পতিকে [পতির নিকট] প্রকটিত [নিজেকে] করে, সেইরূপ [বাক্-শব্দ] কিন্তু অন্তের [বৈয়াকরণের] নিকট শরীর [নিজ স্বরূপ] প্রকাশিত করে। ‘উতত্বঃ’ [উতত্ব, ইত্যাদি প্রথম পাদের অর্থ প্রদর্শিত হচ্ছে] অপরে, কেহ কেহ [বৈয়াকরণ ভিন্ন] শব্দকে দেখেও দেখে না [অর্থজ্ঞানের অভাব বশত প্রকৃত পক্ষে জানে না]। অপর কেহ ইহাকে [বাক্কে] শুনেও শোনে না [অর্থ-

জানাভাবে শোনে না]। [মন্ত্বেয়] (এই) অর্ধভাগ অজ্ঞকে [অজ্ঞের লক্ষণ] বলছে। ‘উত স্বস্মৈ তৎ’ বিসম্ভে’ [এই তৃতীয় পাদের অর্থ বলা হচ্ছে] শরীরকে [স্বরূপকে] বিবৃত করে [প্রকটিত করে], ‘জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ’ [চতুর্থপাদেয় অর্থ বলা হচ্ছে], যেমন [পতির] কামনা করে উত্তমবস্ত্র পরিহিতা পত্নী পতির নিকট নিজের আত্মাকে [স্বরূপকে] বিবৃত করে, এইরূপ বাক্ [শব্দ] বাগ্বিদের [বৈয়াকরণের] নিকট নিজের আত্মাকে [স্বরূপকে] বিবৃত [প্রকটিত] করে। বাক্ আমাদের নিকট নিজেকে প্রকটিত করুক—এই হেতু ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। ‘উততঃ’ [প্রতীকের দ্বারা যে প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছিল তাহা সমাপ্ত হলো] ॥ ২৫ ॥

বিবৃতি:—মহাভাষ্যকার এই মন্তব্যটি ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৭১ তম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকরূপে উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত মন্ত্বেয়-প্রথম পাদে, যে ‘উত’ শব্দটি আছে, সেটি একটি নিপাত। ‘অপি’ শব্দের বা অর্থ, এখানে ‘উত’ শব্দেরও সেই অর্থ। অর্থাৎ অপি = ও। এই ‘উত’ শব্দটির ক্রম ভিন্ন অর্থাৎ এই ‘উত’ শব্দকে ‘পশুন’ এই শব্দের পর বসাতে হবে। তাহলে এইরূপ ক্রম হবে—ত্বঃ বাচ্ম পশুন উত ন দদর্শ।’

‘ত্ব’ শব্দটির অর্থ অন্ত বা অপর। এখানে বৈয়াকরণ থেকে অন্ত। এই প্রথম পাদেয় অর্থ হবে—যে, শব্দের অর্থ জানে না—এইরূপ অন্ত ব্যক্তি [অবৈয়াকরণ] শব্দকে দেখেও—অর্থাৎ গুরুর নিকট থেকে বেদাদিশ্রবণ করে প্রত্যহ উত্তম রূপে তার মেভাশ করেও অর্থ না জানার ফলে দেখে না। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করায় বেদাদির অর্থ জানতে পারে না। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তি বেদ [বেদাদি শাস্ত্র] অভ্যাস করেও প্রকৃত পক্ষে শব্দকে জানে না। বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের ফল হচ্ছে অর্থজ্ঞান। অর্থজ্ঞান না করে যে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করে, তার সেই অধ্যয়ন শুকপাখীর বুলি পড়ার মত ব্যর্থ।

‘উত ত্বঃ শৃণু শৃণোত্যোনাম্’ এই দ্বিতীয় পাদেও সেই পূর্বকথিত ‘ত্বঃ’ শব্দটি ‘অন্ত’ অর্থে প্রযুক্ত। ততরাং দ্বিতীয় পাদেয় অর্থও পূর্বের মত—অর্থাৎ বৈয়াকরণ ভিন্ন অন্ত ব্যক্তি এই শব্দকে গুরুর নিকট থেকে বা অন্তের নিকট থেকে শুনেও অর্থজ্ঞান না থাকায় প্রকৃত পক্ষে শোনে না। অর্থজ্ঞানহীনভাবে শব্দ শোনা ঢাক ঢোল প্রভৃতির শব্দের [ধ্বনির] শোনার মত ব্যর্থপ্রায়।

যন্ত্রের এই প্রথম পাদ বা অর্ধভাগে অর্থজ্ঞানশূন্য বা অবৈয়াকরণের নিন্দা করা হয়েছে।

‘উতো’ অংশে তৎৎৎ বিসম্ভে’ এই তৃতীয় পাদে যে ‘উতো’ এইরূপ শব্দটি দেখা যাচ্ছে সেটি উত+উ এই দুটি শব্দের সন্ধি করে ঐ নিম্নস্বরূপ বৃদ্ধিতে হবে। দুটি নিপাত মিলে ঐরূপ ‘উতো’ হয়েছে। এই দুটি নিপাতের সমুদিত অর্থ হচ্ছে—‘কিন্তু’।

‘অংশে’ এই পদটি অত্যাধিক সর্বনাম ‘অ’ শব্দের চতুর্থীর একবচনের রূপ। অত্বে অর্থাৎ বৈয়াকরণকে = বৈয়াকরণের উদ্দেশ্যে। ক্রিয়া যমভিপ্রীতি [বাঃ সূঃ ১০৮৫] সূত্র অনুসারে এখানে অত্বে অভিপ্রায় করে—উদ্দেশ্য করে—এই অর্থে চতুর্থী হয়েছে।

‘তৎৎৎ’ এই পদটি বৈদিক রূপ। ‘তন্’ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনে ‘অম্’ করে “বাচন্দসি” [৩।৪।৮৮] সূত্রের অনুবৃত্তি বশত ‘অমি পূর্বঃ’ [৬।১।১০৭] সূত্রে ‘অম্’ এর অকারের পূর্বরূপ না হওয়ায় উকারের ‘যণ্’ আদেশ করায় ‘তৎৎৎ’ এই রূপসিদ্ধ হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতে এর রূপ হয় ‘তনন্ম’। এর অর্থ হচ্ছে ‘শরীরকে’ অর্থাৎ স্বরূপকে।

“বিসম্ভে” এই শব্দটি ‘বি’ উপসর্গ পূর্বক স্ ধাতুর উত্তর বৈদিক নিয়মে বর্তমান কাল অর্থে লিট্ ‘ত’ হয়ে (১৬৪) সিদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে—বিসৃত করে = প্রকটিত করে। বিবৃতকরে—এই ক্রিয়ার কর্তার বোধক কোন পদ—এই তৃতীয় পাদে নাই। এইজন্য—প্রথম পাদস্থিত ‘বাচম্’ পদটি প্রথমা বিভক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে এখানে অস্বয় করতে হবে। সূত্রবাং সম্পূর্ণ তৃতীয় পাদটির আকার হবে—‘বাক্ উত উ অংশে তৎৎৎ বিসম্ভে।’ শব্দ, কিন্তু অত্বে = বৈয়াকরণের নিকট নিজের শরীর অর্থাৎ স্বরূপকে বিবৃত [প্রকাশিত] করে—ইহাই সমগ্র তৃতীয় পাদের অর্থ। বাহার ব্যাকরণের জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তি সেই জ্ঞানের সাহায্যে শব্দের স্বরূপ জানতে পারে—ইহাই তাৎপর্য।

বাক্ [শব্দ] নিজের শরীরকে অর্থাৎ স্বরূপকে অত্বে বৈয়াকরণের নিকট বিবৃত করে কিরূপ ভাবে—ইহা বুঝাবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন ঋতি চতুর্থ পাদের দ্বারা—‘জায়ের পত্য উশতী স্ববাসাঃ’।

বশ্, কাষ্ঠো অৰ্থাৎ ইচ্ছা অর্থের বোধক বশ্, ধাতুর উত্তর 'শত্' প্রত্যয় ককে তার জ্বলিলে 'উশতী' পদটি সিদ্ধ হয়েছে। সূত্রবাং 'উশতী' পদের অর্থ হলো 'কামনাবতী'। পতির কামনাবতী—পতির কামনা করে যে পত্নী। ভাষ্যকার এর ব্যাখ্যায় 'কাময়মানা' ইহা বলেছেন। তাহলে পতির কামনাবতী জায়া—পত্নী। আর কিরূপ বিশেষণযুক্তা পত্নী? তার উত্তরে বলেছেন 'স্ববাসাঃ' উত্তম বস্ত্র যাহার। ঋতু স্নানের পর উত্তমবস্ত্র পরিহিতা ইহাই অর্থ। এইরূপ বিশেষণবিশিষ্টা পত্নী, 'পত্যে' পতির উদ্দেশ্যে অৰ্থাৎ পতির নিকট। তৃতীয় পাদ হতে 'বিসম্বে' পদটির অলুপ্ত করতে হবে এই চতুর্থ পাদে। সেই 'বিসম্বে' পদের অলুপ্ত [সম্বন্ধ] করে 'স্বম্ বা আশ্বানম্' এইরূপ একটি দ্বিতীয়াস্ত পদ অধ্যাহার করতে হবে। সূত্রবাং চতুর্থ পাদের সম্পূর্ণ আকার হবে—“উশতী স্ববাসাঃ জায়া স্বম্ পত্যে বিসম্বে ইব।” এর অর্থ হচ্ছে “ঋতুস্নাতা উত্তমবস্ত্র পরিহিতা পতির কামনাবতী পত্নী যেমন পতির নিকট নিজে কৈ বিবৃত করে”

[এই দৃষ্টান্ত অলুপ্তসারে] সেইরূপ বাক্ [শব্দ] ও অস্ত্র বৈবাকরণের নিকট নিজে স্বরূপকে প্রকাশিত করে। এইরূপ তৃতীয় পাদে বাক্যের অর্থের সমাপ্তি হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে—এইমন্ত্র বলেছেন—বৈবাকরণের নিকটই শব্দের সমস্ত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। ব্যাকরণ জ্ঞানের দ্বারা বৈবাকরণ, শব্দের অর্থ জেনে শাস্ত্রীয় কর্মাদির অলুপ্তান এবং বেদার্থজ্ঞান হতে যোগরূপ উপাস্ত জেনে যোগাভ্যাস করে শব্দের সমস্ত স্বরূপ জানতে পারেন। 'অবৈবাকরণ' বেদাদিশাস্ত্র শুনে বা অভ্যাস করেও অর্থজ্ঞানের অভাবে শব্দকে দেখে না বা শুনে না—তার শব্দের অধ্যয়নভ্যাস ও শ্রবণ ব্যর্থ হয়। অতএব শব্দ যাতে আমাদের নিকট তার স্বরূপ বিবৃত করে—অৰ্থাৎ যাতে আমরা শব্দের স্বরূপ জানতে পারি—সেই হেতু আমাদের ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপৰ্য—মহাভাষ্যকার ইহাই ব্যাখ্যায় দ্বারা প্রদর্শন করেছেন। 'উততঃ', এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্র স্মৃতিত হয়েছিল সেই শাস্ত্রের অর্থ করা হলো বা তার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হলো ॥২৫॥

মূল

‘সক্তদমিব’—

সক্তদমিব তিতউনা পুনস্তো

বজ্র ধীশা মনসা বাচযজ্ঞত।

অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে

ভজ্রেবাং লক্ষ্মীনিহিতাষি বাচি ॥ [ক্ল সং ১০।১৭ঃ২]

‘সক্তদুঃ’ সচতেহুর্ধাবো ভবতি, কসতে বা বিপরীতাদ বিকসিতো ভবতি। ‘তিতউ’ পরিপবনং ভবতি ততবৎ তুলবৎ। ‘বীরঃ’ ধ্যানবস্তুঃ। ‘মমসা’ প্রজ্ঞানেন। ‘বাচমক্রত’ বাচমকৃষত। অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে। ক? য এষ দুর্গো মার্গঃ, একগম্যো বাগ্ধিষয়ঃ। কে পুনশ্চে? বৈয়াকরণাঃ। কৃত এতৎ? ‘ভজ্রেবাং লক্ষ্মী-নিহিতাষি বাচি’ এবাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীনিহিতা ভবতি। লক্ষ্মীলক্ষণাদ ভাসনাং পরিবৃতা ভবতি। ‘সক্তদুঃমিব’ ॥২৬॥

অনুবাদ :—‘সক্তদুঃমিব’ [এই প্রতীকের দ্বারা সূচিত প্রয়োজন প্রদর্শিত হচ্ছে]। ‘সচ’ ধাতু থেকে [নিপ্পন্ন ‘সক্তদুঃ’ [শব্দের অর্থ] দুর্ধাব [দুঃশোধ বাক্যে পরিভূক্ত করা অতি কষ্টসাধ্য] হয়। বিপরীত ‘কস’ ধাতু থেকে [নিপ্পন্ন] [অর্থঃ ‘কস’ ধাতুর ‘ক কার ও ‘স’ কারের বৈপরীত্যে নিপ্পন্ন]। [সক্তদুঃ শব্দের অর্থ] বিকসিত [যাহা ফুলে উঠে] হয়। ‘তিতউ’ [শব্দের অর্থ] পরিপবন হয়। [এই] তিতউ ততবৎ [বিস্তার বিশিষ্ট] অথবা [এই তিতউ] তুলবৎ [বহুছিন্নবিশিষ্ট]। ‘বীরগণ’ ধ্যানযুক্ত [ব্যক্তিগণ]। মনের দ্বারা [মনের কার্য] প্রজ্ঞারদ্বারা। ‘বাক্যকে করে থাকেন’—অন্তরঙ্গকে থেকে [ভুক্ত শব্দকে] পৃথক্ করে থাকেন। এখানে সখা হয়ে সখ্যকে প্রাপ্ত হয়—এখানে [অর্থঃ এই শব্দে] সমদৃষ্টি লাভ করে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। কোথায় [কাহার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়]? এই যে দুর্গম মার্গ [অর্থঃ কঠিন উপায়ের দ্বারা প্রাপ্তব্য] একের [একমাত্র জ্ঞানের] দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য ‘বাক্যের’ বিষয় [অর্থঃ প্রতিরূপ বাক্যের বিষয়]। তাহার কারণ [যারা এই একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়] তাহা কারা? বৈয়াকরণগণ। কিহেতু ইহা [বৈয়াকরণগণ কেন ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন]? ভদ্রা ইহাদের লক্ষ্মী নিহিতা [আছেন] ‘অধিক (১৬৫)

(১৬৫) মহাভাষ্যে উক্ত এই মত্রে যে ‘অধি’ শব্দটি আছে, মাগেশভট্ট তার অর্থ করেছেন ‘অধিক’। সেই অনুসারে এখানে ‘অধি’ শব্দের ‘অধিক’ এই অর্থ গ্রহণ করে অনুবাদ করা হয়েছে। মহাভাষ্যে এই মত্রেয় চতুর্থপাদের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার পর্যালোচনা করলে মনে হয়—মহাভাষ্যকার এই ‘অধি’ শব্দের এরূপ ‘অধিক’ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি অধিশব্দের অধিকরণ কপ অর্থ গ্রহণ করেছেন। ‘অধি’ শব্দের ‘অধিক’ এই অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে ;

বাকে’—ইহাদের বাকে ভ্রাতা [কল্যাণময়ী লক্ষ্মী নিহিতা] আছেন। লক্ষ্মী লক্ষণের দ্বারা প্রকাশনের দ্বারা [অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করতে] সমর্থ হয়। ‘সক্তদুর্মিব’ [এই প্রতীকের দ্বারা স্মৃতিত কার্য সমাপ্ত হলো] ॥২৬॥

ভাবার্থঃ—চালনীর দ্বারা যে রূপ তুষ থেকে পৃথক্ করে সক্তদুর্মকে [ছাত্ত—ববের ছাত্ত] গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ শব্দশাস্ত্রজ্ঞ [বৈয়াকরণ] ব্যক্তিগণ অপশব্দ [অশব্দ অপভ্রংশ শব্দ] থেকে বাক্যকে পৃথগ্ভাবে জানতে পারেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা ‘বাক্যস্বরূপের পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করায় তাঁরা [বৈয়াকরণেরা] একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব—যাহা বাক্যের স্বার্থস্বরূপ তাঁহাকে অবগত হয়ে, সকল বস্তুর স্বরূপকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপে দর্শন করে সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করেন এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন। যেহেতু এই বৈয়াকরণের অমূলীননের বিষয়ীভূত বাক্যতত্ত্ব সর্বপ্রকাশক ব্রহ্মস্বরূপ সংবিৎ সন্নিহিত আছেন ॥ ২৬ ॥

বিবৃতি :—এই মন্ত্রে ‘অক্রত’ এবং ‘অত্রা’ এই দুইটি বৈদিক প্রয়োগ আছে। ‘অক্রত’ এই প্রয়োগটি কৃপাতুর উত্তর লুঙের প্রথম পুরুষের বহু বচনে [আত্ম-

কি ‘অবি’ শব্দের ‘অধিকরণ’ এই অর্থও অপ্রসিদ্ধ নয়। ‘অবিহরি’ এই অব্যয়ীভাব সমাস নিম্নপদে ‘অবি’ শব্দটি অধিকরণ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে; ইহা সিদ্ধান্তকৌমুদীর অব্যয়ীভাব সমাস প্রকরণে দেখা যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে—এই মন্ত্রের চতুর্থপাদে ‘বাচি’ এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদ আছে। এখানে এই সপ্তমী বিভক্তির দ্বারাই ‘অধিকরণ’ রূপ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং এখানে ‘অবি’ শব্দের ‘অধিকরণ’ রূপ অর্থ গ্রহণ করলে এই ‘অবি’ শব্দের কোন সার্থকতা থাকে না। এর উত্তরে বলিয়া এই যে—এরূপ ক্ষেত্রে সার্থকতা না থাকলেও বেদে এইরূপ প্রয়োগের অভাব নাই। “উপদেশেহ অনুমানসিক ইৎ” [১৩২] এই মন্ত্রের মহাভাষ্যে ভ্রমরক্রমে একটি বৈদিক বাক্যাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে—“অত্র অত্র অত্রিতিঃ” এখানে ‘অত্রা’ শব্দটি ‘আঙ,’ এই অব্যয়ের একটি বৈদিক রূপ [৬।১।১২৬]। এখানে ‘অত্রা’ এই সপ্তম্যন্তপদের সহিত প্রযুক্ত হয়েছে ‘আঙ,’ শব্দ অর্থ ‘অত্রা’ শব্দটি সপ্তমী বিভক্তির অর্থ ‘অধিকরণের জ্ঞাতন করেছে। ইহা সিদ্ধান্ত কৌমুদীর বৈদিক শব্দ প্রকরণের হ্রস্ববিদী টীকায় এবং পদমঞ্জরী [৬।১।১২] তে উল্লিখিত আছে। এই মন্ত্রের সাধারণ ভাষ্যে এই ‘অবি’ শব্দ অধিকরণ অর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এই মন্ত্রে ‘বাচি’ এই সপ্তমী বিভক্তির দ্বারাই অধিকরণ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে বলে অধিকরণ অর্থের জ্ঞাতক ‘অবি’ শব্দের কোন আবশ্যকতা নাই—ইহা স্মৃতিত করার উদ্দেশে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় ‘অবি’ শব্দ কিংবা তার কোন প্রতিশব্দের উল্লেখ করা হয় নাই।

নেপথে] ‘অ’ প্রত্যয় করে নিম্পন্ন (১৬৬)। লৌকিক সংস্কৃতে এখানে ‘অকৃত’ এইরূপ প্রয়োগ হয়। ‘অত্রা’ এই বৈদিক প্রয়োগটি ‘এতদ্’ শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিতে ‘ত্রল্’ প্রত্যয় করে ‘ত্র’ এর অকারের দীর্ঘ (১৬৭) করে নিম্পন্ন হয়। লৌকিক সংস্কৃতে এখানে ‘অত্র’ এইরূপ প্রয়োগ হয়। ‘ত্ৰিতত্’ শব্দটি অমর কোষে পুংলিঙ্গ বলে নির্দিষ্ট আছে। মহাভাষ্যকার এই শব্দকে নপুংসকলিঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং ইহা নপুংসক লিঙ্গও।

এই মন্ত্রের প্রথমেই বে ‘সক্ত’ শব্দ আছে, মহাভাষ্যকার তার দুইপ্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন।

প্রথমে ‘সচ্’ [ষচ্] ধাতু থেকে (১৬৮) ‘সক্ত’ শব্দ সিদ্ধ করেছেন। ‘সচ্’ [ষচ্] ধাতুর অর্থ সমবায়। এখানে সমবায় শব্দের অর্থ কোন বস্তুর সঙ্গে মিলিত হওয়া। সক্ত তার তুষের সঙ্গে মিলিত থাকে। এই তুষ থেকে সক্তকে পৃথক্ করা কষ্টসাধ্য। সেইজন্য ভাষ্যকার বলেছেন—সচ্ ধাতু থেকে বে সক্ত নিম্পন্ন হয়, তার অর্থ ‘দুর্ধাব’ অর্থাৎ দুঃশোধ—যাকে শুদ্ধ করতে বিশেষ প্রয়াস করতে হয়, তাহাই সক্ত [ছাতু]। কস্ ধাতু থেকেও সক্ত শব্দ নিম্পন্ন হয়েছে, ইহাও মহাভাষ্যকার বলেছেন। প্রথমে ষচ্ ধাতু [সচ্] থেকে ‘সক্ত’

(১৬৬) ‘নম্বে ঘসহস্রণশব্দহাষচকুণমিজনিত্যো লেঃ’ [২৪।৮০] এই বিশেষ সূত্রে লুঙ লকারে বিহিত চিৎ প্রত্যয়ের লুক্ হয়ে—‘অ’ স্থানে ‘অন্ত’ পরে অত হয়ে সন্ধি করে ‘অন্ত’ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়েছে। লৌকিক প্রয়োগে এখানে ‘চিৎ’ প্রত্যয়ের লুক্ হয় না। সেইজন্য ‘অন্ত’ এর পরিবর্তে ‘অকৃত’ হয়।

(১৬৭) ঋতি তু নু ঘ ম কু ন ও কুরোঁর্যাণাম্, [৩।৩।১৩৩] এই বৈদিক সূত্র অনুসারে ‘অত্র’ এই পদের অন্তর্গত ‘ত্র’ এর অকারের দীর্ঘ হয়ে ‘অত্রা’ এই প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। লৌকিক প্রয়োগে দীর্ঘবিধায়ক এই সূত্রের প্রযুক্তি হয় না। সেইজন্য লৌকিক সংস্কৃতে ‘অত্র’ এইরূপই হয়।

(১৬৮) ধাতুপাঠে সচ্ ধাতু মুণ্ডবকারাদি ‘ষচ্’ এইরূপ পাঠ আছে। ‘ষাষাদেঃ বঃ সঃ’ [৩।১।৩৪] এই সূত্রানুসারে ‘স’ এর স্থানে ‘স’ করে নিতে হবে। ‘ষচ্’ সমবায় এই উত্তরণদী ধাতু ধাতু বহুসম্মত হলেও সর্বসম্মত নয়। [মাধবীর ধাতুবৃত্তিভাদি ত্রষ্টব্য], বীণেশ্বর মতে এই উত্তরণদী নাই, তাঁদের মতে ‘ষচ্’ সেবনে এই ধাতুই সমবায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক একটি ধাতু অনেকাধি হওয়ার, এরূপ প্রয়োগ দোষাবহ নয়। উচ্ছলবন্ত প্রণীত উপাদিবৃত্তিতে [১।৭০] সেচনাধিক সচ ধাতু থেকে সক্ত শব্দ সিদ্ধ করা হয়েছে। ‘সচ্যতে যেন্নে সিচ্যতে ইতি সক্ত ধীবিজ্ঞারঃ।’

শব্দ সিদ্ধ করেছেন (১৬৯)। পরে ক্‌ ধাতু থেকে 'সক্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। ক্‌ ধাতুর অর্থ গতি—ইহা পাণিনিয় ধাতু পাঠে আছে। ধাতু-সমূহ অনেকার্থক (১৭০)। এইজন্য এই ক্‌ ধাতুর বিকাশ [প্রস্তুত হওয়া—এখানে ফুলে উঠা] অর্থও অসুচিত নয়। বিকাশ অর্থে বর্তমান এই ক্‌ ধাতুর উত্তর 'উণাদয়ো বহুলম্' [৩৩।১] এই সূত্রানুসারে 'তন্' প্রত্যয় হয়ে, তার অন্তর্গত সকার ও ককারের পরস্পর বৈপরীত্য হয়ে (১৭১) 'সক্ত' পদ নিষ্পন্ন হতে পারে। এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করলে সক্ত শব্দের অর্থ হয়—যাহা বিকসিত হয় [বিকসিতো ভবতি] যাহা ফুলে উঠে। তিতউ শব্দের অর্থ পরিপন [চালনী]। ভাষ্যকার এই শব্দটি 'তন্' ধাতু অথবা তুদ্‌ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করেছেন (১৭২)। 'তন্' ধাতু থেকে তিতউ শব্দ সিদ্ধ করলে তার অর্থ হয়, বিস্তারযুক্ত [ততবৎ]। তুদ্‌ ধাতু থেকে তিতউ শব্দ সিদ্ধ করলে তার অর্থ হবে ছিত্রযুক্ত [ভূমবৎ]। চালনী বিস্তারযুক্ত ও ছিত্রযুক্ত হওয়ায়—এই দুইটি অর্থের সম্মতি এখানে আছে। তারপর মহাভাষ্যকার ধীর শব্দের অর্থ করেছেন—ধ্যানযুক্ত [ধ্যানবন্তঃ]; ধ্যা [ধৈর্য্‌+চিন্তায়াম্] ধাতু থেকে ধীর শব্দ সিদ্ধ করেছেন। কিন্তু উপাদিশূত্রে [২।২৪] ধা ধাতু থেকে ধীর শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

মনঃশব্দের অর্থ ভাষ্যকারের মতে 'প্রজ্ঞান'। সূত্ররাং এখানে মনঃশব্দের মনোব্যাপারে লক্ষণা করা হয়েছে—বুঝতে হবে। লক্ষ ধাতু থেকে লক্ষ্মী শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যার লক্ষণ—ভাসন—অর্থাৎ প্রকাশ আছে, তাহাই লক্ষ্মী। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করে এখানে স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্মকেই লক্ষ্মী শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। ভাষ্যকার ইহা সৃষ্টি করেছেন। কৈয়ট প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ মহাভাষ্যের এইরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা করেছেন।

(১৬৯) ৪৫. [স৫.] + তুন্ = সক্ত; সিত্তনিসমিসসিচ্যবিধাঞ্জুশিভ্যন্তু [উপাদিশূত্রম্ অখ্যায়। এখানে এই 'তুন্' প্রত্যয়ের 'ন্' এর ইং সংজ্ঞা হয়। সূত্ররাং ইহার লোপ হয়। প্রত্যয়ের নকারের ইং সংজ্ঞাশতঃ এই নিংপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিবির উদ্ভাট হয়। [জুতাদি-বিন্ধ্য, ৬।১।১২৭]। এখানে সক্ত শব্দের আদি অকার উদ্ভাট।

(১৭০) নাথবীর বাতুত্তির = তুধাতু ব্রটব্য।

(১৭১) পুণোদরাবিদ্যাদ্‌ বর্ণব্যভরঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপ।

(১৭২) উপাদিশূত্রে এই 'তিতউ' শব্দটিকে বিস্তারাদর্শক তন্‌ ধাতুর দ্বারাই সিদ্ধ করা হয়েছে।

স্তনোন্তে ড'উঃ সন্‌বচ। [উপাদি মে অধ্যায় ৪০:]।

এই মন্ত্রটির সংক্ষেপে এইরূপ তাৎপর্ষে ব্যাখ্যা করা যায়—চালনীর দ্বারা বৈকুণ্ঠের নিকটবর্তন করে সন্তান সারভাগের গ্রহণ করা বাক, সেইরূপ বৈকুণ্ঠের নিকটবর্তন ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাহায্যে অপশব্দ [অশুদ্ধ শব্দ] থেকে শুদ্ধশব্দকে পৃথক করে থাকেন। এই বৈকুণ্ঠের নিকটবর্তন শব্দের দ্বারা বিচার করতে করতে, ইহার মূল তত্ত্ব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে সর্বত্র সমস্তই প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান (১৭৩)।

এই মন্ত্রটি নিকটের চতুর্থ অধ্যায়ে দশম খণ্ডে ‘তিতউ’ শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। বাক্যমুনি এই প্রসঙ্গে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যাও করেছেন (১৭৪) সেখানে তিনি তিতউ শব্দের যেকোন ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন, মহাভাষ্যকার তা থেকে ঈষৎ ভিন্নভাবে ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। বাক্য বলেছেন—“তিতউ পরিপবনং ততবদ্ বা তুন্নবদ্ বা তিলমাত্রতুন্নমিতি বা।” মহাভাষ্যকার “ততবদ্ বা তুন্নবদ্ বা” এই অংশটুকু বলে শেষাংশ পরিচয় করেছেন। কৈয়ট ‘ততবদ্’ এই অংশের ব্যাখ্যা করেছেন—“বিত্তারবৃত্তম্”—যার বিস্তার আছে। তদ্ব্যতিরিক্ত বিস্তার অর্থ থাকায় কৈয়টের এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত হয় নাই। নিকটের টীকাকার ‘তত’ শব্দের চর্ম অর্থ গ্রহণ করে ব্যাখ্যা করেছেন—“ততেন চর্মণা নক্ষম্”—তত অর্থাৎ চর্ম, তার দ্বারা বন্ধ। (১৭৫) “তিলমাত্রতুন্নম্” এই অংশের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য বলেছেন—যাতে তিলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে—“তিলমাত্রাণি তুন্নানি বা তদ্বিরিতি তিতউ”। বাক্য ও মহাভাষ্যকার সন্তান শব্দের ব্যাখ্যায় সমান রীতি অনুসরণ করেছেন। মহাভাষ্যকার এই মন্ত্রটিকে বৈকুণ্ঠের নিকটবর্তনের প্রাণসঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন। বাক্য একটু ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (১৭৬)। দুর্গাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে বাক্যের

(১৭৩) প্রথমে মহাভাষ্যপ্রদীপোক্তোক্তে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাকরণসিদ্ধান্তস্থানবিশিষ্ট এই প্রকার তাৎপর্ষ প্রদর্শিত হয়েছে।

(১৭৪) সন্তানদিব পরিপবনের পুনঃ। সন্তানঃ সন্তোজ্জ্বল্যো ভবতি। কসতেবা স্যাৎ বিপন্নীতত বিকসিতো ভবতি। বত্র বীরা মনসা বাচ্যকৃত্যত, প্রজানন্। বীরাঃ প্রজানবন্তো ধ্যানবন্তঃ। তত্র সন্তানঃ সন্তানি সন্তানতে তত্রৈবান লক্ষ্মীনিহিতাবিবাচি ইতি।—নিকটঃ ৪।১০।

(১৭৫) মনে হয় দুর্গাচার্যের সময় চালনী চর্মনির্মিত রজ্জ্ব দ্বারা বাঁধা হোত।

(১৭৬) এখানে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়—বাক্যের ব্যাখ্যায় তাৎপর্ষ দুর্গাচার্যের ব্যাখ্যা থেকে বেশ একটু ভিন্ন। বাক্য ‘বাক্য’ শব্দের অর্থ করেছেন ‘প্রজানন্’ [বাচ্যকৃত্যত প্রজানন্]। বাক্য বর্তমান সময়ে প্রচলিত ‘বাক্য’ শব্দের মূল অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

ব্যাখ্যায় অভিপ্রায় এইরূপ, সজ্জুকে [ছাতুকে] বেরূপ চালনী দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয় সেইরূপ যে যজ্ঞে বা সমাজে জ্ঞানী অর্থাৎ বিচারশীল মনীষিগণ মনের সাহায্যে বাক্যকে পরিষ্কৃত করে প্রয়োগ করেন, সেই যজ্ঞে বা সমাজে একই শাস্ত্রে পরিশ্রমশীল এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরস্পরের জ্ঞানের উৎকর্ষ জানিতে পারেন । যেহেতু এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বাক্যে প্রশংসনীয় লক্ষ্মী [বিজ্ঞান] নিহিত আছে । এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান উন্নত হওয়ায়, সেই জ্ঞানের দ্বারা তারা অপরদের জ্ঞানের উৎকর্ষ বুঝতে পারেন । যাদের জ্ঞান উন্নত নয়, তারা পরের জ্ঞানের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না— ইহাই এখানকার অভিপ্রায় ।

পূর্বেই বলা হয়েছে একটি বেদমন্ত্রের অনেকপ্রকার ব্যাখ্যা ভারতীয় পুণ্ড্রাচাৰ্যগণের অসম্মত নয় । বেদের “সর্বমুক্রমশূন্যের” ভাষ্য পর্যালোচনা করলে, উপরে উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ অনুসারে অল্পপ্রকার অর্থ প্রতীতমান হয় । কিন্তু প্রামাণিক মহাভাষ্যকার যে অর্থ প্রদর্শন করেছেন—সেই অর্থে যে এই সকল মন্ত্রের তাৎপৰ্য নাই, তাহা অতি সাহসিক ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বলতে পারেন না (১৭৭) ॥ ২৬ ॥

মূল

‘সারস্বতীম্’

বাজিকাঃ পঠন্তি ‘আহিতাগ্নিরপশবৎ

প্রযুক্ত্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেদ্’

ইতি । প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধোহুং

‘ব্যাকরণম্ ।’ সারস্বতীম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—‘সারস্বতীম্’ [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজনের স্মৃতি করা হয়েছে, তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে] ।

বাজিকগণ পাঠ করেন—‘আহিতাগ্নি অপশবৎ প্রয়োগ করলে প্রায়শ্চিত্তের অমুকূল ‘সারস্বতী ইষ্টি’র অনুষ্ঠান করবে ।’ আমরা প্রায়শ্চিত্তের বোধ্য না হই—এই কারণে ব্যাকরণের অধ্যয়ন [আমাদের] কর্তব্য । সারস্বতীম্ [প্রতীকের দ্বারা স্মৃতি প্রয়োজনবর্ণন সমাপ্ত হলো] ॥ ২৭ ॥

(১৭৭) “এতে চ মন্ত্রঃ সর্বমুক্রমভাবোহুত্বা বিনিযুক্তা অগ্নি ভাষ্যপ্রামাণ্যাদন্ততাত্পৰ্যকং অসীতিবোধম্ । মহাভাষ্যগ্রন্থীপোক্তোক্ত ।

বিবৃতি—যিনি শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অগ্নির আধান করেন তাঁকে আহিতাগ্নি বলা হয়। আহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি [যজ্ঞাদিতে] অন্তঃ [অপভ্রংশ] শব্দ উচ্চারণ করেন, তা হলে তাঁর পাপ হয়। সেই পাপের নিবৃত্তির জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত রূপে ‘সারস্বতী’ নামক ইষ্টির অমৃতচান করিতে হয়। পাপক্ষয়-মাত্রের সাধনীভূত কর্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়। প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি ‘প্রায়’ ও ‘চিত্ত’ এই দুইটি শব্দের সম্মেলনে সিদ্ধ হয়েছে (১৭৮)। প্রপূর্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর ‘পুংসি সংজ্ঞায়াম্ ষঃ প্রায়েণ ৩৩১১৮” এই সূত্রানুসারে ‘ষ’ প্রত্যয় করে অথবা “অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্ ৩৩১২২” এই সূত্রানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয় করে ‘প্রায়’ শব্দটি সিদ্ধ হয়। এখানে প্রায়শব্দ অকারান্ত পুংলিঙ্গ। ‘চিত্তী [চিৎ’ সংজ্ঞানে’ এই ধাতুর উত্তর ‘জিন্’ প্রত্যয়ের দ্বারা ‘চিত্তি’ শব্দ এবং ‘জ্’ প্রত্যয়ের দ্বারা ‘চিত্ত’ শব্দ নিষ্পন্ন হয় (১৭৯)। এইভাবে নিষ্পন্ন যে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ শব্দ, তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে করা হয়েছে। ‘তপঃ’ শব্দের অর্থ কৃচ্ছ্রসাধ্য ক্রিয়া। এই কৃচ্ছ্রসাধ্য ক্রিয়ার নিশ্চয় [স্থির সম্বল] পূর্বক যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তার নাম প্রায়শ্চিত্ত। এই ব্যাখ্যার অনুকূল একটি স্মৃতিবাক্য পদমঞ্জরীতে উদ্ধৃত হয়েছে,—

“প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।

তপোনিশ্চয়সংযোগাৎ প্রায়শ্চিত্তমিতিস্মৃতম্ ॥”

‘প্রায়’ শব্দের অর্থ তপঃ, ‘চিত্ত’ শব্দের অর্থ নিশ্চয় ; যে ব্যাপারে এই ‘তপঃ’ এর নিশ্চয়ের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ প্রথমে কৃচ্ছ্রসাধ্যব্যাপারের অনুষ্ঠানের স্থির নিশ্চয় করে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাকে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ বলে।

ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদীর “প্রৌঢ়মনোরমা” নামক টীকায় এই প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অন্তরূপ ব্যাখ্যার অনুকূল একটি স্মৃতিবাক্য প্রদর্শন করেছেন,—

(১৭৮) এখানে অকারান্ত ‘প্রায়’ শব্দের পর ‘চিত্ত’ শব্দ থাকার ‘প্রায়’ শব্দের পর ‘হট্টের’ [‘স্’ র] আগম হয়। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ‘সমাদাশ্রয়বিধ’ নামক প্রকরণের শেষে একটি বচন পঠিত আছে। তাতে বলা হয়েছে—‘প্রায়’ শব্দের পর ‘চিত্তি’ বা ‘চিত্ত’ শব্দ থাকলে প্রায় শব্দের পর ‘হট্টের’ আগম হয়। “প্রায়স্ত চিত্তিচিত্তয়োঃ”। মহাভাষ্যে উক্ত বাক্যের পরিবর্তে অন্তরূপ বাক্য পঠিত আছে—“প্রায়স্য চিত্তিচিত্তয়োঃ হৃদস্বারো বা” এর অর্থ—প্রায় শব্দের পর চিত্তি বা চিত্ত শব্দ থাকলে প্রায় শব্দের হট্ট, আগম হয় অথবা প্রায় শব্দের অন্ত্য অক্ষরের স্থানে ‘অস্’ আদেশ হয়। [মহাভাষ্যপ্রদীপ—৬।১।১৫৭]

(১৭৯) চিত্তিসংজ্ঞানে জিন্ নপুংসকে ভাবে তঃ।—পদমঞ্জরী

‘প্রায়ঃ পাপং বিনির্দিষ্টং চিত্তং তত্ত্ব বিশোধনম্’

‘প্রায়ঃ’ শব্দের অর্থ পাপ, যে ক্রিয়ার দ্বারা পাপের বিনাশ হয়, তার নাম প্রায়শ্চিত্ত। উপরি উক্ত তুটী স্মৃতিবাক্য থেকে ‘প্রায়ঃ’ শব্দের পরম্পর বিভিন্ন দুইটি অর্থ জানা গেল,—এক অর্থ তপঃ, অপর অর্থ পাপ। উক্ত তুটী বাক্যেরই প্রামাণ্য আছে, সুতরাং দুইটি অর্থই প্রামাণিক (১৮০)।

উপরে প্রায়শ্চিত্ত শব্দের যৌগিক অর্থ প্রদর্শিত হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি কেবল যৌগিক নয়, যোগরূঢ়। এই জন্ত প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকারগণ এই শব্দের পৰ্যবসিত যে অর্থ গ্রহণ করেছেন—সেই অর্থই গ্রহণীয়। কেবল মাত্র পাপ শব্দের উদ্দেশে শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হয়েছে, তার নাম প্রায়শ্চিত্ত (১৮১)। ‘প্রায়শ্চিত্তি’ শব্দটির অর্থও প্রায়শ্চিত্তশব্দের অর্থের অনুরূপ।

উপরি উক্ত “আহিত্যাগ্নিপরশবৎ প্রযুক্ত্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারথ্যতীমিষ্টিং নির্বপেৎ” এই বাক্যটি কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বাক্য। মহাভাষ্যকার অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ বাক্য উদ্ধৃত করবার আরম্ভে ‘যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি’ এইরূপ প্রয়োগ করেছেন। এখানেও এইরূপ ‘যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি’ এইরূপ আরম্ভে বলেছেন। তাতে নিশ্চয় করা যায় যে এই স্মৃতিবাক্যটি একটি ব্রাহ্মণ বাক্য। তবে কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে মহাভাষ্যকার এই বাক্যটিকে উদ্ধৃত করেছেন তা এখনও জানা যায় নাই।

এই বাক্যের প্রথমে যে ‘প্রায়শ্চিত্তীয়া’ শব্দটি আছে, তার অন্তর্গত ‘প্রায়শ্চিত্ত’ শব্দের অর্থ পাপক্ষালন; ইহা কৈয়ট ও নাগেশভট্টের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়। পাপক্ষালনের সাধন যে ইষ্টি তাকেই এখানে প্রায়শ্চিত্তীয়া ইষ্টি (১৮২) বলা হয়েছে। তার পরবর্তী বাক্যে মহাভাষ্যকার প্রায়শ্চিত্তশব্দের কর্মবিশেষ অর্থ গ্রহণ করে ‘প্রায়শ্চিত্তীয়’ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন (১৮৩)। এই ব্রাহ্মণবাক্যে

(১৮০) প্রায়শোতি বিদে’শাধকারান্তপু’ল্লিক্তপোবাচী প্রায়শবঃ, ‘প্রায়ো’ নান তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে” ইতি স্মৃতেঃ। ‘প্রায়ঃ পাপমিতি’ স্মৃতাভ্যাসং পাপবাচ্যমি। লঘুশব্দেন্দুশব্দে—সমাসাভ্যয়বিধি।

(১৮১) পাপক্ষয়বাসাদয়নয়ন বিধিবোধিতঃ কর্ম প্রায়শ্চিত্তব্। দ্ব্যর্থব্দবদন কৃত প্রায়শ্চিত্তব্।

(১৮২) প্রায়শ্চিত্তীয়ামিতি ভবার্থে বৃদ্ধাঙ্কঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ। ভবার্থ ইতি। প্রায়শ্চিত্ত সাধনময়ন ভববর্থঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোক্তোক্ত।

(১৮৩) প্রায়শ্চিত্তায় পাপশোধনায় স্মৃতিস্মৃতিবিহিতায় কর্মণে হিতাত্মন্যিমিত্যোপাধন্য বা ভূবেত্যর্থঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপ।

বলা হয়েছে,—আহিত্যি অন্তঃশব্দ উচ্চারণ করলে প্রায়শ্চিত্ততাই হবেন। পাপ জন্মালে তার ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হয়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আহিত্যির পক্ষে অন্তঃ শব্দের প্রয়োগ পাপজনক। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে—সকল অবস্থায় অন্তঃ শব্দের প্রয়োগ পাপজনক নয়, বজ্রের অনুষ্ঠান কালেই অন্তঃ শব্দের উচ্চারণ পাপজনক। মহাভাগ্যকার পরে এই পশ্চাৎদিককেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যারা ব্যাকরণের অধ্যয়ন করে নাই, তাদের নিকট শুদ্ধ ও অন্তঃ শব্দের পার্থক্য অজ্ঞাত। এইজন্য তাহাদের পক্ষে যে কোন অবস্থায় অন্তঃ শব্দের উচ্চারণ অসম্ভাবিত নয়। সুতরাং অন্তঃ শব্দের উচ্চারণ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ২৭ ॥

মূল

‘দশম্যাং পুত্রস্ত’

যাজ্ঞিক্যঃ পঠন্তি ‘দশম্যন্তরকালং পুত্রস্ত জাতস্ত’ নাম যিদধ্যাদ্ ঘোষবাদ্যন্তরন্তঃসমবুদ্ধং ত্রিপুরবানুকমনরি প্রতিষ্ঠিতং তচ্চি প্রতি-
ষ্ঠিততমং ভবতি দ্যাকরণং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্বাণ তচ্ছিতমি’তি ।
ন চান্তরেণ ব্যাকরণং কৃতন্তজিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্ । ‘দশম্যাং
পুত্রস্ত’ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—‘দশম্যাং পুত্রস্ত’ [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজন সূচিত
হয়েছে তাহা বলা হচ্ছে] ।

যাজ্ঞিকেরা পাঠ করেন—[পুত্রজন্মাবার] দশদিন পরে [নব] জাত পুত্রের
নাম করবে [নাম রাখবে] । যে নামের আদিতে ঘোষবান্ বর্ণ [থাকবে]
মধ্যে অন্তঃস্থা (১৮৪) বর্ণ থাকবে ; [যে নাম] ‘বুদ্ধ’ সংজ্ঞক শব্দ হবে না ।
[নামকরণ সংস্কারের যিনি অধিকারী—পিতা তাঁর] তিন পুরুষের অভিধায়ক
[শব্দের অঙ্গরূপ] হবে ; অরি অর্থাৎ গজ্ঞাতে যে নাম প্রতিষ্ঠিত নয়—সেইরূপ
নাম অতিশয় প্রতিষ্ঠিত [প্রসিদ্ধ] হয়, দুই অক্ষর অথবা চার অক্ষর কৃদন্ত নাম
রাখবে, তচ্ছিত [নাম] করবে না । ব্যাকরণ [জ্ঞান] ব্যতীত কৃৎ বা

(১৮৪) ব, র, ল, বকে সাধারণতঃ অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়। এখানে এই শব্দটিকে অকারান্ত নয়, কিন্তু আকারান্ত অন্তঃস্থানক। “অন্তঃস্থ শব্দ আদন্তঃ” লঘুণকেন্দ্রণেখর সংজ্ঞাপ্রকরণ।

করে প্রথমে ত্রিপুরম্ এই শব্দ সিদ্ধ হয়; তারপর ত্রিপুরম্ অক্ষুবর্তীতি ত্রিপুর উপপদ পূর্বক অল্প উপসর্গের উত্তর কৈ শব্দে কৈ ধাতুর উত্তর মূলবিভূজাদিত্যং 'ক' প্রত্যয় করে 'অন্তেষামপি দৃশ্যতে। এই সূত্রানুসারে 'অল্প' শব্দের উ কারের দীর্ঘ হয়ে—'ত্রিপুরানুকম্' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'অনরি প্রতিষ্ঠিতম্'—এই অংশের দুইটি অর্থ হতে পারে। (১) নৃশব্দের অর্থ মানুষ। নৃ শব্দের সহিত নঞসমাসে—'অনৃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তার সপ্তমীর একবচনে 'অনরি' এইরূপ হয়। অনরি প্রতিষ্ঠিতম্—এই অংশের অর্থ যাহা মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ দেবতার যে নাম সেইরূপ নাম রাখবে। (২) অরিশব্দের অর্থ শত্রু। অরিশব্দে 'নঞ' তৎপুরুষ করলে 'অনরি' রূপ সিদ্ধ হয়। অনরৌ প্রতিষ্ঠিতম্ এইরূপ বিগ্রহ করে অনরি প্রতিষ্ঠিতম্ শব্দ সিদ্ধ হয়। অথবা ন অরিপ্রতিষ্ঠিতম্—এইরূপ নঞ সমাস করে 'অনরিপ্রতিষ্ঠিতম্' সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হচ্ছে—যে নাম শত্রুর নাম নয় সেইরূপ নাম রাখতে হবে (১৮৮)। কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত নাম রাখতে হবে, যেমন 'দেবনন্ত', 'দেবদন্ত' শব্দের শেষে 'দন্ত' শব্দ দা + ক্ত [ক্ত রূপ কৃত্যপ্রত্যয়] কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত হওয়ায় ঐ নাম রাখার যোগ্য। তদ্ধিতান্ত নাম রাখা নিষেধ—যেমন 'তনুশৌক্য' এই নামের শেষে 'শৌক্য' শব্দটি তদ্ধিতান্ত [গুরু শব্দের উত্তর 'গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ' সূত্রে 'গৃঞ' তদ্ধিত প্রত্যয়] হওয়ায় এইরূপ নাম রাখলে পুণ্য হবে না অথচ পাপ হবে। যে ব্যক্তি গৃহস্থপ্রমে অবস্থান করেন, তাঁর পুত্র জন্মাবার সম্ভাবনা থাকায় পুত্রজন্মে তাঁরপক্ষে নামকরণ সংস্কার অবশ্য কর্তব্য। এই নামকরণ সংস্কারে উপযুক্ত নাম নির্বাচনে ব্যাকরণের অপেক্ষা আছে বলে, গার্হস্থ্যব্যাপারের অন্তর্গত কর্তব্যের যথাযথ সম্পাদনের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা উচিত;—ইহাই এখানে মহাভাষ্যকার এই শাস্ত্রব্যাক্য-প্রদর্শনের দ্বারা সূচিত করেছেন ॥ ২৮ ॥

মূল।

‘সুদেবো অসি’

‘সুদেবো অসি বরুণ যন্ততে সপ্ত সিদ্ধবঃ।

অনুক্রমস্তি কাকুৎস্থস্য স্মরণামি ॥ [৬ সং ৮৬১।১২]

“সুদেবো অসি বরুণ।” সত্যদেবোহসি।

‘যন্ত তে সপ্ত সিদ্ধবঃ’ সপ্তবিভক্তয়ঃ।

‘অনুক্ররন্তি কাকুদম্।’ কাকুদং তালু। কাকুজিহ্বা,

সাহস্মিন্নিহ্ম্যত ইতি কাকুদম্। সূর্য্যং সুবিরামিব।

তদ্ব্যথা—শোভনামূর্মিঃ সুবিরামগ্নিরন্তঃ প্রবিষ্টা দহতি, এবং
তে সপ্ত সিদ্ধবঃ সপ্তবিভক্তরন্তাবনুক্ররন্তি। তেনাসি সত্যদেবঃ।
সত্যদেবঃ সত্যমেত্যাখ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ‘সুদেবো অসি’ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—‘সুদেবো অসি’ [এই প্রতীকের দ্বারা যে প্রয়োজন সূচিত
হয়েছে তাহা প্রদর্শিত হচ্ছে]

হে বরুণ! তুমি সুদেব হয়েছ। যেহেতু সপ্ত সমুদ্র [তোমার] কাকুদকে
[তালুকে] [আশ্রয় করে] প্রবাহিত হচ্ছে। অগ্নি, যেরূপ ছিদ্ৰবহুল শোভনা
লৌহপ্রতিমাকে [মলহীন করে]। ‘বরুণ সুদেব হয়েছ’ সত্যদেব হয়েছ।
‘কেহেতু তোমার সপ্ত সমুদ্র’ সপ্ত বিভক্তি। ‘কাকুদকে [আশ্রয় করে] প্রবাহিত
হচ্ছে’—কাকুদ—তালু। কাকু—জিহ্বা, সেই [জিহ্বা] ইহাতে উৎক্ষিপ্ত হয়,
এইক্লন্ত [ইহা] কাকুদ। ‘যেরূপ ছিদ্ৰবহুল শোভনা লৌহপ্রতিমাকে’—যেরূপ
শোভনা সুবিরাম [ছিদ্ৰবহুল] লৌহ প্রতিমাকে, অগ্নি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে
দহ করে, এইরূপ তোমার সপ্তসমুদ্র=সপ্তবিভক্তি তালুকে [আশ্রয় করে]
প্রবাহিত হচ্ছে। সেই ক্লন্ত তুমি সত্যদেব হয়েছ। আমরা সত্যদেব হতে
পারব, এইহেতু ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। ‘সুদেবো অসি’ [এই প্রতীকের
দ্বারা যে প্রয়োজনের সূচনা করা হয়েছিল তাহা সমাপ্ত হল] ॥২৯॥

বিত্ত্বিতি—‘যন্ত তে সপ্ত সিদ্ধবঃ’ এইস্থলে ‘যন্ত’ এই বাক্যী বিভক্তিটি পঞ্চমীর
স্থানে হয়েছে। বেদে এইরূপ বিভক্তিব্যত্যয় অনেকবার লক্ষ্য করা গেছে।
পূর্বে এবিধের ব্যাকরণের প্রমাণও উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে। সুতরাং ‘যন্তাং’
এই অর্থে ‘যন্ত’ এইরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতে ‘সূর্য্যম্’ এই
প্রকার রূপ হয়। বৈদিক সংস্কৃতে ‘সূর্য্যম্’ এইরূপ ও হয় (১৮২)। সূর্য্য শব্দের
অর্থ লৌহ প্রতিমা ইহা অমরকোষে দেখা যায় (১৯০)। মহাভাষ্যকার এখানে

(১৮২) সূর্য্যবিত্ত্বিতিপ্রাপ্তে ‘অগ্নিপূঃ’ [৩।১ ১০৭] ইত্যত্র ‘বা হৃদসি’ [৩।১।১০৬] ইত্যনুবৃত্ত্য
ব্যাপদেশঃ।—মহাভাষ্যপ্রণীত। শব্দকৌক্যেও এর অনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(১৯০) সূর্য্য ভূপাংঃপ্রতিমা।—অমরকোষে পৃথ্বী-৩ঃ।

‘স্বর্মা’ শব্দের ‘শোভনা উর্মী’ [শোভনাস্বর্মীম্] এইরূপ অর্থ গ্রহণ করেছেন। নাগেশভট্ট মহাভাষ্য প্রদীপোদ্যোতে ‘স্বর্মা’ শব্দের ‘শোভনা অরঃ [লৌহ] প্রতিমা’ [১২১] এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ইহা পর্যালোচনা করলে মনে হয় এখানে ‘স্ব’ শব্দের অর্থ শোভন এবং ‘উর্মী’ শব্দের অর্থ লৌহ প্রতিমা—এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় অনুসারে ‘উর্মী’ শব্দের অর্থ লৌহ প্রতিমা—ইহা স্বীকার করতে হবে। ‘স্বষি’ শব্দের অর্থ ছিদ্ৰ। এই স্বষি শব্দের উত্তর ভূমা অর্থে [বাহুল্য অর্থে] মত্বর্ধীয় ‘র’ প্রত্যয়ের দ্বারা (১২২) ‘স্বষির’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এই ‘স্বষির’ শব্দের অর্থ হচ্ছে বহুল ছিদ্ৰযুক্ত।

এই মন্ত্রটি বর্ণনের ভিত্তি। বর্ণনের ব্যাকরণজ্ঞানকে লক্ষ্য করে তাঁকে সত্যাদেব বলে প্রশংসা করা হয়েছে। সাত বিভক্তির প্রত্যেক বিভক্তিতে অনন্ত শব্দরাশি সিদ্ধ হয়। এইজন্য এই মন্ত্রে সপ্ত বিভক্তিকে সপ্ত সমুদ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্ত্রের শেষাংশেব উপমার [স্বর্মাং স্বষিরামিব] দ্বারা বলা হয়েছে এই যে—অগ্নি যেমন সঙ্কীর্ণ লৌহপ্রতিমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে দগ্ধ করে; দগ্ধ করার কালে সেই প্রতিমা সকল প্রকার মল কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ হয়; সেইরূপ যশোহর শব্দজ্ঞান হয়েছে, তাঁর সকল প্রকার পাপ নষ্ট হয়ে যায়, তিনি পবিত্র হয়ে স্বর্গ প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। ব্যাকরণের অধ্যয়নই শব্দজ্ঞানের একমাত্র উপায়। অতএব ব্যাকরণের অধ্যয়নই শব্দজ্ঞান উৎপাদনের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন—ইহা এই মন্ত্রে উপমাধারা প্রতিপাদিত হয়েছে। স্বর্গপ্রাপ্তি-রূপ বলের উদ্দেশে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য (১২৩)।

ইহা প্রতিপাদনের উদ্দেশে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এখানে এই মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন ॥ ২২ ॥

(১২১) স্বর্মাঃ শোভনামরঃপ্রতিমাম্ ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত ।

(১২২) উষ-স্বষি মুক-মধোরঃ [৫১২।১০৭]

ভূমিনিকাশঃসাহ নিত্যযোগেহতিশায়নে ।

সদ্বন্ধেহতি বিবন্ধায়াং ভবন্তি মতুজ্জ্বলয়ঃ ॥ মহাভাষ্য ৫১২.৩৮ ।

(১২৩) অনেন স্বর্গপ্রাপ্তিঃ কদমিত্যুক্তম্ ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত ।

মূল

কিং পুমরিদং ব্যাকরণমেবাধিজিগাংসমানেভ্যঃ

প্রয়োজনমবাখ্যায়তে, ন পুমরন্তদপি কিঞ্চিৎ ?

ওম্ ইত্যেবমুক্তাঃ * বৃত্তান্তশঃ শ্মিত্যেবমাদীঞ্

শব্দান্ পঠন্তি ॥ ৩০ ॥

অনুগাম—কি কারণে ব্যাকরণই অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুকগণকে [ব্যাকরণের] প্রয়োজন বলা হচ্ছে ; অস্ত কিছুর [বেদের] অধ্যয়নেচ্ছুকগণকে [প্রয়োজন বলা হয় না] । ‘ওম্’ এইরূপ উচ্চারণ করে প্রপাঠক ক্রমে ‘শম্’ প্রবৃত্তি শব্দরাশির অধ্যয়ন করে থাকে ॥ ৩০ ॥

বিবৃতি—অধিপূর্বক অধ্যয়নার্থক ‘ইঙ্’ ধাতুর উত্তর ‘সন্’ প্রত্যয় করে, সেই সনস্ত ‘অধিজিগাংস’ ধাতুর উত্তর ‘শানচ্’ প্রত্যয় করে—“আধিজিগাংসমানেভ্যঃ” এই পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। ইচ্ছা অর্থে সাধারণত ‘সন্’ প্রত্যয় হয়। ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা হয়েছে। যাদের ব্যাকরণ অধ্যয়নের ইচ্ছা আছে, তাদের সেই ইচ্ছা থেকেই ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হবে। এরূপ অবস্থায় ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বর্ণনার কোন সাধকতা দেখা যায় না। এইজন্য এখানে ‘সন্’ প্রত্যয়ের অস্ত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আশঙ্কা বা সন্দেহবনা অর্থেও ‘সন্’ প্রত্যয় হয় (১২৪)। এখানে সেই সন্দেহবনা অর্থে ‘সন্’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে—এইরূপ ব্যাখ্যা করতে হবে। তা হলে “ব্যাকরণম্ অধিজিগাংসমানেভ্যঃ” ইত্যাদি অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা হবে—যাদের ব্যাকরণ অধ্যয়ন করার সন্দেহবনা আছে অর্থাৎ যারা ব্যাকরণের প্রয়োজন অবগত হলে, ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হতে পারে, তাদের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বলা হচ্ছে। বস্তুতঃ যাদের বোগ্যতা না থাকার কোন কালে ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়ার সন্দেহবনা নাই, তাদের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণের প্রয়োজন বর্ণনা নিরর্থক। সন্ প্রত্যয়ের ইচ্ছা অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইজন্য এখানে অনুবাদে ‘সন্’ প্রত্যয়ের ইচ্ছা অর্থ প্রদর্শিত হয়েছে। বস্তুতঃ এখানে যে সন্দেহবনা অর্থেই ‘সন্’ প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করা উচিত, তার যুক্তি উপরে প্রদর্শিত হল।

* ‘ওম্, ইত্যুক্তাঃ’—পাঠান্তর।

(১২৪) মহাভাষ্য—৩।১।৭ জেটব্য।

তৈত্তিরীয়সংহিতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ‘প্রপাঠক’ দেখা যায়।

এক একটি অধ্যায়কে বিভিন্ন ‘প্রপাঠকে’ বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্রপাঠকেই এখানে মহাভাষ্যকার ‘বৃহত্তান্ত’ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করেছেন। এক একটি প্রপাঠকে প্রায় এক একটি বিষয়ের আলোচনা আছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সাধারণভাবে এক একটি প্রপাঠক এক একটি বিষয়ের প্রকরণ। ইহা লক্ষ্য করে মহাভাষ্যকার ‘প্রপাঠক’ শব্দের পরিবর্তে ‘বৃহত্তান্ত’ শব্দের ব্যবহার করেছেন। ‘বৃহত্তান্ত’ শব্দের প্রকরণ অর্থে ব্যবহার যুক্তিহীন নয়।

যারা বেদের অধ্যয়ন করে, তাদের অধ্যয়নের পূর্বে এবং পরে প্রণব [ওঁ] উচ্চারণ করবার বিধান আছে—

ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্ধ্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা।

অবত্যানোকৃতং পূর্বং পরস্তাক্ষ বিশীর্ষতে ॥ [মনু ২য় অঃ]

বেদের পাঠের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে প্রণব উচ্চারণ করবে। আরম্ভে প্রণব উচ্চারণ না করলে বেদক্ষরিত হয় এবং সমাপ্তিতে প্রণব উচ্চারণ না করলে বেদ বিশীর্ণ হয়ে যায়। ওঁকারটি আবার স্বীকৃতির সূচক। এই কারণে বেদের অধ্যয়নের পূর্বে প্রণবের উচ্চারণের দ্বারা গুরুর প্রতি শিষ্যের আহ্বগত্যও সূচিত হয়। এই কারণে বেদের অধ্যয়নের পূর্বে প্রণবের উচ্চারণের প্রথা আছে। সেই প্রথাকে লক্ষ্য করে এখানে পতঞ্জলি ‘ওমিত্যুক্তদা’ ইহা লিখেছেন।

এখানে ভাষ্যে যে আশঙ্কা করা হয়েছে—তার অভিপ্রায় এই—যারা বেদের অধ্যয়ন করে, বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন বর্ণনা করে তাদের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদন করতে হয় না। তারা কোনরূপ প্রয়োজনের অপেক্ষা না করেই বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিস্তৃতভাবে প্রয়োজনের বর্ণনা করা হয়েছে। ইহার দ্বারা দ্বারা ব্যাকরণের উৎকর্ষ অপেক্ষা অপকর্ষই দ্যোতিত হচ্ছে। ভাষ্যে ‘শমিত্যেবমাদীন’ বলা হয়েছে। এখানে ‘শম্’ শব্দটি অর্থব্বেদের “শমোদেবীরীষ্টে” ইত্যাদি বুঝাচ্ছে। ভাষ্যকার প্রথমে বৈদিক শব্দের উদাহরণ প্রসঙ্গেও অর্থব্বেদের প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন। এখানেও সেই রীতির অনুসরণ করেছেন ॥৩০॥

মূল।

পুরাবল্ল এতদাসীৎ সংস্করোক্তবকালংঃ ব্রাহ্মণ্য ব্যাকরণং

* ‘সংস্কারকালোক্তবক’ পাঠান্তর।

+ ‘উত্তরব্রাহ্মণ্য নানানুপ্রদানজ্যেষ্ঠো’ পাঠান্তর।

স্বাধীযতে । তেভ্যন্তন্তৎস্থানকরণানুপ্রদানজ্যেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপনিশ্যন্তে । তদন্যেষে ন তথা । বেদমবীত্য ব্রহ্মিতা বক্তারো ভবন্তি । বেদারো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধাঃ, লোকাচ্চ লৌকিকা অনর্থকং ব্যাকরণমিতি । তেভ্য এবং বিশ্রুতিগল্পবুদ্ধিভ্যোহধ্যোভ্যোঃ স্তম্ভন্ তুয়া আচার্য ইদং শাস্ত্রমঘাচষ্টে ইমানি প্রয়োজনানি অধ্যোয়ং ব্যাকরণমিতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—পূর্বকালে এই [ব্রীতি] ছিল, [উপনয়ন] সংস্কারের উত্তরকালে ব্রাহ্মণগণ ব্যাকরণের অধ্যয়ন করতেন । সেই সেই [উচ্চারণ] স্থান, করণ [আভ্যন্তর্য প্রবৃত্ত], এবং অনুপ্রদানে [বাহ্য প্রবৃত্তে] অভিজ্ঞ সেই সকল [ব্যক্তি] কে বৈদিক শব্দ সমূহের [বেদের] উপদেশ করা হোত । বর্তমান সময়ে তাহা সেরূপ নাই । বর্তমান সময়ে [প্রথমে] বেদ অধ্যয়ন করে [বিবাহাদি ব্যাপারে] স্তম্ভবৃত্ত [ব্যগ্র] হয়ে বক্তা হন [বলতে আরম্ভ করেন]—বেদ থেকে বৈদিক শব্দ সকল আমাদের [কাছে] জ্ঞাত হয়েছে ; লৌকিক শব্দ সকল লোক থেকে [আমাদের জ্ঞাত হয়েছে] [অতএব] ব্যাকরণ অনর্থক [নিম্নপ্রয়োজন] । এইরূপ বিরুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন সেই অধ্যোভ্যগণকে আচার্য [অধ্যাপক—মহাভাষ্যকার] স্তম্ভদ্ব হয়ে [বন্ধু ভাবে] এই [প্রয়োজন প্রতিপাদক শাস্ত্রের অধ্যাখ্যান [বর্ণনা] করেন ; [ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নের] এই সকল প্রয়োজন [আছে, অতএব] ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ॥ ৩১ ॥

বিশেষবক্তব্য :—‘তেভ্যন্তন্তৎস্থানকরণানুপ্রদানজ্যেভ্যোঃ’ এই অংশে ‘তেভ্যন্তন্তৎস্থানকরণানুপ্রদানজ্যেভ্যোঃ’ এইরূপ পাঠান্তর প্রচলিত পুস্তকে আছে । সেই পাঠ শুদ্ধ নয় । অনু-প্রদান শব্দের অর্থ বাহ্য প্রবৃত্ত । নাদ বাহ্য প্রবৃত্তের অন্তর্গত । নাগেশভট্ট মহাভাষ্য প্রদীপাদ্যোতে ‘অনুপ্রদান’ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন—‘অনুপ্রদানং নাদাদিবাহ্যপ্রবৃত্তঃ’ স্তম্ভবাং প্রচলিত পাঠে ‘নাদ’ শব্দটির আধিক্য সমর্থন যোগ্য নয় ॥ ৩১ ॥

বিবৃতি :—পূর্বমহাভাষ্যে ব্যাকরণের প্রয়োজন বর্ণনার বিরুদ্ধে যে আশঙ্কা উপস্থাপিত হইয়াছিল, সেই আশঙ্কার সমাধান করা হচ্ছে । মুখের যে অংশে বায়ুর সংযোগ হয়, যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাকে সেই বর্ণের স্থান বলে । বর্ণের উচ্চারণ করতে হলে, ঐ সকল স্থানে বায়ুর সংযোগ সম্পাদনের জন্য মুখের

মধ্যে কৰ্ণ, তালু, প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা বাধুতে ক্রিয়া উৎপাদন করতে হয়। মুখের মধ্যে এই যে ব্যাপার হয়, সেই সকল ব্যাপারের নাম 'করণ' বা আভ্যন্তর প্রযত্ন'। এই আভ্যন্তর প্রযত্নের দ্বারা প্রথমে বর্ণ উচ্চারিত হলেও তাতে স্পষ্টতা আসে না। এই স্পষ্টতা সম্পাদনের জন্য অন্ত প্রকার ব্যাপারের অপেক্ষা থাকে, এই ব্যাপারের নাম 'অহুপ্রদান' বা বাহ্য প্রযত্ন। এই বাহ্য প্রযত্ন মুখের বাহিরে শরীরের অভ্যন্তরে নিম্পাদিত হয়। মুখের বাহিরে এই প্রযত্ন হয় নলেই ইহাকে বাহ্যপ্রযত্ন বলে। স্থান, করণ এবং অহুপ্রদানের বিষয় সাক্ষাদভাবে ব্যাকরণে আলোচিত না হলেও, যাহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে, তাহাদের এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকলে, ব্যাকরণের অধ্যয়ন কোন রূপে চলতে পারে না। এই সকল বিষয়ে 'শিক্ষায় আলোচিত হয়েছে। অতএব যাহারা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে ইচ্ছুক, তাদের 'শিক্ষা' অধ্যয়ন করতে হয়। ইহা লক্ষ্য করেই মহাভাষ্যকার বলেছেন প্রথমেই যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করত, তারা স্থান, করণ এবং অহুপ্রদানে অভিজ্ঞ হয়ে বেদের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হত। "তুল্যান্ত প্রযত্নঃ সর্বগম্" [১।১।১০] এই শৃঙ্গের মহাভাষ্যে স্থান, করণ ও অহুপ্রদানের আলোচনা করা হয়েছে ॥৩১॥

মূল

উক্তঃ শব্দঃ। স্বরূপমপ্যুক্তং ; প্রয়োজনান্ত

প্যুক্তানি। শব্দানুশাসনমিদানীং কর্তব্যম্ ॥৩২॥

অনুবাদ :-শব্দ বলা হয়েছে। [শব্দের] স্বরূপও বলা হয়েছে। [ব্যাকরণ অধ্যয়নের] প্রয়োজনও বলা হয়েছে। এখন শব্দানুশাসন [শব্দের উপদেশ] করতে হবে ॥৩২॥

বিশৃঙ্খলিত :-এখানে মহাভাষ্যকার বলেছেন—শব্দ, তাহার স্বরূপ এবং ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন বলা হয়েছে। ইহাদের মধ্যে "গৌরবঃ পুরুষঃ হস্তী" ইত্যাদি গ্রন্থে শব্দ বলা হয়েছে। "যেনোচ্চারিতেন সাক্ষাৎস্বরূপককৃত্ত খুরবিবার্ণনাং সত্ৰত্যয়ো ভবতি"। এই বাক্যে শব্দের স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে। আর "রক্ষণার্থং বোধানামধ্যায়ং ব্যাকরণম্" এইখান থেকে আরম্ভ করে "সত্যমেবাঃ শ্রামেভ্যোঃ ব্যাকরণম্" এই পর্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ব্যাকরণ

অধ্যয়নের প্রয়োজন বলা হয়েছে। মহাভাষ্যকার এই গ্রন্থে প্রথম থেকে আরম্ভ করে এতদূর পর্যন্ত যা কিছু বলেছেন, তার উপসংহার করবার জন্য এখানে বলেন—“উক্তঃ শব্দঃ” ইত্যাদি। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় শব্দ এবং ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা হয়েছে—ইহা পরিষ্কৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই উপসংহার করা হয়েছে।

নাগেশ ভট্ট এখানে মহাভাষ্যের উক্তরূপ তাৎপৰ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন বিষয় এবং প্রয়োজন নিরূপণ করাতেই সম্বন্ধ এবং অধিকারীও নিরূপিত হয়ে গেছে। এই জন্য মহাভাষ্যকার পৃথগ্ভাবে সম্বন্ধ ও অধিকারী বলেন নাই (১২৫)

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার যোগ্য—যে বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে তার উল্লেখ করে, এর পর যা বলা হবে, তরে সূচনা করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থের মধ্যে পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপে বর্ণনা করে, পরবর্তী প্রতিপাত্ত বিষয়ের উল্লেখ করার রীতি আছে (১২৬)। ইহার দ্বারা পূর্ববর্তী সন্দর্ভের সহিত পরবর্তী সন্দর্ভের সঙ্গতি সূচিত হয় এবং শিষ্যের বুদ্ধি পরবর্তী প্রতিপাত্ত বিষয়ে অবহিত হয়। এই স্থলে মহাভাষ্যকার ‘উক্তঃ শব্দঃ……উক্তানি’ এই অংশের দ্বারা পূর্ববর্তী গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলন করে ‘শব্দাভ্যুশাসনমিদানীং কর্তব্যম্’ এই বাক্যের দ্বারা পরবর্তী গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয় সূচিত করেছেন ॥৩২॥

মূল

তৎ কথং কর্তব্যম্ ? কিং শব্দোপদেশঃ কর্তব্যঃ, আহোশ্বিদপ-
শব্দোপদেশঃ, আহোশ্বিহুভয়োপদেশ ইতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ :- সেই [শব্দাভ্যুশাসন] কি প্রকারে করতে হবে ? শব্দের উপদেশ

(১২৫) অধ্যয়সংহারো গ্রন্থস্য বিষয়প্রয়োজননিরূপণমেতাবত। কৃতমিতি বোধনিতুম্।
তেনৈব সম্বন্ধাধিকারিণ্যুক্তাবিতি তৌ পৃথগ্ভোনোক্তৌ ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোক্তোক্তা

শাস্ত্রের দুই প্রকার সম্বন্ধ আছে—(১) শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এবং (২) বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ। শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ, তার নাম প্রতিপাত্ত্যপ্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ। বিষয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধের নাম প্রয়োজ্যপ্রয়োজকভাবসম্বন্ধ। যে প্রয়োজনের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শাস্ত্র রচিত হয়, বিনি সেই প্রয়োজনের প্রার্থী, তিনিই শাস্ত্রের অধিকারী।

(১২৬) ব্রহ্মসংহিতাশব্দভাষ্য ১১১৫; দেখা যায়, এই রীতি শব্দরভাষ্য প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে। শব্দরভাষ্যে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের আরম্ভে ও এইরূপ আছে।

করতে হবে? অথবা অপশব্দের উপদেশ [করতে হবে] কিংবা উভয়ের উপদেশ [করতে হবে] ॥৩০॥

বিবৃতি :—এখানকার মূলের ‘কিম্’ শব্দটি প্রব্লেব্ধক। ‘অপশব্দ’ এই শব্দটির অর্থ অসাধু অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দ। ‘এই অপশব্দের’ প্রতিবন্ধিতাবে এখানে ‘শব্দ’ এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। সূত্ররূপে এখানে ‘শব্দ’ এই শব্দটির অর্থ শুদ্ধ শব্দ—সাধুশব্দ। যদি ব্যাকরণে কেবল শুদ্ধ শব্দের উপদেশ করা হয় অর্থাৎ সমস্ত শুদ্ধ শব্দ সংগ্রহ করে ব্যাকরণে পাঠ করা হয়, তা হলে সেই সকল শুদ্ধশব্দ ব্যতীত অশুদ্ধশব্দগুলি যে অপশব্দ, তা বুঝতে পারা যাবে। এইরূপ কেবল অপশব্দগুলির যদি ব্যাকরণে পাঠ করা হয়, তা হলে সেই সকল অপশব্দ ভিন্ন অশুদ্ধ যে সকল শব্দ অবশিষ্ট থাকবে, সেগুলিই শুদ্ধ শব্দ—ইহা বুঝতে পারা যাবে। ব্যাকরণে শুদ্ধশব্দ এবং অপশব্দ—এই উভয় প্রকার শব্দের পৃথগ্ভাবে পাঠ করলে, অনায়াসে শুদ্ধ ও অশুদ্ধশব্দকে স্পষ্টভাবে জানতে পারা যাবে। এখানে পূর্বেক্ত তিনটি ভিন্নভিন্ন প্রশ্ন এইরূপ বিভিন্ন তিনটি অভিপ্রায়কে অবলম্বন করে উত্থাপিত হয়েছে ॥ ৩০ ॥

মূল

অন্তরোপদেশেন কৃতং স্যাৎ । তদ্বধা,—ভক্ষ্যমিহমোভক্ষ্য-
প্রতিবেধো গম্যতে । ‘পঞ্চ পঞ্চনখাভক্ষ্যাঃ’ ইত্যুক্তে গম্যত এতদ্
অতোহম্যে অভক্ষ্যা ইতি । ‘অভক্ষ্যপ্রতিবেধেন বা ভক্ষ্যমিয়মঃ ।
তদ্বধা ‘অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুকুটঃ’ ‘অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ’ ইত্যুক্তে গম্যত
এতদ্ ‘আরণ্যো ভক্ষ্য’ ইতি । এবমিহাপি । যদি তাবচ্ছন্দোপ-
দেশঃ ক্রিয়তে, ‘গৌরিত্যেতন্মিহপদিষ্টে গম্যত এতদ্ ‘গাব্যাদয়োহ-
পশ্চাদাঃ’ ইতি । অথাপ্যপশ্চাদোপদেশঃ ক্রিয়তে, গাব্যাদিষপদিষ্টেহু-
গম্যত এতদ্ ‘গৌরিত্যেষ শব্দাঃ’ ইতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ :—[শব্দ এবং অপশব্দের মধ্যে] অন্তর্যের উপদেশের দ্বারা
[প্রয়োজন] সিদ্ধ হবে। যেমন ভক্ষ্যের নিয়মের দ্বারা অভক্ষ্যের নিষেধ
প্রতীয়মান হয়।—‘পাঁচটি পঞ্চনখযুক্ত প্রাণী ভক্ষ্য’ এইরূপ বললে—ইহা বুঝতে
পারা যায় যে,—ইহার ভিন্ন অশুদ্ধ [পঞ্চনখবিশিষ্টপ্রাণী । অভক্ষ্য । অথবা
অভক্ষ্যের নিষেধের দ্বারা, ভক্ষ্যের নিয়ম [প্রতীত হয়]। যেমন—‘গ্রাম্য
কুকুট অভক্ষ্য’ ‘গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য’ এরূপ বললে—ইহা বুঝতে পারা যায় যে,

আরণ্য [বনে জাত] [কুট্ট বা শূকর] ভক্ষ্য। এখানে ও [শব্দান্তরান্বিত] এইরূপ। যদি শব্দের উপদেশ [পাঠ] করা হয়, ‘গোঃ’ এই শব্দ উপ-
দিষ্ট হলে,—ইহা বুঝতে পারা যায় যে,—গাবী প্রভৃতি অপশব্দ। অর্থাৎ যদি
অপশব্দের উপদেশ করা হয়—‘গাবী’ প্রভৃতি শব্দ উপদিষ্ট হলে ইহা বুঝতে
হয় যে—‘গোঃ’ এইটি শব্দ ॥ ৩৪ ॥

বিবৃতি—শব্দ এবং অপশব্দ এই উভয়ের উপদেশ [পাঠ] করলে যদিও
স্পষ্টভাবে উভয়ের জ্ঞান হতে পারে, তথাপি উভয়ের উপদেশ অধিক প্রয়াস
সাপেক্ষ বলে গৌরবগ্রস্ত। এই কারণে মহাভাষ্যকার বলছেন,—উভয়ের
উপদেশের প্রয়োজন নাই। শব্দ ও অপশব্দ—এই উভয়ের মধ্যে একত্বের
উপদেশ করলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। মহাভাষ্যকার এখানে দুটি দৃষ্টান্ত
প্রদর্শন করে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন—ভক্ষ্যের
নিয়ম করলে, তার দ্বারা অভক্ষ্যের নিষেধ প্রতীত হয়। “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যঃ”
—পঞ্চায়, ষাণ্ণিধি [সজ্ঞা], গোমা, শশক, এবং কূর্ম এই পাঁচটি পঞ্চনখ
যুক্ত প্রাণী ভক্ষ্য (১২৭), ইহা বললে, এই পাঁচটি ব্যতীত ইহাদের
সমানশ্রেণীর পঞ্চনখযুক্ত অপর প্রাণী—বানরাদি অভক্ষ্য, ইহা অনা-
য়াসেই বুঝতে পারা যায়। এইরূপ ‘গোঃ’ প্রভৃতি সাধুশব্দের উপদেশ করলে,
ইহা ব্যতীত, ইহার সমানার্থক ‘গাবী’ ‘গোমী’ ‘গোতা’ ‘গোপোত্তলিকা’
প্রভৃতি শব্দ যে অপশব্দ, ইহা সহজেই বুঝা যায়। অথবা অভক্ষ্যের নিষেধ
করলে, তার দ্বারা ভক্ষ্যের নিয়ম প্রতীত হয়। ‘গ্রাম্য কুট্ট অভক্ষ্য’ ‘গ্রাম্য
শূকর অভক্ষ্য’ এরূপ বললে, গ্রাম্যকুট্ট ও গ্রাম্য শূকরের অভক্ষ্যতা প্রতীতির

(১২২) পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যঃ ব্রহ্মকল্পেণ বাবয়।

শব্দ্যকঃ ষাণ্ণিধিঃ গোমা শশকঃ কূর্মঃ পঞ্চনখঃ ॥

[বাণীকিরামায়ণ কিকিঙ্কাকান্ত] ১৭৩০

শব্দ্যকঃ ষাণ্ণিধিঃ। শুভিকাকারশল্যাবৃত্তসর্বাঙ্গো ভুক্তবিশেষঃ ইত্যন্যে। [স্বাভাভিঃসীমিতিক]

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যঃ ব্রহ্মকল্পেণ বাবয়ঃ।

ষাণ্ণিধিঃ প্রাণীভেদে বা ভক্ষ্যে কামসংক্ৰমঃ ॥

[মহাভাষ্যতঃ পাণ্ডিত্যঃ] ১০১৭০

ন ভক্ষ্যেৎকচরানজাতান্ কৃষবিজ্ঞান্।

ভক্ষ্যেৎপশু সনুদ্বিষ্টান্ সর্বাণ্ পঞ্চনখান্তথা ॥

পশুবিধং শব্দ্যকঃ গোমাঃ ষাণ্ণিধিঃ কূর্মঃ পশুভেদাৎ ॥

ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেবাহরনুষ্ঠানৈকভোজনতঃ ॥

[সনুসংহিতা] ১৭—১৮

সঙ্গে সঙ্গে আরণ্য অর্থাৎ বন্যকুট এবং বন্যশূকর যে ভক্ষ্য তাহাও বুঝতে পারা যায়। এইরূপ ‘গাবী’ প্রভৃতি অপশব্দের উপদেশ করলে ‘গৌঃ’ প্রভৃতি শব্দ যে শুদ্ধ তাহা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্যাকরণে শুদ্ধশব্দ এবং অপশব্দ—এই উভয়ের উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ব্যাকরণে উপদেশ করতেই হয়, তাহলে ইহাদের মধ্যে যে কোন একটির উপদেশ করলেই অনায়াসে ঠিকিত প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। মহাভাষ্যকার “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ” এই বাক্যকে নিয়ম বলেছেন। পূর্বমীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা নিয়মবিধি নয় কিন্তু পরিসংখ্যাবিধি, মীমাংসকদের মতে বিধি তিন প্রকার—(১) অপূর্ববিধি, ২ নিয়মবিধি এবং (৩) পরিসংখ্যাবিধি,—

বিধিরত্যস্বমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।

তত্র চাত্তজ ৫ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥ [তত্ত্ববর্তিক]

(১) যাহা অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে বিষয় পূর্বে কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয় নাই, তদ্বিষয়ে যে বিধি হয়, ইহাকে ‘অপূর্ব বিধি বলে। যেমন ‘অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি’। কুমারিলভট্টের অনুবর্তী মীমাংসকদের মতে— ইহার অর্থ অগ্নিহোত্র নামক হোমের দ্বারা ইষ্ট [ইচ্ছার বিষয়ীভূত] বস্তু উৎপাদন করবে (১২৮)। এই বাক্যের দ্বারা ইষ্ট [স্বর্গ] বস্তুর উৎপাদনের প্রতি ‘অগ্নি-হোত্র’ নামক হোমের করণতা, প্রতীত হয়ে থাকে। ইষ্টবস্তুর প্রতি হোমের এই করণতা এই বাক্যের অর্থজ্ঞানের পূর্বে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয় নাই। অতএব এইরূপ অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপক হওয়ায় ‘অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি’ এই বাক্যটি অপূর্ববিধি। (২) যে স্থলে অল্প প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন দুইটি পক্ষ বৈকল্পিক ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়ে আছে, সে স্থলে যদি বিধিবাক্যের দ্বারা প্রমাণাত্মক প্রাপ্ত দুই পক্ষের মধ্যে অভ্যুতর পক্ষে পর্ববসান ঘটে, তবে সে স্থলে নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়ে থাকে। দর্শ এবং পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে পুরোডাশ দ্বারা হোম করা হয়। তণ্ডুল অথবা যবের চূর্ণের সঙ্গে উষ্ণ জল (১২৯) মিশ্রিত করে সেই চূর্ণকে কৃমাকৃতি পিণ্ড করতে হয়।

(১২৮) “অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি” এই বাক্যের উক্তপ্রকার অর্থ ভাট্টমীমাংসকসম্প্রদায়ের সম্মত। বেহেতু তাঁরা এই বাক্যের “অগ্নিহোত্রঃ হোমেন ইষ্টং ভাবয়েৎ” এইরূপাদিবোধ স্বীকার করেছেন।

(১২৯) এই উক্ত্যলকে ‘মদন্তী’ শব্দে অভিহিত করা হয়। যে পাত্রে এই জল রেখে অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়, সেই পাত্রের নাম ও ‘মদন্তী’। [শৌভ্রপাণ্যনির্ণয়, ইষ্ট প্রকরণ].

গার্হপত্য নামক অগ্নিতে যুক্তিকানিমিত্ত কপালে (২০০) এই পিণ্ডকে ভৰ্জন করলে, সেই কুর্মাভূতি পিণ্ড পুরোড়াশ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এইরূপ পুরোড়াশ নির্মাণ করতে যে চূর্ণের প্রয়োজন হয়, সেই চূর্ণ করবার পূর্বে ধাত্ত কিংবা যবকে তুষ-রহিত করে নিতে হয়। ধাত্ত বা যবের উপরিভাগ থেকে তুষের অপসারণ নথের দ্বারা করতে পারা যায়, আবার উদুখলে ধাত্ত বা যব রেখে তাতে মুলের আঘাত করলে ও তুষের অপসারণ হতে পারে। যে স্থলে নথের দ্বারা চিরে তুষের অপসারণ করা হয়ে থাকে, সে স্থলে মুষলাঘাতের প্রয়োজন হয় না। আবার যে স্থলে মুষলাঘাতের দ্বারা তুষের অপসারণ করা হয়, সে স্থলে নথ বিদলনের [নথের দ্বারা তুষ চিরার] অপেক্ষা থাকে না। অতএব এরূপ স্থলে অবঘাতের [মুষলাঘাতের] পান্থিক প্রাপ্তি আছে। নিয়ত প্রাপ্তি নাই। এইরূপ অবস্থায় "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই বিধির দ্বারা অবঘাতের নিয়ত প্রাপ্তি সম্পাদন করা হয়েছে। পুরোড়াশের জন্ত যে তণ্ডুল প্রস্তুত করতে হবে, সেই তণ্ডুল কোন অবস্থাতেই নথবিদলনাদি অগ্ন প্রকারে নিষ্পাদন করা চলবে না, সকল অবস্থাতেই সেই তণ্ডুল অবঘাতের দ্বারা সম্পাদন করতে হবে। এই নিয়ম বিধির কোন দৃষ্টফল সম্ভাবিত নয়। অবঘাতব্যতীত নথবিদলনাদি দ্বারা ও তুষের নিবৃত্তি করা যেতে পারে। এইজন্ত নিয়মবিধির অদৃষ্ট ফল স্বীকার করা হয়। এই অবঘাত [মুষলাঘাত] থেকে একটি অপূর্ব [অদৃষ্ট] উৎপন্ন হয়। এই অপূর্বটি, দর্শপূর্ণমাসাদি প্রধানযাগ জন্ত পরমাপূর্বের [দর্শপূর্ণমাসাদি প্রধান যাগ হতে যে অপূর্ব উৎপন্ন হয়, সেই অপূর্ব স্বর্গাদি ফলের সাধ্য কারণ বলে তাকে পরমাপূর্ব বলে] উৎপত্তিতে সহায়তা করে। এই অবঘাতজনিত অপূর্ব না থাকলে সেই পরমাপূর্বের উৎপত্তি হতে পারে না। এস্থলে এই অবঘাত বিধির দ্বারা অবঘাতের অভাবপক্ষে প্রাপ্ত নথবিদলনাদির নিবৃত্তি হয়। (৩) যে স্থলে একই বিষয়ে একাধিক বস্তুর অগ্ন কোন প্রকারে যুগপৎ প্রাপ্তি ঘটে, সেই স্থলে বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্নের নিবৃত্তি করে কোন একটি পদার্থের নিশ্চিতরূপে প্রাপ্তির সম্পাদন কবলে, সেইরূপ স্থলে পরিসংখ্যাবিধি স্বীকৃত হয়। যেমন পান ভোজনাদি মাতৃয়ের স্বাভাবিক রাগের [কামন্যর] বস্ত। এই স্বাভাবিক রাগের বশে গণ্ডার, কূর্ম, শশক, সজ্জার এবং গোদা এই পাঁচটি পক্ষনখযুক্ত

(২০০) পুরোড়াশের ভর্জনে ব্যবহৃত হুই অঙ্গুলি উচ্চ অগ্নিপক্ক যুক্তিকানিমিত্ত পাত্রবিশেষের নাম কপাল।

প্রাণীর ভক্ষণে যেরূপ মানুষের প্রবৃত্তি হতে পারে, সেইরূপ এই পাঁচটি ভিন্ন বানর প্রভৃতি অল্প পঞ্চনথবিশিষ্ট প্রাণীর ভোজনেও মানুষের প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত পঞ্চনথবিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণই মানুষের রাগপ্রাপ্ত।^১ এস্থলে “পঞ্চ পঞ্চনথা ভক্ষ্যাঃ” এইপ্রকার বিধিবাক্যের দ্বারা উক্ত পাঁচটি পঞ্চনথবিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণ বিহিত হয়েছে। এই বিধি উক্ত পাঁচটি প্রাণীর ভক্ষণের বিধান করছে এরূপ মনে করলে—এই বিধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ এই বিধি ব্যতিরেকেও স্বাভাবিক রাগের বশে বানরাদি অল্প পঞ্চনথবিশিষ্ট প্রাণীর মত উক্ত ‘শস্যক’ প্রভৃতি পাঁচটি প্রাণীর ভক্ষণও প্রাপ্ত আছে। যাহা অল্পপ্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহার জ্ঞাত বিধির কোন অপেক্ষা না থাকায় সেরূপ স্থলে বিধিব্যর্থতায় পর্যবসান হওয়া ব্যতীত অল্প কোন গতি থাকে না। এইজন্য এই ক্ষেত্রে বিধির ব্যাপার প্রবৃত্তির দিকে স্বীকার না করে নিবৃত্তির দিকেই স্বীকার করা হয়। উক্ত পাঁচটি পঞ্চনথবিশিষ্ট প্রাণী ব্যতীত অল্প পঞ্চনথবিশিষ্ট বানরাদি প্রাণী ভক্ষণ করবেনা, এইরূপ নিষেধের অমুকূলে ‘পঞ্চ পঞ্চনথা ভক্ষ্যাঃ’ এই বিধির তাৎপর্য ব্যাপ্যাত হয়। এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে বিধির ব্যর্থতা নিবারিত হয়ে থাকে। যে স্থলে নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়, সে স্থলে অত্নের নিবৃত্তি হয়ে থাকে বটে, কিন্তু সেই নিবৃত্তি শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না। অল্প একটি বস্তুর [অবধাতের] নিয়ত ভাবে শব্দের দ্বারা বিধান করলে অল্প বস্তুর [নথবিদলন প্রভৃতির] পক্ষান্তরে যে প্রাপ্তি আছে, সেই প্রাপ্তির আপনা থেকেই নিবৃত্তি ঘটে। এই নিবৃত্তিকে আর্থিক নিবৃত্তি বলে। পরিসংখ্যা বিধিস্থলে সেই বিধির ব্যর্থতানিবারণের জন্য সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই অত্নের নিবৃত্তি স্বীকার করতে হয়। অতএব নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যা বিধির মধ্যে মূলত পার্থক্য এই যে, নিয়মবিধিস্থলে অত্নের নিবৃত্তি অর্থসিদ্ধ, সাক্ষাৎ শব্দপ্রতিপাত্ত নয়। পরিসংখ্যাবিধিস্থলে অত্নের নিবৃত্তি সাক্ষাৎ শব্দেরই প্রতিপাত্ত,—অর্থসিদ্ধ নয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে ‘পঞ্চ পঞ্চনথা ভক্ষ্যাঃ’ এই বিধি বাক্যটি পূর্বমীমাংসক গণের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিসংখ্যাবিধি, নিয়মবিধি নয় (১০১)। এখন এখানে এই প্রশ্ন উঠে যে মহাভাষ্যকার ‘পঞ্চ পঞ্চনথা ভক্ষ্যাঃ’ এইরূপ বিধি-

(১০১) নিয়মবিধি এবং পরিসংখ্যাবিধির পার্থক্য কেবল যে নবামীমাংসকদেরই সম্মত তা নয়। ইহা পূর্বমীমাংসার সুরকার জৈমিনি ও ভাট্টকার শবরদ্বায়ী প্রভৃতিরও সম্মত।

বাক্যকে পরিসংখ্যা বিধির অন্তর্গত না বলে ‘নিয়ম’ রূপে উল্লেখ করেছেন কেন? এখানে তাঁর অভিপ্রায় কি? এর উত্তরে মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোতে নাগেশ ভট্ট বলেছেন পরিসংখ্যাত্বলে সাক্ষাদভাবে অন্তের নিবৃত্তি হয়। নিয়মস্থলে সাক্ষাদভাবে অন্তের নিবৃত্তি না থাকলেও, অন্তের নিবৃত্তি অর্থসিদ্ধ ইহা স্বীকৃত হয়েছে। তা হলে ‘নিয়ম’ এবং ‘পরিসংখ্যা’ এই দুই প্রকার বিধিতেই কোন না কোন ভাবে অন্তের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। এই অন্তনিবৃত্তি অংশে ‘নিয়ম’ এবং ‘পরিসংখ্যার’ যে সাম্য আছে, সেই সাম্যকে অবলম্বন করে ‘নিয়ম’ এবং ‘পরিসংখ্যার, অভেদ আশ্রয় করে মহাভাষ্যকার এখানে ‘পরিসংখ্যাকে’ ও ‘নিয়ম’ বগে উল্লেখ করেছেন (২০২) ॥৩৪॥

মূল

কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ? লঘুত্বাচ্ছকোপদেশঃ।

লঘীয়াঙ্ককোপদেশঃ, গরীয়ানপশকোপদেশঃ।

একৈকস্য শব্দস্য বহুবোহপভ্রংশাঃ। তদ্ যথা ‘গৌ’—রিত্যস্য শব্দস্য গাবীগোণীগোতাগোপোতলিকৈভ্যেবমানয়োহপভ্রংশাঃ। ইষ্টাষাখ্যানং খবপি ভবতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ :—এখানে [শব্দ ও অপশব্দের উপদেশের মধ্যে] কোন্টি প্রশস্ততর? লঘুববশত শব্দের [শুদ্ধ শব্দের উপদেশ [প্রশস্ততর]। শব্দের [সাদৃশ্যশব্দের] উপদেশ লঘুতর; অপশব্দের [অসাদৃশ্যশব্দের] উপদেশ গুরুতর। এক একটি [সাদৃশ্য] শব্দের বহু অপভ্রংশ [অসাদৃশ্যক] [আছে]। যেমন ‘গৌঃ’ এই [সাদৃশ্য] শব্দের গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা ইত্যাদি প্রকার অপভ্রংশ সকল [আছে]। ঈঙ্গিত বস্তুর [শুদ্ধ শব্দের] বর্ণনা ও [সিদ্ধ] হয় ॥৩৫॥

বিরূতি :—মহাভাষ্যকার শব্দের উপদেশ বিষয়ে প্রথমে তিনটি বিকল্প উঠিয়েছিলেন। শব্দের উপদেশ অথবা অপশব্দের উপদেশ কিংবা শব্দ ও অপশব্দ এই উভয়ের উপদেশ। সেই তিনটি বিকল্পের মধ্যে যখন তার ব্যাখ্যা

(২০২) নবম্য পরিসংখ্যাং কথং নিয়মম্ভেদে ব্যবহারঃ? অস্তি চ নিয়মপরিসংখ্যায়োৰ্ভেদঃ। পাকিকাপ্রাপ্তিকাপ্রাপ্তালপরিপূরণকল্পে নিয়মঃ, অন্তনিবৃত্তিকলাচ পরিসংখ্যা ইতি চেৎ। ন। নিয়মেংগাপ্রাপ্তপরিপূরণকল্পবোধব্যবহার। অর্থাৎ নিবৃত্তে: সঙ্কেতেবাব্যাহিত্যোক্তে:।—
কলাচরপ্রদীপোদ্যোতঃ।

করেছিলেন তখন দুটি বিকল্পেরই ব্যাখ্যা করেছিলেন। ভক্ত্যের নিয়মের দ্বারা যেমন অভক্ত্যের নিবেদন বুঝায় সেইরূপ শব্দের [সাধুশব্দের] উপদেশের দ্বারা অসাধুশব্দেরও পরিচয় হয়ে যায়। এইটি প্রথম বিকল্পের ব্যাখ্যা। অভক্ত্যের নিবেদনের দ্বারা যেমন ভক্ত্যের নিয়ম হয় সেইরূপ অপশব্দের উপদেশের দ্বারা তদতিরিক্ত শব্দগুলি সাধুশব্দ ইহা জানা যায়। এইটি দ্বিতীয় বিকল্পের ব্যাখ্যা। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বে তৃতীয় বিকল্পটি উঠালেও তার ব্যাখ্যা করেন নাই। উত্তর প্রদানকালেও দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বিকল্পের কোন প্রসঙ্গ উঠান নাই। এই ভাবে তৃতীয় বিকল্প উঠিয়ে তার সম্বন্ধে কিছু বললেন না কেন? এইরূপ একটা আশঙ্কা হতে পারে। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি নিজেই উক্ত তৃতীয় পক্ষের অনাবশ্যকতার সূচনা করেছেন। তিনি পূর্বেই “অন্ততরোপদেশেন কৃতং স্মৃৎ” অন্ততরের উপদেশের দ্বারা শঙ্কাহুগাসন সিদ্ধ হয়ে যায়। সাধুশব্দের উপদেশ অথবা অসাধুশব্দের উপদেশের দ্বারা শঙ্কাহুগাসন সিদ্ধ হয়ে যায়। ভাষ্যকারের এই উক্তির দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তিনি তৃতীয় পক্ষটি হেব বলেই পূর্বেই সূচিত করে দিয়েছেন। শব্দের উপদেশ বা অপশব্দের উপদেশের দ্বারা শব্দের জ্ঞান সিদ্ধ হলে—উভয়ের [সাধু ও অসাধু শব্দের] উপদেশ অত্যন্ত গৌরবগ্রস্ত বলে বার্থ। এই জন্য এখানে ভাষ্যকার প্রশ্ন উঠিয়েছেন “কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ” “জ্যায়ঃ” প্রশস্ত শব্দের উত্তর ঈয়স্ম্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন। প্রশস্ত শব্দের স্থানে জ্যা আদেশ এবং ঈয়স্ম্ এর ঈকার লোপ করে ‘জ্যায়স্’ শব্দ সিদ্ধ হয়। দুইটি বস্তুর মধ্যে একের অতিশয় উৎকর্ষ বুঝালে তদ্বাচকশব্দের উত্তর তরপ্ বা ঈয়স্ম্ প্রত্যয় হয়। এখানে শব্দের উপদেশ এবং অপশব্দের উপদেশ এই দুটি বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাবার জন্য প্রশস্ত শব্দের উত্তর ঈয়স্ম্ প্রত্যয় করায় উক্ত দুইটি পক্ষের কোন পক্ষটি প্রশস্ততর ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য রূপে পর্ববসিত হয়েছে।

এর উত্তরে ভাষ্যকার বলেছেন “লঘুত্বাচ্ছঙ্কোপদেশঃ”। শব্দের অর্থাৎ সাধুশব্দের উপদেশই প্রশস্ততর, যেহেতু সাধুশব্দের উপদেশে লাঘব আছে। অপশব্দ বা অসাধুশব্দের উপদেশ অপেক্ষা সাধুশব্দের উপদেশে লাঘব আছে। ইহারই ব্যাখ্যা করেছেন—“লঘীয়াচ্ছঙ্কোপদেশঃ” শব্দের উপদেশ লঘুতর। “গয়ীয়ানপশঙ্কোপদেশঃ” অপশব্দের উপদেশ গুরুতর। অপশব্দের উপদেশ কেন গুরুতর? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন “একৈকস্ত শব্দস্ত বহুবোহ্

পত্রংশাঃ।” এক একটি সাধুশব্দের অনেক অপশব্দ আছে। যেমন একটি ‘গৌঃ’ এই সাধুশব্দের গাবী, গোপী, ইত্যাদি অনেক অপশব্দ আছে। অতএব সাধুশব্দের উপদেশে যে লাঘব আর অসাধুশব্দের উপদেশে গৌরব ইহা স্পষ্টই প্রতীত হচ্ছে। এইভাবে সাধুশব্দের উপদেশে লাঘব আছে বলে, সাধুশব্দের উপদেশ করলে, তন্নিম্ন শব্দগুলি যে অপশব্দ অর্থাৎ অসাধুশব্দ তাহা অনায়াসে জানা যাবে। তার পর মহাভাষ্যকার বলেছেন—এই সাধুশব্দের উপদেশে কেবল লাঘব আছে বলেই যে সাধুশব্দের উপদেশ ‘জ্যায়ান্’ অর্থাৎ প্রশস্ততর, তা নয় কিন্তু এই সাধুশব্দের উপদেশ করলে ইষ্টের অধ্যাখ্যানও হয় বলে সাধুশব্দের উপদেশ [জ্যায়ান্] প্রশস্ততর। “ইষ্টের অধ্যাখ্যান” ইষ্ট অর্থাৎ ঈক্ষিত হচ্ছে শব্দের [সাধুশব্দের] জ্ঞান। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ‘অথ শব্দানুশাসনম্’ এই প্রথম ভাষ্যের দ্বারা “শব্দের অর্থাৎ সাধুশব্দের জ্ঞানই শব্দানুশাসন [ব্যাকরণ] শাস্ত্রের সাক্ষ্যং প্রয়োজন” ইহা প্রতিপাদিত করেছেন। অতএব সাধুশব্দের জ্ঞান ইষ্ট। তার অধ্যাখ্যান অর্থাৎ বর্ণনা বা প্রতিপাদন করা হয়, যদি সাধুশব্দের উপদেশ করা হয়। সাধুশব্দের উপদেশ থেকে সাক্ষাদ্ ভাবে ঈক্ষিত সাধুশব্দের জ্ঞান হবে। যে ব্যক্তি নিজের ঈক্ষিত বস্তু চায়, সে সেই ঈক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে বিলম্ব সহ করে না, তাহাতে সে ত্বরান্বিত হয়। সাধুশব্দের জ্ঞান যাহার ঈক্ষিত সে অপরের [আচার্যের] নিকট থেকে সাধুশব্দের উচ্চারণ শুনে সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ করবে। কিন্তু অসাধুশব্দের উপদেশ করলে অসাধুশব্দগুলি থেকে ভিন্ন শব্দই সাধু শব্দ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হতে বিলম্ব হবে। ইহা সাধুশব্দজ্ঞানের ইচ্ছুক ব্যক্তির ঈক্ষিত নয়। সুতরাং সাধুশব্দের উপদেশই তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ইষ্টের প্রতিপাদক—ইহা বুঝতে হবে। কৈয়ট আর একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সাধুশব্দের প্রয়োগ থেকে ধর্ম হয়। তা হলে সাধুশব্দের উপদেশ করলে, তা থেকে সাধুশব্দের জ্ঞান হবে, সেই সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে সাধুশব্দের প্রয়োগে ধর্ম হবে। ধর্ম ইষ্ট। অতএব সেই ইষ্টধর্মের কারণ সাধুশব্দের বর্ণনাটিও ইষ্ট বর্ণনা। ইষ্টের সাধনও ইষ্ট ॥ ৩ঃ ॥

মূল

অর্থৈতন্নিঞ্ শব্দোপদেশে সতি কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতি-

পদপাঠ: কর্তব্য:—গৌরব: পুরুষো হস্তী শকুনির্মুগো ব্রাহ্মণ ইত্যে-
বমাদয়: শব্দ: পঠিতব্য: ? নেত্যাহ। অনভ্যাপায় এষ শব্দানাং
প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠ:। এবং হি জায়তে—“বৃহস্পতিরিজ্জায়
দ্বিবাং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ-
নাস্তং জগাম।” বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা, ইজ্জচ্চাধ্যোতা, দ্বিবাং বর্ষসহস্র-
মধ্যয়নকালো, স চাস্তং জগাম, কিং পুনরদ্যত্বে। য: সর্বথা চিরং
জীবতি স বর্ষশতং জীবতি। চতুর্ভিষ্চ প্রকারৈবিদ্যোপযুক্তা ভবতি।
আগমকালেন, আধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি।
তত্র চাস্যাগমকালেনৈবায়ু: কংস্রং পর্যুপযুক্তং স্যাৎ। তস্মাদনভ্যাপায়:
শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠ: ॥ ৩৬ ॥

অল্পবাদ :- এখন এই শব্দের [সাধুশব্দের] উপদেশ [কর্তব্যরূপে নিশ্চিত
হলে, শব্দসমূহের জ্ঞানে [জ্ঞানের উপায়রূপে] কি প্রত্যেক পদের পাঠ কর্তব্য
[হবে]—গাঃ, অশ্বঃ, পুরুষো, হস্তী, মৃগঃ ব্রাহ্মণঃ—ইত্যাদি প্রকারে শব্দের
পাঠ করা হবে? না—এই উত্তরে দিচ্ছেন। এই প্রত্যেক পদের পাঠ শব্দ
সকলের প্রতিপত্তিতে [জ্ঞানে] উপায় নয়। এইরূপ শোনা যায় [প্রতি
আছে]—বৃহস্পতি দ্বিবা [দেবতাদের সম্বন্ধী] একসহস্র বৎসর ইজ্জকে, প্রতিপদে
পঠিত শব্দ সমূহের শব্দপারায়ণ [শব্দপারায়ণ নামক শাস্ত্র] বলেছিলেন,
[তাথাপি] শেষ প্রাপ্ত হন নাই [শেষ করতে পারেন নাই]। বৃহস্পতি
প্রবক্তা [অধ্যাপক], ইজ্জ অধ্যোতা, অধ্যয়নের কাল দেবতা সম্বন্ধী এক হাজার
বৎসর, অথচ শব্দের শেষ প্রাপ্ত হন নাই [শব্দ শেষ করতে পারেন নাই],
আধুনিক কালে আর কি [কথা]। অধুনা যে সর্বথা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে
[বাঁচে] সে [বভ্রোর] একশত বৎসর জীবিত থাকে। চার প্রকারে বিজ্ঞা
উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। আগম কালের দ্বারা [গুরুর নিকট থেকে গ্রহণ
কালে] আধ্যায়কালের দ্বারা [অদ্বীত শাস্ত্রের অভ্যাস কালে] প্রবচন অর্থাৎ
অধ্যাপনা কালের দ্বারা, এবং ব্যবহারকালের [যজ্ঞাদি কর্মে প্রয়োগকাল]
দ্বারা [বিদ্যা উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়]। সে স্থলে [সেই চার প্রকারের মধ্যে]
আগমকালেই [গ্রহণ কালেই] ইহার [প্রতিপদে শব্দগ্রহণকারী আধুনিক

ব্যক্তির] সমস্ত আয়ু সমাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং শব্দ সমূহের জ্ঞানে [জ্ঞান নিমিত্ত] প্রতিপদ পাঠ উপায় নয় ॥ ৩৬ ॥

বিবৃতি :—শব্দ ও অপশব্দের উপদেশের মধ্যে শব্দের উপদেশে লাক্ষ্য এবং ইষ্টের অসাধ্যান হয় ইহা মহাভাষ্যকার পূর্বে বলেছেন। এখন এর উপর আশঙ্কা হতে পারে—শব্দের [সাধু শব্দের] উপদেশ কি ভাবে করা হবে? যত সাধু শব্দ আছে তার এক একটি করে উপদেশ করা হবে অথবা অন্য কোন উপায়ে সেই সাধুশব্দের উপদেশ করা হবে তার মধ্যে প্রথম উপায়ে অর্থাৎ প্রত্যেক সাধুশব্দের উপদেশ করলে, এই পক্ষে কিদোষ হতে পারে তাহা প্রদর্শন করবার জন্য বলেছেন—‘অঐতন্মিন্ শব্দোপদেশে’ ইত্যাদি। এখানে ‘অথ’ শব্দটি প্রশ্ন বুঝবার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রশ্ন ‘অথ’ শব্দের বাচ্যার্থ নয়, কিন্তু ‘অথ’ শব্দ প্রয়োগে স্থলবিশেষে প্রশ্নের ভাবটি দো্যোজিত হয়। যদিও প্রশ্নার্থক ‘কিম্’ শব্দটি উক্তবাক্যে আছে, তথাপি ‘কিম্’ শব্দের দ্বারা প্রশ্নার্থটি স্পষ্ট করা হয়েছে ‘অথ’ শব্দের দ্বারা প্রশ্ন অর্থ দো্যোজিত হয় বলে প্রশ্নার্থটি অস্পষ্টভাবে প্রতীত হয় ; সেই অস্পষ্টতা দূর করবার জন্য পুনরায় ‘কিম্’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। অথবা এখানে ‘অথ’ শব্দটি আনন্তর্ভার্থকও বলা যেতে পারে। পূর্বে, শব্দের উপদেশের কর্তব্যতা প্রস্তাবিত হয়েছে তাকে অপেক্ষা করে, শব্দের উপদেশের প্রকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়েছে, পূর্ব প্রস্তাবিত কোন বিষয়কে অপেক্ষা করে পরবর্তী কোন বস্তুর কখনও অথ শব্দটি ফলত আনন্তর্ভ-অর্থের বোধক হয় (২০৩)। ‘অঐতন্মিন্ শব্দোপদেশে সতি’ এই বাক্যাংশটির বধ্যাক্রান্ত অর্থ—[অনন্তর] [এখন] ‘এই শব্দোপদেশ হলে’। কিন্তু শব্দের উপদেশ ‘হলে’ প্রতিপদের পাঠ কর্তব্য—এইরূপ বাক্যার্থ অসঙ্গত হয়ে যায়, এইজন্য ‘এতন্মিন্ শব্দোপদেশে সতি’ এই বাক্যাংশের অর্থ করতে হবে—“এই শব্দের উপদেশ কর্তব্যরূপে নিশ্চিত হলে—অর্থাৎ সাধুশব্দেরই উপদেশ করতে হবে—ইহা নিশ্চিত হলে।” এইরূপ অর্থের সঙ্গে “কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ কর্তব্যঃ” এই পরবর্তী বাক্যাংশের অর্থের সঙ্গতি অব্যাহত থাকে।

“শব্দানাং প্রতিপত্তৌ” ‘এই হলে “শব্দানাং” এই শব্দের অর্থ ‘সাধু শব্দ সকলের’। ‘প্রতিপত্তি’ শব্দের অর্থ এখানে “জ্ঞান”। যদিও ‘প্রতিপত্তি’ শব্দের ‘লাভ’ এইরূপ একটি অর্থ আছে, তথাপি শব্দের লাভটি জ্ঞানভির আর

কিছুই নয় বলে সোজাহজি ‘প্রতিপত্তি’ শব্দের ‘জ্ঞান’ অর্থ গ্রহণ করা। যুক্তিসূক্ত মনে হয়। “প্রতিপদপাঠঃ” এখানে ‘পদং পদং’ এইরূপ বীজ্য অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস করে ‘প্রতিপদম্’ এই পদ নিষ্পন্ন হয়। “প্রতিপদং [অর্থাৎ প্রত্যেকপদের] পাঠঃ” এইরূপ বহীতৎপুরুষ সমাস করে ‘প্রতিপদপাঠ’ শব্দটি সিদ্ধ হয়। প্রত্যেক পদের পাঠ অর্থাৎ উচ্চারণ করে কি সাধুশব্দের উপদেশ করা হবে?— ইহাই এখানে প্রশ্নের অভিপ্রায়। ইহাই বুঝাবার জন্য পরে বলেছেন— “গৌরবঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ।” ‘গৌঃ, অবঃ’ ইত্যাদি রূপে কি এক একটি শব্দের পাঠ [উচ্চারণ] করা হবে?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন ‘নেত্যাহ। অননুপায় এষ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ’। না। শব্দসকলের জ্ঞানের নিমিত্ত এই প্রত্যেক পদের পাঠ উপায় নয়। এখানে “প্রতিপত্তৌ” এই শব্দে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ ‘নিমিত্ত’, নিমিত্তার্থে সপ্তমী “চর্মশি দীপিনং হস্তি” এইস্থলে যেমন চর্ম শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে সপ্তমী। “শব্দানাং প্রতিপত্তৌ” এইস্থলে ‘শব্দানাং’ এখানে কর্মে বহী বিভক্তি। প্রত্যেক পদের [সাধুশব্দের], পাঠ, শব্দসকলের জ্ঞানের উপায় নয় কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই যেন বলেছেন—“এবং হি ক্ষয়তে বৃহস্পতিরিজ্জায়.....কিং পুনরজ্জয়ে।” এখানে “বৃহস্পতিরিজ্জায় দিব্যাং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নাস্তং জগাম।” এটি একটি প্রতিবাক্য। ইহা অর্থবাদ বাক্য। অর্থবাদ বাক্য ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত। ইহা কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তর্গত? তাহা জানা যায় না। মহাভাষ্যকারও এই বাক্যটি কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে, তাহা জানতেন না মনে হয়। কারণ তিনিও বলেছেন “এবং হি ক্ষয়তে” এইরূপ শোনা যায়। এই অর্থবাদ বাক্যটি যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা যদি মহাভাষ্যকার জানতেন তাহলে—“এবং হি ক্ষয়তে” এইরূপ না বলে “যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি” বলতেন অথবা কিছু না বলে কেবল এই প্রতি বাক্যটি উদ্ধৃত করতেন। হুতরাং মহাভাষ্যকারও ইহা বিশ্বদস্তীর মত লোকপরম্পরায় শুনেছিলেন। “দিব্যং বর্ষসহস্রম্” = দেবলোকে অর্থাৎ স্বর্গলোকের এক হাজার বৎসর। আমাদের মনুস্মৃতির এক বৎসর বা ৩৬৫ দিনে দেবতাদের এক অহোরাত্র হয়। সেই অহোরাত্রের পরিমাণে এক হাজার বৎসর বৃহস্পতি ইন্দ্রকে ‘শব্দপারায়ণ’ শাস্ত্র বলেছিলেন। মনুস্মৃতির ৩৬৫০০ হাজার

বৎসর পরিমিত হচ্ছে দেবতাদের এক হাজার বৎসর। এতদিন বলেও বৃহস্পতি সেই শব্দপারায়ণ শাস্ত্র শেষ করতে পারেন নাই। “শব্দপারায়ণ” এই শব্দটি কেবল যৌগিক নয়। যে শব্দ থেকে কেবলমাত্র প্রকৃতিও প্রত্যয়ের অর্থই বুঝা যায় তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন ‘পাচক’ শব্দটি যৌগিক। কারণ ‘পাচক’ শব্দের অর্থ পাককর্তা। এই ‘পাককর্তা’ অর্থটি প্রকৃতি-প্রত্যয় লভ্য। পচ্ ধাতুরূপ প্রকৃতির অর্থ ‘পাক’। আর ধূল [অক] প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা। সেইরূপ এই ‘শব্দপারায়ণ’ শব্দটি যদি যৌগিক হয়, তাহলে ‘শব্দানাংপারায়ণম্’ ‘শব্দানাং পারম্ দ্বয়তে অনেন’ অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দ সকলের] সাধুশব্দের] পারপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ অর্থে “শব্দ-পারায়ণম্” এই শব্দটিকে গ্রহণ করলে, তার দ্বারা বুঝা যায়—যে শাস্ত্রে শব্দ সকলের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্র। তাহলে “শব্দানাং শব্দপারায়ণম্” এস্থলে সমাসের অন্তর্গত নয় এমন “শব্দানাং” এই শব্দটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ‘শব্দপারায়ণ’ শব্দ থেকেই তো বুঝা যাচ্ছে—যে শব্দ সকলের পারগামী শাস্ত্র। এইজন্ত এই ‘শব্দপারায়ণম্’ শব্দটিকে ‘যোগরূঢ়’ বলতে হবে। যে শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়,—পৃথগ্ভাবে অর্থ না বুঝিয়ে সম্মিলিত ভাবে কোন প্রসিদ্ধ অর্থকে বুঝায় সে শব্দকে রূঢ় বলে। আর যে শব্দের সেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ অর্থে প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থেরও অদ্বয় হয় প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ পরিত্যক্ত হয় না—সেই শব্দটিকে ‘যোগরূঢ়’ বলে। এখানে ‘শব্দপারায়ণ’ শব্দটি সমুদিতভাবে শাস্ত্রবিশেষকে বুঝাচ্ছে, যে শাস্ত্রের দ্বারা সকল শব্দের জ্ঞান হয়। এই অর্থে এখানে যৌগিক বা প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থেরও সমদ্বয় হওয়ায় এই শব্দটি যোগরূঢ় হয়েছে (২০০)। এখন এখানে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে—“শব্দপারায়ণম্” এই যোগরূঢ় শব্দের দ্বারা বুঝা গেল যে “শাস্ত্রবিশেষ” ই উক্ত শব্দের অর্থ। “শব্দানাং শব্দপারায়ণম্” এর অর্থ হলো শব্দসমূহের বোধক শাস্ত্রবিশেষ। এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় এখানে পৃথক্ “শব্দানাং” এই শব্দটিতে পুনরুক্তি দোষ হলো না। কিন্তু “শব্দপারায়ণম্” এই শব্দ থেকে যে শাস্ত্রবিশেষ বুঝা গেছে সেই শাস্ত্রটি শব্দ সকলের বোধক শাস্ত্র—এই

অর্থটিও বুঝা গেছে। কারণ ঐ শব্দটি যোগরূঢ় বলে—তাতে যৌগিক অর্থ হচ্ছে যে শব্দ সকলের পারগামী অর্থাৎ বোধক শাস্ত্র। সুতরাং শব্দপারায়ণম্” এই শব্দের দ্বারা যে অর্থ [শব্দসকলের বোধক] পাওয়া গেছে, সেই অর্থের একাংশ যে “শব্দ সকলের”—সেই অর্থটিকে “শব্দানাম্” এই শব্দটি বুঝাচ্ছে বলে ‘অর্থের পুনরুক্তি’ হয়ে গেল। শব্দের পুনরুক্তি নিবারণিত হলেও অর্থের পুনরুক্তি দোষ থেকে গেল। এর উত্তরে কৈয়ট বলেছেন উক্ত প্রতিবাক্যে যে “প্রতিপদোক্তানাম্” এই শব্দটি আছে—তার অর্থ হচ্ছে “প্রত্যেকপদে পঠিত”। প্রত্যেকপদে পঠিত কে? এখানে বিশেষ্য কে? ‘প্রতিপদোক্তানাম্’ এই শব্দটি বিশেষণ বলে বুঝা যাচ্ছে, এই বিশেষণের বিশেষ্য হচ্ছে শব্দ। প্রত্যেক পদে পঠিত হচ্ছে শব্দ। এই শব্দরূপ বিশেষ্যটি যদিও ‘শব্দপারায়ণম্’ এই শব্দ থেকে অর্থসিদ্ধ রূপে গম্যমান হয় তথাপি স্পষ্ট করে সেই বিশেষ্যকে বুঝাবার জন্য ‘শব্দানাম্’ এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। ‘শব্দ’ রূপ বিশেষ্যকে বুঝানো এই “শব্দানাম্” শব্দের কার্য বলে অর্থের পুনরুক্তি হয় নাই (২০৫)।

মোটকথা—এই অর্থবাদ বাক্যের দ্বারা ইহাই জানা গেল প্রত্যেক পদের পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করে সাধু শব্দসকলের উপদেশক একগ্রন্থ ছিল, তারনাম “শব্দপারায়ণ”। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দেবতাদের পরিমাণে এক হাজার বৎসর ঐ শাস্ত্র শুনিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নাই। মহাভাষ্যকার বলেছেন—যেখানে বৃহস্পতি উপদেষ্টা আর ইন্দ্র ঐধ্যোতা বা শ্রোতা—উভয়েই বহুবর্ষজীবী। তবুও প্রত্যেক পদের পাঠ করে সকল শব্দ শেষ করতে পারেন নাই, সেখানে আধুনিক কালের মানুষ যে প্রত্যেক পদের পাঠ করে শব্দজ্ঞান লাভ করতে পারবে না—তাতে আর বলার কি আছে। এখনকার মানুষের পক্ষে ঐভাবে শব্দজ্ঞান লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। “অজ্ঞে” শব্দটি একটি অব্যয়। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের আয়ুঃ প্রাচীনকালের মানুষের চেয়েও অনেক বেশী। সেই দেবতারা শব্দপারায়ণ শাস্ত্র শেষ করতে পারেন নাই। সুতরাং প্রাচীন কালের মানুষও সেই শাস্ত্র শেষ করতে পারেন নাই। আর আজকালকার মানুষের তো কথাই নাই। আজকালকার মানুষের মধ্যে

যদি কোন মাঠস্থ সবচেয়ে বেশীদিন বাঁচে, সে একশত বৎসরই বাঁচে ; তার বেশী বাঁচেনা। আবার এই সাধুশব্দের জ্ঞান কেবল গুরুর নিকট থেকে শুনলেই বা অধ্যয়ন করলেই যে সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তা নয়। প্রথমে গুরুর নিকটে শ্রবণ বা অধ্যয়ন করে শব্দের প্রাথমিক জ্ঞান হয়। তারপর নিজে সেই শাস্ত্রের অভ্যাস অর্থাৎ সেই শব্দগুলি আয়ত্তকরা এবং তার অর্থ নিশ্চয় করা রূপ দ্বিতীয় স্তরে শব্দের জ্ঞান, আরও পরিপক হয়। তারপর অধ্যাপনা কালে তৃতীয়স্তরে আরও শব্দের জ্ঞান সুপরিপক হয়। শেষে সেই শব্দজ্ঞান, ব্যবহারের দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্মে মন্ত্রাদির প্রয়োগ এবং মন্ত্রাদি ব্যতীতও কতকগুলি ক্ষেত্রে লৌকিক প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, শব্দজ্ঞান দ্বারা বেদের অর্থ জ্ঞানে যোগাদি অভ্যাসরূপ ব্যবহারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে, তখন শব্দজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। মহাভাষ্যকার বলেছেন এই ভাবে চার অবস্থায় বিদ্যার উপযোগিতা আছে। চার প্রকারে বিদ্যার উপযোগিতা প্রাপ্ত হলে তবেই বিদ্যার সার্বকতা বা পূর্ণতালাভ হয়। “চতুর্ভিচ্চ প্রকারৈবিত্তোপযুক্তা ভবতি, আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি।” এখানে ‘আগম’ শব্দের অর্থ অধ্যয়ন—গুরুর নিকট থেকে শ্রবণ। ‘স্বাধ্যায়’ শব্দের অর্থ অভ্যাস। ‘প্রবচন’ শব্দের অর্থ অধ্যাপনা। আর ‘ব্যবহার’ শব্দের অর্থ যজ্ঞাদি কর্মে প্রয়োগ। চারটি প্রকারের দ্বারা বিদ্যা উপযুক্ত হয়। এখানে এই প্রকার শব্দের অর্থ ‘কাল’ এই কথা নাগেশ ভট্ট বলেছেন। চারটি কালের দ্বারা বিদ্যা উপযুক্ত অর্থাৎ উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যার উপযোগিতার অধিকরণ হচ্ছে কাল, এই কাল বিদ্যার উপযোগিতার অধিকরণ হলেও বিদ্যারও অধিকরণ হয়। সুতরাং “চতুর্ভূ প্রকারেষু বা চতুর্ভূ কালেষু বিদ্যা উপযুক্তা ভবতি” এইরূপ বলা উচিত ছিল। তা না বলে “চতুর্ভিঃ” ইত্যাদিরূপে তৃতীয়া কেন বললেন। তার উত্তরে নাগেশ বলেন সেই আধারভূতকালকে করণ বিবক্ষা করায় তৃতীয়ার নির্দেশ করেছেন। তার ফলিত অর্থ হচ্ছে “চতুর্ভূ কালেষু” অর্থাৎ চারটি বিভিন্ন কালে বিদ্যার উপযোগ হয়। নাগেশ আরও বলেছেন— আগমকালে ও স্বাধ্যায়কালে অর্থাৎ অধ্যয়নকালে ও অভ্যাসকালে লোকে বিদ্যার্থীকে ‘এই বিদ্যার্থী বুদ্ধিমান’ বলে আদর পূর্বক অন্নবস্ত্রাদি দান করে। অতএব আগমকাল ও স্বাধ্যায়কালে অন্নবস্ত্রাদির লাভই বিদ্যার উপযোগ। আর তৃতীয় অর্থাৎ অধ্যাপনাকালে অধ্যাপকের প্রতিষ্ঠা হয়, উত্তম শিষ্যপ্রাপ্তি হচ্ছে

তার দ্বারা দক্ষিণালাভ ও সংকার প্রভৃতি হয়, এই প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিই তৃতীয়কালে বিদ্যার উপযোগ। আর চতুর্থ কালে বা যজ্ঞাদির অমুষ্ঠানকালে অপশব্দের প্রয়োগজনিত যে প্রায়শ্চিত্ত, সেই প্রায়শ্চিত্তের অভাব, অজ্ঞাদির সহিত কৰ্ম্মামুষ্ঠান, দক্ষিণালাভ ও প্রতিষ্ঠা এইগুলি বিদ্যার উপযোগিতা। সাধুশব্দের জ্ঞানবশত বিদ্বান্ ব্যক্তি যজ্ঞে অপশব্দ প্রয়োগ করেন না। অতএব অপশব্দের প্রয়োগ করলে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, তা আর বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকে করতে হয় না। এইভাবে চারকালে বিদ্যার উপযোগিতা হলে তবেই সম্পূর্ণ অধ্যয়ন হয়। কেবলমাত্র গুরু নিকট থেকে শ্রবণ করলেই অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। প্রত্যেক পদের পাঠের দ্বারা যদি শব্দের জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তাহলে শব্দজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব হয়। যেহেতু আধুনিক কালের অম্মাণ্যুঃ মানুষের শব্দের শ্রবণ কালেই আয়ুঃ সমাপ্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক শব্দের শ্রবণ করতে করতেই তার মৃত্যু উপস্থিত হবে; তার আর অভ্যাস, অধ্যাপনা ও যজ্ঞাদিকর্ম্ম করা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। অথচ অভ্যাসাদি না করলে বিদ্যা সম্পূর্ণ হবে না।

সুতরাং প্রত্যেক পদের পাঠ, শব্দের জ্ঞানে উপায় হতে পারে না।

প্রত্যেক শব্দ পাঠ করে যে সমস্ত শব্দের [সাধুশব্দের] জ্ঞান সম্ভব নয়, এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে ভরদ্বাজ নামক ঋষি ইন্দ্রের আরাধনা করে ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে তাঁর অমুগ্ধাহে তিনশত বৎসর আয়ুঃ লাভ করেছিলেন। সেই তিনশত বৎসরের সমস্ত বৎসরই তিনি গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বেদাধ্যয়ন করতেন। তিনশত বৎসরের শেষে জরাজীর্ণ হয়ে ভরদ্বাজ বেদাধ্যয়নে অসমর্থ হয়ে শুয়ে আছেন দেখে, ইন্দ্র এসে ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করলেন ভরদ্বাজ! ভোম্মাকে যদি আরও একশত বৎসর আয়ুঃ দিই, তা হলে কি করবে? ভরদ্বাজ উত্তর দিলেন—বেদ অধ্যয়ন করব। তখন ইন্দ্র নিজের যোগবলে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদকে তিনটি বিশাল পর্বতরূপে পরিণত করে পূর্বে ভরদ্বাজের অজ্ঞাত অবস্থায় সেই তিনটি পর্বতকে পৃথক্ পৃথক্ তিন স্থানে স্থাপিত করে ভরদ্বাজকে দেখিয়ে বললেন। এই দেখ ভরদ্বাজ এই তিনটি পর্বত সমূহ বেদ। তারপর ইন্দ্র সেই তিনটি পর্বত থেকে তিন মুঠো ধূলা এনে ভরদ্বাজকে দেখিয়ে বললেন এই দেখ ভরদ্বাজ এই তিন মুঠো ধূলা হল, তিন বেদ, সুতরাং তিনটি পর্বত

রূপ আরও অনন্ত বেদ আছে। তুমি তিনশত বৎসরে এই তিন মুষ্টি ধূলা পরিমিত বেদমাত্র অধ্যয়ন করেছে। এর অতিরিক্তি এই বিশাল বেদ তোমার অজ্ঞাত। সুতরাং সমস্ত বেদের অধ্যয়ন অসম্ভব। এই বলে ইন্দ্র ভরদ্বাজকে সবিতৃসম্বন্ধী অগ্নিবিদ্যার উপদেশ দিলেন। ভরদ্বাজ সেই বিদ্যালাভ করে অমৃত হয়ে স্বর্গে গেলেন (১০৬) ॥ ৩৬ ॥

মূল

কথং তর্হীমে শব্দাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ ? কিঞ্চিংসামান্তবিশেষলক্ষণং প্রবর্ত্যাম্। যেনান্নেন যজ্ঞেন মহতৌ মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যে-
রন্। কিং পুনস্তৎ ? উৎসর্গাপবাদৌ। কচ্চিৎসর্গঃ কর্তব্যঃ কচ্চিদ-
পবাদঃ। কথংজাতীয়কঃপুনরুৎসর্গঃ কর্তব্যঃ কথংজাতীয়কোইপবাদঃ ?
সামান্তেনোৎসর্গঃ কর্তব্যঃ। তদ্যথা—“কর্মণ্যন্” [৩.২.১]।
তস্য বিশেষ্যেণাপবাদঃ। তদ্ যথা—“আতোহমুপসর্গে কঃ”
[৩.২.৩] ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ :—তা হলে [প্রতিপদপাঠ, শব্দজ্ঞানের উপায় না হলে] কি
রূপে এইসকল [প্রতিপদ পাঠে দুজ্ঞেয়] শব্দের জ্ঞানলাভ হবে ? কিছু সামান্ত
ও বিশেষ বিশিষ্ট লক্ষণ [শাস্ত্র] প্রবর্তন করতে হবে। যাহাতে অল্প প্রযত্নে
বিশাল [বড়], বিশাল শব্দসমূহ [অধ্যোক্তগণ] জানতে পারবে [বিশাল
থেকে বিশালতর শব্দ সমূহ জানতে পারবে]।

তাহা [সামান্ত বিশেষের স্বরূপ] কি ? উৎসর্গ ও অপবাদ [সাধারণ
এ বিশেষ]। কোন কোন [লক্ষণ বা শাস্ত্র] টি সাধারণ [ভাবে] করতে
হবে, কোন কোন [শাস্ত্র] টি বিশেষ ভাবে [প্রণয়ন] করতে হবে। কি

(২০৬) ভরদ্বাজে হ ত্রিভিরাগ্নি ব্রহ্মসংস্থাস। তংহজীর্ণং হুবিং শব্দানমিত্র উপব্রজ্যোবাচ
ভরদ্বাজ, যন্তে চতুর্থমাদ্ভ্যাম্, কিমনেন কুর্থা ইতি। ব্রহ্মসংস্থেনেন চরৈরমিতি হোবাচ। তং হ ত্রীন্
গিবিরগানবিক্রান্তানি বর্ণয়াক্ষর। তেবাং হৈকৈকস্মাদ্ভিমান্দে। স হোবাচ ভরদ্বাজেতামহয়।
বেদা বা এতে। অনন্তা বৈ বেদাঃ। এতবা এতৈস্ত্রিভিরাগ্নিভিরবোচোঃ। অথ ত ইতরদনুজ্ঞেব।
এহাং বিদ্ধি। অহংবৈ সর্ববিভেতি। তস্মৈ হৈতমগ্নিঃ সাত্বিত্রযুবাচ। তং স বিদ্ধিত্যমুতো
ভূত্বা-সর্গং লোকমিয়ার। [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১১.৩৫] গৌতম ধর্মহত্বের ব্যাখ্যায় হরদত্ত ও
বলেছেন—

জানন্ত্যাগাংগাণাং প্রতিপদপাঠো ন শব্দাঃ। [গৌতমধর্মসূত্র ১৬।৩২]

প্রকারে উৎসর্গ [সাধারণ] করতে হবে, কি প্রকারে আপবাদ [বিশেষ করতে হবে]? সামান্যের [সামান্য শাস্ত্রের] দ্বারা উৎসর্গ [সাধারণ-নিয়ম] করতে হবে। যেমন “কর্মণ্যৎ” [৩।২।১]। বিশেষের [বিশেষ শাস্ত্রের] দ্বারা তার বাধ [করতে হবে]। যেমন “আতোহুপসর্গে কঃ” [৩।২।১] ॥ ৩৭ ॥

বিবৃতি :—প্রতিপদের পাঠ দ্বারা সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ অসম্ভব বলা হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসা হওয়াই স্বাভাবিক যে তাহলে কি উপায়ে সমস্ত সাধুশব্দের জ্ঞান অর্জন করা যাবে। লোকের এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাই, মহাভাষ্যকার প্রণবাক্যে সূচিত করেছেন “কথং তর্হি ইমে শব্দাঃ প্রতি পদ্ব্যাঃ?” কি প্রকারে বা কি উপায়ে তা হলে এই সকল শব্দ জ্ঞাতব্য হবে? প্রত্যেক পদের পাঠের দ্বারা যদি শব্দ সমূহের জ্ঞান লাভ অসম্ভব হয়, তা হলে অতঃ কি উপায়ে এই প্রতিপদপাঠে দৃষ্টির শব্দ সমূহের জ্ঞান অর্জিত হবে? ইমে—শব্দের এই বিশেষণটির দ্বারা “এই সকল প্রতিপদ পাঠে দৃষ্টির” এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“কিঞ্চিৎ সামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্যম্, যেনাল্লেন যত্বেন মহতো মহতঃ শব্দোঘান প্রতিপদ্যোরন্।” সামান্য বিশেষযুক্ত কিঞ্চিৎ লক্ষণ প্রবৃত্ত কবতে হবে; যার দ্বারা অল্প যত্নে বিশাল শব্দ সমূহ লোকে জ্ঞানতে পারবে। এই বাক্যে ‘সামান্যবিশেষবৎ’ এই শব্দটি ‘লক্ষণ’ এর বিশেষণ। লক্ষণের আর একটি বিশেষণ হচ্ছে ‘কিঞ্চিৎ’। এই ‘সামান্যবিশেষবৎ’ বলতে কি ইবার্থে ‘বতুপ্’ প্রত্যয় করে সামান্য ও বিশেষের মত এই অর্থ গ্রহণ করতে হবে অথবা ‘সামান্যবিশেষো’ এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস যুক্ত শব্দের উত্তর অস্তি অর্থে ‘মতুপ্’ প্রত্যয় করে—‘সামান্যবিশেষবিশিষ্ট’ এইরূপ অর্থ বুঝতে হবে? এইরূপ আশঙ্ক্য সমাধানে কৈয়ট বলেছেন—“সামান্যবিশেষো যস্মিন্ স্তংসামান্য-বিশেষবৎ” সামান্য এবং বিশেষ আছে যাতে তাহা সামান্যবিশেষবৎ। স্তত্রাং বুঝা যাচ্ছে ভাষ্যর এই শব্দটি “সামান্যবিশেষো” এই দ্বন্দ্ব সমাসযুক্ত শব্দের উত্তর অস্তি অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। সামান্য ও বিশেষ যাহাতে আছে এইরূপ যে লক্ষণ তাহা সামান্যবিশেষবৎ। কিন্তু যাহা সামান্য বিশেষ তাহাই তো লক্ষণ হয়; লক্ষণটি সামান্য বিশেষাত্মক। যেমন গরুর লক্ষণ সান্নাদি। সান্না বা গলকঙ্কল প্রভৃতি গরুর লক্ষণ। এই গলকঙ্কল প্রভৃতি সমস্ত

গুরু সামান্ত্যধর্ম, আর গো মহিষ অশ্বাদির মধ্যে গুরু বিশেষধর্ম। গুরুব্যতীত মহিষাদিতে এই সামান্ত্য নাই, গুরুমাত্রে আছে, এই জন্ত উহা [সামান্ত্য] বিশেষ। আর সকল গোসামধারণ বলে সামান্ত্য সকল গুরু সামান্ত্য ধর্ম। এইভাবে দেখা যাচ্ছে লক্ষণটি সামান্ত্যবিষয়ক। অথচ মহাভাষ্যে “সামান্ত্য বিশেষবলক্ষণং” সামান্ত্যবিশেষযুক্ত লক্ষণ এই কথা বললেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় মহাভাষ্যে “সামান্ত্যবিশেষবলক্ষণম্” এই স্থলে লক্ষণ শব্দের অর্থ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীরূপ শাস্ত্র। যাহার দ্বারা লক্ষিত হয় তাহা লক্ষণ। সূত্র বা শাস্ত্রের দ্বারা সাধুশব্দ লক্ষিত হয়, এই জন্ত সূত্ররূপ-শাস্ত্রই এখানে লক্ষণ; আর লক্ষ্য হচ্ছে সাধুশব্দ। এখন সূত্রে বা শাস্ত্রে বহন লক্ষণ শব্দের অর্থ হলো, তখন এই সূত্র বা শাস্ত্রে সামান্ত্যের এবং বিশেষের উল্লেখ আছে বলে শাস্ত্র বা সূত্র সামান্ত্যবিশেষবৎ হতে পারল (২০৭)।

এইভাবে সামান্য বিশেষবিশিষ্ট সূত্ররূপশাস্ত্র প্রবর্তন করতে হবে, বার দ্বারা মহৎ মহৎ শব্দ সমূহ লোকে অল্প যত্নে জানাতে পারবে। ভাগ্যে যে “মহতো মহতঃ শব্দৌদ্যান্ প্রতিপত্তোরন” এই কথা বলা হয়েছে এখানে মহৎ বলতে ‘বড’ এইরূপ অর্থ নয়। বড বড শব্দ জানা যাবে ছোট, ছোট শব্দ জানা যাবে না এইরূপ তাৎপর্থে “মহতঃ” শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু এখানে ‘মহৎ’ শব্দের অর্থ অনেক। এক একটি সূত্রের দ্বারা অনেক সংখ্যক শব্দ সংগৃহীত হয়ে যাবে। প্রত্যেক পদের পাঠ করে করে শব্দের জ্ঞান করতে গেলে যে গুরুতর প্রয়াস করতে হত, সামান্ত্য বিশেষবিশিষ্ট সূত্রের দ্বারা শব্দের জ্ঞানে অনেক কম পরিশ্রম করতে হবে। হয়ত একটা সূত্রের দ্বারা হাজার খানিক কি তার চেয়েও বেশী শব্দের জ্ঞান হয়ে যেতে পারে। “মহতো মহতঃ” এস্থলে ‘মহত্’ শব্দের দ্বিতীয় বহুবচনান্ত রূপটি “শব্দৌদ্যান্” ইহার বিশেষণ। বীজা অর্থে দ্বিগু হয়েছিল। অনেক অনেক শব্দ রাশি = সামান্ত্য-বিশেষবহীন্ লক্ষণের দ্বারা জানা যাবে। অথবা পূর্বের ‘মহতঃ’ এই শব্দটি ‘মহৎ’ শব্দের পঞ্চমীর একবচনের রূপ আর দ্বিতীয় ‘মহত্’ শব্দটি উক্ত শব্দের দ্বিতীয় বহুবচনের রূপ—এইভাবে গ্রহণ করাও যেতে পারে। মহৎ থেকে মহৎ অর্থাৎ অনেক থেকে অনেক শব্দ সংগৃহীত হয়ে যাবে।

এখন এর উপরে মহাভাষ্যকার এর উঠিয়েছেন “কিং পুনঃ” জাহা কি ? অর্থাৎ যে সামান্তবিশেষবিশিষ্ট লক্ষণের প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে সেই সামান্ত ও বিশেষের স্বরূপটি কি ? এর উত্তরে মহাভাষ্যকার নিজেই বলেছেন—
 “উৎসর্গাপবাদো । কচ্চিৎসর্গঃ কর্তব্যঃ কচ্চিৎপবায়ঃ ।” সাধারণ ও বাধক । কোন সাধারণ নিয়ম করতে হবে, আবার কোন বাধক বা বিশেষ নিয়ম করতে হবে । সামান্তের স্বরূপ হচ্ছে উৎসর্গ অর্থাৎ ব্যাপ্তি । বাহা অধিক স্থলে ব্যাপ্ত তাহা সামান্ত । আর বিশেষের স্বরূপ হচ্ছে অপবাদ অর্থাৎ বাধক । “অপোত্ততে অনেন” বাধিত হয় যার দ্বারা এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে অপূর্বক বদধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে অপবাদ শব্দটি নিষ্পন্ন হয় । তার অর্থ বাধক । বাহা সামান্তকে বাধা দেয় তাহা অপবাদ ! এই ভাবে সামান্ত ও বিশেষের স্বরূপ বলে মহাভাষ্যকার বলেছেন কোন উৎসর্গ করতে হবে অর্থাৎ কতক কতক সাধারণ নিয়ম করতে হবে, আর কতক কতক বিশেষ নিয়ম করতে হবে ।

এই কথার উপরেই ভাষ্যকার নিজে প্রায় উঠিয়েছেন ‘কথংজাতীয়কঃ পুনরুৎসর্গঃ কর্তব্যঃ কথংজাতীয়কোহপবাদঃ’ কিপ্রকারে সামান্তনিয়ম করা হবে, কি প্রকারে বিশেষ নিয়ম করা হবে । “কথংজাতীয়কঃ” এই শব্দে “প্রকারবৎ” অর্থে ‘জাতীয়ক’ প্রত্যয় হয়েছে এবং প্রকার অর্থে কিম্ শব্দের উত্তর ‘খম্’ প্রত্যয় হয়েছে । এই ভিত্তি এখানে “কথংজাতীয়কঃ” শব্দের অর্থ কিরূপ-প্রকারবিশিষ্টক, তাৎপর্যার্থ হচ্ছে কিপ্রকারে—কিভাবে ।

এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন “সামান্তেনোৎসর্গঃ কর্তব্যঃ । তদ্ বথা—কর্মণ্যন্ তন্ত বিশেষণাপবাদঃ । তদ্ বথা—আতোহনুপসর্গে কঃ ।”

সামান্তসূত্রের দ্বারা সাধারণ নিয়ম করা হবে । যেমন ‘কর্মণ্যন্’ ॥ বিশেষ সূত্রের দ্বারা সেই সাধারণ নিয়মের বাধ করা হবে । যেমন ‘আতোহনুপসর্গে কঃ ।’ ‘উৎসর্গশব্দের অর্থ সামান্ত বা সাধারণ । আর সামান্ত শব্দের অর্থও সামান্ত । তা হলে ভাষ্যকার ‘সামান্যেন উৎসর্গঃ কর্তব্যঃ’ এই অংশের অর্থ হবে “সামান্তের দ্বারা সামান্ত করবে ।” এইরূপ অর্থ অনুপপন্ন । পুনরুৎসর্গদোষও আছে । এইজন্য “সামান্যেন” এই শব্দের অর্থ করতে হবে সামান্ত শাস্ত্র বা সূত্র । আর “উৎসর্গঃ” এই শব্দের অর্থ হবে সামান্ত নিয়ম ।

একপ অর্থ করলে আর অল্পপত্তি হয় না। সামান্ত সূত্রের দ্বারা সামান্ত নিয়ম করতে হবে।

আর বিশেষসূত্রের দ্বারা সেই সামান্তের বা সামান্ত নিয়মের অপবাদ অর্থাৎ বাধ করতে হবে। এখানে “অপবাদ” শব্দটি ভাববাচ্যে যৎসু বলে এর অর্থ হবে বাধ। সামান্য সূত্র কি? ইহা বুঝাবার জন্য তদ্ বধা ‘কর্মণ্যণ্’? আর বিশেষ সূত্র কি ইহা বুঝাবার জন্য ‘তদ্ বধা—‘আতোহ-
ল্পপসর্গে কঃ’ ইহা ভাব্যাকার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রদর্শন করেছেন।

‘কর্মণ্যণ্’ এইটি সামান্ত সূত্র, কর্মরূপ [কর্মকারকরূপে দ্বিতীয়াস্ত] উপপদ পূর্বক ধাতুর উত্তর + অণ্ প্রত্যয় হয়। যেমন ‘কৃন্তং করোতি’ এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে কৃন্তন্ এই কর্মরূপ উপপদ পূর্বক কৃ ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় করলে ‘কৃন্তকার’ শব্দ সিদ্ধ হয়। এই একটি সামান্ত সূত্রের দ্বারা কৃন্তকার, কাণ্ডলাব, শক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ ইত্যাদি অনেক শব্দের জ্ঞান হয়ে যায়। আর “আতোহল্পপসর্গে কঃ” এইটি বিশেষ সূত্র। উপসর্গ পূর্বে না থাকলে অর্থাৎ উপসর্গরূপ উপপদ না থাকলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর ‘ক’, প্রত্যয় হয়।

কর্মণ্যণ্ সূত্রে বলা হয়েছে কর্মরূপ উপপদ পূর্বে থাকলে যে কোন ধাতুর উত্তর অর্থাৎ সকল ধাতুর উত্তরই অণ্ প্রত্যয়ের প্রাপ্তি আছে বলে উক্ত প্রত্যয়ের স্থল অনেক ব্যাপক হওয়ায় ইহা সামান্ত নিয়ম হলো। আর “আতোহল্পপসর্গে কঃ” এইসূত্রে বলা হলো উপসর্গ ভিন্ন উপপদ পূর্বে থাকলে কেবল মাত্র আকারান্ত ধাতুর উত্তর, ক প্রত্যয় হবে। সুতরাং এইসূত্রের স্থল [কার্য] অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল বলে এই সূত্রটি বিশেষ সূত্র। এর দ্বারা সামান্ত নিয়মের বাধ হবে। “কর্মণ্যণ্” এই সামান্ত সূত্রের দ্বারা সব ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ থাকায় আকারান্ত ধাতুর উত্তরও “অণ্” প্রত্যয়ের প্রাপ্তি হয়েছিল। কিন্তু “আতোহল্পপসর্গে কঃ” এই সূত্র আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয়ের বিধান করার আকারান্ত ধাতুর উত্তর প্রাপ্ত অণ্ প্রত্যয় বাধিত হয়ে যাবে অর্থাৎ অণ্ প্রত্যয় হবে না। এই জন্য বিশেষ সূত্র সামান্তের অপবাদ অর্থাৎ বাধক হয় বলা হয়েছে। এই বিশেষের দ্বারা সামান্যের বাধ বিষয়ে বহু বিচারের অবকাশ আছে। বাহ্যিক ভাবে এখানে তার বর্ণনা করা হলো না। বাই হোক এই “আতোহল্পপসর্গে কঃ” এই বিশেষ সূত্রের দ্বারাও ধনদ, ধান্দ, গোদ, ইত্যাদি দ্ব্যর্থক জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। অতএব

এইভাবে সামান্য ও বিশেষ সূত্রের প্রবর্তন করলে ব্যাকরণের দ্বারা অল্প বস্তু সন্ধান সাধুশব্দের জ্ঞান লাভ হবে, প্রতিপদ পাঠের দ্বারা শব্দের জ্ঞানলাভ অসম্ভব—ইহাই এখানে মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় ॥ ৩৭ ॥

মূল

কিং পুনরাবৃত্তিঃ পদার্থ অহোষিদ্ভব্যাম্ ? উভয়মিত্যাহ । কথং জায়তে ? উভয়থা হ্যাচার্ণেণ সূত্রানি পঠিতানি । আকৃতিং পদার্থং যদ্বা “জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্ততরস্যাম্” [১২।৫৬] ইত্যাচ্যতে । জব্যং পদার্থং যদ্বা ‘সরূপাণাম্’ [১২।৬৩] ইত্যেকশেষ আরভ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ :—পদের অর্থ কি জাতি অথবা জব্য [ব্যক্তি] ? উভয় [জাতি এবং ব্যক্তি উভয়]—ইহা বলেন [বৈয়াকরণ] । কিরূপে জানা যায় ? [উভয়ই যে পদের অর্থ তাহা কিরূপে জানলে] । আচার্ণ [পানিনি] উভয় প্রকারেই সূত্র সকল পাঠ করেছেন [উচ্চারণ করেছেন] । জাতি পদার্থ [ইহা] মনে করে “জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্ততরস্যাম্” ইহা [এই সূত্র] বলেছেন । জব্য [ব্যক্তি] পদার্থ [ইহা] মনে করে ‘সরূপাণাম্’ [সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ] এই [এইসূত্রে] একশেষ আরম্ভ করেছেন ॥ ৩৮ ॥

বিশৃতি :—শব্দানুশাসনের প্রয়োজন বলা হয়েছে । কিভাবে শব্দের অনুশাসন করতে হবে তাহাও বলা হয়েছে । সামান্যসূত্র ও বিশেষসূত্রের দ্বারা শব্দের উপদেশ করা হবে—ইহাই মহাভাষ্যকার পূর্বে বলে এসেছেন । শব্দের স্বরূপ অনেক পূর্বে বলেছেন । এখন জিজ্ঞাসা হয়—সামান্য সূত্র বা বিশেষ সূত্রগুলি বাক্যাত্মক বলে—সেই সূত্রবাক্যের ঘটক পদের অর্থ কি । এই জিজ্ঞাসা হওয়ায় প্রশ্ন করেছেন—‘কিং পুনরাবৃত্তিঃ পদার্থ অহোষিদ্ ভব্যাম্ ?’ পদের অর্থ কি জাতি অথবা ব্যক্তি ? এখানে প্রশ্নবাক্যের অন্তর্গত ‘আকৃতি’ শব্দের অর্থ জাতি । ‘আকৃতি’ শব্দটি জাতি অর্থেই যে সমধিক প্রসিদ্ধ তাহা

এই গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে । যে পদার্থ দ্বারা সকল ব্যক্তিতে একাকার জ্ঞান হয়, সেই পদার্থকে জাতি বলা হয় । সকল গোব্যক্তিতে ইহা গরু, ইহা গরু, এইভাবে একাকার জ্ঞান আমাদের হয় ; একাকার জ্ঞান একটি অল্পগত পদার্থ ব্যতীত হতে পারে না । এই অল্পগত পদার্থটি জাতি । গোষটি সকল গরুতে অল্পগত । এইজন্ত উহা জাতি । এইরূপ অন্তর্জ্ঞও বুঝতে হবে ।

এই ভাষ্যে যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি উল্লিখিত আছে, তাই অর্থ ব্যক্তি। অসাধারণ এক
একটি পদার্থকে ব্যক্তি বলা হয়। যেমন প্রত্যেক গন্ধ এক একটি ব্যক্তি। এই
জ্ঞাতি ও ব্যক্তির মধ্যে কোনটি, পদের অর্থ? ইহাই প্রশ্নের অভিপ্রায়। এই
প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“উভয়মিত্যাৎ”। উভয়ই অর্থাৎ জ্ঞাতি
এবং ব্যক্তি এই উভয়ই পদের অর্থ। উভয়ই পদের অর্থ—মহাভাষ্যকার ইহা
বলাভে—পূর্বপক্ষী ভিজ্ঞাসা করছেন—“কথং জ্ঞাতং”? জ্ঞাতি এবং ব্যক্তি
উভয়ই যে পদের অর্থ, তাহা জানলে কিরূপে? সূত্রকার পাণিনি যে সকল
সামান্তসূত্র এবং বিশেষ সূত্র রচনা করেছেন, সেই সূত্রটুক পদের অর্থ
জ্ঞাতি এবং ব্যক্তি উভয়ই—ইহা কি করে [সিদ্ধান্তী] জানলে? এর উত্তরে
মহাভাষ্যকার বলেছেন—“উভয়থা হ্যাচাৰ্ধেণ সূত্রানি পঠিতানি। আকৃতিং
পদার্থং যস্মা ‘জাত্যাখ্যায়ামেকশ্বিন্ বহুবচনমন্ততত্ত্বমিত্যাচ্যতে। ব্রহ্মং
পদার্থং যস্মা ‘সন্ধপাণাম্’—ইত্যেকশেষ আরভ্যতে।” আচাৰ্ধ [পাণিনি]
উভয় প্রকারে অর্থাৎ জ্ঞাতিকে পদার্থ বলে গ্রহণ করে এবং ব্যক্তিকে পদার্থ
বলে গ্রহণ করে সূত্রপাঠ করেছেন অর্থাৎ সূত্রের রচনা করেছেন। জ্ঞাতিকে
পদার্থ বলে নিশ্চয় করে ‘জাত্যাখ্যায়ামেকশ্বিন্ বহুবচনমন্ততত্ত্বম্’—এই সূত্র
রচনা করেছেন। এই সূত্রের অর্থ হচ্ছে জ্ঞাতি বুঝালে একত্ব অর্থে শব্দের
উত্তর বিকল্পে বহুবচন হয়। কেবলমাত্র ব্যক্তিই যদি পদের অর্থ রূপে
সৰ্বত্র সিদ্ধ হত, তাহলে ‘সম্পন্নাব্রীহয়ঃ’ ইত্যাদি প্রয়োগে ব্রীহি [ধান্ত]
ব্যক্তি অনেক বলে ‘ব্রীহি’ শব্দের উত্তর অনায়াসে বহুবচন সিদ্ধ হয়ে যেত। সেই
বহুবচনের জন্য “জাত্যাখ্যায়ামেকশ্বিন্” ইত্যাদি সূত্র রচনা করবার প্রয়োজন
হত না। অতএব পাণিনি এই সূত্র রচনা করেছেন। এই সূত্র রচনা থেকে
বুঝা যাচ্ছে জ্ঞাতিও পদের অর্থ হয়। “সম্পন্নাব্রীহয়ঃ” এখানে ‘ব্রীহি’
পদের অর্থ ব্রীহি জ্ঞাতি। জ্ঞাতি একটি বলে সেই একত্ব অর্থে বহুবচন হতে
পারতো না। বিকল্পে বহুবচন করবার জন্য এখানে পাণিনি উক্ত সূত্র
রচনা করেছেন। আবার ব্যক্তিকে পদার্থ বলে নিশ্চয় করে পাণিনি—
“সন্ধপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ” এই স্থলে একশেষ অর্থাৎ একশেষের প্রতি-
পাদক সূত্র আরম্ভ করেছেন। কেবলমাত্র জ্ঞাতিই যদি সৰ্বত্র পদার্থ বলে সিদ্ধ
হত তা হলে ‘জ্ঞাতি’ এক বলে সেই একত্ববিশিষ্ট জ্ঞাতি বুঝাতে সম্ভাব্যতাই
একটি সূত্রের প্রয়োগ সিদ্ধ হয়ে যেত। এই একটি শব্দের প্রয়োগ অবশিষ্ট

করবার জন্য ‘সরুপাণাম্’ ইত্যাদি সূত্র রচনার প্রয়োজন হত না। অভিপ্রায়ঃ এই যে—একপ্রকার বিভক্তি পরে থাকলে সমান আকারেব দুই বা বহুশব্দের মধ্যে একটি শব্দ অবশিষ্ট থাকবে—ইহাই হচ্ছে সরুপাণামিত্যাদি সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ। যেমন দুটি গরুবুঝাবার জন্য দুইবার একই প্রথমবিভক্ত্যন্ত গৌশ্চ-গৌশ্চ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করলে সেই দুইটি শব্দের একটি মাত্র অবশিষ্ট থাকবে—সেখানে ‘গাৰৌ’ এইরূপ প্রয়োগ হবে। এইরূপ অনেক গরুকে বুঝাবার জন্য তিনবার বা তার অধিক ঐ এক আকারের শব্দের প্রয়োগ করলেও তার মধ্যে একটি অবশিষ্ট থাকবে। “গৌশ্চ গৌশ্চ গৌশ্চ” এইরূপ উল্লেখ করলে ঐ তিনটি শব্দের একটি অবশিষ্ট থেকে “গাবঃ” এইরূপ প্রয়োগ হবে। এখন কেবলমাত্র জাতিই যদি সংজ্ঞা পদের অর্থ হয়, তাহলে গোব্রজাতি তো একটি। সেই একটি পদার্থ বুঝাবার জন্য একবার ‘গো’ শব্দের প্রয়োগ তো এমনিই সিদ্ধ হয়ে যেত। তার জন্য ‘সরুপাণাম্’ ইত্যাদি সূত্র ব্যর্থ হয়ে যেত। জাতি দুই নয় যাতে “গৌঃ গৌঃ” এইরূপ দুইবার বা তিন চারবার শব্দের প্রয়োগের অবকাশ হত এবং এই দুই তিন শব্দের একটিকে অবশিষ্ট করবার আবশ্যকতা থাকত। কিন্তু ‘ব্যক্তি’ পদার্থ হলে একটি গো ব্যক্তিকে বুঝাবার জন্য একটি গো শব্দের, আর একটি গোব্যক্তিকে বুঝাবার জন্য আর একটি গোশব্দের, এইরূপ তিন চার গো ব্যক্তি বুঝাবার জন্য তিন বা চারবার গোশব্দের উল্লেখ করতে হয়। সেইখানে পাণিনির সূত্রের সার্থকতা থাকলো যে এইরূপ সমান স্ভাভারের একবিভক্ত্যন্ত অনেক শব্দের মধ্যে একটি অবশিষ্ট থাকবে। অতএব এখানে ব্যক্তি পদের অর্থ বলে বুঝা যাচ্ছে। তাহলে দেখা গেল যে স্থলবিশেষে জাতি, পদের অর্থ হচ্ছে আবার কতকগুলি স্থলে ব্যক্তি, পদের অর্থ হচ্ছে। পাণিনির সূত্র থেকে ইহা বুঝা যাচ্ছে। লক্ষ্য অর্থের অহুরোধে পাণিনি লক্ষণ [সূত্র] করেছেন। সর্বত্রই যে ব্যক্তি ও জাতি এই উভয়ই পদের অর্থ হচ্ছে তা নয়। কিন্তু কোথায়ও কোন পদের অর্থ হচ্ছে জাতি। আর কোথায়ও বা অপর পদের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি। এইভাবে লক্ষ্যের অহুরোধে এক একটি পদ [জাতি বা ব্যক্তিরূপ পদ] স্বীকার করতে হয়। অতএব পাণিনি একটি মাত্র পদ আশ্রয় করলে সর্বত্র ব্যবহৃত সিদ্ধ হতে পারে না বলে—পদার্থজ্ঞেয় উভয়পদ স্বীকার করে সূত্র রচনা করেছেন।

পদের অর্থ ব্যক্তি কি জাতি—এই বিষয়ে বাদীদের মধ্যে বহু বিবাদ আছে। কেহ কেহ জাতিই পদের বাচ্যার্থ স্বীকার করেন। কেহবা ব্যক্তিই পদের অর্থ বলেন। আবার কেহ জাতি, আকৃতি [অবয়বসংস্থান] বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদার্থ বলেন। যাহারা কেবলমাত্র জাতিকে পদার্থ [বাচ্যার্থ] স্বীকার করেন তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই—ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করলে কোন একটি ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করবে অথবা সকল ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করবে। কোন একটি ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করলে—পদ থেকে অন্ত ব্যক্তিরও বোধ হয় দেখা যায় অথচ অন্ত ব্যক্তিতে শক্তি নাই। পদ থেকে পদের অর্থের উপস্থিতিতে শক্তিজ্ঞান একটি কারণ। যেখানে পদ থেকে অন্ত ব্যক্তির উপস্থিতি হচ্ছে, সেখানে শক্তি না থাকায় শক্তির জ্ঞানও নাই। শক্তির জ্ঞান না থেকে ব্যক্তির উপস্থিতি হচ্ছে বলে শক্তির জ্ঞানকে আর পদার্থ উপস্থিতির কারণ বলা যায় না। যাহা না থেকে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার কারণ হতে পারে না। সুতরাং কোন একটি ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা যেতে পারে না। আর যদি সমস্ত ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে ব্যক্তি অনন্ত বলে, শক্তিও অনন্ত স্বীকার করতে হয়। তাতে মহাগৌরব হয়ে যায়। আর অনন্ত ব্যক্তিতে অনন্ত শক্তির জ্ঞানও সম্ভব নয়। এই জন্য জাতিতেই শক্তি স্বীকার করতে হবে। জাতি এক বলে শক্তিজ্ঞান সহজেই হয়ে যায়। সমস্ত গুরুতে অল্পগত একাকার জ্ঞান হয়ে থাকে বলে গোত্র নামক জাতি সিদ্ধ হয়। সেই গোত্র গৌরুপ দ্রব্যে অবস্থিত। গোপদের শক্তি গোত্রে আছে জ্ঞানে সর্বত্র গোপন থেকে গোত্রের উপস্থিতি হয়ে যায়। গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে শক্তি না থাকলেও গোত্রজাতির সঙ্গে গোব্যক্তির সমবায় সম্বন্ধ থাকায় জাতির জ্ঞান হতে গেলে ব্যক্তির জ্ঞান না হয়ে জাতির জ্ঞান হতে পারে না বলে জাতির জ্ঞানে ব্যক্তি তুল্যজ্ঞানজন্ম হয়ে যায়। সুতরাং ব্যক্তির জ্ঞান অল্পপন্ন হয় না। এইভাবে গোপ্রভৃতি শব্দ যেমন গোপ্রভৃতিতে স্থিত গোত্রাদি জাতির বাচক। সেইরূপ গুরু প্রভৃতি শব্দ ও গুরাদি গুণগত গুরাদি জাতির বাচক। ঙিখ ডবিখ প্রভৃতি সংজ্ঞাবোধক শব্দও ঙিখ ডবিখ জাতির বাচক। যদিও একব্যক্তিতে স্থিত ধর্ম, জাতি হয় না, তথাপি ঙিখ [কাঠের হাতী] ডবিখ [কাঠের হরিণ] প্রভৃতিরও প্রতিদিন পরিণাম ভেদ হয় বলে বিভিন্ন

পরিণাম বা অবস্থা ভেদেও সেই এই ভিৎ ইত্যাদি জ্ঞান হয় বলে ভিৎ—
প্রভৃতি জ্ঞাতি স্বীকার করা হয়। এইরূপ ক্রিয়াতেও জ্ঞাতি স্বীকার করা হয়।
‘পচতি পচতঃ পচন্তি’ প্রভৃতি থেকে অভিন্ন জ্ঞান হয় বলে খাতুর বাঢ়ার্থকে
জ্ঞাতি বলে স্বীকার করা হয়। বীরা ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করেন—
তাদের যুক্তি হচ্ছে—গোপ্রভৃতি শব্দ থেকে গো ব্যক্তিরই বোধ হয়। “গামানয়”
“গাং বধান” ইত্যাদি বাক্য থেকে লোকে গোব্যক্তির আনয়ন, গোব্যক্তির বন্ধন
অর্থবুঝে ব্যক্তির আনয়ন প্রভৃতি করে থাকে। গোত্বজ্ঞাতির আনয়ন বা
বন্ধন কেহ করে না বা তাহা সম্ভবও নয়। সুতরাং ব্যক্তিই পদের অর্থ।
পদের শক্তি ব্যক্তিতে থাকে। ব্যক্তি অনন্ত হলেও অনন্ত ব্যক্তিতে অনন্তশক্তি
স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নাই। অনন্ত ব্যক্তিতে একটি শক্তি স্বীকার
করা হয়। অনন্ত গো ব্যক্তিতে গোপদের একটি শক্তি আছে, বলে গৌরব
দোষ হয় না। আর অনন্ত গো ব্যক্তিতে গোপদের শক্তি জ্ঞানও অসম্ভব
নয়। গোত্ব জ্ঞাতিই উক্ত শক্তি জ্ঞানে উপলক্ষণ হয়। অর্থাৎ গোত্বরূপে
গো ব্যক্তিতে শক্তিজ্ঞান হয়। ‘গোত্ব’ সকল গরুতে আছে বলে সকল
ব্যক্তিতে গোত্বের দ্বারা শক্তিজ্ঞান হয়ে যায়। গোত্ব প্রভৃতি জ্ঞাতি উক্ত
শক্তিজ্ঞানে বা গো প্রভৃতি পদজন্ত ব্যক্তির জ্ঞানে অস্বগমক হয় বলে
কোন দোষ নাই (২০৮)। জ্ঞাতিশক্তি ও ব্যক্তিশক্তি সম্বন্ধে প্রায় সকল
গ্রন্থে অল্পবিস্তর বহু বিচারের অবতারণা দেখা যায়। সে সকলের
সংগ্রহ করলে—একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে। বিস্তার ভয়ে এবং প্রয়োজন-
ভাবে তার বিবরণ এখানে করা হল না। জিজ্ঞাসু পাঠক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে
ইচ্ছা করলে জানতে পারেন। এখানে পাণিনির সূত্রে থেকে মহাভাষ্যকার
দেখিয়েছেন—জ্ঞাতি এবং ব্যক্তি—উভয়ই স্থলভেদে পদের অর্থ। মহাভাষ্যকার
পাণিনির এই মতের উপর কোন মন্তব্য করেন নাই, প্রত্যুত পরে এই পম্পশা
আহ্নিকেই তিনিও এই উভয়কে পদের অর্থ বলে স্বীকার করেছেন। সুতরাং
আমরা ধরে নিতে পারি বৈয়াকরণদের মতে জ্ঞাতি ও ব্যক্তি উভয়ই
পদার্থ ॥ ৩৮ ॥

(২০৮) উদ্যৎ লক্ষ্যসিদ্ধরে কটিংগ্রন্থেণে কশিৎপকঃ পরিগৃহতে। তত্র জ্ঞাতিবাদিন আহ :—
জ্ঞাতিত্বেন শব্দেন প্রতিপাদ্যতে, ব্যক্তীনাংমানজ্ঞাৎ সম্বন্ধগ্রহণাসম্ভবাৎ ।...ব্যক্তিবাদিনবাহঃ—
শব্দন্ত ব্যক্তিরেব বাচ্য, যাতেতৎপলক্ষণভাবেবোদ্রশাধানজ্ঞাতিবোবানবকাশঃ।

১ [মহাভাষ্যদ্বীপ—কৈট—পম্পশাহিক]

মূল

কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোশ্চিত্তিকার্যঃ ? সংগ্রহ এতৎ প্রাধান্তেন
পরীক্ষিতম্—নিত্যো বা স্যাৎ কার্যো বেতি । তত্রোক্তা দোষাঃ
প্রোক্তমানস্তপ্তানি । তত্রেষ্ব নির্ণয়ঃ—বদ্যেবং মিত্যঃ, অথাপি
কার্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্যম্ ইতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ :—শব্দ কি নিত্য অথবা কার্য [ক্রিয়াসম্পাদ্য] ? সংগ্রহে ব্যাভি
রচিত সংগ্রহ নামক গ্রন্থে] ইহা [শব্দের নিত্যত্ব ও কার্যত্ব বিষয়ে] প্রধান ভাবে
পরীক্ষা করা হয়েছে [বিচার করা হয়েছে]—[শব্দ] নিত্য হবে অথবা
কার্য [হবে] । সেইখানে [সংগ্রহগ্রন্থে] দোষ সকল [শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে
এবং কার্যত্ব পক্ষে সম্ভাব্যমান দোষ সমূহ] অভিহিত হয়েছে এবং প্রয়োজন
সমূহও অভিহিত হয়েছে । সেখানে [সংগ্রহে] এইরূপ নিশ্চয় [করা হয়েছে] ।
বসিও [শব্দ] নিত্য, তথাপি কার্য । উভয় প্রকারেও [দুই পক্ষেও]
লক্ষণ [ব্যাকরণশাস্ত্র] প্রবর্তন করার যোগ্য [প্রবর্তন করা যেতে
পারে] ॥ ৩৯ ॥

বিরূতি :—শব্দের স্বরূপ বলা হয়েছে । সামান্য বিশেষ সূত্রের দ্বারা শব্দের
জ্ঞান উৎপাদন করা হবে—একথাও বলা হয়েছে । জ্ঞাতিও ব্যক্তি উভয়ই
শব্দের অর্থ ইহাও বলা হয়েছে । ব্যাকরণের সূত্রের দ্বারা শব্দজ্ঞান করা
হবে—ইহা বলা হয়েছে । এর উপর আশঙ্কা হয় এই যে—শব্দ যদি নিত্য হয়,
তাহলে ব্যাকরণ সূত্র ব্যর্থ । কারণ নিত্যকে সূত্রের দ্বারা উৎপাদন করা যাবে
না । আর যদি শব্দ কার্য [উৎপাদ্য] হয়, তাহলে ব্যাকরণের দ্বারা তার উৎপাদন
সম্ভব হতে পারে । এইরূপ আশঙ্কা করে—জিজ্ঞাসা করেছেন—“কিং পুনর্নিত্যঃ
শব্দ আহোশ্চিত্তিকার্যঃ ?” শব্দ নিত্য অথবা কার্য ? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্য-
কার বলছেন—‘সংগ্রহেতৎ প্রাধান্তেন পরীক্ষিতং নিত্যো বা স্যাৎ কার্যো বেতি ।’
ব্যাভি কর্তৃক রচিত সংগ্রহ নামক পাণিনি-সূত্রের ব্যাখ্যাশ্রকগ্রন্থ ছিল । তাতে
একলক্ষ লোক ছিল । সেই গ্রন্থ অতিশয় বিস্তৃত বলে কালক্রমে তার অধ্যয়ন
অধ্যাপনা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় । মহাভাষ্যকার যখন বলছেন সংগ্রহে ইহা বিচার
করা হয়েছে, তখন বুঝা যাচ্ছে যে মহাভাষ্যকার ঐ গ্রন্থ দেখেছিলেন না
পূর্বতন বৈয়াকরণদের নিকট থেকে ঐ সংগ্রহ গ্রন্থের বিষয় বস্তু শুনেছিলেন ।

সেইজন্য মহাভাষ্যকার বলছেন ‘শব্দ নিত্য অথবা কার্য’ এই বিষয়টি সংগ্রহগ্রন্থে প্রধানভাবে বিচার করা হয়েছে। এই বিষয়টি প্রধান ভাবে বিচার করা হয়েছে বলায় বুঝা যাচ্ছে শব্দের সম্বন্ধে অত্যন্ত বিষয় সেই সংগ্রহ গ্রন্থে অপ্রধান ভাবে বিচার করা হয়েছে, নিত্য ও কার্য বিষয়ে প্রধান ভাবে বিচার করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার ‘শব্দ নিত্য অথবা কার্য’ এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং না দিয়ে, এইভাবে যে বললেন—ইহা সংগ্রহে বিচারিত হয়েছে তার অভিপ্রায় এই যে—এখানে আর বিচার করবার প্রয়োজন নাই ; সেখানে [সংগ্রহ গ্রন্থে] বিচার করা হয়েছে এবং বিচারের দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় সিদ্ধান্তিত হয়েছে। অতএব সেই সংগ্রহ গ্রন্থে বিচারের দ্বারা বাহ্য দ্বিতীকৃত হয়েছে তাহাই “শব্দ নিত্য অথবা কার্য” এই প্রশ্নের উত্তর। সেই সংগ্রহগ্রন্থে কি ভাবে বিচার করা হয়েছে—তার অতি সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র বলছেন—মহাভাষ্যকার—“তত্রোক্তাঃ দোষাঃ প্রয়োজনান্তপুস্তানি” অর্থাৎ শব্দ নিত্য হলে কি, দোষ হয় কার্য হলে বা কি দোষ হয় এবং শব্দ নিত্য হলে ব্যাকরণ শাস্ত্রের কিভাবে কি প্রয়োজন সম্পাদিত হয়, শব্দ কার্য হলেই বা ব্যাকরণের কিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এই সব বিষয় সেই সংগ্রহ গ্রন্থে বিচার করা হয়েছে। এই কথা থেকে আশঙ্কা হতে পারে সংগ্রহ গ্রন্থে যদি শব্দের নিত্য ও কার্য বিষয়ে দোষ এবং উভয় পক্ষের প্রয়োজন বিচারিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই বিচারের কি সার্থকতা আছে। বিচারের দ্বারা নির্ণয়ই হচ্ছে বিচারের ফল। অথচ সেখানে উভয় পক্ষেই দোষ এবং প্রয়োজনের বিচার করা হয়েছে। কৌন একতর পক্ষের নির্ণয় করা হয় নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন—‘তত্র স্বেষ নির্ণয়ঃ, যদ্যেব নিত্যঃ তথাপি কার্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্যম্।’ যদিও শব্দ নিত্য তথাপি কার্য [উৎপাদ্য]—উভয় প্রকারে লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্র প্রবর্তন করা যাবে। বৈয়াকরণের মতে ফোটরূপ শব্দ [বাক্যফোট] নিত্য। আর ঐ ফোটের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি বা বর্ণরূপ শব্দ অনিত্য। মীমাংসক মতে শব্দ বর্ণাত্মক। বর্ণসকল নিত্য, সেই বর্ণের অভিব্যঞ্জক বায়বীয় সংযোগ বা সংযোগ বিভাগ যুক্ত বাহ্য অনিত্য বলে সেই ব্যঞ্জকের অনিত্যতা বর্ণে আরোপিত হওয়ায় বর্ণকেও অনিত্য বলে মনে হয়। বস্তুত বর্ণ অনিত্য নয়, কিন্তু নিত্য। বর্ণমাত্রই বিকৃত, নিত্য, দ্রব্য। বর্ণসমূহ নিত্য বলে বর্ণসমূহাত্মক পদও নিত্য। যদিও পৌৰাণপদ্ধতি ক্রম অনিত্য

তথাপি ক্রমবিশিষ্ট বর্ণই পদস্বরূপ বলে পদও নিত্য। পদসমুদায়াত্মক বাক্য দুই প্রকার লৌকিক এবং বৈদিক। তন্মধ্যে বৈদিক বাক্য নিত্য, যেহেতু তাতে শব্দবের প্রবেশ নাই। লৌকিক বাক্য মানুষের পদের পৌৰ্ব্বাপর্য্যাত্মক পদবিশ্ভাস বশত অনিত্য। ত্রায় ও বৈশেষিক মতে বর্ণ অনিত্য। কণ্ঠতালু প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা বর্ণ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হয়ে তৃতীয় ক্ষণে নষ্ট হয়। সুতরাং বর্ণসমুদায়াত্মক পদও অনিত্য বা কার্ঘ্য এবং পদসমুদায়াত্মক বাক্যও কার্ঘ্য। বৈয়াকরণমতে পরা বা পশুস্তী বাক্ নিত্য। মধ্যমা ও বৈখরী অনিত্য বা কার্ঘ্য। আবার সেই বৈয়াকরণদের অনেকের মতে পরা, পশুস্তী, মধ্যমা নিত্য। বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে বাক্যফোটকে নিত্য বলে স্বীকার করা হয়। ঐ বাক্যফোট বস্তুত অখণ্ড। তার কোন অবয়ব নাই। তবে যে পদগুলিকে আমরা বাক্যের অবয়ব মনে করি তাহা কল্পনা। এইভাবে কল্পিত পদরূপ অবয়ব বাক্যফোটে স্বীকার করলেও কোন বিরোধ হয় না। বাস্তব অবয়ব বললেই বিরোধ হয়। কোন কোন বৈয়াকরণ নিত্য বর্ণফোট স্বীকার করেন। আবার কোন কোন বৈয়াকরণ বর্ণব্যতিরিক্ত নিত্য পদফোট স্বীকার করেন। নৈয়ামিক এবং বৈশেষিক ধ্বনিকে শব্দ বলেন। সেই ধ্বনি দুই প্রকার অবর্ণাত্মক শব্দাদিশব্দ এবং বর্ণাত্মক সংস্কৃত ভাষাদি। এই উভয়ই অনিত্য কার্ঘ্য।

মহাভাষ্যকার বলছেন—সংগ্রহে যদিও শব্দকে নিত্য স্বীকার করা হয়েছে, তথাপি কার্ঘ্য শব্দও স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ ফোটরূপ নিত্যশব্দ যেমন স্বীকার করা হয়েছে, সেইরূপ প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি অনিত্য বর্ণাত্মক কার্ঘ্যরূপ শব্দও স্বীকার হয়েছে। এই বর্ণই ধ্বনি। এখানে দ্রষ্টব্য এই—যদিও মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ফোটই মুখ্যশব্দ, তথাপি লোকব্যবহারে ধ্বনি বা বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যাকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যুৎপাদন করা হয় বলে, তাকেও শব্দ বলে ব্যবহার ক্ষেত্রে প্রতিপাদন করা হয়। এই ধ্বনি বা কার্ঘ্যশব্দের দ্বারা পরম্পরা ক্রমে আসল ফোটাশব্দ শব্দকে জানা যায়। এখন এই উভয় বিধ শব্দ স্বীকার করলে কিরূপে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সার্বকতা সিদ্ধ হয়? এর উত্তরে বলা হয়। যে পক্ষে শব্দ নিত্য সে পক্ষে ব্যাকরণের প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দের ব্যুৎপাদন করা সম্ভব না হলেও, ব্যাকরণের দ্বারা সেই নিত্যশব্দ যে সাধু ইহা জানিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং ব্যাকরণের প্রয়োজন শব্দের নিত্য পক্ষেও সিদ্ধ হয়ে যায়। আর শব্দ অনিত্য এই পক্ষে অনিত্যধ্বনিরূপ শব্দ যেমন কণ্ঠ,

তালু প্রভৃতির সাহায্যে উৎপন্ন হয় ; কণ্ঠতালু প্রভৃতি সেই অনিত্য শব্দের কারণ ; সেইরূপ ব্যাকরণও প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণের দ্বারা সেই অনিত্য শব্দের উৎপত্তিতে কারণ হয় বলে শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষেও ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। এই জন্য বলা হয়েছে [সংগ্রহে] “উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্যম্” শব্দ নিত্য এই পক্ষে এবং অনিত্য এই পক্ষেও ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রবর্তন করতে হবে, ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে ॥ ৩৯ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

কথং পুনরিত্যং ভগবতঃ পাণিনেরাচার্যস্য লক্ষণং প্রবৃত্তম্ ?

[বার্তিক]

[“সিদ্ধে শকার্ধসম্বন্ধে লোকতে হর্ষপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ স্বর্গনিয়মঃ, বখা লৌকিকবৈদিকেষু”—বার্তিকগ্রন্থ ॥ ১ ॥]

[বার্তিক]

সিদ্ধে শকার্ধসম্বন্ধে—

[মহাভাষ্য]

সিদ্ধে শব্দেহর্ষে সম্বন্ধে চেতি। অথ সিদ্ধশব্দস্য কঃ পদার্থঃ ? নিত্যপর্ধায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ। কথং জ্ঞায়তে ? বৎকূটেন্দ্রবিচালিশু ভাবেষু বর্ততে ; তদ্বখা—সিদ্ধা দ্যোঃ, সিদ্ধা পৃথিবী, সিদ্ধমাকাশমিতি। মনু চ ভোঃ কার্ধেষপি বর্ততে ; তদ্বখা—সিদ্ধ ওদনঃ, সিদ্ধঃ সূপঃ, সিদ্ধা যবাগুরিতি। যাবতা কার্ধেষপি বর্ততে, তত্র কূট এতন্নিত্যপর্ধায়বাচিনো গ্রহণম, ম পুনঃ কার্ধে যঃ সিদ্ধশব্দ ইতি। সংগ্রহে তাবৎ কার্ধপ্রতিবন্ধিত্ববান্ মন্যামহে নিত্যপর্ধায়বাচিনো গ্রহণমিতি। ইহাপি তদেব।

অথবা সন্তোষকপদান্যবধারণানি। তদ্বখা—অব্ভক্ষো বাহুভক্ষ ইতি। অপ এব ভক্ষয়তি, বাহুমেব ভক্ষয়তি ইতি গম্যতে। এবমিহাপি সিদ্ধ এব, ম সাধ্য ইতি।

অথবা পূর্বপদলোপোহিত্র জটব্যঃ—অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি ।
তদ্ব্যথা—দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি ।

অথবা ‘ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিশব্দির্নহি সন্দেহাদলক্ষণমি’তি
নিত্যপৰ্য্য যবাচিনো গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ :—ভগবান্ আচার্য পাণিনির বিরূপে এই লক্ষণ [ব্যাকরণস্থত্ৰ]
গ্রহণ হইবে ?

[সিদ্ধ শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতোহর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে ধর্মনিয়মঃ যথা
লৌকিকবৈদিকেশু—এই বার্তিক বাক্যকে মহাভাষ্যকার চারভাগে ভাগ করে
ব্যাখ্যা করেছেন । এই আদি বার্তিকবাক্য একটি । ইহা পরে জানা যাবে]

“শব্দার্থ সম্বন্ধ সিদ্ধ থাকায়।” শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ সিদ্ধ থাকায় ।
[আম্মা] সিদ্ধ শব্দের [সিদ্ধ এই শব্দের] পদার্থ [অর্থ] কি ? সিদ্ধ [এই]
শব্দটি, নিত্য [অর্থের] পর্যায় [প্রতিশব্দ] [রূপে] [নিত্যঅর্থের] বাচক ।

কিরূপে জানলে [সিদ্ধ শব্দ নিত্যপর্যায় ইহা কিরূপে জানলে] ? যেহেতু
[সিদ্ধ শব্দটি ’, কূটস্থ, অবিচল ভাব [পদার্থ] সমূহে বর্তমান থাকে
[কূটস্থ অবিচল পদার্থকে বুঝায়] । যেমন স্বর্ণ সিদ্ধ, পৃথিবী সিদ্ধ
আকাশ সিদ্ধ । ওহে, কার্ধরূপ অর্থসমূহেও [সিদ্ধ শব্দ] বর্তমান থাকে
[কার্ধ অর্থকেও বুঝায়] । যেমন অন্ন সিদ্ধ [হয়েছে] স্থপ [ডাল] সিদ্ধ,
যবাগু [যবের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য] সিদ্ধ । যেহেতু কার্ধেও বর্তমান থাকে
[কার্ধকেও বুঝায়—সিদ্ধ শব্দ] তাহলে কি হেতু এই নিত্যের পর্যায়রূপে বাচকে
[সিদ্ধ শব্দের]র গ্রহণ [করা হচ্ছে] ; কার্ধে [কার্ধ অর্থের বাচক] যে সিদ্ধ
শব্দ [তাহার গ্রহণ করা] হচ্ছে না ।

সংগ্রহে [সংগ্রহ গ্রহে] কার্ধের প্রতিপক্ষভাবহেতুক [কার্ধের প্রতিপক্ষ
পদার্থরূপে সংগৃহীত হওয়ায়] নিত্য অর্থের বাচক পর্যায়ের [সিদ্ধ শব্দের]
গ্রহণ হয়েছে—ইহা মনে করি । এখানেও [বার্তিক বাক্যেও] তাহাই [নিত্য
অর্থের বাচক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ] ।

অথবা অবধারণগুলি [নিশ্চয়গুলি] একপদযুক্ত আছে [একটি পদের
দ্বারাও অবধারণ বুঝায় এইরূপ প্রয়োগ আছে] । যেমন “অব্ভক্ষঃ বায়ুভক্ষঃ”
এইরূপ স্থলে জলই ভক্ষণ করে, বায়ুই ভক্ষণ করে—ইহা গম্যমান [অসাক্ষাদ্

ভাবে জ্ঞাত] হয়। এইরূপ এখানেও [বার্তিকগ্রন্থেও] সিদ্ধই, সাধ্য নয় [সিদ্ধই এইরূপ অবধারণ হয়]।

অথবা এখানে। উক্তবার্তিকগ্রন্থে [পূর্বপদের লোপ [করে প্রয়োগ করা হয়েছে, ইহা] বুঝতে হবে। অত্যন্তসিদ্ধ [কে] [অত্যন্তপদলোপকরে] সিদ্ধ [ইহা বলা হয়েছে]। যেমন দেবদত্ত [দেবদত্ত শব্দ প্রয়োগকরিতে] দত্ত [এই রূপ বলা হয়] সত্যভামা [কে বুঝাতে] ভামা [এইরূপ বলা হয়]। অথবা ‘ব্যাখ্যা হতে বিশেষপ্রতীতি হয়, সন্দেহবশত অলক্ষণ [কোন লক্ষণ অলক্ষণ অথবা সূত্র অসূত্র] হয়ে যায় না’ এই হেতু [সিদ্ধ শব্দটিকে] নিত্য অর্থের বাচক [পৰ্যায়] রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, ইহা [এইরূপ] ব্যাখ্যা করণ ॥ ৪০ ॥

বিবৃতি :—শব্দের অঙ্গুশাসন শাস্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে বলে এবাবৎ ভাষ্যকার শব্দের স্বরূপ, প্রয়োজন, শব্দের অর্থের স্বরূপ, কি ভাবে শব্দের উপদেশ করা হবে এইসব বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তার পর বলেছেন শব্দ নিত্যও বটে এবং কার্যও বটে। ব্যাকরণের সূত্রের দ্বারা শব্দের জ্ঞান উৎপাদন করা হবে। এরউপর প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়েছে “কথং পুনঃ ইদং ভগবতঃ পানিনে ঋচাৰ্শস্ত লক্ষণং প্রবৃত্তম্।” মহাভাষ্যকার পাণিনিমুনিকে পূৰ্ব্বাহ বলে ভগবৎ শব্দে বিশেষিত করেছেন। আর তিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের আচাৰ্যও। তিনি [পানিনি] কিরূপে এই লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাকরণসূত্র প্রবৃত্ত করেছেন—রচনা করেছেন। শব্দের ব্যুৎপাদনের জন্ত তিনি শাস্ত্ররচনা করেছেন। এখন শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহলে তো পানিনি সেই শব্দের স্রষ্টা হতে পারেন না। আর যদি শব্দ কার্য হয়, তাহলে অবশ্য পানিনি সেই শব্দের স্রষ্টা হতে পারেন। সন্দেহবশত জিজ্ঞাসা হয়েছে—পানিনি শব্দসকলের স্রষ্টা অথবা স্বর্ভা, এইরূপ সন্দেহে জিজ্ঞাসা বশত প্রশ্ন করা হয়েছে পানিনি কিভাবে এই ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত মহাভাষ্যকার বার্তিক বাক্যের অবতারণা করেছেন ‘সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে ইত্যাদি’, বার্তিক গ্রন্থ পানিনির সূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ। যদিও বার্তিককার তাঁর বার্তিকের দ্বারা পানিনির সূত্রের অঙ্কর ব্যাখ্যা করেন নাই, তথাপি সূত্রের তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা করেছেন। “সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে” ইত্যাদি বাক্যটি বার্তিককারের প্রথম বাক্য। এর পূর্বপৰ্যন্ত বাকিছু বলা হয়েছে সেগুলি মহাভাষ্যকারেরই বাক্য। সূত্ররাঃ

অর্থ শব্দানুশাসনম্’ থেকে আরম্ভ করে ‘কথং পুনরিন্দমিত্যা’দি বাক্য পর্যন্ত গ্রন্থ মহন্তীভূত। “সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতোহর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রোৎসর্গ নিয়মঃ, যথা লৌকিকবৈদিকেষু।” এই বার্তিক গ্রন্থটি একটি সম্পূর্ণ বাক্য হতে পারে, কিন্তু মহাভাষ্যকার উহাকে চারিটি বাক্যে ব্যবস্থাপিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন (১) সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে” শব্দ, অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য হলেও ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রযুক্ত হতে পারে। ইহাই প্রথম বাক্যের অর্থ। (২) “লোকতঃ” শব্দ, অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য ইহা কি করে জানলে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন “লোকতঃ” লোক হতে জানলাম। (৩) ‘লোকতোহর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রোৎসর্গ নিয়মঃ।” “লোকতঃ” এই শব্দটি একবার উল্লিখিত হলেও, তার আর একবার আবৃত্তি করে তৃতীয় বাক্যটি পূরণ করতে হবে। লোকে অর্থজ্ঞানের জন্য শব্দপ্রয়োগ করে, ইহা লোকে ব্যবহার সিদ্ধ। শাস্ত্র [ব্যাকরণাদি শাস্ত্র] ধর্মের জন্য কেবল নিয়ম করে দেয় [শাস্ত্র শব্দ উৎপাদন করে না]। কিন্তু ধর্ম নিয়ম করা হয় এই প্রশ্নের উত্তরে উদাহরণ বলেছেন (৪) যথা লৌকিকবৈদিকেষু” যেমন লোকে এবং বেদে ধর্মের নিয়ম করা হয়।

এখন যে প্রশ্ন প্রথমে উঠেছিল ‘পাণিনি কি ভাবে সূত্রের প্রবর্তন করেছেন, তিনি কি সূত্রের দ্বারা শব্দের সৃষ্টি করেছেন অথবা বিদ্যমান শব্দের স্মরণ করেছেন’, এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার “সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে” এই প্রথম বার্তিকের অবতারণা করেছেন। এই বার্তিকের সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে; শব্দ, অর্থ এবং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এই তিনটি সিদ্ধ অর্থানু নিত্য। এই বার্তিক থেকে প্রশ্নের উত্তর অর্থসিদ্ধ হয়ে গেল। যেহেতু শব্দ অর্থ ও তাদের সম্বন্ধ নিত্য, সেইহেতু পাণিনি সূত্রের দ্বারা শব্দের উপদেশে শব্দের বা শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের স্মরণই করেছেন। তিনি শব্দের স্রষ্টা নয় কিন্তু স্মর্তা। “সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে” এই বার্তিক স্থিত ‘শব্দার্থসম্বন্ধে’ পদটি শব্দশ্চ অর্থশ্চ সম্বন্ধশ্চ এইরূপ বিগ্রহে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস করে “শব্দার্থসম্বন্ধ” শব্দ নিষ্পাদন পূর্বক, তার উত্তর সপ্তমীর একবচন করে নিষ্পন্ন হয়েছে। সমাহারদ্বন্দ্ব একবচন এবং নপুংসকলিঙ্গ হয়। ইতরেত্তর দ্বন্দ্বসমাস করণে উক্ত বার্তিকের আকার হত “সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধেষু”। মহাভাষ্যকার উক্ত বার্তিকের অর্থ বুঝাবার জন্য বলেছেন — ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি’। মহাভাষ্যকারের এই উক্তি দ্বারা ‘শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই পদের বিগ্রহ বাক্য সূচিত হয়ে গেছে।

সিদ্ধ শব্দ নিত্য অর্থের বাচক আবার “নিষ্পন্ন” অর্থেরও বাচক হয়। এখানে বার্তিকহিত সিদ্ধ শব্দের কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে—ইহা জানাবার জন্য প্রশ্ন করেছেন—‘অথ সিদ্ধশব্দস্ত কঃ পদার্থঃ?’ এখানে পদার্থ শব্দটি অভিধেয় অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে ইহা বুঝতে হবে। সিদ্ধ শব্দের অর্থ কি? এইরূপই প্রশ্নের তাৎপর্য। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“নিত্যপর্ধায়বাচী সিদ্ধ-শব্দঃ” ‘পর্ধায়েণবক্তুং শীলমন্ত’ এই ভাবে প্রথমে উপপদ-ভৎপুংস্ব সমাস করে, তারপর নিত্যন্ত [নিত্যরূপ অর্থের] পর্ধায়বাচী এইরূপ বঙ্গীভৎপুংস্ব সমাস করে ‘নিত্যপর্ধায়বাচী’ শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। “সিদ্ধ ইতি শব্দঃ” এইরূপ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (শাকপাথিবাদিবৎ) সমাস করে—‘সিদ্ধ শব্দটি’ নিষ্পন্ন হয়েছে। নিত্য অর্থের পর্ধায় ক্রমে বাচক হচ্ছে সিদ্ধ শব্দ। কখন ও ‘নিত্য’ এই শব্দটি নিত্য অর্থের বাচক হয় আর কখনও বা ‘সিদ্ধে’ এই শব্দটি নিত্য অর্থের বাচক হয় (২০২)। মোট কথা হচ্ছে ভাষ্যকার ‘নিত্যপর্ধায়বাচী সিদ্ধ শব্দঃ’ এই ভাষ্যের দ্বারা বলেছেন এখানে সিদ্ধ শব্দটি নিত্য অর্থের বাচক, সিদ্ধ শব্দের অর্থ ‘নিত্য’। মহাভাষ্যকার পূর্বে—“সিদ্ধ শব্দে অর্থঃ সম্বন্ধে চ’ এই ভাষ্যের দ্বারা ‘সিদ্ধ’ এই শব্দটি—‘শব্দ’ [শব্দ এই শব্দের] ‘অর্থ’ ও ‘সম্বন্ধ’ এই তিনের সঙ্গে অস্থিত (সম্বন্ধ—ইহা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তারপর আবার ‘নিত্যপর্ধায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ’ এই ভাষ্যের দ্বারা ‘সিদ্ধ’ শব্দটি নিত্যার্থক—ইহা বলে দিলেন। তাতে বুঝাগেল শব্দ নিত্য, অর্থ নিত্য; এবং ঐ উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য। বাক্যস্ফোটাৎ শব্দ এবং পদস্ফোটাৎ শব্দ নিত্য। জাতিস্ফোটও নিত্য ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু যারা শব্দকে কার্য বলেন যেমন নৈয়ায়িক বৈশেষিক প্রভৃতি। আর বৈয়াকরণদেরও কেহ কেহ ধ্বনিকে [বর্ণাস্বকধ্বনিকে] শব্দ বলেন, ধ্বনি কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন হয়। এঁদের মতে কিরূপে শব্দ নিত্য হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে কৈয়ট বলেছেন কার্যরূপ শব্দ স্বরূপত নিত্য না হলেও প্রবাহ রূপে নিত্য। একরকম শব্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার সেই প্রকার শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে, এইভাবে প্রবাহরূপে শব্দ নিত্য। যারা জাতিকে শব্দের অর্থ বলেন তাঁদের মতে জাতি নিত্য বলে অর্থও (শব্দের অর্থও)

(২০২) নিত্যলক্ষণসার্থন্ত পর্ধায়েণ বাচকত্বমেবার্থঃ কণাচিন্নিত্যশব্দ জাহ কণাচিৎ সিদ্ধ শব্দ ইত্যর্থঃ। কৈয়ট, মহাভাষ্যপ্রদীপ।

নিত্য। আর ধানের মতে ব্যক্তিই শব্দের অর্থ তাঁদের মতে ব্যক্তি স্বরূপত অনিত্য হলেও প্রবাহরূপে নিত্য। অতএব অর্থও নিত্য হুজো। শব্দ এবং অর্থ নিত্য হওয়ায় তাদের সম্বন্ধও নিত্য। সর্বসম্বন্ধী নিত্য হলে সম্বন্ধও নিত্য হবে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ত্যায়বৈশেষিকমতে শক্তি। মীমাংসক মতে প্রত্যাব্য প্রত্যাবক। বৈয়াকরণ মতে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ শক্তি; তবে এই শক্তিরস্বরূপ হচ্ছে ‘তাবাঙ্গ্য’ (২১০)। বাহা হউক—প্রথম বার্তিকের দ্বারা জানা গেল—শব্দ ও অর্থ এবং তাদের সম্বন্ধ নিত্য। এই তিনটি নিত্য হওয়ায় পাণিনি সেই শব্দার্থসম্বন্ধের স্বরণকর্তা মাত্র, স্রষ্টা নয় ইহাই প্রতিপাদিত হয়।

সিদ্ধশব্দ নিত্যার্থক—একথা মহাভাষ্যকার পূর্বেই বললেন। তার উপর পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করছেন “কথং জায়তে?” মহাভাষ্যকারই পূর্বপক্ষীর প্রশ্ন নিজে উঠিয়েছেন। ‘সিদ্ধ শব্দ যে নিত্য অর্থক বুঝায়—ইহা কিসের জানলে’—ইহাই এই প্রশ্নের অভিপ্রায়।

এর উত্তরে মহা ভাষ্যকার বলছেন—“যৎ কূটস্থেষবিচালিষু ভাবেষু বর্ততে; তদ্বৎথা সিদ্ধা ত্যোঃ, সিদ্ধা পৃথিবী, সিদ্ধমাকামিতি।” এই ভাষ্যবাক্যে যে ‘যৎ’ পদটি আছে এটি একটি অব্যয়শব্দ। সর্বনাম ‘যৎ’ শব্দ নয়। অব্যয় ‘যৎ’ শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি করে, অব্যয়াদাপ্ স্তপঃ” (পাঃ সূঃ ২।৪।০২) সূত্রানুসারে সেই পঞ্চমীর লুক্ করে ‘যৎ’ পদ সিদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ যেহেতু [যস্মাৎ]। কূটের (কামারদের নেই) মত অবস্থান করে যে তাকে কূটস্থ বলে (২১১)। কূটস্থ শব্দের তাৎপর্যার্থ নির্বিকার, অবিনাশী। “বিচালিতুং শীলমস্য” এইরূপ অর্থে বি উপসর্গ পূর্বক চলু ধাতুর উত্তর যিনিপ্রত্যয় করলে—‘বিচালিন্’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ন বিচালী—অবিচালী নঞ্ তৎপুরুষ। অবিচালিন্ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনে ‘অবিচালিষু’ এইরূপ হয়েছে। বিচলন বা স্পন্দন শূন্ত হলো অবিচালী। ‘ভাবেষু’ এখানে ‘ভাব’ শব্দের অর্থ পদার্থ। যেহেতু সিদ্ধ

(২১০) শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধক শক্তিরূপঃ তাবাঙ্গ্যমেবেত্যাহ প্রপকিতম্। মহাভাষ্য-প্রাণীপোদোত - পদ্যশাস্ত্রিক।

(২১১) কূটস্থগোষণ [কূট অর্থ ঘনীভূত মোহা—অর্থ্যাৎ যেই] ভবতিভিঃ যে, তেহ্, সংসর্গিনাংশপি স্বরধনটেবিভাঃ। [মহাভাষ্যপ্রাণীপোদোত—পদ্যশাস্ত্রিক]

শব্দটি কূটস্থ ও অবিচালি অর্থাৎ নিত্য পদার্থে বর্তমান—নিত্যপদার্থকে বুঝায়। যেমন স্বর্গ সিদ্ধ, পৃথিবী সিদ্ধ, আকাশ সিদ্ধ এইরূপ ব্যবহার হয়। কোন কোন ব্যক্তিক স্বর্গকে নিত্য স্বীকার করেন। পৃথিবী ব্যবহারিক ভাবে নিত্য ইহা অনেকে স্বীকার করেন। নৈমায়িক বৈশেষিক আকাশকে নিত্য স্বীকার করেন। মহাভাষ্যকারের মতেও আকাশ ব্যবহারিক নিত্য। সুতরাং এইসব নিত্য পদার্থকে বুঝাবার জন্ত যেহেতু ‘সিদ্ধ’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়; অতএব সিদ্ধ শব্দের অর্থ নিত্য—ইহা জানা গেল।

মহাভাষ্যকারের এইরূপ উত্তরে কোন পূর্বপক্ষী অশঙ্কা করছেন—“নমু চ ভোঃ কার্ধেষপি বর্ততে।নপুনঃ কার্ধে যঃ সিদ্ধ শব্দ ইতি?” যার উৎপত্তি আছে তাকে কার্ধ বলে। উৎপত্তি থাকলে ভাব পদার্থ অবশ্যই বিনাশী হয়। সিদ্ধ শব্দটি যেমন নিত্য পদার্থকে বুঝাবার জন্ত প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ কার্ধ অর্থাৎ অনিত্যবস্তুকে বুঝাবার জন্তও প্রয়োগ করা হয়। যেমন অন্নসিদ্ধ, ডাল সিদ্ধ, যবাগু [যাউ] সিদ্ধ। তাহলে ‘সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই বার্তিকে নিত্য অর্থের বাচকরূপে সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে কার্ধ বা অনিত্য অর্থের বাচকরূপে সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ হয় নাই—ইহা কিরূপ বুঝা যাবে? সিদ্ধ শব্দ যখন উভয় অর্থ [অনিত্য ও নিত্য] বুঝায় তখন কেবল নিত্য অর্থে তাকে [সিদ্ধ শব্দকে] গ্রহণ করা চলে না। ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। পূর্বপক্ষীর এইরূপ বক্তব্যের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“সংগ্রহে তাবৎ কার্ধপ্রতিবন্ধিভাবান্ মত্তামহে নিত্যপর্যায়বাচিনে। গ্রহণমিতি ইহাপি তদেব।”

ব্যাভিকৃত সংগ্রহ নামক গ্রন্থে কার্ধের প্রতিপক্ষভূত পদার্থকে বুঝান হয়েছে বলে, সেই গ্রন্থে সিদ্ধ শব্দটিকে নিত্য অর্থের বাচক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে—ইহাই মনে করি। কার্ধের প্রতিবন্ধী হচ্ছে অকার্ধ অর্থাৎ নিত্য। সংগ্রহে সিদ্ধ শব্দকে কার্ধের বিরোধিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে বলে সিদ্ধ শব্দটি সেখানে নিত্য অর্থের বাচক হয়েছে। “কার্ধপ্রতিবন্ধিভাবান্ মত্তামহে” এখানে “কার্ধ প্রতিবন্ধিভাবাৎ” এইরূপ পঞ্চম্যন্ত পদ বুঝতে হবে দ্বিতীয়া বহুবচনান্ত পদ নয়। কার্ধপ্রতিবন্ধিভাব হেতুক নিত্য পর্যায়বাচক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ সংগ্রহ গ্রন্থে করা হয়েছে। এখানে অর্থাৎ বার্তিকবাক্যেও সেই নিত্যার্থক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ করা হয়েছে—ইহাই মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

সংগ্রহ গ্রন্থে নিত্য অর্থে সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধ শব্দ নিত্য অর্থে কে যেমন বুঝায় তেমন অনিত্য [কার্য] অর্থেও বুঝায়, নিত্য অর্থে যেমন সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় অনিত্য অর্থেও সেইরূপ সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তা হলে সংগ্রহ গ্রন্থের অনুসারে এখানে নিত্য অর্থেই সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ করলে, তাতে কোন একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি পাওয়া যায় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার নিত্যঅর্থে সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ বিষয়ে এখানে আর একটি পক্ষ উপস্থাপিত করছেন—“অথবা সন্ত্যেকপদাত্তব ধারণানি.....সিদ্ধ এব ন সাধ্য ইতি।”

‘এব’ পদ অবধারণকে স্তোত্রিত করে। অত্রযোগের ব্যবচ্ছেদক অর্থ্যাৎ যার সঙ্গে ‘এব’ শব্দ উচ্চারিত হয় সেই শব্দের অর্থ ভিন্নকে ব্যাবৃত্ত [নিবৃত্ত] করে। যেমন ‘পার্থএব’ বললে অর্জুন ভিন্ন অপরে নয় এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। এই ‘এব’ পদ পঠিত না হয়েও অনেক সময় একটি শব্দ সেই অবধারণ অর্থে বুঝিয়ে দেয়। শব্দের সামর্থ্য বশত এইরূপ অর্থ প্রতীত হয়। যেমন “পতিম্ অনুসরতি পতিব্রতা” এইরূপ বললে পতিব্রতা পতিকেই অনুসরণ করে এইরূপ অবধারণ বুঝায়। ‘এব’ শব্দ ‘পতি’ শব্দের সন্নিধিতে পঠিত না হলেও এখানে ‘পতি’ শব্দ অবধারণ অর্থে বুঝায়। এইরূপ অবধারণ অর্থের বোধক পদকে একপদ অবধারণ বলে। এইরূপ স্থলকে লক্ষ্য করে মহাভাষ্যকার বলেছেন—অবধারণার্থক একপদ সকল আছে। তার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন অব্ভক্ষঃ, ‘বায়ুভক্ষঃ’। এইরূপ শব্দের সোজাসৃজি অর্থ [শ্রুত অর্থ] হচ্ছে জলভক্ষণকারী, বায়ুভক্ষণকারী। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করলে এখানে “অব্ভক্ষঃ” এবং “বায়ুভক্ষঃ” শব্দের প্রয়োগের কোন সাধকতা থাকে না। কারণ সকলেই জল পান করে, সকলেই বায়ুগ্রহণ করে। জল বায়ু গ্রহণ না করে কেউ বাঁচে ইহা দেখা যায় না। স্তত্রাং কোন মুনি ঋষি বা এক বিশেষপ্রাণীকে বুঝাবার জন্য ঐরূপ অব্ভক্ষঃ বা বায়ুভক্ষঃ শব্দের যখন প্রয়োগ করা হয় তখন সেই শব্দ দুটির অর্থ এইরূপ বুঝা যায়—জলই ভক্ষণ করে, জলভিন্ন অত্রকিছু ভক্ষণ করে না। বায়ুই ভক্ষণ করে, বায়ুভিন্ন অত্রকিছু ভক্ষণ করে না। এইরূপে শব্দ দুটির সাধকতা রক্ষিত হয়। এখানে ‘অপ্’ শব্দটি বা ‘বায়ু’ শব্দটি একটি থাকলেও অবধারণ অর্থ বুঝাচ্ছে বলে “একপদ অবধারণ” হয়েছে। এইরূপ “সিদ্ধে-শব্দার্থসম্বন্ধে” এই বার্তিক-গ্রন্থে ‘এব’ পদ না থাকলেও কেবল এক ‘সিদ্ধ’

পদই ‘সিদ্ধই’ ‘নিত্যই’ এইরূপ অবধারণ অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে। সাধ্য অর্থার্থ কার্য অর্থকে এখানে ‘সিদ্ধ’ শব্দটি বুঝায় না। কার্য অর্থের ব্যাবর্তক হচ্ছে, এই সিদ্ধ শব্দটি। সুতরাং এই বার্তিকে সিদ্ধ শব্দটি নিত্য অর্থ প্রযুক্ত হয়েছে, কার্য অর্থ নয়—ইহাই মহাভাষ্যকারের উক্ত বাক্যের অর্থ।

মহাভাষ্যকার বার্তিকবাক্যস্থিত ‘সিদ্ধ’ শব্দের নিত্যঅর্থ গ্রহণ করা হয়েছে ইহা বুঝাবার জন্ত আর একটি কল্প [পক্ষ] উপস্থাপিত করেছেন—“অথবা পূর্বপদলোপোহিত দ্রষ্টব্যঃ অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্ যথা দেবদত্তো দত্তঃ, সত্যভামা ভামেতি।”

কোন একটি শব্দ যে অর্থকে বুঝায়—অনেক সময় লোকে, সেই শব্দের একাংশ প্রয়োগ করেও সেই অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। যেমন আজকালও এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। কোন লোকের নাম ‘কৃষ্ণচন্দ্র’। তাকে ‘কৃষ্ণচন্দ্র’ নামেও লোকে বুঝায় আবার ‘কৃষ্ণচন্দ্র’ শব্দের একদেশ ‘কৃষ্ণ’ শব্দের দ্বারাও তাকে বুঝায়। এখানে ‘কৃষ্ণচন্দ্র’ শব্দের উত্তর পদ ‘চন্দ্র’ লোপ করে বুঝানো হয়। আবার কোথায়ও পূর্বপদের লোপ করে সমুদায় শব্দের অর্থ বুঝানো হয়। যেমন ‘হরিশ্চন্দ্র’ কে ‘চন্দ্র’ শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়। এখানে ‘হরি’ এই পূর্বপদের লোপ করা হয়। পূর্বেও সম্পূর্ণ শব্দের একাংশ দিয়ে সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ বুঝানো হোত। এইজন্ত বার্তিককার একটি সূত্র রচনা করেছিলেন—“বিনাপি প্রত্যয়ং পূর্বোত্তরপদয়োৰ্বা লোপো বাচ্যঃ” [বাঃ ৩২২২] প্রত্যয়ের লোপ না হয়েও পূর্ব বা উত্তরপদের বিকল্পে লোপ বলতে হবে। মহাভাষ্যকার এর দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—‘দেবদত্ত’ ইহা একজনের নাম। ‘দেবদত্ত’ শব্দের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করা বা বুঝানো হয়। আবার ‘দেবদত্ত’ এই শব্দের ‘দেব’ এই পূর্বপদলোপকরে ‘দত্ত’ অংশের দ্বারাও সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়। এইরূপ সত্যভামাকে ‘ভামা’ এই অংশের দ্বারাও বুঝানো হয়। এইরূপে লোকে যেমন পূর্বপদের লোপ করে শব্দের প্রয়োগ করে সেইরূপ ‘সিদ্ধে’ শকার্থ শব্দের এই বার্তিকে যে ‘সিদ্ধে’ পদটি আছে সেটি বার্তিককার ‘অত্যন্তসিদ্ধে’ এইরূপ একটি সম্পূর্ণ শব্দের পূর্ববর্তী ‘অত্যন্ত’ পদটি লোপকরে ‘সিদ্ধে’ এইরূপ একাংশ দ্বারা সেই ‘অত্যন্তসিদ্ধ’ শব্দের অর্থকেই বুঝিয়েছেন। ‘সিদ্ধ’ শব্দ নিত্য অর্থ এবং কার্য অর্থকে বুঝালেও এখানে বার্তিকে ‘অত্যন্তসিদ্ধ’ পদার্থকে বুঝাবার জন্তই বার্তিককার ‘সিদ্ধ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাতে আর কুর্খ অর্থকে বুঝা

যাবে না। কারণ কার্য পদার্থ অত্যন্ত সিদ্ধ নয়। “অন্তম্ অতিক্রান্তঃ” অর্থাৎ যাহা বিনাশকে অতিক্রম করে অবিনাশী; তাহাকে অত্যন্ত বলা যেতে পারে। অবিনাশী অর্থে ‘অত্যন্ত’ শব্দটিকে গ্রহণ করলে ‘অত্যন্তসিদ্ধ’ শব্দের অর্থ হয় যাহা অবিনাশী সিদ্ধ। কার্য পদার্থকে সিদ্ধ শব্দের দ্বারা বুঝানো হলেও কার্য পদার্থ বিনাশী বলে অত্যন্তসিদ্ধ হতে পারে না। নিত্য পদার্থই অত্যন্তসিদ্ধ। সুতরাং ‘অত্যন্তসিদ্ধ’ এই শব্দের ‘নিত্য’ এই অর্থ লাভ হওয়ায়, সেই অত্যন্তসিদ্ধ শব্দের একদেশ ‘সিদ্ধ’ শব্দের দ্বারা এখানে নিত্য পদার্থকেই বুঝানো হয়েছে, কার্য পদার্থকে বুঝানো হয় নাই। ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য। ‘অত্যন্তসিদ্ধ’ শব্দের একদেশ ‘অত্যন্ত’ লোপ করে বার্তিককার ‘সিদ্ধ’ শব্দের দ্বারা এখানে ‘অত্যন্তসিদ্ধ’কে বুঝিয়েছেন অথবা কার্য অর্থের বাচক সিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তার নিশ্চায়ক প্রমাণ বা যুক্তি কিছু বুঝা যাচ্ছে না—এইরূপ যদি আশঙ্কা হয়; তাতে সিদ্ধ শব্দের এখানে ‘অত্যন্তসিদ্ধ’ ই অর্থ ইহা নিশ্চয় করা যাবে না। ফলতঃ সন্দেহই থেকে যাবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার আর একটি কল্পের [পক্ষের] উত্থাপন করেছেন—“অথবা “ব্যাখ্যানতো বিশেষ-প্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্” ইতি নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাশ্রমঃ।” কোন লক্ষণ বাক্যে বা সূত্রে অর্থবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে সেই লক্ষণ বাক্যকে বা সূত্রকে ব্যাখ্যা করে তার বিশেষ অর্থের নিশ্চয় করতে হবে। বিশেষ নিশ্চয় সন্দেহের নিবর্তক। সন্দেহ হয় বলে যে সেই আপ্তব্যক্তি লক্ষণ বাক্যকে পরিত্যাগ করা বা সূত্রকে ঋষি প্রণীত সূত্রে পরিত্যাগ করা—তা কোন মতেই চলবে না। ঋষি প্রণীত সূত্রে বা প্রামাণিক আপ্তব্যক্তির বাক্যে সন্দেহ হলে তাকে ব্যাখ্যা করে তার বিশেষ অর্থ নিশ্চয় করে সন্দেহ দূর করতে হবে। সন্দেহ হয় বলে সেই আপ্তব্যক্তি কতৃক উক্ত লক্ষণ অলক্ষণ হয়ে যায় না বা ঋষিপ্রণীত সূত্রে বা অমুশাসন বাক্য অপ্রমাণ হতে পারে না। এখানে “সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে” এই বাক্যটি বার্তিককারের অমুশাসন বাক্য। এই বাক্যে ‘সিদ্ধ’ শব্দের অর্থ নিত্য অথবা কার্য এইরূপ সন্দেহ হচ্ছে বলে এই বার্তিক বাক্যকে অপ্রমাণ বলে পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কিন্তু এইবাক্যকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাকরে বাক্যের অর্থের বিশেষ নিশ্চয় করতে হবে। মহাভাষ্যকার এই কথা বলে তেরপর বলছেন ‘সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই বার্তিকস্থিত ‘সিদ্ধ’ শব্দটিকে নিত্য অর্থের পর্যায় [প্রতিশব্দ] বলে ব্যাখ্যা করব। তাতে এই শব্দটি নিত্যার্থক

এইরূপ নিশ্চয় হয়ে যাবে। নিশ্চয় হয়ে যাওয়ায় তদ্বিষয়ে সন্দেহের নিবৃত্তি হয়ে যাবে। সন্দেহের নিবৃত্তি হলে বার্তিক বাক্যটি স্বতঃপ্রামাণ্যের, প্রতিবন্ধকমুক্ত হবে।

এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি স্থলের উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করে— এখানে উপভাস করছি। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার আরম্ভে ভগবান্ শঙ্করাচার্য অধ্যাসের লক্ষণ করেছেন —“স্বতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ।” এই বাক্যটি বেদান্তমতে অধ্যাসের লক্ষণ বাক্য। কিন্তু কেহ কেহ বলেন এটা কোন প্রকারেই বেদান্তমতে অধ্যাসের লক্ষণ হতে পারে না। কারণ বেদান্তমতে মায়া এবং মায়ার কার্য সমস্ত জগৎ অনির্বাচ্য—মিথ্যা। এই জ্ঞাতাদের মতে রজ্জুতে যে সর্পের অধ্যাস হয়; সেস্থলে রজ্জু বা রজ্জুবচ্ছিন্ন চৈতন্য হচ্ছেন অধিষ্ঠান। সেই অধিষ্ঠানে সর্প হচ্ছে আরোপ্য। এই আরোপ্য সর্পটি ভ্রমকালে অভিনব অনির্বাচ্য রূপে রজ্জুবচ্ছিন্ন চৈতন্যে উৎপন্ন হয়। এই সর্প রজ্জুভিন্ন অগ্নত্র কোথায়ও থাকে না। রজ্জুতে বা রজ্জুবচ্ছিন্ন চৈতন্যে ভ্রমকালে থাকে প্রাতিভাসিকরূপে; পারমার্থিক ভাবে থাকে না। সুতরাং ঐ সর্প মিথ্যা। অগ্নস্থানে স্থিত লোক ব্যবহারে পারমার্থিক সর্প --রজ্জুতে অগ্নথা অগ্নপ্রকারে ভাসমান হয়—ইহা নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, ভাট্ট, পাতঞ্জল, প্রভৃতি বলেন। তাঁদের মতে আত্মা সত্য, জগৎ ও সত্য। দেহ প্রভৃতি সত্য বস্তুতে সত্য আত্মার অগ্নপ্রকারে অবভাস হয়ে আমি মানুষ, সংসারী ইত্যাদি ব্যবহার হয়। এইভাবে অধ্যাস বা ভ্রম স্বীকারে তাঁদের দ্বৈতবাদে কোন হানি হয় না। যেহেতু অধিষ্ঠানও সত্য এবং আরোপ্য ও সত্য। কেবল আরোপ্য বস্তুটির অগ্ন ভাবে আরোপ বা জ্ঞান হয় বলে জ্ঞানটি ভ্রম। বেদান্ত মতে যদি এইরূপ স্বীকার করা হয়, তাহলে ব্রহ্মরূপ আত্মাতে অগ্নত্র স্থিত বা সত্য দেহাদি অগ্নপ্রকারে প্রকাশমান হয় এইরূপ অর্থলাভ হওয়ায় দেহাদি জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। তাতে অদ্বৈতমতের হানি হয়। এইজন্ত বেদান্তমতে ব্রহ্ম বা আত্মাতে অনির্বাচ্য [সদসদনির্বাচ্য] পদার্থের অধ্যাস হয়। সেই অনির্বাচ্য পদার্থ অগ্নত্র থাকে না। কিন্তু বতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মে, প্রতীত হয়, ততক্ষণ তাহা সেই ব্রহ্মে থাকে। বাধজ্ঞান হলে যখন বুঝা যায় উহা ব্রহ্মে নাই, তখন সর্বথা তার [জগতের] অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। এখন—“স্বতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ” এই ভগবদ্ভরোক্ত অধ্যাসলক্ষণ বাক্যটির যথাক্রম অর্থ হচ্ছে

ভিন্ন বস্তুতে পূর্বদৃষ্ট ভিন্নবস্তুর অসম্মিহিতের অবভাস—অর্থাৎ জ্ঞান বা জ্ঞায়মান । লক্ষণ বাক্যটির এইরূপ অর্থ গ্রহণ করলে শুক্তিতে রজতের অধ্যাসটির স্বরূপ এইরূপ হবে—রজত থেকে ভিন্ন বস্তু যে শুক্তি, সেই শুক্তিতে ; পূর্বে, হাটে বা নিজের ঘরের মধ্যে বাহুসে দৃষ্ট যে ভিন্ন [শুক্তিথেকে ভিন্ন] রজতরূপ বস্তু তার জ্ঞান হয়, আর সেই শুক্তিতে রজতটি অসম্মিহিত [অবর্তমান] । অধ্যাসের এই স্বরূপ হলে ভাষ্যোক্ত লক্ষণটি অল্পখ্যাতিবাদীদের মতানুসারে সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতবাদে এইরূপ অধ্যাস সিদ্ধ হয় না । কারণ তাঁরা পূর্বদৃষ্ট অল্পত্রস্থিত রজতের অবভাস ভিন্নবস্তু শুক্তিতে হয়—ইহা স্বীকার করতে পারেন না । ইহা স্বীকার করলে আরোপ্য রজতের মিথ্যাও সিদ্ধ হয় না । অল্পরূপ ভাবে আত্মাতে আরোপ্যমান অনাত্মার মিথ্যাও সিদ্ধ না হওয়ায় অনাত্মার সত্যত্ব-সিদ্ধির প্রসঙ্গ হওয়ায় অদ্বৈতবাদ শূন্যে বিলীন হয়ে যায় । অতএব সন্দেহ হয় যে ভাষ্যকার “স্মৃতিরূপঃ” ইত্যাদি লক্ষণটিকে দ্বৈতবাদীদের মতানুসারে করেছেন অথবা নিজমতে করেছেন এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় উক্ত অধ্যাসলক্ষণটি অলক্ষণ হয়ে যায় অর্থাৎ এই লক্ষণটিকে অনির্বাচ্যবাদীদের লক্ষণ বলে গ্রহণ করা যায় না । এর উত্তরে এই মহাভাষ্যকারের উক্তিটি এখানে স্মরণ করতে হবে “ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তিঃ” ইত্যাদি । অর্থাৎ ভগবচ্ছরোক্ত “স্মৃতিরূপঃ” ইত্যাদি লক্ষণ বাক্যকে ব্যাখ্যা করে বিশেষ অর্থ জ্ঞান লাভ করতে হবে । উক্ত লক্ষণ বাক্যের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে এইরূপ করলে বিশেষজ্ঞান বশত সন্দেহ নিবৃত্তি হবৈ । যথা: ‘পরত্র’ পদের অর্থ ভিন্ন বস্তুতে । “স্মৃতিরূপঃ” পদের অর্থ ‘অসমানসত্তাক’ “পূর্বদৃষ্ট” শব্দের অর্থ পূর্বজ্ঞানজন্যসংস্কারবিষয়ীভূত । “অবভাসঃ” শব্দের অর্থ জ্ঞায়মান ও জ্ঞান । অর্থের অধ্যাস এবং জ্ঞানের অধ্যাস—এই দ্বিবিধ অধ্যাস সংগ্রহ করবার জন্য ‘অবভাস’ শব্দটিকে কর্মবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ঘঞস্ত বলে গ্রহণ করতে হবে । ফলত “অধিষ্ঠানাসমান সত্তাকাবভাস” এইরূপ ফলিত অর্থ প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত ভগবৎপাদোক্ত অধ্যাস লক্ষণ সঙ্গত হবে । কল্পতরুপরিমলে বিদ্বত আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥৪০॥

মূল

কিং পুনরনেন বর্ণোন ? কিং ন মহতা কঠেন নিত্যশব্দ
এবোপান্তঃ, যস্মিন্নুপাদীয়মানেহসন্দেহঃ স্যাৎ ?

মঙ্গলার্থম্ মাজলিক আচার্যো মহতঃ শাস্ত্রোদ্যন্ত মঙ্গলার্থং সিদ্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুক্তো । মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীর পুরুষাণি চ ভবন্ত্যায়ুষ্পুরুষাণি চ, অধ্যোতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথা স্মরিতি ।

অয়ংখণ্ডপি নিত্যশব্দো নাবশ্যং কুটস্থেষুবিচারিষু ভাবেষু বর্ততে । কিং তর্হি ? আভীক্ষ্যেহপি বর্ততে ; যথা নিত্যপ্রহসিতঃ, নিত্য-প্রজলিত ইতি । যাবতা আভীক্ষ্যেহপি বর্ততে, তত্রাপ্যনেনৈবার্থঃ স্তাৎ—ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তিন্’ হি সন্দেহাদলক্ষণমিতি । পশ্যতি স্বাচার্যো মঙ্গলার্থশ্চৈব সিদ্ধশব্দ আদিতঃ প্রযুক্তো ভবিষ্যতি, শঙ্ক্যামি চৈনং নিত্যপর্যায়বাচিনং বর্ণয়িতুমিতি । অতঃ সিদ্ধশব্দ এব উপাত্তো ন নিত্যশব্দ ইতি ॥৪১॥

অনুবাদ :- এই বর্ণনীর [ব্যাখ্যেয় সিদ্ধ শব্দের দ্বারা কি [প্রয়োজন] [সিদ্ধ হবে] ? উচ্চ কণ্ঠে ‘নিত্য’ এই শব্দ কেন গৃহীত হলো না, যাহা [যে নিত্য শব্দ] গৃহীত হলে অসন্দেহ [সন্দেহের প্রাগভাব রক্ষিত] হোত ?

মঙ্গলের জন্ত । মঙ্গলরূপ প্রয়োজনবান্ আচার্য [বরকৃষ্টি—বার্তিককার] বিশাল শাস্ত্রসমূহের [বার্তিকসমুদায়াত্মক গ্রন্থের] মঙ্গলের জন্ত প্রথমে [বার্তিক গ্রন্থের প্রথমে] ‘সিদ্ধ’ এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন । যে সকল শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গল থাকে, সেই সকল শাস্ত্র বিস্তার লাভ করে [লোকে প্রচারিত হয়], সেই সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নঅধ্যাপনাকারিগণ শাস্ত্রবিচারে বিজয়ী হন, দীর্ঘায়ু হন এবং সেই সকল শাস্ত্রের অধ্যয়োগ সিদ্ধকাম হন । ‘নিত্য’ এই শব্দটিও যে অবশ্য [ঐকান্তিকভাবে] অবিনাশী ও দেশান্তরপ্রাপ্তিশূন্য পদার্থকে বুঝায়, তা নয় । তা হলে কি ? [আর কাকে বুঝায়] । পৌনঃপুত্য অর্থকেও বুঝায় ; যেমন পুনঃ পুনঃ হাস্ত করেছিল, পুনঃ পুনঃ জল্পনা [কথাবলা] করেছিল । যেহেতু [নিত্যশব্দ] আভি ক্ত্য [পৌনঃপুত্য] অর্থকেও বুঝায়, সেখানেও [সেই নিত্যশব্দ প্রয়োগেও] ইহার দ্বারাই [এই রীতিতেই] অর্থ [নিশ্চিত অর্থ গৃহীত] হবে— ‘ব্যাখ্যার দ্বারা বিশেষ জ্ঞান হয়, যেহেতু সন্দেহ বশত অলক্ষণ হয় না ।’ ‘আদিতে প্রযুক্ত [ব্যবহৃত] সিদ্ধশব্দ মঙ্গল প্রয়োজনকই হবে ইহাকে [সিদ্ধশব্দকে] নিত্য অর্থের বাচক পর্যায় রূপে ব্যাখ্যা করতে পারব—[ইহা] আচার্য

[বার্তিককার] দেখেছিলেন [নিশ্চয় করেছিলেন]। এইহেতু সিদ্ধ শব্দকেই গ্রহণ করেছেন, নিত্যশব্দকে [গ্রহণ করেন] নাই ॥৪১॥

পদপরিচয় :—‘বর্ণেন’ = চূরাদিগণীয় বর্ণ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে যৎপ্রত্যয় করে [বর্ণি + যৎ] ‘বর্ণ্য’ শব্দ নিষ্পন্ন হয় ; তার তৃতীয়ার একবচনের রূপ। ইহার অর্থ—বাক্যে—যে সিদ্ধ শব্দকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেই ব্যাখ্যায় [সিদ্ধ শব্দ] দ্বারা। ‘কিম্’ = প্রশ্নার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ‘কি প্রয়োজন’ - ইহাই প্রশ্নার্থ।

মাত্রলিক : = অনিন্দিত ক্রৈস্তিত বস্তুর সিদ্ধিকে মাত্রল বলে। মাত্রল শব্দের উত্তর “মাত্রলং প্রয়োজনমশ্রু” এইরূপ অর্থে ‘ঠক্’ প্রত্যয় করে ‘ঠ’ এর স্থানে ‘ইক’ করে মাত্রলিক শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ মাত্রল ধীর প্রয়োজন এমন আচার্য। আচার্যের বিশেষণ হয়েছে মাত্রলিকটি।

নিত্যপ্রহসিত : = প্রউপসর্গ পূর্বক হস্তধাতুর উত্তর কৃত্ববাচ্যে ‘ক্’ প্রত্যয় করে ‘প্রহসিতঃ’ শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হাস্য করেছিল [যে কর্তা]। ‘প্রহসিতঃ’ শব্দের সঙ্গে ‘নিত্য’ শব্দের সমাস করে [নিত্যাং] প্রহসিতঃ “নিত্য প্রহসিতঃ” শব্দসিদ্ধ হয়েছে। অর্থ হচ্ছে = পুনঃপুনঃ হেসেছিল। এইরূপ “নিত্য প্রজ্ঞলিতঃ” শব্দেরও ব্যুৎপত্তি বুঝতে হবে। জ্ঞানধাতুর অর্থ কথা বলা ॥৪১॥

বিবৃতি :—‘সিদ্ধ’ এই শব্দটি নিত্য অর্থকে বুঝায়, আবার কার্য বা উৎপাদ্য অর্থকেও বুঝায়। যেমন ‘সিদ্ধমাক্যশম্’ এইরূপ প্রয়োগ ; আবার ‘সিদ্ধ ময়ম্’ এইরূপও প্রয়োগ হয়। ‘সিদ্ধে শব্দার্থঃশব্দে’ এই বার্তিকে ‘সিদ্ধ’ শব্দটি নিত্য অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, অথবা কার্য অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে এইরূপ সন্দেহ হলে মহাভাষ্যকার নানাভাবে এখানকার সিদ্ধ শব্দটিকে নিত্যার্থক বলেছেন। শেষে বললেন সন্দেহ স্থলে ব্যাখ্যার দ্বারা নিশ্চয় উৎপাদন করে সন্দেহ দূর করা হয়। অতএব উক্ত বার্তিক বাক্যস্থ সিদ্ধ শব্দটির ব্যাখ্যা করে নিত্য অর্থ গ্রহণ করা হল। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী বলছেন—“কিং পুনরনেন বর্ণেন।...অসন্দেহঃ স্যাৎ।” বার্তিককার যদি নিত্য অর্থ বুঝাবার জন্য সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন, তা হলে তাঁর তাহা উচিত হয় নাই। কারণ সিদ্ধ শব্দটি যখন দ্ব্যর্থ বোধক শব্দ, নিত্য ও কার্য এই দুই অর্থের বোধক, তখন সিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করলে পাঠকদের সন্দেহ হবেই, উক্ত বার্তিকবাক্যে সিদ্ধ শব্দ নিত্যার্থক কি কার্যার্থক? সন্দেহ

হলে মহাভাষ্যকার বললেন ব্যাখ্যা করে একতর অর্থের অর্থাৎ এখানে নিত্য অর্থের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন কি? যে ‘সিদ্ধ’ শব্দের অর্থনিশ্চয়ের জন্ত ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে, সেইরূপ ব্যাখ্যায় ‘সিদ্ধ’ শব্দ বার্তিককার প্রয়োগ করলেন কেন? ‘নিত্য’ অর্থ বুঝাবার যদি তাঁর প্রয়োজন ছিল, তাহলে তিনি ‘নিত্য’ এই শব্দটি কেন প্রয়োগ করলেন না। “নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে” এইরূপ বার্তিক বাক্য রচনা করলে তো আর সন্দেহের অবকাশ থাকতো না। সুতরাং সেই সন্দেহ দূর করবার জন্ত আর ব্যাখ্যারও আবশ্যকতা হতো না। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন—‘মঙ্গলার্থম্’ মঙ্গলের জন্ত। এইটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যা নিজেই মহাভাষ্যকার ‘মান্বলিক আচাধো.....যথা স্থ্যিরিতি’ এই গ্রন্থে প্রদর্শন করেছেন। ভাষ্যের লক্ষণেই আছে “স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে” অর্থাৎ ভাষ্যকার নিজের কথিত সংক্ষিপ্ত পদগুলিকে নিজেই ব্যাখ্যা করেন। সেই জন্ত এখানে মহাভাষ্যকার ‘মঙ্গলার্থম্’ এই সংক্ষিপ্ত পূর্ববর্ণিত পদটির নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে কাতায়ন, পাণিনি সূত্রের উপর প্রায় চারহাজার বার্তিকবাক্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর বার্তিক গ্রন্থটি বিশাল গ্রন্থ। এইরূপ একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করতে গেলে তার প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা শিষ্ট সম্প্রদায়ের আবশ্যকীয় রীতি। বার্তিককার এই মঙ্গলাচরণ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। তিনি বিলক্ষণভাবে জানতেন যে শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরণ করতে হয়। বার্তিককারের মঙ্গলেরও প্রয়োজন ছিল। মঙ্গলের দ্বারা গ্রন্থসমাপ্তি হয় অথবা গ্রন্থসমাপ্তির বিব্রধ্বংস হয়। এতদ্ব্যতীতও শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরণ করা হলে যে শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গল বর্ণিত হয় সে শাস্ত্র লোকে প্রচারিত হয়, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করেন বা অধ্যাপনা করেন তাঁদের শাস্ত্রবিচারে জয় হয়, সেই শাস্ত্র যারা অধ্যয়নাদি করেন তাঁরা দীর্ঘায়ু হন, এবং অধ্যয়নকারীরা তাঁদের কাম্য ফল লাভ করেন। বার্তিককার এই সমস্ত জানতেন। সেই জন্ত তিনি তাঁর বার্তিক গ্রন্থের আদিতে ‘নিত্য’ শব্দের প্রয়োগ না বরে ‘সিদ্ধ’ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ‘সিদ্ধ’ শব্দ শ্রবণ করলে বা উচ্চারণ করলে মঙ্গল হয়। এইরূপ বলা সত্ত্বেও যদি পূর্বপক্ষী সম্পূর্ণ আশঙ্ক হতো না পারেন তাঁর মনে যদি সেই পূর্বোক্ত ভাব উদ্ভিত হয় অর্থাৎ বার্তিককার গ্রন্থারম্ভের প্রথমে মঙ্গলার্থক অন্ত্যকোন ‘অথ’

শব্দাদির প্রয়োগ করে অসন্দিগ্ধ ‘নিত্য’ শব্দের প্রয়োগ কেন করলেন না। ‘অথ নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই ভাবে যদি বার্তিক গ্রন্থ রচনা করতেন তা হলে তো আর কোন দোষ থাকতো না। মঙ্গলাচরণও করা হোত আর সন্দেহের অবকাশও হোত না। এর উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন “অয়ং খৰ্গপি নিত্যশব্দ.....অতঃ সিদ্ধ শব্দ এবোপাত্তো ন নিত্যশব্দ ইতি।” মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষীকে বলছেন দেখ। তুমি বলছ বার্তিককার জোর গলায় অসন্দিগ্ধ ‘নিত্য’ শব্দের প্রয়োগ করলেন না কেন? সিদ্ধ শব্দটি সন্দিগ্ধ, কারণ উহা দ্ব্যর্থবোধক বলে লোকের সন্দেহ হয়। আবার সেই সন্দেহ নিরাসের জন্ত ব্যাখ্যা করতে হয়। কিন্তু দেখ! যে ‘নিত্য’ শব্দের কথা তুমি বলছিলে সেই নিত্য শব্দও কেবল মাত্র অবিনাশী ও উৎপত্তি রহিত নিত্য অর্থকে যে বুঝায় তা নয়। কিন্তু ‘নিত্য’ এই শব্দটিও দ্ব্যর্থক। এই নিত্য শব্দটি পৌনঃপুন্ত অর্থকেও বুঝায়। যেমন “নিত্য আস্মা” এখানে অবস্থান্তর-শূন্ত অবিনাশী জন্মরহিত নিত্য অর্থকে নিত্য শব্দটি বুঝাচ্ছে। আবার “নিত্য প্রহসিতঃ” এইরূপ প্রয়োগও হয়। এখানে ‘নিত্য’ শব্দের উৎপত্তি বিনাশশূন্ত অর্থ হতে পারে না। কারণ হান্তক্রিয়া কখনও উৎপত্তি বিনাশ শূন্ত নয়। কিন্তু এখানে ‘নিত্য’ শব্দের আভীক্ষ্য অর্থাৎ পৌনঃ পুন্তই অর্থ। পুনঃ পুনঃ হাসছে ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং বার্তিককার যদি তাঁর বার্তিক গ্রন্থের প্রথমে ‘নিত্য’ এই শব্দ প্রয়োগ করতেন “নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে” এইরূপ বলতেন তা হলেও লোকের সন্দেহ হোত ‘নিত্য’ এই শব্দটি এখানে কি উৎপত্তি বিনাশ শূন্ত অর্থকে বুঝাচ্ছে অথবা পৌনঃপুন্ত অর্থকে বুঝাচ্ছে। সন্দেহ হলে আবার সেই “ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তিঃ” অর্থাৎ ব্যাখ্যা করতে হোত, ব্যাখ্যা করে, তবে বিশেষ নিশ্চয় পূর্বক সন্দেহ দূর করতে হোত। তাতে লাভ কি হোত। লাভ তো হোত না বরং ক্ষতিই হোত। ক্ষতি এই যে প্রথমেই ‘নিত্য’ এই শব্দের প্রয়োগ করলে বার্তিককারের মঙ্গলাচরণ করা হোত না। ‘নিত্য’ শব্দটি মঙ্গল জনক নয়। ‘সিদ্ধ’ শব্দটি মঙ্গলজনক। বার্তিককার ইহা বিশেষভাবে জেনে আদিতে ‘সিদ্ধ’ এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন। আর তিনি ইহা জানতেন যে এই সিদ্ধ শব্দটিকে নিত্যের পর্যায় রূপে ব্যাখ্যা করতে পারব। সুতরাং বার্তিককারের এই আদিতে ‘সিদ্ধ’ শব্দের প্রয়োগ অতীব বুদ্ধিমত্তার সূচনা করে দিচ্ছে। এক প্রয়োগে দুইকার্ষ সিদ্ধি মঙ্গলাচরণ করা

এবং শব্দার্থ সম্বন্ধের নিত্যত্ব বুঝান। ‘নিত্য’ শব্দের আদিতে প্রয়োগ করে, ব্যাখ্যা করে নিত্য অর্থের বাচকত্ব বলে প্রতিপাদিত করলেও মঙ্গলাচরণ কার্য নিস্পন্ন হোত না। তার জন্য অতঃ কোন ‘অর্থ’ শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগে মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ হলেও গৌরব দোষ হয়ে যেত। ‘অর্থ’ শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ। আর ‘নিত্য’ শব্দের দ্বারা নিত্য অর্থ বুঝানো, এতে গৌরব দোষ হোত। আদিতে ‘সিদ্ধ’ এই শব্দের প্রয়োগে একটি শব্দের দ্বারা উভয় কার্য সিদ্ধ হওয়ায় লাঘব রক্ষিত হয়েছে। এইজন্য বার্তিককার আদিতে ‘সিদ্ধ’ শব্দের প্রয়োগ করেছেন, ‘নিত্য’ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই ॥ ৪১ ॥

মূল

অথ কং পুনঃ পদার্থং মন্যেব বিগ্রহঃ ক্রিয়তে—“সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ” ইতি ? আকৃতিমিত্যাহ। কুত এতৎ ? আকৃতির্হি নিত্য্য দ্রব্যমনিত্যম্। অথ দ্রব্যে পদার্থে কথং বিগ্রহঃ কর্তব্যঃ ? সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চেতি। নিত্য্যো হৃদ্যবতামর্থৈরভিসম্বন্ধঃ ॥৪২॥

অনুবাদ :-[আচ্ছা] কাকে [কোন বস্তুকে] পদের অর্থ মনে করে ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ’ এইরূপ বিগ্রহ [সমাস বাক্য] করছ ? আকৃতিকে [পদের অর্থ মনে করে] ইহা বলেন। কিহেতু ইহা [আকৃতি পদের অর্থ] ? আকৃতি নিত্য্য, দ্রব্য [ব্যক্তি] অনিত্য। দ্রব্য [ব্যক্তি], পদের অর্থ হলে কিপ্রকার বিগ্রহ করবে ? ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চ’ এইরূপ [বিগ্রহ করব]। অর্থের সহিত অর্থবানের [শব্দের] সম্বন্ধ নিত্য্য ॥৪২॥

বিবৃতি :-‘সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই বার্তিকবাক্যস্থিত ‘সিদ্ধ’ শব্দটি ‘নিত্য’ অর্থের বাচক ইহা মহাভাষ্যকার বহু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করে এলেন। তার পূর্বে মহাভাষ্যকার ‘সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই বাক্যের বিগ্রহ বাক্য প্রদর্শন করেছেন সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ ইতি। অবশ্য ‘সিদ্ধে’ এই শব্দটি সমাসের অন্তর্গত নয় বলে বিগ্রহ বাক্যে ‘সিদ্ধে’ এই শব্দের উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে নিস্প্রয়োজন নয়। কারণ মহাভাষ্যকার ‘সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই বার্তিক বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থের সম্বন্ধ কিরূপ হবে তাকে লক্ষ্য করেই ঐরূপ বিগ্রহ বাক্য প্রদর্শন করেছেন স্বল্প সমাসের পূর্বে বা পরে যে পদ থাকে, সেই পদটি স্বল্প সমাসের অন্তর্গত

প্রত্যেক পদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় এইরূপ নিয়ম আছে (২-৮)।, ‘শব্দার্থসম্বন্ধে’ এইপদটি সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসযুক্ত পদ। তার পূর্বে ‘সিদ্ধে’ এই পদটি আছে। উক্ত নিয়ম অনুসারে ‘সিদ্ধে’ এই পদটি ‘শব্দ অর্থ ও সম্বন্ধ’ এই তিনের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে। ‘শব্দ’ নিত্য এবং কার্য এই উভয় প্রকার আছে ইহা মহাভাষ্যকার ৩২ সংখ্যক গ্রন্থে দেখিয়েছেন। অবশ্য সেখানে কার্যাত্মক শব্দকে প্রবাহরূপে নিত্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন কৈয়ট। আর অর্থ [পদের অর্থ] জ্ঞাতি এবং ব্যক্তি উভয়ই পাণিনির সন্মত ইহা ৩৮ সংখ্যক গ্রন্থে দেখানো হয়েছে। এখন বার্তিককারের ‘সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে’ এই বার্তিকে সিদ্ধ শব্দটির অর্থ যখন নিত্য বলেই গৃহীত হয়েছে, তখন ‘সিদ্ধেশব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ’ এইরূপ বিগ্রহে সিদ্ধ শব্দ যদি ‘শব্দ অর্থ ও সম্বন্ধ’ এই তিনের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহলে শব্দ ও নিত্য, অর্থ ও নিত্য, এবং সম্বন্ধ [শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ] ও নিত্য ইহাই পাওয়া যায়। অর্থ নিত্য বললে সেই অর্থ অর্থাৎ পদের অর্থটি কি যাকে নিত্য বলা হচ্ছে, সেই অর্থটি কি জ্ঞাতি অথবা ব্যক্তি এইরূপ সন্দেহ করে প্রশ্ন করছেন “অর্থ কংপুনঃপদার্থঃ মত্বা..... সম্বন্ধে চেতি”। আপনি [মহাভাষ্যকার] কোন বস্তুকে পদের অর্থ মনে করে বার্তিক বাক্যের ‘সিদ্ধে শব্দে, অর্থে সম্বন্ধে চ’ এইরূপ বিগ্রহ করেছেন?

এর উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন ‘আকৃতিমিত্যাহ।’ ‘আকৃতিম্’ এইপদের পর “পদার্থঃ মত্বা এষ” বিগ্রহঃ ক্রিয়তে সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ ইতি।” এই পূর্ববাক্যাংশটির অনুয়ক করে অর্থ বুঝতে হবে। তাহলে সমগ্র বাক্যটি এইরূপ হবে “আকৃতিং পদার্থঃ মত্বা সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি বিগ্রহঃ ক্রিয়তে ইতি আহ।” তার অর্থ হবে “আকৃতিকে পদার্থ মনে করে সিদ্ধে, শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ’ এইরূপ বিগ্রহ করা হয়েছে” ইহা বলেন।” কে বলেন তার কোন কর্তার নির্দেশ নাই। সুতারাং বলা ক্রিয়ার কর্তা কে? এইরূপ প্রশ্ন হলে তার উত্তরে বলবো মহাভাষ্যকারই বলা ক্রিয়ার কর্তা। মহাভাষ্যকার “ক্রমঃ” “বদামঃ” এইভাবে প্রত্যক্ষ [স্পষ্টভাবে] উত্তমপুরুষের প্রয়োগ না করে নিজেকে প্রায়শঃ প্রথম পুরুষরূপে উল্লেখ করেন। ইহা অনেকস্থলে দেখা যাচ্ছে। তিনি নিজের অহঙ্কার সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে, সর্বত্র অতিবিনীত ভাবেই প্রতিপাত্ত বিষয়ের উল্লেখ করেন। ‘আকৃতিমিত্যাহ’

এই বাক্যে ‘আকৃতিম্’ পদের পর ঐরূপ পূর্ববাক্যাংশের অনুবন্ধ না করলে এখানে অর্থের সামঞ্জস্য হবে না। ‘ইতি’ নিপাতের যোগে ‘আকৃতিম্’ এইরূপ দ্বিতীয়া না হয়ে প্রথমা হয়ে যাবে। এখানে ‘আকৃতি’ শব্দের অর্থ পূর্বের মত ‘জাতি’ বলেই বুঝতে হবে। পরবর্তী ভাষ্য গ্রন্থের দ্বারাও ইহা বুঝা যাবে। আকৃতি অর্থাৎ জাতিকে পদার্থ মনে করে ঐরূপ [পূর্বোক্ত প্রকারে] বিগ্রহ করা হয়েছে, ব্যক্তিকে পদার্থ মনে করে বিগ্রহ করা হয় নাই কেন? এইরূপ আশঙ্কা করে পূর্বপক্ষী বলেছেন ‘কৃত এতৎ? কি হেতু ইহা অর্থাৎ আকৃতিকে পদার্থ মনে করে উক্ত বিগ্রহ করা হয়েছে, ব্যক্তিকে পদার্থ মনে করে বিগ্রহ করা হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেছেন ‘আকৃতিহিনিতিয়া দ্রব্যমনিতিয়া’। যেহেতু জাতি নিত্য, দ্রব্য অর্থাৎ ব্যক্তি অনিত্য। ব্যক্তিকে পদার্থ বলে গ্রহণ করলে “সিদ্ধে অর্থে” এইরূপ অসম্বদ হয়ে যাবে। অথচ ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থঃ সম্বন্ধে’ এইরূপ বিগ্রহে নিত্য শব্দ, নিত্য অর্থ, নিত্য সম্বন্ধ এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। ব্যক্তি অনিত্য, জাতি নিত্য এইজন্য জাতিকে পদের অর্থরূপে গ্রহণ করে উক্ত বিগ্রহ করা হয়েছে।

অনন্তর ভাষ্যকার ব্যক্তিকে পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলেও ‘সিদ্ধে শব্দার্থঃ সম্বন্ধে’ এই বার্তিক গ্রন্থের সম্বয় করা যাবে এই অভিপ্রায়ে পূর্বপক্ষ উঠিয়েছেন “অথ দ্রব্যো পদার্থে কথং বিগ্রহঃ কর্তব্যঃ?” দ্রব্য অর্থাৎ ব্যক্তিকে পদার্থ বলে গ্রহণ করলে ‘সিদ্ধে শব্দার্থঃ সম্বন্ধে’ এখানে কিরূপে বিগ্রহ করা যাবে? এর উত্তরে বলেছেন “সিদ্ধে শব্দে অর্থঃ সম্বন্ধে চ ইতি” সিদ্ধ শব্দ, সিদ্ধ অর্থঃ সম্বন্ধ। এইরূপ বিগ্রহে সিদ্ধে শব্দটির ‘শব্দ’ এই শব্দের সঙ্গে এবং ‘অর্থঃ সম্বন্ধঃ’ এই শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে। তার মানে “শব্দার্থঃ সম্বন্ধে” এই বার্তিকের পদটিকে এইভাবে ব্যুৎপাদন করতে হবে ‘অর্থানাং সম্বন্ধঃ’ ‘অর্থঃ সম্বন্ধঃ’ এইভাবে প্রথমে অর্থঃ শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ শব্দের ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করতে হবে। তৎপুরুষ সমাসে সাধারণতঃ উত্তর পদের অর্থ প্রধান হয়। এই জ্ঞাত ‘অর্থঃ সম্বন্ধঃ’ এই শব্দটির ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করলে ‘সম্বন্ধঃ’ শব্দটির অর্থ প্রধান হবে, অর্থঃ অপ্রধান হয়ে যাবে। তার পর ‘শব্দঃ অর্থঃ সম্বন্ধঃ অনয়োঃ সমাহারঃ’ এইরূপ বিগ্রহে সমাহার বস্তু সমাস করতে হবে। ‘সমাহারঃ’ বস্তু হলে সমাহারে একবচন ও নপুংসকলিঙ্গ হওয়ায় ‘শব্দার্থঃ সম্বন্ধঃ’ এইরূপ প্রথমাবিভক্তিতে

রূপ হবে। সেই ‘শব্দার্থ’সম্বন্ধ’ রূপ সমাহার ব্হন্দসমাসযুক্ত শব্দের সপ্তমীতে ‘শব্দার্থ’সম্বন্ধে’ এইরূপ সিদ্ধ হয়েছে। এইরূপ সিদ্ধ হওয়ায় “সিদ্ধে শব্দার্থ’ সম্বন্ধে’ এই বার্তিক বাণ্যের অন্তর্গত অসমস্ত ‘সিদ্ধে’ এই পদটির অর্থ [নিত্য] ‘শব্দার্থ’সম্বন্ধে’ এই সমাসান্ত শব্দের অন্তর্গত ‘শব্দ’ এই শব্দের অর্থে’ এবং ‘অর্থ’সম্বন্ধ’ এই শব্দের অর্থে’ অস্থিত হবে, ‘অর্থ’সম্বন্ধে’র অন্তর্গত ‘অর্থ’ এই শব্দের অর্থে’ অস্থিত হবে না। কারণ “পদার্থঃ পদার্থেন্নাশ্ব্যেতি নতু পদার্থৈকদেশেন” পদের [একটি পদের] অর্থ, অপর পদার্থে’র [অপর পদের প্রধান অর্থের] সহিত অস্থিত হয়, পদার্থে’র [অপর পদার্থে’র] একাংশের সহিত অস্থিত হয় না। এইরূপ নিয়ম আছে। শব্দচ অর্থ’সম্বন্ধচ এইরূপ ব্হন্দ সমাস [সমাহার ব্হন্দ] করাতে ব্হন্দসমাসে সকল পদের অর্থ’ প্রধান বলে “সিদ্ধে’ এই পদের অর্থ’টি ‘শব্দ’ পদের অর্থের সঙ্গে এবং ‘অর্থ’সম্বন্ধ’ পদের অর্থের সঙ্গে অস্থিত হবে। “অর্থ’সম্বন্ধ’ শব্দটি ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস নিম্পন্ন হওয়ায় ‘অর্থ’ এই শব্দটি ‘অর্থ’সম্বন্ধ’ শব্দের একদেশ [একাংশ] হয়ে গেছে বলে ‘সিদ্ধ’ শব্দের অর্থ’ সেই ‘অর্থ’সম্বন্ধ’ শব্দের একাংশ ‘অর্থ’ শব্দের অর্থের সহিত অস্থিত হবে না। সুতরাং “সিদ্ধঃ শব্দঃ” অর্থ’ নিত্য, শব্দ, “সিদ্ধঃ অর্থ’সম্বন্ধঃ” অর্থ’ নিত্য অর্থ’সম্বন্ধ [পদের অর্থের সম্বন্ধ] এইরূপ অর্থ’ শব্দের নিত্য এবং অর্থ’সম্বন্ধের নিত্য প্রাপ্ত হওয়ায় অর্থ’ বা পদের অর্থকে ব্যক্তি বলে গ্রহণ করলে ব্যক্তি অনিত্য হলেও কোন দোষ হয় না। কারণ ‘সিদ্ধ’ এই শব্দের অর্থ’টি তো “অর্থ’সম্বন্ধের” অন্তর্গত ব্যক্তিরূপ অর্থ’ অস্থিত হচ্ছে না। এই অভিপ্রায়ে মহাভাষ্যকার বললেন ব্যক্তিকে পদের অর্থ’ বলে গ্রহণ করলে ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থ’সম্বন্ধে চ’ এইরূপ বিগ্রহ করা হবে।

কিন্তু এইরূপ বললেও এর উপর প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক এই যে—অর্থ’ পদের অর্থ’ ব্যক্তি হলে, সেই ব্যক্তি অনিত্য বলে অর্থও অনিত্য হল। অর্থ যদি অনিত্য হয় তাহলে অর্থের সম্বন্ধ কি করে নিত্য হবে? অর্থ’ অনিত্য হলে সেই অর্থের বিনাশ হওয়ায়, তার সম্বন্ধও অনিত্য হয়ে যাবে। অতএব মহাভাষ্যকার ‘সিদ্ধে অর্থ’সম্বন্ধে’ এইরূপ বিগ্রহ প্রদর্শন করে, অর্থ’সম্বন্ধকে নিত্য বলে সূচিত করেছেন। ইহা তো অস্বপ্নময়। এই প্রশ্নের উত্তরে কৈট মহাভাষ্য-প্রবীণে বলেছেন অর্থ’ অনিত্য হলেও অর্থের সঙ্গে শব্দের যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ হচ্ছে যোগ্যতা। সেই যোগ্যতার আশ্রয় হচ্ছে শব্দ! শব্দ নিত্য

বলে তাতে আশ্রিত যোগ্যতারূপ সম্বন্ধও নিত্য হতে পারে (২০২)। এই যোগ্যতা হচ্ছে অর্থজ্ঞানজনকস্বযোগ্যতা। শব্দ, অর্থজ্ঞানের জনক হয়, শব্দের অর্থজ্ঞান জনকতার যোগ্যতা আছে, সেই যোগ্যতা হচ্ছে তাদাত্ম্য। পদের অর্থ নষ্ট হলে বা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হলেও শব্দ, সেই নষ্ট বা ভাবী অর্থের জ্ঞান জন্মিয়ে দেয় বলে নষ্ট বা ভাবী পদার্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। সেইবুদ্ধিতে উপস্থিত অর্থের সঙ্গে শব্দের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নিত্য হতে পারে। যেহেতু শব্দে স্থিত সম্বন্ধটি অর্থস্থিত সম্বন্ধ থেকে অভিন্ন বলে শব্দের নিত্যতা নিবন্ধন তাদাত্ম্য সম্বন্ধটিও নিত্য হয়। আকাশ যেমন নিত্য সেইরূপ আকাশবৃত্তি শব্দও নিত্য (২১০)। এই অভিপ্রায়ে মহাভাষ্যকারও বলেছেন “নিত্যো হর্থবতা-মর্থৈরতিসম্বন্ধঃ”। অর্থ আছে যাদের সেই শব্দসমূহের; অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য ॥ ৪২ ॥

মূল

অথবা দ্রব্য এব পদার্থ এব বিগ্রহো ত্রায্যঃ—সিদ্ধে শব্দে অর্থ সম্বন্ধে চেতি। দ্রব্যং হি নিত্যমাকৃতিরনিত্য। কথং জায়তে? এবং হি দৃশ্যতে লোকে যুৎ কয়াচিদাকৃত্য যুক্তা পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃচ্চ ঘটিকাঃ ক্রিয়ন্তে, ঘটিকাকৃতিমুপমৃচ্চ কুণ্ডিকাঃ ক্রিয়ন্তে। তথা স্তবর্ণং কয়াচিদাকৃত্য যুক্তং পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃচ্চ রুচকাঃ ক্রিয়ন্তে, রুচকাকৃতি-মুপমৃচ্চ কটকাঃ ক্রিয়ন্তে। কটকাকৃতিমুপমৃচ্চ স্বস্তিকাঃ ক্রিয়ন্তে! পুনরাবৃত্তঃ স্তবর্ণপিণ্ডঃ পুনরপরয়াকৃত্য যুক্তঃ খাদিরাক্সরসবর্ণে কুণ্ডলে ভবতঃ। আকৃতিরন্যা চান্যা চ ভবতি, দ্রব্যং পুনস্তদেব। আকৃত্যুপমর্দেন দ্রব্যমেবাবশিষ্যতে ॥৪৩॥

অনুবাদ :—অথবা দ্রব্য [উপাদান দ্রব্য ও ব্যক্তি] পদার্থ হলেই ‘সিদ্ধে

(২০২) অনিত্যত্বের কথং সম্বন্ধস্যা নিত্যত্বের চেদ, যোগ্যতালক্ষণস্বং সম্বন্ধস্য, তদ্যাস্ত শব্দাশ্রয়ত্বলক্ষণস্য চ নিত্যত্বাদিদোষঃ।

(২১০) নমু তাদাত্ম্যন্ত সম্বন্ধে কথং তত্ত নিত্যত্বমিতি চেদ। নষ্টতাবিবর্তনোপ পি বোধ্যযোক্তার্থেন তস্য তাদাত্ম্যং নিত্যমিত্যাশয়াৎ। শব্দবৃত্তিধর্মস্যার্থ বৃত্তিধর্মভেদমাপন্নত তাদাত্ম্যত্বেনাধোবধাচ্চ। ‘শব্দন্ত চ নিত্যত্বাদি’তি। আকাশবত্বব্রিটশব্দোহপি নিত্যঃ। ব্যঞ্জকাতাবাত্ত্ব ন সর্বদোশলভ ইতি। [মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত]

শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ' এই [এইরূপ] বিগ্রহ যুক্তিযুক্ত। যেহেতু দ্রব্য নিত্য, আকৃতি [অবয়বসম্মিলন] অনিত্য। কিরূপে জানলে? [দ্রব্য নিত্য, আকৃতি অনিত্য—ইহা কিরূপে জানলে]। লোকে এইরূপ দেখা যায়—যুক্তিকা কোন এক আকার বিশেষ বিশিষ্ট হলে পিণ্ড হয়; পিণ্ডাকারকে নষ্ট করে ছোট ঘট করা হয়। ছোট ঘটের আকারকে নষ্ট করে হাঁড়ি উৎপাদন করা হয়। সেইরূপ স্ববর্ণ কোন এক আকারের দ্বারা যুক্ত হলে পিণ্ড হয়; পিণ্ডাকারকে নষ্ট করে রুচক [অলঙ্কারবিশেষ] করা হয়, রুচকাকারকে নষ্ট করে কটক [স্ববর্ণালঙ্কারবিশেষ] করা হয়, কটকাকারকে নষ্ট করে শস্তিক [সোনার আর এক প্রকার অলঙ্কার] করা হয়।

[সেই রুচকাকারাদি থেকে] পুনরায় স্ববর্ণ, পিণ্ডাকারে আবর্তিত [হয়]। পুনরায় অপর আকারের দ্বারা যুক্ত হয়ে [স্ববর্ণপিণ্ড] যদিও কাঠের অগ্নির বর্ণ সন্দেশ বর্ণবিশিষ্ট কুণ্ডল যুগল হয়]। আকৃতি [অবয়বসম্মিলনরূপ আকার] ভিন্ন ভিন্ন হয়; কিন্তু দ্রব্য তাহাই [থাকে]। আকারের বিনাশে দ্রব্যই অবশিষ্ট থাকে ॥ ১৩ ॥

বিরূতি :—মহাভাষ্যকার, কোন শ্রুতি বাক্য বা স্মৃতি বা বার্তিক প্রভৃতির ব্যাখ্যায় নানাপ্রকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। নানা পক্ষ অবলম্বন করে ব্যাখ্যার কৌশল প্রদর্শন পূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা, মহাভাষ্যকারের এক অদ্ভুত প্রতিভার কার্য। পূর্বে 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে' এই বার্তিকের ব্যাখ্যায় আকৃতি অর্থাৎ জাতিকে পদের অর্থ স্বীকার করে বিগ্রহ বাক্য প্রদর্শন করেছেন। আকৃতি বা জাতির নিত্যতা নিবন্ধন তাতে 'সিদ্ধ' এই বিশেষণের অর্থ দেখিয়েছেন। এখন দ্রব্যকে পদের অর্থ স্বীকার করে তাতে [দ্রব্যে] 'সিদ্ধ' এই বিশেষণের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনের জন্ত বলছেন—'অথবা দ্রব্যে এব পদার্থে' ইত্যাদি। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে—মহাভাষ্যকার পূর্বে দ্রব্যকে অনিত্য বলেছিলেন আর আকৃতিকে নিত্য বলেছিলেন,—আর এখন ঠিক তার বিপরীত বলছেন—দ্রব্য নিত্য আর আকৃতি অনিত্য। এতে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ কখন রূপ দোষ ভাষ্যকারের উপর আপত্তি হয়। কিন্তু বস্তুত তানয়। তিনি এই ভাবে বিরুদ্ধার্থবাদী নন। তাঁর বাক্যের অর্থ গম্ভীর। পূর্বে তিনি আকৃতি শব্দে জাতি এবং দ্রব্য শব্দে ব্যক্তিকে বুঝিয়েছিলেন। জাতি নিত্য, গবাদি ব্যক্তি অনিত্য—ইহা শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণ ও অদ্বয় ব্রহ্মবাদী বেদান্তি ভিন্ন—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

আর এখন আকৃতি শব্দে আকার, বা সংস্থান [অবয়বসন্নিবেশ] এবং দ্রব্য শব্দে কার্ণের উপাদান দ্রব্যকে বুঝিয়েছেন। মহাভাষ্যকারের এখানকার বাক্যাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে ইহা বুঝা যায়—ঘটাদি কার্ণের উপাদান মৃত্তিকাদি দ্রব্য নিত্য, আর মৃৎপিণ্ড, কপালাদি আকার [অবয়বসন্নিবেশ] অনিত্য। মৃত্তিকা পিণ্ডের আকারে কখন অবস্থান করে, আবার পিণ্ডাকার নষ্ট হয়ে কখনও কপালাকারে, কখনও ঘটাকারে অবস্থান করে; সূতরাং পিণ্ড, কপাল, ঘটাদি আকার [অবয়ববিন্যাস] অনিত্য। মৃত্তিকারূপ দ্রব্য নিত্য। পিণ্ড, চূর্ণ, কপাল, ঘট প্রভৃতি আকৃতি [অবয়বসন্নিবেশ বা সংস্থান] গুলি পরিবর্তিত বা বিনষ্ট হলেও সর্বত্র মৃত্তিকা কিন্তু অন্তর্গতভাবে থাকে। সূতরাং মৃত্তিকারূপ দ্রব্য নিত্য; পিণ্ডাদি আকৃতি অনিত্য। এইরূপ স্ববর্ণ দ্রব্য নিত্য—কটক কুণ্ডল প্রভৃতি আকৃতি অনিত্য। তবে মৃত্তিকারূপ দ্রব্য বা স্ববর্ণরূপ দ্রব্যও বাস্তবিক নিত্য নয়। কোন সময় প্রলয়াদিকালে মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যেরও বিনাশ হয়। তাহলে মহাভাষ্যকার কি করে এই মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যকে নিত্য বললেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দুই প্রকারে করা যায়। প্রথমত নিত্য মানে আপেক্ষিক নিত্য অর্থাৎ অধিককালস্থায়ী। পিণ্ড, কপালাদি আকারের অপেক্ষা মৃত্তিকা অনেক অধিক কালস্থায়ী। এই হেতু মৃত্তিকারূপ দ্রব্য নিত্য, আর পিণ্ড কপালাদি আকৃতি অনিত্য—অল্পকালস্থায়ী। দ্বিতীয় উত্তর এই—পিণ্ড, কপাল প্রভৃতি বিকার পদার্থকে বিচার করলে দেখা যায় উহার অর্থাৎ এই বিকার, মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছু নয়—উহার কেবল নাম মাত্র। উহাদেব স্বরূপ মৃত্তিকাই। এইভাবে মৃত্তিকাকে গ্রহণ করে বিচার করলে দেখা যাবে, ঐ মৃত্তিকাও তার কারণ দ্রব্য ভিন্ন কিছু নয়। সূতরাং মৃত্তিকা, জল, তেজঃ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ শেষ পর্যন্ত তাদের মূল কারণ শব্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। বৈয়াকরণদের মতে ঐ শব্দ ব্রহ্মই বিবর্তিত হয়ে সমস্ত গবাদি শব্দ ও পৃথিব্যাদি অর্থ রূপে জগতে প্রতিভাত হয়। অতএব সেই শব্দব্রহ্মই সত্য বা নিত্য, অন্তঃসমস্তই অনিত্য। এই শব্দব্রহ্মকেই মহাভাষ্যকার এখানে ‘দ্রব্য’ শব্দের দ্বারা গূঢ়ভাবে বুঝাতে চেয়েছেন। আর সেই শব্দব্রহ্মের সমস্ত কার্ণকে ‘আকৃতি’ শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন। সূতরাং ‘আকৃতি অনিত্য, দ্রব্য নিত্য’, মহাভাষ্যকারের এই উক্তি উপপন্ন হয়। শব্দ শব্দের অর্থ ব্রহ্মতত্ত্ব বলে অর্থ নিত্য হতে পারে। ঘট শব্দের অর্থ ঘটোপাধ্যাক্ষিক

ব্রহ্ম । যুক্তিকাশঙ্কের অর্থ যুক্তিকাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম । এইভাবে অসত্য উপাখ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বই দ্রব্যপদের দ্বারা বোধ্য হওয়ায় “দ্রব্য নিত্য” এবং কারণীভূত ব্রহ্মবস্তুতে আরোপিত আকৃতি বা আকার অসত্য বলে অনিত্য, এইরূপ মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করা যায় ॥ ৪৩ ॥ (২১১) ।

মূল

আকৃতাৱপি পদার্থ এষ বিগ্রহো জ্ঞায্যঃ—সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি । নহু চোক্তমাকৃতিরনিত্যোতি । নৈতদস্তুি । নিত্যাকৃতিঃ । কথম্ ? ন কচিৎপরতেতি কৃৎস্বা সর্বত্রোপরতা ভবতি, জব্যাস্তরস্থা তূলভ্যতে । অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্—ঋৎ কুটস্থমবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্যমুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যতন্মিত্য-মিতি । তদপি নিত্যং যস্মিন্ন্তত্ত্বং ন বিহন্যতে । কিং পুনস্তত্ত্বম্ ? তস্ম ভাবস্তত্ত্বম্ । আকৃতাৱপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আকৃতি [সংস্থান], পদের অর্থ হলেও “সিদ্ধে শব্দে, অর্থে, সম্বন্ধে চ” এই বিগ্রহ জ্ঞায্য [যুক্তিযুক্ত] । আকৃতি অনিত্য, ইহা [আপনি] বলেছেন । ইহা হয় না [না, উহা ঠিক নয়] । আকৃতি নিত্য । কিরূপ [আকৃতি কিরূপে নিত্য] ? কোন স্থলে উপরত [জ্ঞানের অবিসয়] হলো বলে সর্বত্র উপরত হয় না ! অত্র দ্রব্যো—[আশ্রয় দ্রব্যাস্তরে] স্থিত রূপে কিন্তু উপলব্ধ হয় । অথবা ‘যাহা ঋৎ, কুটস্থ, বিচলনশূন্য, বিনাশ, পরিণাম ও বিকার রহিত, উৎপত্তিরহিত, বৃদ্ধিরহিত ও অব্যয়যোগী তাহা নিত্য’ ইহাই নিত্যের লক্ষণ নয় । [কিন্তু] বাহাতে [যাহা বিনষ্ট হলেও] তত্ত্বের বিঘাত [বিনাশ] হয় না—তাহাও নিত্য । তত্ত্ব কি ? তাহার [বস্তুর] ভাব তত্ত্ব । আকৃতিতে ও [আকৃতি নষ্ট হলেও] তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বাস্তি—মহাভাষ্যকার “সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে” এই বাস্তবিক গ্রন্থের বিগ্রহ দেখিয়েছিলেন—“সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ” । এইরূপ বিগ্রহে পদের অর্থও

(২১১) এইভাবে সেই সেই অসত্য উপাখ্যার। অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বকে ‘দ্রব্য’ শব্দের অর্থ বলে স্বীকার করলে—দ্রব্যের নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে কল্পিত সংস্থানরূপ আকৃতি যেমন অনিত্য হয়, সেইরূপ জ্ঞাতিও আকৃতিপদের বাচ্য বলে—সেই জ্ঞাতিও অনিত্য হয় । সুতরাং এই পক্ষে এখানে আকৃতি শব্দের দ্বারা সংস্থান এবং জ্ঞাতি—উভয়কে গ্রহণ করলে কোন অনুলপত্তি হয় না ।

নিত্য বলে প্রতিশাদিত হওয়ার পূর্বপক্ষী প্রমাণ করেছিলেন পদের অর্থ কি? তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছিলেন—‘আকৃতি’ পদের অর্থ। সেখানে ‘আকৃতি’ শব্দের দ্বারা জাতিকেই তিনি অভিপ্রেত করেছিলেন। কারণ অদ্বৈতবাদী ভিন্ন সকল আত্মিক দর্শনানুসারীরা জাতিকে নিত্য বলেন। সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসম্মিলনকে কেহ নিত্য বলেন না। সুতরাং মহাভাষ্যকারের প্রথম উক্তিতে আকৃতি শব্দটি জাতির বাচক। তারপর দ্বিতীয় উক্তিতে মহাভাষ্যকার ‘দ্রব্যকে’ পদের অর্থ বলে দ্রব্যের নিত্যতা এবং আকৃতির অনিত্যতা দেখিয়েছিলেন। সেই দ্বিতীয় উক্তিতে মহাভাষ্যকার পিণ্ড, ঘটিকা প্রভৃতিকে আকৃতি বলেছিলেন। তাতে আকৃতি শব্দে তিনি অবয়বসম্মিলনকে বুঝিয়েছিলেন। যেহেতু অবয়ব সম্মিলন অনিত্য। কিন্তু সেই দ্বিতীয় উক্তিতে তিনি ‘জাতিকে’ আকৃতি শব্দে লক্ষ্য করেন নাই। কারণ জাতিরূপ আকৃতির নিত্যতা তিনি প্রথমে বলে এসে আবার তার অনিত্যতা বললে—তার উক্তিতে পরস্পর বিরোধের প্রসক্তি হয়ে যেত। মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় পর্ধ্যয়ে ‘দ্রব্যকে’ পদের অর্থ বলে, তার [দ্রব্যের] নিত্যতা বলেছেন। সেখানে দ্রব্য বলতে তাঁর দৃষ্টান্ত দ্বারা মৃত্তিকাপ্রভৃতি কারণ দ্রব্যকে বুঝা গেছে। মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ দ্রব্য বস্তুত নিত্য না হলেও মৃত্তিকাদির বিকার পিণ্ড, চূর্ণ, কপালাদির ভুলনায় মৃত্তিকাদি দ্রব্য দীর্ঘকাল স্থায়ী বলে আপেক্ষিক নিত্য।

এখন তৃতীয় পর্ধ্যয়ে মহাভাষ্যকার বলেছেন—আকৃতিকেও পদের অর্থ বলে স্বীকার করলেও “সিন্ধে শব্দে অর্থে সন্ধে চ” এইরূপ বিগ্রহ করা যাবে, তার মানে আকৃতি নিত্য ইহাই স্বীকার করতে হচ্ছে। এখানে অর্থাৎ এই তৃতীয় পর্ধ্যয়ে মহাভাষ্যকার উচ্চারিত ‘অকৃতি’ শব্দের অর্থ ‘জাতি’ ইহা বলা যায় না। কারণ এই জাতিরূপ আকৃতি যে নিত্য তাহা মহাভাষ্যকার প্রথম পর্ধ্যয়ে বলে, এসেছেন। তার অনিত্যতার আশঙ্কাই উঠে নাই; যার জন্য এই তৃতীয় পর্ধ্যয়ে সেই জাতির অনিত্যতার খণ্ডন করে নিত্যতা বলতে পারেন। সুতরাং এই তৃতীয় পর্ধ্যয়ে মহাভাষ্যকারের “আকৃতাবপি পদার্থে” এইস্থলে “আকৃতি” শব্দের অর্থ—সংস্থান [অবয়বসম্মিলন] বলেই গ্রহণ করতে হবে। এই সংস্থানরূপ আকৃতিকে এখন নিত্য বলায় পূর্বপক্ষী আক্ষেপ করেছেন—“নহু চোক্তমাকৃতিরনিত্যোতি।” ‘আকৃতি অনিত্য’ এই কথা মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় পর্ধ্যয়ে বলেছিলেন। সেই দ্বিতীয় পর্ধ্যয়ে উক্ত ‘আকৃতি’ শব্দের অর্থ যে

সংস্থান [জ্ঞাতি নয়] তাহা পূর্বেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে কথিত 'আকৃতি' শব্দের সংস্থান অর্থ গ্রহণ করলে, এই তৃতীয় পর্ধ্যায়োক্ত 'ননুচোক্ত মাকৃতিরনিত্যোতি' এই পূর্বপক্ষীর কথাও সঙ্গত হয়। নতুবা দ্বিতীয়পর্ধ্যায়ে কথিত আকৃতি শব্দের 'জ্ঞাতি' অর্থগ্রহণ করলে মহাভাষ্যকারের কথার বিরোধ হয় [ইহা পূর্বেই দেখান হয়েছে] বলে, তৃতীয় পর্ধ্যায়ে সেই মহাভাষ্যকারের উক্তির উপর পূর্বপক্ষীর আক্ষেপও অযুক্ত হয়ে যায়। পূর্বপক্ষীর এই আক্ষেপের উত্তরে মহাভাষ্যকার বললেন—“নৈতদন্তি, নিত্যাকৃতিঃ” ‘না, ইহা নয় অর্থাৎ আকৃতি অনিত্য নয়, কিন্তু আকৃতি নিত্য।’ মহাভাষ্যকারের এই উত্তরবাক্য থেকেও বুঝা যায় যে, তিনি এখানে সংস্থানরূপ আকৃতির অনিত্যতার নিষেধ করে নিত্যতার কথা বলছেন। তিনি যদি এখানে জ্ঞাতিরূপ আকৃতির অনিত্যতার নিষেধ করে নিত্যতার কথা বলতেন তাহলে তিনি—“নৈতদন্তি, আকৃতির্নিত্যাইত্যুক্তম্” অর্থাৎ—‘না আকৃতি অনিত্য নয়, কিন্তু নিত্য ইহা [আমি] পূর্বে বলেছি’ এইরূপই বলতেন। কারণ তিনি প্রথম পর্ধ্যায়ে আকৃতিকে নিত্য বলে এসেছেন। কিন্তু ভাষ্যকার সেভাবে বললেন না। তিনি “নিত্যাকৃতিঃ” ‘আকৃতি নিত্য’ এইভাবে বগলেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে তিনি [মহাভাষ্যকার] দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে সংস্থানরূপ আকৃতিকেই অনিত্য বলেছিলেন। এখন আবার তৃতীয় পর্ধ্যায়ে সেই সংস্থানরূপ আকৃতিকে নিত্য বলছেন। এতে কেহ প্রশ্ন করতে পারেন এইভাবে মহাভাষ্যকারের উক্তিতে তো পূর্বাপরবিরোধের প্রসক্তি হলো। তার উত্তরে বলব—এই বিরোধের সমাধান তো মহাভাষ্যকার স্বয়ং ‘কথম্’ ‘ন কচিৎপরত’ ইত্যাদি নীচের বাক্যের দ্বারাই করে দিয়েছেন। সেই নীচের পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। “কথম্”? মহাভাষ্যকার যখন বললেন “নৈতদন্তি নিত্যাকৃতিঃ” না এইরূপ নয় আকৃতি নিত্য। তখন পূর্বপক্ষী বলছেন ‘কথম্’ আকৃতি কিরূপে নিত্য? পূর্বপক্ষীর এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন—“ন কচিৎপরতেতি কৃষা সর্বত্রোপরতা ভবতি, দ্রব্যান্তরস্থা তু উপলভ্যাতে” কোনস্থলে [কোন দ্রব্য অর্থাৎ ব্যক্তিতে] উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত হলো বলে সর্বত্র নিবৃত্ত হয় না। অত্র দ্রব্যো [ব্যক্তিতে] উপলব্ধ হয়। কোন গোব্যক্তির ধ্বংস হলে সেই ব্যক্তিতে গরুর সংস্থান [অবয়বসন্নিবেশ] উপরত অর্থাৎ ক্রমান্বয়ের অবিষয় হলেও অত্রদ্রব্য

অর্থাৎ অল্প গোব্যক্তিতে গোসংস্থানরূপ আকৃতি উপলব্ধ হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে একটি গোব্যক্তিতে যে অবয়বসম্মিলন [সংস্থান] থাকে, অপর গোব্যক্তিতে তো সেই অবয়বসম্মিলন থাকে না। গোব্যক্তিগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ গোব্যক্তিগত অবয়বসম্মিলনও ভিন্ন ভিন্ন। তাহলে সংস্থান বা অবয়বসম্মিলনকে এখানে ‘আকৃতি’ শব্দের অর্থ বলে গ্রহণ করলে তো মহাভাষ্যকারের এই কথার সামঞ্জস্য হয় না। মহাভাষ্যকার বলেছেন—একটি দ্রব্য বা ব্যক্তিতে আকৃতি উপরত হলেও অল্পত্র—অল্প ব্যক্তিতে উপলব্ধ হয়। মহাভাষ্যকারের এই কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে এখানে একই আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে থাকে। একটি ব্যক্তি মরে গেলেও জগতে অল্প ব্যক্তিতে সেই আকৃতি থাকে; তাতে সেই আকৃতি উপলব্ধ হয়। সংস্থানকে আকৃতি বলে গ্রহণ করলে সংস্থান এক নয় বলে ভাষ্যের উক্ত বচন সঙ্গত হয় না। এব উত্তরে বলা যায় ব্যক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও যেমন “ইহা গরু” “ইহা গরু” এইরূপ অল্পগত জ্ঞান হয়। সেখানে অল্পগমক হচ্ছে জ্ঞাতি। এই জ্ঞাতি রূপ আকৃতি যেমন সকল ব্যক্তির অল্পগমক, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন সংস্থানেরও অল্পগমক এই জ্ঞাতি। প্রত্যেক গরুকে দেখলে, তাদের অবয়ব সম্মিলন ভিন্ন ভিন্ন হলেও সেই অবয়বসম্মিলনগুলির মধ্যে এমন একটা সাদৃশ্য আছে, যাতে আমরা মনুষ্য প্রভৃতির অবয়ব সম্মিলন থেকে সমস্ত গরুর অবয়ব সম্মিলনকে ভিন্ন একজাতীয় অবয়ব সম্মিলন বলে বুঝতে পারি। স্তত্রাং সকল গোব্যক্তিতে অবয়বসম্মিলনগুলি এক অল্পগত জ্ঞাতিবিশিষ্ট অবয়বসম্মিলন বলে, গোব্যক্তিগত অবয়বসম্মিলনগুলিকে এক বলা যেতে পারে [গোণভাবে এক বলা যায়]। স্তত্রাং একটি গোব্যক্তি মারা গেলে তাতে অবয়বসম্মিলনরূপ আকৃতি না দেখা গেলেও অপর গোব্যক্তিতে সেই অবয়বসম্মিলন দেখা যায়। এইভাবে মহাভাষ্যের উক্তি সঙ্গত হয়। মহাভাষ্যকারের এইরূপ উক্তি থেকে বুঝা গেল সংস্থানরূপ আকৃতি নানাদ্রব্যে অর্থাৎ ব্যক্তিতে থাকে বলে কোন ব্যক্তি নষ্ট হলেও অপর ব্যক্তিতে উপলব্ধ হয়। এর দ্বারা কিন্তু সংস্থানরূপ আকৃতি যে নিত্য তাহাতো বুঝা গেল না। সংস্থানগুলি একজাতীয় বলে, বস্তুত এক নয়, অতএব নিত্যও নয়। এর উত্তরে বক্তব্য এই যে—এখানে মহাভাষ্যকার পারমাণবিক নিত্যতার কথা বা ব্যাবহারিক নিত্যতার কথা বলেন নাই, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্যতার কথাই বলেছেন। অভিপ্রায় এই যে—পারমাণবিক

ভাবে নিত্য হচ্ছে একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্যাকরণঅনুসারে শব্দব্রহ্ম। আর ব্যাবহারিকভাবে নিত্য হচ্ছে, আকাশ, কাল, দিক্, জাতি ইত্যাদি। এবং প্রবাহরূপে একপ্রকার নিত্যতা স্বীকার করা হয়। যেমন সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ তীরে এসে বিলীন হয়ে গেলেও অতীত তরঙ্গ উঠছে, আবার সেই তরঙ্গ বিলীন হলেও অপর তরঙ্গ উঠছে—এইভাবে প্রবাহ বা, ধারারূপে তরঙ্গ নিত্য। প্রত্যেক তরঙ্গ বিনাশী হলেও ধারারূপে নিত্য। এইরূপ এই জগতে এক একটি গোব্যক্তি বিনষ্ট হলেও অপর অপর গোব্যক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, সেইগুলির বিনাশেও অতীত গোব্যক্তি থাকছে—এইভাবে দ্রব্য বা ব্যক্তিকেও যেমন প্রবাহরূপে নিত্য বলা যায় সেইরূপ সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসম্মিলনও প্রবাহ রূপে নিত্য। একটি গোসংস্থান নষ্ট হলেও অপর গোসংস্থান উৎপন্ন হচ্ছে, সেটি নষ্ট হলেও আর একটি হচ্ছে,—এইভাবে সংস্থানও প্রবাহরূপে নিত্য। “সংস্থানত্বাবচ্ছিন্নব্যক্তীনাং তত্ত্বময়ী ব্যক্ত্যা বিনা অনাদিকালজ্ঞাবর্তনম্, সংস্থানস্ত প্রবাহনিত্যতা।” অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে যত সংস্থান (থাকে) তাহাদের অতীতম সংস্থান কোন কালে নাই এমনটা নয়। এমন কোন কাল পাওয়া যাবে না, যে কালে কোন না কোন সংস্থান থাকে না। এইরূপ প্রবাহ নিত্যতাই সংস্থানের নিত্যতা, মহাভাষ্যকারের অভিপ্রেত। তাঁর এই অভিপ্রায় পরবর্তী গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রকটিত করেছেন।

উহাই বলছেন—“অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্ ঋবং কূটস্থম্…… তন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং বশ্বিংস্তবং ন বিহন্ততে।”

ঋবম্ = অতীত বস্তুর সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধশূন্য। কূটস্থম্ = আগন্তুক বস্তুর সহিত সম্বন্ধশূন্য (২১২)।

অবিচালি = অপরিণামী। অনপায়োপজনবিকারি = ‘অপায়শ্চ উপজনশ্চ বিকারশ্চ’ এইভাবে দ্বন্দ্বসমাস করে প্রথমে ‘অপায়োপজনবিকারঃ’ পদ সিদ্ধ হয়। তারপর ‘অপায়োপজনবিকারঃ সন্তি অস্ত’ এইরূপ অর্থে মত্বর্ধীয় ‘ইনি’ প্রত্যয় করে ‘অপায়োপজনবিকারি’ এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। তারপর ‘ন অপায়োজনবিকারি’ এইরূপ নঞ তৎপুরুষ সমাস করে ‘অনপায়োপজন

(২১২)। ঋবম্—স্বাভাবিকবস্তুর সংসর্গহীন। কূটস্থম্ আগন্তুক সংসর্গহীন। অবিচালি অপরিণামি। অপায়োপজনবিকারহীনমিত্যেব ব্যাখ্যানম্—অমুংগতবৃত্ত্যবয়োগি ইতি। বড়ভাববিকাররা হতাঃ বানেন ভাষণে উচ্যতে।—অন্নভট্টঃ।

বিকারি' ইহা সিদ্ধ হয়। অথবা “অপায়শ্চ উপজনশ্চ অপায়োপজনো, অপায়োপজনো চ তৌ বিকারৌ চেতি অপায়োপজনবিকারৌ, তৌস্তঃ অশ্চ ইতি অপায়োপজনবিকারি, ন অপায়োপজনবিকারি অনপায়োপজনবিকারি” এই-ভাবে ও সিদ্ধ করা যায়। এখানে ‘অপায়’ শব্দের দ্বারা বিনাশ এবং অপক্ষয় এই দুইটি অর্থ গৃহীত হয়েছে বলে ‘অনপায়’ শব্দের দ্বারা বিনাশ ও অপক্ষয়—রূপ বিকারের অভাব নিত্যবস্তুতে আছে—ইহা বুঝা যাচ্ছে। ‘উপজন’ শব্দের দ্বারা জন্ম এবং অস্তিত্ব বুঝায় বলে ‘অনুপজন’ অর্থে জন্ম এবং জন্মের পর অস্তিত্বের নিষেধ নিত্য বস্তুতে করা হয়েছে ইহা বুঝা যায়। ‘বিকার’ শব্দের দ্বারা ‘বুদ্ধি’ বুঝায় বলে ‘অবিকারি’ বলতে বুদ্ধিশূন্য বুঝা যায়। ‘অবিচালি’ শব্দের দ্বারা পরিণামরূপ বিকাররাহিত্য বুঝা গেছে। তাহলে “অবিচালানপায়োপজন-বিকারি” এই অংশের দ্বারা ‘জায়তে, অস্তি, বিপরিশ্রমতে, বর্ধতে, অপচীয়তে নশ্রতি, এই ছয়টি ভাববিকারের নিষেধ করায় নিত্যবস্তুতে ছয়টি ভাববিকার থাকে না—ইহা সিদ্ধ হয়। “অনপায়োপজনবিকারি” এই শব্দের দ্বারা যাহা বলা হয়েছে—‘অনুৎপত্তি, অবুদ্ধি, অব্যয়যোগি’ এই তিনটি শব্দের দ্বারাও তাহাই বলা হয়েছে। অতএব ‘অনপায়োপজনবিকারি’ শব্দেরই ব্যাখ্যা হচ্ছে ‘অনুৎপত্ত্যবুদ্ধ্যব্যয়যোগি। ‘অনুৎপত্তি’ শব্দের দ্বারা জন্ম ও সত্তার নিষেধ করা হয়েছে। ‘অবুদ্ধি’ শব্দের দ্বারা বুদ্ধির নিষেধ করা হয়েছে। ‘অব্যয়যোগি’ শব্দের দ্বারা অপক্ষয় ও বিনাশের নিষেধ করা হয়েছে। ‘অনুৎপত্তি = নাস্তি উৎপত্তির্ধ্বশ্চ’ এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে—এই শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। অবুদ্ধি = ‘নাস্তি বুদ্ধির্ধ্বশ্চ’ এইরূপ বিগ্রহে ‘অবুদ্ধি’ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। অব্যয়যোগি = “ব্যয়শ্চ যোগঃ অশ্চ অস্তি, ব্যয়যোগি, ন ব্যয়যোগি অব্যয়যোগি” এইভাবে এই শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। অথবা ‘অব্যয়শ্চ যোগোহশ্চ অস্তি’ এইরূপ বিগ্রহে—উহা সিদ্ধ হয়েছে বলা যায়। ঋবশব্দের অর্থ অবিনাশী অর্থাৎ সম্বন্ধীর বিনাশ হলেও যাহার বিনাশ হয় না। যেমন—‘গবাদি ব্যক্তিরূপ সম্বন্ধীর বিনাশ হলেও গোমাদি জাতির বিনাশ হয় না।’ ‘কুটস্থ’ শব্দটি ঐ ঋব’ শব্দের ব্যাখ্যা। তাহলে উক্ত মহাভাগ্যবাক্যের অর্থ এইরূপ হয়—যাহা সম্বন্ধিবিনাশেও অবিনাশী এবং জন্ম, অস্তিত্ব [জন্মের পর অস্তিত্ব] বুদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ ষড়্ভাববিকারশূন্য তাহা নিত্য—ইহাই যে নিত্যের লক্ষণ তা নয় কিন্তু যাহাতে [যাহা বিনষ্ট হলেও] তত্ত্বের বিঘাত

হয় না—তাহাও নিত্য। মহাভাষ্যকারের এই উক্তির দ্বারা বুঝা যাচ্ছে—
ঋব, কূটস্থ ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্মবস্তুর নিত্য। আর গোত্বাদি
জাতি নিত্য। এইরূপ সংস্থানও নিত্য। ব্রহ্মবস্তুর কূটস্থ, ঋব ইত্যাদি
বিশেষণের দ্বারা লক্ষিত বলে তাহা পরমার্থত নিত্য। আর গোত্বাদি
জাতির জন্ম প্রভৃতি ছয়টি বিকার নাই, এবং সংসর্গী গোব্যক্তির বিনাশেও
অবিনাশী, ইহা বৈশেষিক—প্রভৃতি অনেক বাদী বলেন। এই জন্ত
গোত্বাদি জাতিও নিত্য। শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে শব্দব্রহ্ম পারমার্থিক
নিত্য। গোত্বাদি ব্যাবহারিক নিত্য।

সিদ্ধ সংস্থান অর্থাৎ অবয়বসম্মিশ্রণ বিনষ্ট হলেও মহাভাষ্যকার বলেছেন—
উহাও নিত্য। কেন নিত্য? তার উত্তরে বলেছেন—“যস্মিন্‌স্বত্বং ন বিহন্ততে”
অর্থাৎ যাহা বিনষ্ট হলেও তার তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না, তাকেও নিত্য বলা যায়।
এই নিত্যকে প্রবাহরূপে নিত্য বলা হয়। যেমন—গোব্যক্তি নষ্ট হলেও সেই
গোব্যক্তির তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ গোট—তাহা নষ্ট হয় না। একটি গোব্যক্তি নষ্ট
হলেও অপর গোব্যক্তিতে গোট থাকে। অপর গোব্যক্তিতে গোটের জ্ঞান
হয়। এই হেতু গোব্যক্তিকেও নিত্য বলা যায়। প্রবাহরূপে গোব্যক্তি
সকল নিত্য। এক একটি গোব্যক্তি নষ্ট হলেও অপর অপর গোব্যক্তি জগতে
থাকে বলে গোব্যক্তি সকল প্রবাহরূপে নিত্য। এইরূপ সংস্থান বা অবয়ব
সম্মিশ্রণগুলির মধ্যে এক একটির বিনাশ হলেও অগ্নাত্ত গোব্যক্তিতে অগ্নাত্ত
অবয়বসম্মিশ্রণরূপ আকৃতিও নিত্য। অবশ্য উহা প্রবাহরূপে নিত্য।
মহাভাষ্যকার এইভাবে প্রবাহরূপে নিত্যকেও সিদ্ধ শব্দের অর্থ বলে গ্রহণ করে
“সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে” এই বার্তিকের যোজনা করেছেন। “তদপি নিত্যং
যস্মিন্‌স্বত্বং ন বিহন্ততে।” এই মহাভাষ্যে ‘তত্ত্বম্’ শব্দটির উল্লেখ আছে।
উক্ত শব্দের অর্থ জ্ঞানবার জন্ত পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করছেন—“কিंपুনন্তত্ত্বম্”
অর্থাৎ ‘তত্ত্ব কি? তত্ত্বের স্বরূপ কি? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—
“তত্ত্ব ভাবস্তত্ত্বম্” তাহার ভাব—অর্থাৎ ধর্মরূপবস্তুর প্রকারীভূত ধর্মকে ভাব
বলে। সেই প্রকারীভূত ধর্মই বস্তুর তত্ত্ব। যেমন ‘ঘট’ রূপ ধর্মের প্রকারীভূত
ধর্ম হচ্ছে ‘ঘটত্ব’। এই ঘটত্বই ঘটের তত্ত্ব। বস্তুরূপে ধর্মকেই এখানে তত্ত্ব
বলা হয়েছে। এই অভিপ্রায়ে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“আকৃত্যাবপি তত্ত্বং
ন বিহন্ততে।” এর অর্থ হচ্ছে—“আকৃত্যে বিহতায়ামপি তত্ত্বং তদ্বস্তি ধর্মঃ

ন বিহন্তে”। অর্থাৎ আকৃতি বিনষ্ট হলেও তদ্ব বা তদ্বস্তি ধর্ম নষ্ট হয় না। যেমন গরুর অবয়ব সন্নিবেশ নষ্ট হলেও সেই অবয়বসন্নিবেশবস্তি ধর্ম যে গোত্র তাহা নষ্ট হয় না। এক একটি গোব্যক্তি নষ্ট হলে সেই সেই গোব্যক্তিস্থিত অবয়বসন্নিবেশ নষ্ট হলেও অপর অপর গোব্যক্তিস্থিত অবয়বসন্নিবেশের জ্ঞান হয় বলে সর্বত্র অবয়বসন্নিবেশে অহুগত গোত্ররূপ জ্ঞাতি থাকে। সেই জ্ঞাতির বিনাশ হয় না। যদি ও গোত্ররূপ ধর্ম বা জ্ঞাতি সমবায় সম্বন্ধে গোব্যক্তিতে থাকে, গোর অবয়বসন্নিবেশে থাকে না। অতএব গোত্ররূপধর্মটি অবয়বসন্নিবেশ বস্তি নয়, তথাপি গোত্ররূপ ধর্ম, সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে গোর অবয়বসন্নিবেশে থাকে বলে গোত্রকে গোর অবয়বসন্নিবেশবস্তি ধর্ম বলা যায়। এইভাবে অবয়বসন্নিবেশরূপ আকৃতি বিনষ্ট হলেও তার তদ্ব অর্থাৎ গোত্র নষ্ট হয় না বলে তাকেও অর্থাৎ অবয়বসন্নিবেশরূপ আকৃতিকেও নিত্য বলা যায়। সুতরাং তাহা যদি পদের অর্থ হয় তাহলেও উক্ত বার্তিক গ্রন্থের অর্থের অসামঞ্জস্য হয় না। ইহাই মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় ॥ ৪৪ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অথবা কিং ন এতেন—ইদং নিত্যম্, ইদমনিত্যম্ ইতি। যন্নিত্যং তং পদার্থং মন্বৈষ বিগ্রহঃ ক্রিয়তে—সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি।

কথং পুনর্জর্জায়তে—সিদ্ধঃ শব্দোহর্থঃ সম্বন্ধাশ্চেতি।

[বার্তিক]

লোকতঃ ॥ [দ্বিতীয় বার্তিক]

[মহাভাষ্য]

যল্লোকেহর্থমর্থযুপাদায় শব্দান প্রযুজ্যতে। নৈবাং নিবৃত্তৌ যদ্বং কুর্ষন্তি। যে পুনঃ কার্ষা ভাবাঃ নিবৃত্তৌ তাবত্তেষাং যদ্বং ক্রিয়তে। তদ্ যথা ঘটেন কার্ষ্যং করিষ্যন্ কুন্তকারকুলং গত্বাহ কুরু ঘটং, কার্ষ্যমেনে করিষ্যামীতি। ন তদ্বচ্ছব্দান্ প্রযোক্ষ্যমাণো* বৈয়াকরণ-

* 'প্রযুক্তমাণো' পাঠান্তর।

কুলং গত্বাহ কুরু শব্দান্ প্রযোজ্য ইতি । তাবত্যেবার্থমুপাদায়
শব্দান্ প্রযুক্ততে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ :- অথবা ‘ইহা নিত্য’ ইহা অনিত্য’ ইহার দ্বারা [এইরূপ
বিচারের দ্বারা] আমাদের কি [প্রয়োজন] । বাহা নিত্য তাহাকে পদের
অর্থ মনে করে [নিশ্চয় করে] “সিদ্ধে শব্দে অর্থে সৰ্ব্বদে চ” এই বিগ্রহ
করা হয় । শব্দ সিদ্ধ [নিত্য] অর্থ সিদ্ধ এবং সৰ্ব্বদে সিদ্ধ—ইহা কিরূপে
জানলে ? ‘লোক থেকে’ [মানুষের কাছ থেকে] । যেহেতু লোকে
[বিশ্বের মানব] ভিন্ন ভিন্ন অর্থকে গ্রহণ করে [উদ্দেশ্য করে, বুঝাবার
অভিপ্রায়ে] শব্দ সকল প্রয়োগ [উচ্চারণ] করে । ইহাদের [শব্দ সকলের]
নিষ্পাদনে [উৎপাদনে] যত্ন করে না । যে সকল পদার্থ কার্য [উৎপাদ্য]
তাহাদের উৎপত্তিতে যত্ন করা হয় । যেমন—ঘটের দ্বারা কার্য [প্রয়োজন]
সম্পাদন করবে এই হেতু [লোকে] কুন্তকারের গৃহে গমন করে বলে—ঘট
[নির্মাণ] কর, উহার দ্বারা [আমি] কার্য [প্রয়োজন] সম্পাদন করব ।
সেইরূপ শব্দ সকল প্রয়োগ করবে বলে [সেইহেতু], বৈয়াকরণের গৃহে গমন
করে, শব্দ সকল কর [নির্মাণ কর] [আমি] তাহাদের [শব্দ সকলের]
প্রয়োগ করব—এইরূপ বলে, না । সেই পরিমাণেই [বৈয়াকরণের গৃহে না
গিয়েই] অর্থকে গ্রহণ করে [অর্থকে বুঝাবার উদ্দেশ্য করে] শব্দ সকলের
প্রয়োগ করে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্ৰুতি :- পদের অর্থ আকৃতিও হয় আবার দ্রব্যও হয় । পানিনিকর্তৃক
উভয়ই পদার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে । এবিষয়ে বার্তিক
বারের অভিমত কি ? তাহা জানবার কৌতূহল হলে ‘সিদ্ধে শব্দার্থসৰ্বদে’
এই বার্তিক গ্রন্থের মহাভাষ্যকার কৃত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় আকৃতিও পদার্থ
হয় আবার দ্রব্যও পদার্থ হয় । আকৃতি শব্দের দুইপ্রকার অর্থ মহাভাষ্যকারের
ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া গেছে, জাতি এবং সংস্থান । দ্রব্যশব্দেরও দুই প্রকার
অর্থ বুঝা যায়, ব্যক্তি এবং উপদানদ্রব্য । উক্ত বার্তিকগ্রন্থের সিদ্ধ শব্দটি নিত্য
অর্থের বোধক ইহা বুঝাবার জন্য মহাভাষ্যকার পদের অর্থকে কখনও জাতি
বলে গ্রহণ করে তার নিত্যতা বলেছেন, কখনও বা সংস্থান বলে গ্রহণ করে
তার নিত্যতা প্রতিপাদন করেছেন । আবার কখনও দ্রব্যকে পদের
অর্থ বলে গ্রহণ করে তার নিত্যতা প্রতিপাদন করেছেন । তার মধ্যে

‘সংস্থান’ রূপ অর্থটি বস্তুত নিত্য নয় কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য। দ্রব্য অর্থাৎ উপাদান দ্রব্য যুক্তিকা প্রভৃতিও বস্তুত নিত্য নয়, কিন্তু আপেক্ষিক নিত্য। জ্ঞাতিরূপ অর্থটি বৈশেষিকাদি মতে নিত্য হলেও বেদান্তমতে বা ব্যাকরণ মতে পরমার্থত নিত্য নয়। এইরূপ অবস্থায় বার্তিকের ‘সিদ্ধ’ শব্দটির নিত্য অর্থ গ্রহণ করলে পদের অর্থ বস্তুত নিত্য না হওয়ায় বার্তিকগ্রন্থের অসামঞ্জস্য হয়ে যায়। এই অসামঞ্জস্য আশঙ্কার পরিহার করবার জন্য মহাভাষ্যকার বলছেন “অথবা কিং ন এতেন—ইদং নিত্যম্……সম্বন্ধে চেতি।” আকৃতি নিত্য, দ্রব্য অনিত্য বা দ্রব্য নিত্য সংস্থানরূপ আকৃতি অনিত্য ইত্যাদি বিচারে কাজ কি? আকৃতি বা দ্রব্য যদি অনিত্য হয় বা নিত্য হয় হউক। তথাপি জগতে কিছু নিত্য বস্তুতো আছে। যে বস্তু নিত্য তাকেই পদের অর্থ বলবো। তাকে [সেই নিত্যবস্তুকে] পদের অর্থ বললে ‘সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে’ এই বার্তিকের ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ’ এইরূপ বিগ্রহ উপপন্ন হবে। কারণ ‘শব্দ’ যে নিত্য তাহা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন অর্থকেও নিত্য বলা হল। শব্দ এবং অর্থ উভয়েই নিত্য হলে সেই উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য হবে। এখানে মহাভাষ্যকার “যাহা নিত্য তাকেই পদের অর্থ বলে গ্রহণ করব” এইভাবে পদের অর্থকে নিত্য বললেন, কিন্তু সেই অর্থটি কি? যাহা নিত্য অথচ পদের অর্থ; এই বিষয়ে মহাভাষ্যকার কিছু স্পষ্ট করে বললেন না। সুতরাং কোন্ বস্তু পদের অর্থ তাহার নিশ্চয় হল না। মহাভাষ্যপ্রদীপে কৈয়ট বলেছেন—যখন যখন শব্দ উচ্চারণ করা হয় তখন তখন অর্থাকার বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় (২১৩)। এর ব্যাখ্যায় নাগেশ বলেছেন—বাহিরের বস্তু পদের অর্থ নয়, কিন্তু অর্থাকার বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় যে বৌদ্ধ পদার্থ তাহাই পদের অর্থ। বৌদ্ধ বলতে বুদ্ধিবৃত্তিরূপজ্ঞানে বিষয়ীভূত অর্থ। প্রশ্ন হতে পারে সেই বৌদ্ধ অর্থ নিত্য হলো কিরূপে? তার উত্তরে কৈয়ট এবং নাগেশ উভয়েই বলেছেন প্রবাহরূপে নিত্য (২১)। তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানেও ঠিক বস্তুত নিত্যবস্তু পদের অর্থ বলে গৃহীত হলো না, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্যের গ্রহণ হলো। এখানে কৈয়ট

(২১৩) যদা যদা শব্দ উচ্চারিত্ত্বা তদা অর্থাকার বুদ্ধিরূপজ্ঞানম্ ইতি প্রবাহনিত্যার্থস্য নিত্যত্বম্। মহাভাষ্যপ্রদীপ।

(২১৪) বাহ্যঃ পদার্থো ন শব্দবোধে বিষয়ঃ কিন্তু বৌদ্ধঃ, স চ প্রবাহনিত্য ইতি ভাবঃ। অগ্গভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত।

ও নাগেশের উপর বক্তব্য এইবে, যদি তাঁরা প্রবাহরূপ নিত্য পদার্থকে পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলেন, তাহলে প্রবাহরূপে ব্যক্তি, বা সংস্থান বা জব্যও নিত্য হয় বলে সেই পদার্থগুলিকে পদের অর্থ স্বীকার না করে তাঁরা আবার এক বৌদ্ধ অর্থকে পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলেন কেন? এতে কি লাভ হলো। এবং এতে কি ঠিক ঠিক মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত হলো? আমাদের মনে হয়, “সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে” এই বার্তিকের প্রথম ভাষ্য হচ্ছে ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ; ভাষ্যের ব্যাখ্যায় কৈয়ট বলেছিলেন—জ্ঞাতিরূপ অর্থ নিত্য; জব্যরূপ অর্থকে পদের অর্থ বললেও সমস্ত শব্দের বাচ্যার্থ হচ্ছে সেই সেই অসত্য উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব নিত্য বলে পদের অর্থও নিত্য হয়। ঘট শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘটদ্বাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম; গো শব্দের অর্থ হচ্ছে গোদ্বাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। এই মতে জ্ঞাতিও অবিচ্ছিন্নত্ব বলে পরমার্থত নিত্য নয়। এইভাবে “যং নিত্যং তং পদার্থং মত্বা” এই মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায়ও সেই অসত্য উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বকেই পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলে পূর্ণোক্ত দোষের সম্ভাবনা হত না, অথচ পদের নিত্য অর্থটিও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হত। অতিরিক্ত বৌদ্ধ অর্থেরও কল্পনা করতে হত না। যাই হোক মহাভাষ্যকার প্রথম থেকেই ‘সিদ্ধে’ ইত্যাদি বার্তিক গ্রন্থের বিগ্রহ করে এসেছেন ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ’ এইরূপ। ‘সিদ্ধ’ শব্দের ‘নিত্য’ অর্থই তিনি গ্রহণ করেছেন। মহাভাষ্যকারের কথিত বাক্যে প্রশ্ন হতে পারে ‘শব্দ নিত্য’ ‘অর্থ নিত্য’ এবং তাদের ‘সম্বন্ধ নিত্য’ ইহা কি করে জানা গেল? মহাভাষ্যকার উহা কি করে জানলেন? এইরূপ প্রশ্ন মহাভাষ্যকার “কথং পুনর্জায়তে সিদ্ধঃ শব্দোহর্থঃ সম্বন্ধশ্চেতি।” এই গ্রন্থে উত্থাপিত করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তররূপে মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় বার্তিকাংশ “লোকতঃ।” এই গ্রন্থটি উপভুক্ত করেছেন এবং পরে তার ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে ‘লোক’ এই শব্দের তাৎপর্যার্থ হচ্ছে অনাদিলোকব্যবহারপরম্পরা।” লোকে ইদানীং অর্থকে বুঝাবার জন্ত শব্দ প্রয়োগ করে; এর পূর্বকালেও এইভাবে ব্যবহার করত; তার পূর্বেও করত। সুতরাং লোকের এই যে শব্দার্থসম্বন্ধের ব্যবহার তাহা অনাদি। এই লোকের ব্যবহার বলতে বুদ্ধদের অর্থ্যাং শব্দার্থভিজ্ঞ মানুষদের ব্যবহারই বুঝতে হবে। সাধারণ অজ্ঞ মানুষের ব্যবহার নয়। কারণ অজ্ঞদের ব্যবহারকে প্রমাণ বলে স্বীকার করা যায় না। বুদ্ধেরা, কোন্

শব্দের কি অর্থ, কোন শব্দের সঙ্গে কোন অর্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা জেনে ব্যবহার করেন। ইদানীং কালের বুদ্ধেরা আবার পূর্ববর্তী বুদ্ধদের ব্যবহার থেকে শব্দার্থসম্বন্ধবিষয়ে ব্যুৎপত্তি [জ্ঞান] লাভ করেন। অনিত্য বস্তু বিষয়ে লোকের যেরূপ ব্যবহার হয়, শব্দার্থ সম্বন্ধের ব্যবহার তা থেকে বিলক্ষণ, এই জ্ঞাত নিত্য। কি ভাবে লোকব্যবহারদ্বারা শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতা জানা যায়—ইহা বুঝাবার জ্ঞাত মহাভাষ্যকার বলছেন “যল্লোকে অর্থম্ অর্থম্ উৎপাদয়..... তাবতোব্যর্থম্ উৎপাদয় শব্দান্ প্রযুক্ততে।” লোকে কোন অর্থ অপরকে বুঝাবার জ্ঞাত শব্দ প্রয়োগ করে। সেই শব্দ শুনে অপরের অর্থজ্ঞান হয়। শব্দ শুনে যখন তার অর্থের জ্ঞান হয়, তখন বুঝতে হবে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ আছে। যার সঙ্গে যার সম্বন্ধ নাই, তাদের মধ্যে একটিকে জানলে নিয়ত ভাবে অপরটির জ্ঞান হয় না। যেমন পর্বতের জ্ঞান হলে নিয়ত ভাবে নদীর জ্ঞান হয় না। কিন্তু হস্তীকে জানলে হস্তিপকের [মাছতের] স্মরণ হয়। হস্তীর সঙ্গে হস্তিপকের সম্বন্ধ আছে এইভাবে শব্দ শুনে অর্থের স্মরণ হয়, বা অর্থের জ্ঞান হলে তার বাচক শব্দের জ্ঞান হয় বলে শব্দ ও অর্থের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কোন লোক অপর ব্যক্তির জ্ঞানোৎপাদনের জ্ঞাত বলল “এই বনমধ্যে এক সুন্দর সরোবর আছে”। এই শব্দ থেকে শ্রোতার অর্থ জ্ঞান হল। এখানে বক্তা পূর্বোক্ত শব্দ গুলিকে উৎপাদন করে না, বা তার অর্থগুলিকে উৎপাদন করে না, কিন্তু পৃথকে ঐ শব্দ ছিল বক্তা উচ্চারণের দ্বারা ঐ শব্দকে অভিব্যক্ত করেছে মাত্র; অর্থও ছিল, বক্তা অর্থ গুলিকেও উৎপাদন করে না, কিন্তু শব্দের উল্লেখ করে সেই শব্দসম্বন্ধ অর্থ অপরকে বুঝায় অর্থাৎ অপরের অর্থজ্ঞান উৎপাদন করে; অর্থের উৎপাদন করে না। এথেকে বুঝা যায় শব্দ নিত্য, অর্থও নিত্য এবং তাদের সম্বন্ধও নিত্য। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝাবার জ্ঞাত মহাভাষ্যকার বলছেন—লোকে কার্য অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর ব্যবহার করবার জ্ঞাত যেমন সেই বস্তুর উৎপাদনে যত্ন করে, সেইরূপ শব্দার্থসম্বন্ধের ব্যবহার করবার জ্ঞাত শব্দের উৎপাদনে যত্ন করে না। যেমন ঘটে জলরাখা প্রভৃতি কাঁধের জ্ঞাত লোকে কুস্তকারের গৃহে গমন করে, বলে ঘটভৈরী কর, অুমি সেই ঘটের দ্বারা আমার প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করব। এইভাবে শব্দের প্রয়োগ

করবার জন্য কেউ বৈয়াকরণের গৃহে গিয়ে বলে না—শব্দ তৈরী কর আমি প্রয়োগ করব অর্থাৎ অর্থ বুঝাবার জন্য শব্দের প্রয়োগ করব, কিন্তু বৈয়াকরণের গৃহে না গিয়ে বা শব্দের নির্মাণ বিষয়ে অন্য কোন বস্তু না করেই শব্দের প্রয়োগ করে। এইরূপ শব্দের ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে ‘শব্দ নিত্য।’ এখানে মহাভাষ্যকার স্পষ্টকরে অর্থ বা সম্বন্ধের নিত্যতা বিষয়ে পৃথক করে না বললেও তাঁর শব্দব্যবহারের উল্লেখ থেকেই অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যতা বুঝা যাচ্ছে। যেমন কোন লোক অপরকে কোন অর্থ বুঝাবার জন্য যেকোন শব্দের সৃষ্টি বিষয়ে বস্তু করে না, সেইরূপ সেই শব্দের অর্থের সৃষ্টিবিষয়ে বা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ সৃষ্টি বিষয়েও বস্তু করে না। পূর্ব থেকে শব্দও থাকে, অর্থও থাকে সম্বন্ধও থাকে, বস্তু কেবলমাত্র উচ্চারণের দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তন করে, শব্দ অভিব্যক্ত হয়ে সেই শব্দসম্বন্ধ অর্থকে শব্দই বুঝিয়ে দেয়। সুতরাং শব্দ, অর্থ, ও তাদের সম্বন্ধ যে নিত্য, তাহা এই লোক ব্যবহার থেকে জানা যায়—ইহাই মহাভাষ্যকারের বক্তব্য ॥ ৪৫ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

যদি তর্হি লোক এষু প্রমাণম্, কিং শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে ?

[বার্তিক]

লোকতোহর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ ॥

[তৃতীয় বার্তিক]

[মহাভাষ্য]

লোকতোহর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ ক্রিয়তে।
কিমিদং ধর্মনিয়ম ইতি। ধর্মায় নিয়মো ধর্মনিয়মঃ। ধর্মার্থো বা
নিয়মো ধর্মনিয়মঃ। ধর্মপ্রয়োজনো বা নিয়মো ধর্মনিয়মঃ

॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ :—যদি লোক [লোকব্যবহার] এই সকল বিষয়ে [শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধে অথবা শব্দ সমূহে] প্রমাণ, তা হলে শাস্ত্র কি করে ? “লোকব্যবহার থেকে অর্থজ্ঞানরূপ প্রয়োজনের জন্য শব্দের প্রয়োগ [সিদ্ধ হলে] শাস্ত্রের

[ব্যাকরণ শাস্ত্রের] দ্বারা ধর্মনিয়ম [করা হয়] । [বার্তিকের অর্থ] । লোক ব্যবহার হতে অর্থজ্ঞান প্রয়োগে শব্দপ্রয়োগে, শাস্ত্রের দ্বারা ধর্মনিয়ম করা হয় । এই ধর্মনিয়মটি কি ? ধর্মের নিমিত্ত নিয়ম ধর্মনিয়ম । ধর্মার্থক নিয়ম ধর্ম নিয়ম । ধর্ম প্রযুক্ত নিয়ম ধর্মনিয়ম ॥ ৪৬ ॥

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার “লোকতঃ” এই বার্তিকাংশের ব্যাখ্যায় বলে এলেন অনাদিলোকব্যবহার থেকে শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব জানা যায় । তার উপর প্রশ্ন করা হচ্ছে “যদি তর্হি লোক এষু প্রমাণং কিং শাস্ত্রেণ ক্রিয়ন্তে।” শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যত্ব যদি লোকব্যবহার থেকে জানা যায়, তাহলে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ বিষয়ে লোকব্যবহারই প্রমাণ বলে বুঝা যায় । ব্যাকরণের দ্বারা শব্দ নিষ্পাদিত হয় না, ইহাও বুঝা যাচ্ছে । তাহলে এই ব্যাকরণ শাস্ত্র কি করে ? ব্যাকরণ শাস্ত্র ব্যর্থ হয় । লোকের অর্থাৎ যদি অনাদিবুদ্ধব্যবহার পরম্পরা থেকেই সাধারণ মানুষ শব্দের প্রয়োগ করে থাকে, সেক্ষেত্রে ব্যাকরণের কোন প্রয়োজন নাই । ইহাই প্রশ্নকারীর অভিপ্রায় । ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার “লোকতোহর্থপ্রযুক্তে শব্দ প্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ ।” এই বার্তিক উদ্ধৃত করেছেন । যদিও বার্তিক গ্রন্থে “লোকতঃ” এই শব্দটি একবার উল্লিখিত আছে অথপি অর্থের সঙ্গতি করবার জন্ত মহাভাষ্যকার এই ‘লোকতঃ’ শব্দটি আর একবার আবৃত্তি করে “অর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে” এই বার্তিকাংশের সঙ্গে সম্বন্ধ করে উদ্ধৃত করেছেন । এখানে “লোকতঃ” এই শব্দের সম্বন্ধ না করলে অর্থসঙ্গতি হবে না । এই বার্তিক বাক্যস্থিত ‘লোকতঃ’ শব্দের অর্থ লোকব্যবহার হতে অর্থাৎ অনাদি বুদ্ধব্যবহার পরম্পরা থেকে । ‘অর্থপ্রযুক্তে’ ‘অর্থেন প্রযুক্তে’ তৃতীয়াতৎ পুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন । এখানে ‘অর্থ’ শব্দের “অর্থজ্ঞান” এইরূপ অর্থ বুঝতে হবে । অর্থজ্ঞানের জন্ত প্রযুক্ত যে শব্দপ্রয়োগ তাহা লোকব্যবহার থেকে সিদ্ধ থাকায়—ইহাই “লোকতোহর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে” এই বার্তিকাংশের অর্থ । “অপরের অর্থজ্ঞান হোক” এই উদ্দেশ্যে অপরে শব্দ প্রয়োগ করে ; এই শব্দ প্রয়োগ লোকব্যবহার থেকে মানুষ জেনে করে থাকে । এইভাবে লোকব্যবহার থেকে জেনে মানুষ অপরের অর্থজ্ঞানের জন্ত শব্দের প্রয়োগ করে ; এইভাবে শব্দপ্রয়োগ প্রাপ্ত হলে “শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ” ব্যাকরণ শাস্ত্র জানিয়ে দেয় এই শব্দের ‘এই প্রকৃতি, এই প্রত্যয়’ । এই ভাবে প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ জেনে

সাদৃশ্যপ্রয়োগ করলে ধর্ম হয়, অতুলা অসাদৃশ্য শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয় না। সুতরাং ব্যাকরণ শাস্ত্র শব্দ তৈরী করে না বা শব্দের প্রয়োগ সাক্ষাদভাবে জানায় না, কিন্তু কোনগুলি সাদৃশ্য তাহা জানিয়ে দিয়ে সেই সাদৃশ্য শব্দের প্রয়োগ করলে ধর্ম হয় এইরূপ নিয়ম করে দেওয়াই ব্যাকরণ শাস্ত্রের কাজ। এইখানে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। মহাভাষ্যকার এই বার্তিকের সঙ্গে ‘ক্রিয়তে’ এই ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করে বার্তিকবাক্যের অর্থের সঙ্গতি করে দিয়েছেন। তারপর তিনি “ধর্মনিয়মঃ” এই শব্দটির অর্থ করবার জন্য প্রশ্ন উঠিয়েছেন “কিমিদং ধর্মনিয়ম ইতি।” ধর্মনিয়ম ইহা কি? ধর্মনিয়মের অর্থ কি? এইপ্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য মহাভাষ্যকার ‘ধর্মনিয়ম’ শব্দটির তিন প্রকার বিগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। প্রথমে “ধর্মায় নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ” এইভাবে চতুর্থী বিভক্তির দ্বারা বিগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এইভাবে চতুর্থ্যন্ত ‘ধর্ম’ শব্দের উল্লেখ করলেও এখানে চতুর্থীতৎপুরুষ সমাস করে “ধর্মনিয়মঃ” শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ইহা মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় নয়। কারণ পাণিনি “চতুর্থী তদন্থার্থবলিহিতস্বরক্ষিতৈঃ” [পাঃ সূঃ ২।১।৩৬] এই সূত্রের দ্বারা বলেছেন চতুর্থ্যন্ত শব্দের অর্থের জন্য যে বস্তু, সেই বস্তুবাচক শব্দ এবং বলি, হিত, স্বপ্ন, রক্ষিত এই সকল শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত শব্দের সমাস হয়। যেমন ‘কুণ্ডলায় হিরণ্যম্’ কুণ্ডলহিরণ্যম্। এখানে চতুর্থ্যন্ত শব্দ কুণ্ডল-শব্দ, সেই কুণ্ডল শব্দের স্বার্থ যে অলঙ্কারবিশেষ, তাহার জন্য হচ্ছে স্ববর্ণ, সেই স্ববর্ণের বাচক শব্দ হিরণ্য শব্দ, অতএব এখানে সমাস হল। সেইরূপ “ধর্মায় নিয়মঃ” এই বিগ্রহে চতুর্থী সমাসের প্রাপ্তি হয়েছিল। কিন্তু পাণিনি বলি ও রক্ষিত শব্দের উল্লেখ করে নিয়মিত করে দিয়েছেন—প্রকৃতি বিকৃতিভাব স্থলেই তাদন্থো চতুর্থী সমাস হবে। ‘ধর্ম এবং নিয়ম’ এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাটার ও প্রকৃতি নয় বা কেহ কাহারও বিকৃতি নয়।

১.

সুতরাং এখানে ‘ধর্মশাস্ত্র নিয়মঃ’ সম্বন্ধসামান্ত্রে ষষ্ঠীস্তপদের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হবে। তবে যে মহাভাষ্যকার “ধর্মায় নিয়মঃ” এইভাবে বিগ্রহে চতুর্থী প্রয়োগ করেছেন—তার অভিপ্রায় হচ্ছে—ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধসামান্ত্রের বোধক বলে এখানে ষষ্ঠীর অর্থ তাদন্থ্যরূপ সম্বন্ধ বুঝাবার জন্য ‘ধর্মায়’ এইরূপ চতুর্থীর প্রয়োগ করা হয়েছে। তারপর মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় বিগ্রহ দেখিয়েছেন—“ধর্মার্থে বা নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ।” এই বিগ্রহে মধ্যপদলোপী

কর্মধারয় সমাস করে ‘অর্থ’ পদের লোপ করা হয়েছে। যেমন “শাকপ্রিয়ঃ পাথিবঃ” শাকপাথিবঃ সমাস হয়। এখানেও সেইরূপ বুঝতে হবে। তৃতীয় বিগ্রহে মহাভাষ্যকার বলেছেন “ধর্মপ্রয়োজনো বা নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ”। এখানেও শাকপাথিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হয়েছে। তবে “ধর্মঃ প্রয়োজনং যন্তু” ধর্মপ্রয়োজনঃ” অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে প্রয়োজন যার [যে নিয়মের] এইভাবে যদি “ধর্মপ্রয়োজন” শব্দটির অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে “ধর্মার্থঃ নিয়মঃ” এই দ্বিতীয় বিগ্রহের সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহের কোন ভেদ থাকে না। কারণ সেই দ্বিতীয় বিগ্রহে “ধর্মঃ অর্থঃ যন্তু” এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করে ‘ধর্মার্থঃ’ শব্দটি ব্যুৎপাদন করতে হবে। ‘ধর্মায়’ ইতি ‘ধর্মার্থঃ’ এইভাবে যদি “ধর্মার্থঃ” শব্দটিকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন করা হয় তাহলে এই চতুর্থী সমাসটি নিত্য সমাস বলে—“ধর্মার্থঃ নিয়মঃ” এইরূপ বিগ্রহ করে, সেবানকার ‘অর্থ’ শব্দের লোপ করা যাবে না। নিত্যসমাসের একাংশলোপ ব্যাকরণের অনুশাসনবিরুদ্ধ। তাহলে বহুব্রীহি সমাস করেই [ধর্মঃ অর্থঃ যন্তু] ‘ধর্মার্থঃ’ শব্দটি গ্রহণ করতে হবে। সেখানে “ধর্মার্থঃ” শব্দের অন্তর্গত অর্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘প্রয়োজন’, অন্য কোন অর্থ সেখানে সম্ভব হবে না। তাহলে দ্বিতীয় বিগ্রহ ও তৃতীয় বিগ্রহে অর্থের কোন প্রভেদ থাকবে না। তাতে তৃতীয় বিগ্রহ প্রদর্শন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এইজন্য কৈয়ট বলেছেন—‘ধর্মপ্রয়োজন ইতি’—লিঙাদিবিষয়েণ নিয়োগাখ্যেণ ধর্মেণ প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ।” অর্থাৎ লিঙ্, লোট্, তব্য, অনীয়, লেট্ এই সকল প্রত্যয়ের বাচ্যার্থ যে নিয়োগরূপ ধর্ম তার দ্বারা প্রযুক্ত। এই বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বলা আবশ্যিক। এইজন্য নাগেশের ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে বিবৃত করছি। প্র+যুক্ত ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে লুট্ প্রত্যয় করে যে ‘প্রয়োজন’ শব্দ নিষ্পন্ন হয় তাহা নপুংসক লিঙ্গ হয়, ‘প্রয়োজনম্’ এই প্রকাররূপ হয়। তার অর্থ ‘ফল’। কিন্তু এখানে মহাভাষ্যে যে “ধর্মপ্রয়োজনঃ” শব্দের অন্তর্গত ‘প্রয়োজন’ শব্দটি আছে তাহা ‘কৃত্যলুটোবহুত্বম্’ [৩৩।১১৩] সূত্রানুসারে ‘প্রযজ্যতে’ ‘অসৌ’ এইভাবে কর্মবাচ্যে লুট্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। ধর্মেণ প্রযজ্যতে [অসৌ] এইরূপ অর্থে লুট্ করে, ‘প্রয়োজন’ এই কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ‘ধর্ম’ শব্দের উত্তর কর্তার বধী কবে বধীতৎপুরুষ সমাস হয়েছে—‘ধর্মন্ত প্রয়োজনঃ’ ‘ধর্মপ্রয়োজনঃ’ এইভাবে ‘ধর্মপ্রয়োজন’ শব্দ নিষ্পন্ন হলে

তার সঙ্গে ‘নিয়ম’ শব্দের ‘ধর্মপ্রয়োজনঃ নিয়মঃ’ এইরূপ বিগ্রহ করে শাকপাণি-বাদিত্ব অনুসারে সমাস করে ‘ধর্মনিয়মঃ’ শব্দ সিদ্ধ হয়। এখানে অর্থাৎ ‘ধর্ম-প্রয়োজনঃ’ এই শব্দের অন্তর্গত ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ কার্য বা নিয়োগ। প্রভাকর মীমাংসক মতানুসারে তাঁরা লিঙ, লোট, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়ের বাচ্যার্থ কার্য বা অপূর্ব স্বীকার করেন। যাগাদি ক্রিয়াজ্ঞা এবং যাগাদিক্রিয়ার প্রয়োজক হচ্ছে অপূর্ব। এই অপূর্ব যেমন যাগাদিক্রিয়াসাধ্য, আবার সেইরূপ এই অপূর্বই যাগাদিক্রিয়ার প্রবর্তক। অপূর্ববশতই লোকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত হয়। এই অপূর্বকে প্রভাকরমতানুসারীরা ‘কার্য’ নামে—‘নিয়োগ’ নামে অভিহিত করেন। যাগাদিবিষয়ককৃতিসাধ্য বলে এই অপূর্ব কার্য। আবার এই অপূর্বই নিজের বিষয় যে যাগাদি ক্রিয়া, তাতে পুরুষকে নিযুক্ত করে বলে—এর নাম ‘নিয়োগ’। এই ‘নিয়োগ’ লিঙাদির বাচ্যার্থ। এই নিয়োগ, কার্য বা অপূর্বকে প্রভাকরমতানুসারীরা ধর্ম বলেন। এই ‘অপূর্বরূপ ধর্ম কতৃক নিযুক্ত হয় নিয়ম’ এইরূপ অর্থ এখানে “ধর্মপ্রয়োজনো নিয়মঃ” এই মহাভাষ্যাংশের তাৎপর্য বলে বুঝতে হবে। ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ অপূর্বদ্বারা যে নিয়ম প্রযুক্ত হয়—নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই নিয়ম হচ্ছে “ধর্মপ্রয়োজনঃ নিয়মঃ”। কি সেই নিয়ম? এই প্রশ্নের উত্তরে নানেশ বলেছেন অসাধুনিবৃত্তি—অর্থাৎ অসাধুশব্দের প্রয়োগের নিবৃত্তি হয় যে নিয়ম থেকে সেই নিয়ম হচ্ছে কায বা অপূর্বের দ্বারা প্রযুক্ত। শাস্ত্রে যে বিধি আছে, সেই বিধি বা অপূর্বের দ্বারা অসাধুশব্দের নিবৃত্তি করা হয়। ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রের দ্বারা ধর্মনিয়ম। স্ততরাং মহাভাষ্য কারের দ্বিতীয় বিগ্রহের অর্থ হচ্ছে [ধর্মার্থনিয়ম] ‘ধর্মফলক নিয়ম’, যে নিয়মের ফল বা প্রয়োজন হচ্ছে ধর্ম। আর তৃতীয় বিগ্রহের অর্থ হলো ধর্মপ্রয়োজ্য-নিয়ম, যে নিয়ম ধর্মের দ্বারা প্রযুক্ত হয়। এইভাবে অর্থের ভেদ থাকায় মহাভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় কোন দোষ নাই ॥ ৪৬ ॥

মূল

[বার্তিক]

—যথা লৌকিকবৈদিকেষু ॥১॥ [চতুর্থ বার্তিক]

[মহাভাষ্য]

প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যঃ—‘যথা লোকে বেদে চ ইতি

প্রযোক্তব্যে' 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু' প্রযুঞ্জতে । অথবা যুক্ত-
এবাত্র তদ্ধিতার্থঃ, যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু । লোকে
তাবৎ “অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুকুটঃ” “অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ” ইত্যাচ্যতে ।
ভক্ষ্যং নাম ক্ষুৎপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে । শক্যং চানেন শমাংসাদিভি-
রপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তম্ । তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে—ইদং ভক্ষ্যমিদমভক্ষ্য-
মিতি । তথা খেদাংশ্রীষু প্রবৃত্তিভবতি । সমানশ্চ খেদাবগমো
গম্যায়ং চ অগম্যায়ং চ । তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে—ইয়ং গম্যা,
ইয়মগম্যোতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—“যেমন লৌকিক পদার্থসমূহে ও বৈদিক পদার্থসমূহে” [নিয়ম
দেখা যায়] ॥ ১ ॥ [বার্তিক]

[ভাষার্থ] দক্ষিণদেশীয়গণ তদ্ধিতপ্রিয়; ‘যেমন—লোকে ও বেদে
এইরূপ প্রয়োগের কর্তব্যতা, [দক্ষিণদেশীয়গণ] ‘যেমন লৌকিকে ও বৈদিকে’
ইহা প্রয়োগ করেন । অথবা এখানে তদ্ধিত [প্রত্যয়ের] এর অর্থ সন্ততই,
যেমন লৌকিক ও বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহে । লোকে ‘গ্রাম্য কুকুট অভক্ষ্য’
‘গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য’ ইহা বলা হয় । ক্ষুধার প্রতিকারের জন্য ভক্ষ্য পদার্থ
গ্রহণ করা হয় । এই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কুকুরের মাংস প্রভৃতির দ্বারাও ক্ষুধার
নিবৃতি করতে পারে । সেইখানে [ভক্ষণবিষয়ে] নিয়ম করা হয়—ইহা ভক্ষ্য,
ইহা অভক্ষ্য । সেইরূপ—রাগ বশত স্ত্রীতে প্রবৃতি হয় । গম্য এবং অগম্য
স্ত্রীতে তুল্যভাবে খেদ [রাগ] নিবৃতি হয় । সেখানে—‘ইহা গম্য, ইহা অগম্য
এইরূপ নিয়ম করা হয় ॥ ৪৭ ॥

বিবৃতি—লোকব্যবহার থেকে জেনে মানুষ অপরকে অর্থ বুঝাবার জন্য
শব্দ প্রয়োগ করে । ব্যাকরণশাস্ত্র কেবল সেই শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে ধর্মের
নিয়ম করে দেয়—‘সাধুশব্দের প্রয়োগ করবে’ । ইহা বার্তিককার বলে এসেছেন ;
মহাভাষ্যকারও বার্তিকের ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা প্রকটিত করেছেন । এখন
সেই ধর্মনিয়ম বুঝাবার জন্য বার্তিককার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছেন—‘যথা লৌকিক
বৈদিকেষু’ যেমন লৌকিক ও বৈদিক পদার্থবিষয়ে [নিয়ম করা হয়] । মহা-
ভাষ্যকার উক্ত বার্তিকগ্রন্থের ব্যাখ্যা করবার জন্য প্রথমে বলছেন “প্রিয়তদ্ধিতাঃ
দাক্ষিণাত্যাঃ” দক্ষিণদেশীয়গণ তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ করতে ভালবাসেন ।

মহাভাষ্যকারের এইউক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে বার্তিককার কাত্যায়ন দক্ষিণদেশীয় ছিলেন। দক্ষিণদেশীয়েরা তদ্ধিতপ্রিয় বলে কি করে জানা গেল? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—‘যেমন—যেখানে লোকে ও বেদে’ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করলে কার্যনির্বাহ হয়ে যায়, সেখানে বার্তিককার—‘যেমন লৌকিকে এবং বৈদিকে’ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। “লোকে ভবঃ” ‘লৌকিকঃ’, ‘বেদে ভবঃ’ ‘বৈদিকঃ’ এইভাবে লোক এবং বেদশব্দের উত্তর—‘তত্ত্বভবঃ’ অর্থে ‘ঐচ্ছ’ প্রত্যয় করে লৌকিক এবং বৈদিকশব্দ নিষ্পন্ন হয়। লোকে এবং বেদে বললে বুঝা যায়, যাবৎ লোক হচ্ছে অবয়বী, আর সেই লোকে কথিত কতিপয় পদার্থ হচ্ছে অবয়ব। এখানে লোক শব্দের অর্থ লোকব্যবহার। এইরূপ সমস্ত বেদ অবয়বী, বেদে কথিত পদার্থ অবয়ব। অতএব এখানে লোক বা বেদকে অবয়ববী, এবং সেখানে প্রাপ্ত পদার্থকে অবয়ব ধরলে সেই অবয়বাবয়বিভাবে বলা যেতে পারে—“যেমন লোকে [নিয়ম] বেদে [নিয়ম]” এইরূপ বললে কোন ক্ষতি হয় না বরং শব্দের লাঘব হয়। বার্তিককার এইরূপ প্রয়োগ না করে—লোকসমুদায়, বেদসমুদায় এবং লোকসমুদায়ের অবয়ব, ও বেদসমুদায়ের অবয়বে আধারআধেয়ভাবের কল্পনা করে যে “লৌকিকবৈদিকেষু” এইরূপ প্রয়োগ করেছেন—তাতে তাঁর তদ্ধিতপ্রিয়স্বচিতি হয়েছে - এইরূপ তাৎপর্থে মহাভাষ্যকার প্রথমে বার্তিককারের উপর কিঞ্চিৎ উপহাস করেছেন। কিন্তু মহাভাষ্যকার এই কথা বলে পরে যেন নিজেরই দোষসংশোধন করবার জ্ঞাত বললেন—“অথবা যুক্ত এবা তদ্ধিতার্থঃ। যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু।” অথবা এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থ যুক্তিযুক্ত। যেমন লৌকিক ও বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহে। ‘লোক’ শব্দ ও ‘বেদ’ শব্দের উত্তর ‘অধ্যাত্মাদেষ্ঠপ্রিয়াতে’ এই বার্তিক সূত্রানুসারে ‘ঐচ্ছ’ প্রত্যয় করে ‘লৌকিক’ ও ‘বৈদিক’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। লোক ও বেদ সমুদায় অবয়বী এবং সেই লোকে ও বেদে আছে যে সব পদার্থ তাহার। অবয়ব, এইভাবে অবয়বাবয়বিভাব কল্পনা করলে “যথা লোকে বেদে চ” এইরূপ বলা চলত। কিন্তু মহাভাষ্যকার বলেছেন—এখানে লোক ও বেদকে ভিন্ন ধরে, সেইবেদে ও লোকে কথিত যে সিদ্ধান্ত শব্দ ও অর্থ, তাকেও ভিন্নধরনে লোক ও বেদ শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ের আবশ্যকতা থাকে। কারণ লোকে ও বেদে এই শব্দের দ্বারা আদ্য লোক বেদ সম্ভূত বা লোক বেদ কথিত সিদ্ধান্তকে ধরা যায়

না। অথচ লোক বেদকথিত সেই সিদ্ধান্তকে বুঝাতে হবে। এইজন্য ‘লৌকিক’ ও ‘বেদ’ শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করে ‘লৌকিক’ এবং ‘বৈদিক’ শব্দ নিষ্পাদন পূর্বক বার্তিককার প্রয়োগ করেছেন। অতএব এখানে বার্তিককারের তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োজন থাকায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। ‘কৃতান্ত’ শব্দের অর্থ সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত দুইপ্রকার শব্দ ও অর্থ, উভয়ই সিদ্ধান্ত (২১)।

এখানে ‘লৌকিক’ এইশব্দের অর্থ স্মৃতিতে নিবদ্ধ। ‘বৈদিক’ এই শব্দের অর্থ শ্রুতিতে নিবদ্ধ, ইহা কৈয়ট বলেছেন। কিন্তু স্মৃতিতে বা শ্রুতিতে সিদ্ধান্ত শব্দ নিবদ্ধ থাকতে পারে, সিদ্ধান্ত অর্থ কিরূপে নিবদ্ধ থাকবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে নাগেশ ভট্ট বলেছেন “তৎপ্রতিপাদকবাক্যে ইত্যর্থঃ” সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক বাক্যসমূহে ইহাই অর্থ। সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক বাক্যে অর্থ বর্ণিত থাকে। তা হলে “যথা লৌকিকবৈদিকেষু” এই বার্তিকের তাৎপর্যার্থ হচ্ছে যেমন স্মৃতিতে উপনিবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক বাক্য সমূহে ও শ্রুতিতে উপনিবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক বাক্যসমূহে [নিয়ম করা হয়, সেইরূপ ব্যাকরণশাস্ত্রে ধর্মের নিয়ম করা হয়]

লৌকিক সিদ্ধান্ত বাক্যে অর্থাৎ স্মৃতিতে উপনিবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক বাক্যে কি ভাবে নিয়ম করা হয় ইহাই মহাভাষ্যকার প্রথমে প্রদর্শন করছেন “লোকে তাৎ “অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুটঃ.....ইয়মগম্যোতি।” “অভক্ষ্যঃ গ্রাম্যকুটঃ” “অভক্ষ্যঃ গ্রাম্যশূকরঃ” এই দুইটি স্মৃতি বাক্য মহাভাষ্যকার কোন স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা ঠিক জানা যায় না। তবে ইহার অনুরূপ বাক্য বোধায়ন পূর্বসূত্রে উল্লিখিত আছে ‘অভক্ষ্যঃ পশবো গ্রাম্যঃ, তথা কুটঃশূকরম্।’ গ্রাম্যকুট বা গ্রাম্যশূকর ভক্ষণ করবে না। স্মৃতিতে গ্রাম্যকুট ও গ্রাম্যশূকরের ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার এই স্মৃতিবাক্যে কিভাবে নিয়ম করা হয়েছে তাহা বুঝাবার জন্য বলেছেন “ভক্ষ্যং চ নাম ক্ষুঃপ্রতিধাতার্থমুপাদীয়তে”। এই বাক্যটির অর্থের সঙ্গতি করতে হলে বলতে হবে ‘ভক্ষ্যং চ নাম তৎ যৎ ক্ষুঃপ্রতিধাতার্থমুপাদীয়তে’। একটি ‘তৎ’ পদ ও একটি ‘যৎ’ পদ অধ্যাহার করতে হবে। ভক্ষ্য পদার্থ তাহা

(২১) নাগেশবাবয়বিবিশাগঃ, কিং তর্হি লোকবেদব্যতিরিক্তসিদ্ধান্তশব্দার্থোভয়রূপ ইত্যর্থঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপ-কৈয়ট।

যাহা ক্ষুধানিবৃত্তির জন্ত গ্রহণ করা হয়। “শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তম্”, এখানে ‘অনেন’ বলতে ‘ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কতৃক’ ইহাই বুঝতে হবে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কুকুরের মাংস প্রভৃতির দ্বারাও ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়। এই মহাভাষ্যবাক্যে ‘ক্ষুৎ’ পদটি স্ত্রীলিঙ্গ ক্ষুৎশব্দের প্রথম-বিভক্তির একবচনান্ত রূপ। এবং ইহা কর্মকারক। উক্তকর্মে প্রথমা হয়েছে। এর ক্রিয়া হচ্ছে “শক্যাম্।” শক্ শব্দে শক্ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে “শকি সহোচ” [পাঃ সূঃ ৩।১।২২] সূত্রে যৎ প্রত্যয় করা হয়েছে। কর্মবাচ্যে ক্রিয়া কর্মের অধীন হয়। কর্ম এখানে ‘ক্ষুৎ’। উহা স্ত্রীলিঙ্গ একবচনান্ত বলে, তার অনুসারে ক্রিয়া পদটি ‘শক্য’ এইরূপ তৎযা উচিত ছিল। অথচ মহাভাষ্যকার এখানে “শক্যাম্” এইরূপ নপুংসকলিঙ্গে প্রথমার একবচনের রূপ প্রয়োগ করলেন কেন? ইহা কি ব্যাকরণের অন্তর্শাসন বিরুদ্ধ হয় নাই? ইহার উত্তরে কৈয়ট বলেছেন শাক্ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে যে কৃত্যপ্রত্যয় [যৎপ্রত্যয়], এখানে হয়েছে; সেই কর্মটিকে কোন বিশেষভাবে না বুঝিয়ে সামান্যভাবে সেই কর্মকে নপুংসকলিঙ্গান্ত ‘তৎ’ প্রভৃতি কোন সর্বনামের দ্বারা বুঝিয়ে প্রথমে শক্ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করা হয়েছে। সেই হেতু উহা “শক্যং” এইরূপ নপুংসকলিঙ্গের একবচনের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। তারপর ‘ক্ষুৎ’ এই কর্মপদের সঙ্গে ‘শক্য’ শব্দের সম্বন্ধ তৎযা তার স্ত্রীলিঙ্গ প্রাপ্ত হলে এই স্ত্রীলিঙ্গ পরে প্রাপ্ত হচ্ছে বলে বহিবঙ্গ। আর “শক্যাম্” এই নপুংসকলিঙ্গের সংস্কারটি পূর্বসিদ্ধ বলে অন্তরঙ্গ। অতএব বহিবঙ্গ ‘স্বীড়’ আর অন্তরঙ্গ নপুংসকলিঙ্গ সংস্কারকে বাধাদিতে পারে না। “অসিদ্ধং বহিবঙ্গমন্তরঙ্গে” এই পরিভাষা থেকেও পাওয়া যায়; অন্তরঙ্গ কার্যে বহিবঙ্গকার্য অসিদ্ধ। এইরূপ প্রয়োগ শাস্ত্রে বহু দেখা যায়। “নহি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মণ্যশেষতঃ [গীতা ১৮।৩১] “জষ্টুং শক্যমবোধ্যাযাং নাবিদ্ধার চ নাস্তিকঃ” [রামায়ণ ১।৬।৮]। যাহা হউক ভক্ষণ বিষয়ে মানুষের রাগ বশত যে কোন বস্তুর দ্বারা ক্ষুধ্রিবৃত্তি প্রাপ্ত আছে। সেইখানে অর্থাৎ সেই ভক্ষ্যপদার্থ বিষয়ে শাস্ত্র [স্মৃতি শাস্ত্র] “অভক্ষ্যঃ গ্রাম্য কুকুটঃ” ইত্যাদি বাক্যে নিয়ম করে দিলেন ‘ইহা ভক্ষ্য ইহা অভক্ষ্য’। এখানে গ্রাম্যকুকুট বা গ্রাম্যশূকর প্রভৃতির ভক্ষণের নিষেধের দ্বারা শাস্ত্র তদভিন্ন ভক্ষ্যবস্তুর ভক্ষণের অনুমোদন করেছেন। এখানে ইহাই নিয়ম, একের নিষেধের দ্বারা অপরের অনুমোদন। এইভাবে

খেদবশত অর্থাৎ চিন্তের খেদ বা কামনিবৃত্তির জন্ম মাহুষের জ্ঞীতে প্রবৃত্তি হয়। মাহুষের সেই প্রবৃত্তি গম্যা এবং অগম্যা জ্ঞীতেও প্রাপ্ত থাকে। শাস্ত্র “পরদারান্ ন মর্শয়েৎ” অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন করবে না, ইত্যাদি নিষেধের দ্বারা শাস্ত্র বিধি অনুসারে বিবাহিত নিজ জ্ঞীগমনের অনুমোদন রূপ নিয়ম করেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে ব্যাকরণ শাস্ত্র জন্ম জ্ঞান পূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করলে ধর্ম হয়, অসাধু শব্দের প্রয়োগ করলে অধর্ম হয়, অতএব অসাধুশব্দের প্রয়োগের নিষেধরূপ নিয়ম ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা করা হয় ॥ ৪৭ ॥

মূল

বেদে খল্বপি “পয়োব্রতে। ব্রাহ্মণে। যবাগৃব্রতে। রাজ্ঞা আমিক্ষা-ব্রতে। বৈশ্যা” ইত্যুচ্যতে। ব্রতং নামাভ্যবহারার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন শালিমাংসাদীন্যপি ব্রতয়িতুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে। তথা বৈশ্বঃ খাদিরো বা যুপঃ স্মাদিত্যুচ্যতে। যুপশ্চ নাম পশুবন্ধার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন যৎ কিঞ্চিদপি কাষ্ঠমুচ্ছিতানুচ্ছিত্য বা পশুবন্ধম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে।

তথা অগ্নৌ কপালানুধিশ্রিত্যাভিমন্তয়তে “ভৃগুনামঙ্গিরসাম্ [ঘর্মশ্চ] তপসা। তপ্যধ্বম্” [বাজনেয়িসংহিতা ১।১৮]। অন্তরেণাপি মন্ত্রমগ্নির্দহনকর্ম। কপালানি সন্তাপয়তি। তত্র চ নিয়মঃ ক্রিয়তে—এবং ক্রিয়মাণমভ্যুদয়কারি ভবতীতি।

এবমিহাপি সমানায়ামথগতৌ(ক) শব্দেন চাপশব্দেন চ ধর্ম-নিয়মঃ ক্রিয়তে—শব্দেনৈবাত্থোইভিধেয়ো নাপশব্দেনেতি। এবং ক্রিয়মাণমভ্যুদয়কারি ভবতীতি ॥৪৮॥

অনুবাদঃ—বেদেও ‘ব্রাহ্মণ পায়োব্রত, ক্ষত্রিয় যবাগৃব্রত, বৈশ্ব আমিক্ষা ব্রত’ ইহা বলা হয়। ভোজনের জন্ম যাহা গ্রহণ করা হয় তাহা ব্রত। ব্রত পালন করী, শালি তণ্ডুলের অন্ন, মাংসাদিও ব্রতরূপে গ্রহণ করতে পারে। সেখানে [ব্রতরূপে ভোজনে] নিয়ম করা হয়। সেইরূপ ‘বিষকাষ্ঠের বা খদির কাষ্ঠের যুপ হবে’ ইহা [বেদে] বলা হয়। পশুবন্ধন করবার জন্ম যুপ গ্রহণ করা হয়। সেই পশুবন্ধনকারী ব্যক্তি যে কোন কাষ্ঠ তক্ষণ [চাঁচা ছোলা]

করে বা তক্ষণ না করে পশুবন্ধন করতে পারে। সেখানে [কাষ্ঠবিশেষরূপ
রূপ বিষয়ে] নিয়ম করা হয়।

সেইরূপ অগ্নিতে কপাল সকল স্থাপন করে মন্ত্র পাঠ করে ‘ভৃগুগোত্রীয়-
গণের অগ্নিরা গোত্রীয়গণের তপস্তাদ্বারা তপ্ত হও’। মন্ত্র [মন্ত্রোচ্চারণ]
ব্যতীতও দাহক্রিয়াকারী অগ্নি কপাল সকলকে সন্তপ্ত করে। সেখানে
[কপালের স্তম্ভাকরণে] নিয়ম করা হয়—এইরূপ [মন্ত্র পাঠ পূর্বক সন্তপ্ত করা
হলে] করা হলে অভ্যাদয়কারী [অদৃষ্টোৎপাদনকারী] হয়। এইরূপ এখানে
ও [শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে] শব্দের [সাধুশব্দের] দ্বারা এবং অপশব্দের [অসাধুশব্দের]
দ্বারা অর্থজ্ঞান সমান ভাবে হলেও ধর্মের নিমিত্ত নিয়ম করা হয়, সাধুশব্দের
দ্বারা অর্থের কথন করবে, অসাধুশব্দের দ্বারা অর্থের কথন করবে না।
এইরূপ করা হলে [তাদৃশ অনুষ্ঠান] অভ্যাদয়কারী [অদৃষ্টজনক] হয় ॥ ৮ ॥

বিস্তৃতি :—লৌকিক নিয়ম অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিয়ম দেখিয়ে মহাভাগ্যকার
এখন বৈদিক নিয়ম দেখাবার জন্তে বলছেন ‘বেদে যত্রপি’ ইত্যাদি। ‘যলু’
এবং ‘অপি’ এই দুইটি নিপাত নিশ্চয় অর্থের স্তোতক। মহাভাগ্যে ‘পর্যব্রতো
ব্রাহ্মণো যবাগ্‌ব্রতো রাজন্ত্র্যামিক্ষাব্রতো বৈশ্বঃ’ এইরূপ বাক্য ঠিক বেদে
পাঠিত বাক্য নয়। কিন্তু বেদে ব্রাহ্মণেব ব্রত, ক্ষত্রিয়েব ব্রত ও বৈশ্বের ব্রত সম্বন্ধে
যে রূপ বাক্য আছে, তার অর্থ গ্রহণ করে সেইরূপ তাৎপর্যে মহাভাগ্যকার এখানে
বাক্যরচনাপূর্বক উল্লেখ করেছেন। ‘ব্রত’ বলতে কতকগুলি উপবাসাদি
অনুষ্ঠানকে বুঝায়। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে ভোজনবিশেষকেও ব্রত বলা হয়।
কোন যাগযজ্ঞ বা তপস্তাবিশেষে যে ভোজনের নিয়ম পালন, সেইরূপ নিয়ম
পালনে, ব্রাহ্মণ কেবল দুগ্ধ পান করে থাকবেন, ক্ষত্রিয় কেবল যবাগ্‌ [যবের
দ্বারা নির্মিত খাদ্য বিশেষ] ভক্ষণ করে থাকবেন, বৈশ্ব কেবল আমিক্ষা অর্থাৎ
ছানা ভক্ষণ করে থাকবেন। দুগ্ধ গরম করে ঘন করে তাতে দধি সংযোগ
করলে যে বস্তু উৎপন্ন হয় তাকে ‘আমিক্ষা’ বলে। সুতরাং উহা ছানাবিশেষ।
বেদশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম করা হয়েছে। এখন ব্রতানুষ্ঠানকারী যান্ত্রিক উত্তম
শালি তণ্ডুলের অন্ন এবং মাংস প্রভৃতি ভোজন করেও ব্রতপালন করতে পারেন,
কিন্তু সেই ভোজন বিষয়েই এখানে বেদশাস্ত্র নিয়ম করে দিয়েছেন—ব্রাহ্মণ
কেবল দুগ্ধপানই করবেন, ক্ষত্রিয় কেবল যবাগ্‌ ভক্ষণ করবেন, বৈশ্ব কেবল
ছানা ভক্ষণ করবেন; দুগ্ধ প্রভৃতি একটি ভোজনের নিয়ম করে তদ্বিত্ত বস্তুর

ভোক্তাদের নিবৃত্তি করে দেওয়া হয়েছে। ‘পমোত্রতঃ’ ‘পয়ঃ ব্রতং যশ্চ’ এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন শব্দ। এইরূপ ‘যবাগূত্রতঃ’ এবং ‘আমিক্সাত্রতঃ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝতে হবে।

মহাভাগ্যকার বৈদিক নিয়মের তিনটি উদাহরণের উল্লেখ এখানে করেছেন। প্রথম উদাহরণের কথা বলে দ্বিতীয় উদাহরণের কথা “তথা বৈবঃ খাদিরো বানিয়মঃ ক্রিয়তে।” এই গ্রন্থে বলেছেন। বৈদিক যজ্ঞ তিন প্রকার, ইষ্টি, পশু ও সোম। যে যাগে ওষধি দ্রব্য অর্থাৎ ধান যব প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা যাগ সম্পাদন করা হয়, তাহাকে ইষ্টি যাগ বলে। যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি যাগ। যে যাগে পশুর দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা হয় তাহাকে পশুযাগ বলে। যেমন অশ্বমেধাদি যাগ। সোমলতার রস নিষ্কাশন করে তাহার দ্বারা যে যাগ সম্পাদন করা হয় তাহাকে সোমযাগ বলে। যেমন ‘অগ্নিষ্টোম’ প্রভৃতি যাগ। সোমযাগেও অপ্রধানভাবে পশুর আছতি দিতে হয়। পশুকে বন্ধন করার ভল্ল যূপের প্রয়োজন। এই যূপ বেলকাঠ বা খয়ের কাঠের দ্বারা নির্মাণ হবে—ইহাই বেদে নিয়ম করেছেন। সেই যূপনির্মাণ করতে হলে কাঠকে চোঁছে খুব মশ্ণ করিতে হয়। আটটি কোণ করিতে হয়, ‘যূপং তক্ষোতি’ ‘যূপমষ্টাঙ্গী কৰোতি’ ইত্যাদিরূপ যূপের নির্মাণ প্রক্রিয়াও বেদে আছে। যাই হোক যাগে পশুর অনেক সংস্কার আছে। তাব মধ্যে পশুকে যূপে বন্ধন করা একটি সংস্কার। পশুকে যে কোন কাঠে বন্ধন করা যেতে পারে, বা কাঠকে না চোঁছে .ও তাতে পশুকে বাঁধা যেতে পারে। কিন্তু বেদ নিয়ম কবে দিলেন—বিব অথবা খদির কাঠের যূপ করতে হবে। সেই কাঠ অবশ্য ভালভাবে পালিশ প্রভৃতি করতে হবে। কাবণ যূপ বললেই চাঁছ! ছোলা! কাঠকে বুঝায়। এই নিয়মেও বিব বা খদির কাঠের বিধান করে অল্প কাঠের নিবৃত্তি করে দেওয়া হয়েছে।

তারপর মহাভাগ্যকার—বৈদিক তৃতীয় নিয়মের উল্লেখ করেছেন—“তথাগ্নৌ কপালান্নধিশ্রিত্য . . .অভ্যাদয়কারি ভবতীতি।” থালার যেমন কান্না কিছুটা উচু থাকে সেইরূপ দুই আঙুল উচু কান্নাই বিশিষ্ট মাটির [পোডান] থালাকে ‘কপাল’ বলে। সেই কপাল আগুনের উপর স্থাপন করে কপালকে উষ্ণ করার বিধি বেদে আছে। উষ্ণ করার সময় এই মন্ত্রপাঠ করতে হয়—“ভৃগ্নামজিরসাং ঘর্মসা তপসা তপ্যধ্বম্।” • ‘ভৃগোরপত্যানি’

এইরূপ ভৃগুশব্দের উত্তর বহুবচনে যে অপত্য প্রত্যয় হয়, সেই অপত্য প্রত্যয়ের —“তদ্রাজ্ঞস্ত বহুবলুক্ তেনৈবাস্ত্রিয়াম্ পা: ২।৪।৩২” অর্থাৎ বহুবচনে তদ্রাজ্ঞ-প্রত্যয়ের লুক্ হয়ে “ভৃগবঃ” পদসিদ্ধ হয়। এখানে ‘ভৃগুনাম্’ পদটি ঐ বহুবচনে অপত্যার্থক ‘ভৃগু’ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ। সূত্রবাং উহার অর্থ ভৃগুর অপত্যগণের। এইরূপ “অঙ্গিঃসাম্” পদেরও অর্থ ‘অঙ্গিরার অপত্যগণের’।

‘তপসা’ এই পদের অর্থ তাপের দ্বারা বা তপস্তার দ্বারা। ‘ঘর্মসা’ এই পদটি বাজসনেয়ি সংহিতাতে [বর্তমান সংস্করণে] দেখা যায় না। সূত্রবাং “ভৃগুনামঙ্গিরসাং তপসা তপাধ্যম্” এই মন্ত্রের সংক্ষেপে অর্থ হচ্ছে—[হে কপাল সকল] ভৃগুর অপত্যগণের এবং অঙ্গিরার অপত্যগণের তপস্তার দ্বারা বা তাপের দ্বারা তপ্ত হও। কপালগুলিকে অগ্নিতে [অগ্নির উপরে] স্থাপন করে মন্ত্রপাঠ না করেও তপ্ত করা যায়, আবার মন্ত্র বলেও তপ্ত করা যায়। কিন্তু বেদে নিয়ম করে দিয়েছেন—মন্ত্র উচ্চারণ করেই কপাল সকলকে তপ্ত করতে হবে। মন্ত্র উচ্চারণ করে তপ্ত করলে তা থেকে অভ্যদয় অর্থাৎ একটি অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় ; সূত্রবাং মন্ত্র উচ্চারণ না করে তপ্ত করলে সেই অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না। এখানেও মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কপাল সকলের তপ্ত করা বিধির দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ না করে কপালের তপ্ত করার নিবৃত্তি রূপ নিয়ম করা হয়েছে। মহাভাষ্যকার এই বৈদিক তিনটি নিয়মের উদাহরণ প্রদর্শন করে এবং পূর্বে দুইটি লৌকিক মিয়মের উদাহরণের বর্ণনা করে, ব্যাকরণশাস্ত্রের ধর্মনিয়মের উপসংহার করছেন—“এবমিহাপি.....অভ্যদয়কারি ভবতীতি।” পূর্বোক্ত লৌকিক ও বৈদিক নিয়মের দৃষ্টান্তের মত শব্দপ্রয়োগবিষয়েও সাধুশব্দের বা অসাধু শব্দের দ্বারা তুল্যভাবে অর্থজ্ঞান হলেও ধর্মের নিয়ম করা হয়েছে—যে সাধুশব্দের প্রয়োগের দ্বারা অর্থের অভিধান [কথন, বোঝান] কববে, অসাধুশব্দের প্রয়োগ করে অর্থের অভিধান করবে না। এখানেও সাধু শব্দের প্রয়োগের বিধান করে অসাধু শব্দের প্রয়োগের নিবৃত্তিরূপ নিয়ম করা হয়েছে। এইরূপ সাধু শব্দের প্রয়োগ করলে অভ্যদয় অর্থাৎ ধর্ম হয়। অন্তথা হয় না —ইহাই মহাভাষ্যকারের ভাষ্যের তাৎপর্য ॥ ৪৮ ॥

মূল

[বার্তিক]

‘অস্ত্যপ্রযুক্তঃ’ [দ্বিতীয় সংখ্যক বার্তিকের অংশ]

[মহাভাষ্য]

সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তাঃ । তদ্ যথা—উষ, তের, চক্র, পেচ ইতি । কিমতো যৎ সন্ত্যপ্রযুক্তাঃ ? প্রয়োগাদ্বি ভবাঙ্জানানাং সাধুত্বমধ্যবস্তুতি । ‘য ইদানীমপ্রযুক্তা নামী সাধবঃস্ব্যঃ । ইদং তাবদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্—যচ্চাতে সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি । যদি সন্তি নাপ্রযুক্তাঃ, অথাপ্রযুক্তা ন সন্তি । সন্তি চ অপ্রযুক্তাশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্ । প্রযুক্তান এব খলু ভবানাহ—সন্তি শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি । কশ্চদানীমহো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্মাৎ ? নৈতদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্ । সন্তীতি তাবদক্রমো যদেতাঙ্গান্ত্রবিদঃ শাস্ত্রেণানুবিদধতে । অপ্রযুক্তা ইতি ক্রমো যল্লোকেতপ্রযুক্তা ইতি । যদপ্যুচাতে কশ্চদানীমহো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্মাদিতি, ন ক্রমোহস্মাভিরপ্রযুক্তা ইতি । কিং তর্হি ? লোকেতপ্রযুক্তা ইতি । নন্তু চ ভবানপ্যভ্যন্তরো লোকে ? অভ্যন্তরোহহং-লোকে ন হহং লোকঃ ॥৪৯॥

অনুশঙ্গঃ—আছে, অপ্রযুক্ত [অব্যবহৃত] । [বার্তিকানুবাদ]

[ভাষ্যানুবাদ]

[পূর্বপক্ষী] [কতকগুলি] শব্দ আছে [কিন্তু] প্রযুক্ত [ব্যবহৃত] হয় না । যেমন—উষ, তের, চক্র, পেচ ইত্যাদি ।

[অতঃ কোন প্রথমপূর্বপক্ষীর বিরোধী পূর্বপক্ষী] আছে অথচ অপ্রযুক্ত [ইহা] যদি [হয়] তাহে কি [হলো] ?

[প্রথম পূর্বপক্ষী] আপনি [সিদ্ধান্তী] শব্দ সকলের প্রয়োগ থেকে [শঙ্কেব] সাধুত্ব নিশ্চয় করেন । এখন যেগুলি [যে শব্দগুলি] অপ্রযুক্ত ঐগুলি সাধু হতে পারে না ।

[কোন তটস্থ (বিচারে লিপ্ত নয়)] [আপনি ' যে বলছেন "শব্দ সকল আছে অথচ 'অপ্রযুক্ত'—ইহা বিরুদ্ধ। যদি [শব্দ] থাকে [তাহলে] অপ্রযুক্ত নয়, আর যদি অপ্রযুক্ত [হয়, তাহলে] নাই। আছে অথচ অপ্রযুক্ত—ইহা বিরুদ্ধ। আপনি প্রয়োগ করেই বলছেন—শব্দগুলি আছে, অথচ অপ্রযুক্ত। [প্রথম পূর্বপক্ষীর উপর উপহাস] আপনার তুল্য অন্ত কোন ব্যক্তি এখন আছে—যে শব্দের প্রয়োগে সাধু [কুশল হয়] হতে পারে] ?

[প্রথম পূর্বপক্ষী] না ইহা বিরুদ্ধ নয়। আছে এইকথা বলছি—যেহেতু শাস্ত্রজ্ঞগণ [ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞ] শাস্ত্রের দ্বারা এই শব্দগুলির সংস্কার [প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাংপাদন] করে থাকেন। অপ্রযুক্ত ইহা বলছি [এইজন্য] যেহেতু লোকে অপ্রযুক্ত। আর যে আপনি বলছেন—“আপনার তুল্য অন্ত কোন ব্যক্তি এখন শব্দের প্রয়োগে সাধু আছে ?” [এই বিষয়ে] [শব্দগুলি] আমাদের কর্তৃক অপ্রযুক্ত—ইহা বলছি না। [দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী] তাহলে কি ? [প্রথম পূর্বপক্ষী] লোকে অপ্রযুক্ত [ইহা বলছি]। [দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী] আজ্ঞে ! আপনিও তো লোকের ভিতরে [অন্তর্গত] ? [প্রথম পূর্বপক্ষী] আমি লোকের ভিতরে, কিন্তু আমি লোক নই ॥ ৪২ ॥

বিত্তি :—মহাভাষ্যকার প্রথম সংখ্যক বার্তিক ব্যাখ্যা করেছেন। এখন দ্বিতীয় বার্তিক ব্যাখ্যা করবার জন্য বার্তিকগ্রন্থ উদ্ধৃত করছেন ‘অন্ত্যপ্রযুক্তঃ’। “অন্ত্যপ্রযুক্তঃ” এইটুকুই দ্বিতীয় বার্তিক নয়। কিন্তু দ্বিতীয় বার্তিক সম্পূর্ণ হচ্ছে “অন্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নাত্মে শব্দপ্রয়োগাৎ ১” মহাভাষ্যকার ব্যাখ্যার শেষের বিভাগের সুবিধার জন্য “অন্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নাত্মে শব্দপ্রয়োগাৎ” এই সম্পূর্ণ বার্তিকের ‘অন্ত্যপ্রযুক্তঃ’ এই অংশটি প্রথমে উপস্থাপিত করেছেন। “অন্ত্যপ্রযুক্তঃ” এই অংশটিকে মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষীর উপস্থাপনীয় আশঙ্কারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। বার্তিকে যে ‘অন্ত্য অপ্রযুক্তঃ’ এইভাবে একবচনের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ এই নয় যে ‘একটি শব্দ অপ্রযুক্ত আছে।’ কিন্তু জাতি অভিপ্রায়ে ওখানে একবচনের প্রয়োগ হয়েছে। সুতরাং শব্দবিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ অপ্রযুক্ত অব্যবহৃত, ইহাই বার্তিকগ্রন্থের তাৎপৰ্য। সেই জন্য এই বার্তিকের ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যকার “সম্ভি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তাঃ” এইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ করে পূর্বপক্ষীর আশয় প্রকটিত করেছেন। পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে বার্তিককার ও মহাভাষ্যকার উভয়েই পূর্বে বলেছেন ‘অনাদিবুদ্ধব্যবহার

পরস্পর। থেকে জেনে লোকে অপরকে অর্থ বুঝাবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করে, ব্যাকরণশাস্ত্র সেইখানে ধর্মনিয়ম করে—‘সাধুশব্দের প্রয়োগ করবে, অসাধু শব্দের প্রয়োগ করবে না।’ এথেকে বুঝা যাচ্ছে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে বা শিষ্টের। যে সকল শব্দ প্রয়োগ করেন সেইগুলি সাধু; সেই শব্দই ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ করে ব্যুৎপাদন করে। অথচ এমন কতকগুলি শব্দ দেখা যাচ্ছে যেগুলিকে ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত করা হয়েছে, কিন্তু লোকে সেইশব্দগুলির প্রয়োগ নাই। পূর্বপক্ষী সেইরূপ শব্দগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছেন, যেমন—উষ, তের, চক্র, পেচ।

পূর্বপক্ষী মনে করেছেন যে শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা সাধু হয়, বা অপ্রযুক্ত তাহা অসাধু। ব্যাকরণশাস্ত্র সাধু শব্দের ব্যুৎপাদন করে, অসাধু শব্দের ব্যুৎপাদন করে না। অপ্রযুক্ত শব্দ অসাধু। এখন ব্যাকরণ শাস্ত্র যদি অপ্রযুক্ত অর্থাৎ অসাধু শব্দের ব্যুৎপাদন করে তাহা অপ্রমাণ হয়ে পড়বে। পূর্বপক্ষীর মনে মনে এইরূপ অভিপ্রায় থাকলেও ‘সব কথা প্রকাশ না করে বলেছেন—
—‘অপ্রযুক্ত অর্থাৎ যাহার প্রয়োগ করা হয় না এইরূপ শব্দ সকল আছে, যেমন উষ, তের, চক্র, পেচ।’

পূর্বপক্ষী এইকথা বলাতে অপর কোন ব্যক্তি [যিনি, ২য় পূর্বপক্ষী অথবা পূর্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তীর বিচারে লিপ্ত নন] বলছেন—“কিমতো বৎসন্ত্যপ্রযুক্তাঃ” ? ‘অপ্রযুক্ত [অব্যবহৃত] শব্দ যদি থাকে’ তাতে তোমার কি ক্ষতি হলো ? অতঃ পরে ব্যক্তির এইরূপ কথায় প্রথম পূর্বপক্ষী বলছেন—“প্রয়োগাচ্ছি ভবাক্ত-কানাং সাধুত্বম্……নামী গাধবঃ স্মাঃ।” আপনি [সিদ্ধান্তী] প্রয়োগ—থেকে শব্দের সাধুত্ব নিশ্চয় করেন। উষ, তের চক্র, পেচ—ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ নাই। তাহলে এই শব্দগুলির প্রয়োগ নাই বলে—ইহারা অসাধু হউক। পূর্ব-পক্ষীর এই কথায় ততঃ পরে ব্যক্তি [দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী] বলছেন—“ইদং তাষষ্টি প্রতিবিদ্যম্ ……প্রয়োগে সাধুঃ স্মাৎ” আপনার [১ম পূর্বপক্ষীর] কথা পরস্পর বিরুদ্ধ। যেহেতু ঘট প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা জল আনয়ন ক্রিয়া প্রভৃতি কার্য না হলেও, সেই ঘটাদির সত্তা থাকে। কিন্তু শব্দের সত্তা প্রয়োগ থেকেই জানা যায়। প্রয়োগ না হলে শব্দের সত্তা জানা যেতে পারে না। অথচ আপনি বলছেন—শব্দ আছে, অপ্রযুক্ত। সুতরাং আপনার কথা বিরুদ্ধ। শব্দ যদি থাকে—তাহলে প্রযুক্ত হবেই, অপ্রযুক্ত হতে পারে না। আর যদি

অপ্রযুক্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে—শব্দ নাই। আছে অথচ অপ্রযুক্ত ইহা [শব্দের বেলায়] বিরুদ্ধ। আপনি স্বয়ং প্রয়োগ করেই বলছেন, শব্দ আছে কিন্তু অপ্রযুক্ত। আপনি নিজের কথার বিরোধে নিজেকে বুঝতে পারছেন না—এই অভিপ্রায়ে তটস্থ ব্যক্তি ১ম পূর্বপক্ষীকে উপহাসযুক্ত বাক্য বলছেন, আপনার জাতীয় অল্প কোন্ ব্যক্তি আছে, যিনি এইরূপ শব্দ প্রয়োগে পটু ?

তটস্থ ব্যক্তির এইরূপ কথায় প্রথম পূর্বপক্ষী তাঁর পূর্বপক্ষ দৃঢ় করার জন্ত বলছেন—“নৈতদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্। সন্তীতিঅস্মাভিরপ্রযুক্তাঃ ইতি।” অর্থাৎ আমার কথা বিরুদ্ধ নয়। কারণ ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি দেখে শব্দগুলির সম্ভার অনুমান করেছে। আর আপনি [তটস্থ] যে উপহাস করেছিলেন—আপনার মত কোন ব্যক্তি এইরূপ শব্দ প্রয়োগে পটু ইত্যাদি। আমার উপর এই দোষও আপত্তি হয় না। যেহেতু আমি ‘শব্দগুলি অপ্রযুক্ত’ বলেছি কিন্তু “আমি শব্দগুলির প্রয়োগ করি না” এই কথা বলি নাই। প্রথম পূর্বপক্ষীর এই কথা শুনে তটস্থ ব্যক্তি প্রশ্ন করছেন—“কিং তর্হি? শব্দগুলি আপনার কর্তৃক অপ্রযুক্ত নয় তো কি? কার কর্তৃক অপ্রযুক্ত? ইহার উত্তরে প্রথম পূর্বপক্ষী বলছেন—“লোকেঃপ্রযুক্তা ইতি।” অর্থ বুঝাবার জন্ত এই শব্দগুলি লোকে ব্যবহৃত হয় না। তটস্থ ব্যক্তির পুনরায় আক্ষেপ—“নহু চ ভবান্যভ্যন্তরো লোকে”। আক্ষেপে আপনিও তো লোকের অন্তর্গত। লোকে অপ্রযুক্ত হলে আপনার কর্তৃক ও এই শব্দগুলি অপ্রযুক্ত। তা হলে আপনি যে বলেছিলেন—‘আমার কর্তৃক অপ্রযুক্ত—ইহা আমি বলছি না’—আপনার সেই বাক্য অসঙ্গত হয়ে গেল। তটস্থ ব্যক্তির এইরূপ আক্ষেপের উত্তরে প্রথম পূর্বপক্ষী বলছেন—“অভ্যন্তরোহং লোকে ন ত্বেহংলোকঃ” আমি লোকের ভিতরে বা লোকের অন্তর্গত কিন্তু আমি লোক নয়। অর্থ বুঝাবার জন্ত যারা শব্দ প্রয়োগ করে তারাই এখানে ‘লোক’ শব্দের অর্থ। আমি অর্থ বুঝাবার জন্ত ‘উস, তের’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করি নাই, কিন্তু শব্দগুলির কেবল স্বরূপেরই উল্লেখ করেছে; সুতরাং আমি লোক নয়। ইহাই প্রথম পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। এইভাবে প্রথম পূর্বপক্ষী তার অপ্রযুক্ত শব্দের সম্ভা স্থাপন করে—ইহাই প্রতিপাদন করল যে অপ্রযুক্ত শব্দ যখন আছে, তখন সেই অপ্রযুক্ত শব্দগুলি অসাধু; ব্যাকরণশাস্ত্র সেই সকল শব্দের ব্যুৎপাদন করায় ব্যাকরণ অপ্রমাণ হলো ॥ ৪২ ॥

মূল
[বার্তিক]

অন্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ ॥ ২ ॥

[মহাভাষ্য]

অন্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেৎ, তন্ন। কিং কারণম্? অর্থৈ শব্দ
প্রয়োগাৎ। অর্থৈ শব্দাঃ প্রযুক্ত্যন্তে, সন্তি চৈবাং শব্দানামর্থ্য
যেষথেষু প্রযুক্ত্যন্তে ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ :—[পূর্বপক্ষ] অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। [সিদ্ধান্ত] না; তাহা
নয়। [শঙ্কা] কারণ কি? [উত্তর] অর্থৈ শব্দের প্রয়োগ হয় এই হেতুক।
[বার্তিকানুবাদ] অর্থৈ [অর্থ বুঝাবার জন্য] শব্দের প্রয়োগ হয়। এই
শব্দগুলির [উষ, তের ইত্যাদি শব্দের] অর্থ আছে, যে সকল অর্থৈ [অর্থ
বুঝাবার জন্য] শব্দগুলি প্রযুক্ত হয় ॥ ৫০ ॥ [ভাষ্যানুবাদ]

নিরূত :—‘অন্ত্যপ্রযুক্তঃ’ এই বার্তিকাক্ষের দ্বারা পূর্বোক্তরূপে যে আশঙ্কার
উত্থাপন করা হয়েছে সেই আশঙ্কার উত্তর দিবার জন্য “অন্ত্যপ্রযুক্ত
ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ” এই সম্পূর্ণ বার্তিক বলা হয়েছে। আশঙ্কা হতে
পারে যে “অন্ত্যপ্রযুক্তঃ” এবং “অন্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ” এই
উভয়কে বার্তিক বলে স্বীকার করলে “অন্ত্যপ্রযুক্তঃ” অংশটি পুনরুক্ত হয়ে পড়ে।
এর উত্তরে বলা হয় “ন অর্থৈ শব্দপ্রয়োগাৎ” এই অংশটি নিষেধ বুঝাচ্ছে,
যার নিষেধ বুঝাবে, সেই নিষেধ অংশটিকে উপস্থাপিত করবার জন্য
“অন্ত্যপ্রযুক্তঃ” অংশটির উল্লেখ করা হয়েছে বলে পুনরুক্তি দোষ হয় না। যাই
হোক পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেছিল উষ ইত্যাদি শব্দগুলি আছে, অথচ লোকে
প্রযুক্ত হয় না। তার উত্তরে বার্তিককার এবং বার্তিকের ব্যাখ্যাকার পতঞ্জলি
উভয়েই বললেন অর্থৈ অর্থাৎ অর্থবিষয়ক জ্ঞানেব জন্য পদগুলির প্রয়োগ
করা হয়। অতলোকের যাতে অর্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার জন্য অপরে ‘উষ’
ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগ করেন। বার্তিককার ও ভাষ্যকারের কথা থেকে বুঝা
যাচ্ছে, যে ‘উষ,’ ‘তের’ ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ আছে অর্থাৎ অর্থের জ্ঞান
হয়। অর্থের জ্ঞান হয় বলে, সেই অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাদের বাচক শব্দের
প্রয়োগের অনুমান করা যায়। যেখানে যেখানে অর্থের জ্ঞান লোকের

হয়, সেই সেই স্থলে সেই সেই অর্থের বাচক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।
স্বতরাং “উষ” ইত্যাদি শব্দগুলি, লোকে প্রযুক্ত, যেহেতু সেই সেই অর্থজ্ঞানের
জনক” এইরূপ অনুমানের দ্বারা শব্দগুলি প্রযুক্ত [লোকে ব্যবহৃত] ইহাই
সিদ্ধ হয়, পূর্বলক্ষীর আশঙ্কিত অপ্রযুক্ত নয় (২১৬) ॥ ৫০ ॥

মূল

[বার্তিক]

অপ্রয়োগঃ প্রয়োগাত্মকঃ ॥ ৩ ॥

[মহাভাষ্য]

অপ্রয়োগঃ খণ্ডপোষাং শব্দানাং ত্রাযাঃ। কৃতঃ? প্রয়োগা-
ত্মকঃ। যদেতেষাং শব্দানামর্থৈহিত্যাঙ্কদান্ প্রযুঞ্জতে। তদ্ যথা
—উষেত্যস্ত শব্দস্তার্থে ক যুয়মুষিতাঃ, তেরেত্যস্তার্থে কিংযুয়ং
তীর্ণাঃ, চক্রেত্যস্তার্থে কিংযুয়ং কৃতবন্তঃ, পেচেত্যস্তার্থে—কিং
যুয়ং পক্ববন্ত ইতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ :—প্রয়োগের ভেদ আছে বলে [উষইত্যাদি শব্দের] অপ্রয়োগ
[বার্তিকানুবাদ]। [মহাভাষ্যানুবাদ]। এই শব্দগুলির [উষ ইত্যাদি শব্দের]
অপ্রয়োগ যুক্তিযুক্তই। কি হেতু [কিহেতু অপ্রয়োগ ন্যায্য]? প্রয়োগের
ভেদ আছে [এই হেতু]। যে হেতু এই শব্দগুলির [উষ ইত্যাদি শব্দের]
অর্থ [অর্থজ্ঞানের জ্ঞান] [লোকে] অত্র শব্দের প্রয়োগ করে। যেমন—
“উষ” এই শব্দের অর্থ [অর্থ বুঝাবার জ্ঞান] “ক যুয়মুষিতাঃ,” “তের” এই
শব্দের অর্থ “কিং যুয়ং তীর্ণাঃ,” “চক্র” এই শব্দের অর্থ “কিং যুয়ং কৃতবন্তঃ,”
“পেচ” এই শব্দের অর্থ “কিংযুয়ং পক্ববন্ত” এই রূপ [প্রয়োগ করে] ॥ ৫১ ॥

বিবৃতি :—পূর্ববার্তিকের শেষাংশে এবং তার ব্যাখ্যারূপ মহাভাষ্যে
বলা হয়েছে, যেহেতু “উষ” “তের” ইত্যাদি শব্দের অর্থজ্ঞান হয়, সেই হেতু
সেই অর্থের বাচক শব্দের প্রয়োগ হয়, শব্দ গুলি প্রযুক্ত, অপ্রযুক্ত নয়।

(২১৬) অর্থে শব্দপ্রয়োগঃ। অর্থসম্ভাবঃ শব্দপ্রয়োগে লিঙ্গম্। ন হি বিবা শব্দেনার্থ-
প্রত্যয়ন্যপপত্ততে ॥—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

অর্থ শব্দপ্রয়োগঃ ইতি। অর্থবিষয়জ্ঞানায় শব্দপ্রয়োগাধিতার্থঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্ধোত।

* “ক যুয়ং” পাঠান্তর। “ক যুয়ং” পাঠান্তর।

অনুমানের দ্বারা শব্দগুলি লোকের প্রযুক্ত বলে জানা যায়। এখন তৃতীয় সংখ্যক বার্তিকে বার্তিককার অজ্ঞমতে উষ, তের ইত্যাদি শব্দ গুলির অন্তভাবে অপ্রযুক্তত্বের আশঙ্কা করছেন। মহাভাষ্যকারও বার্তিক অনুসারে ব্যাখ্যা করে শব্দগুলির অপ্রযুক্তত্বের কারণ বর্ণনা করেছেন। “অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্যত্বাৎ” এই বার্তিক বাক্যে “অপ্রয়োগঃ” এই পদের সঙ্গে “উষ, তের ইত্যাদিশব্দানাম্ লোকে” এইরূপ বাক্যাংশ স্থিতি করে অর্থ বুঝতে হবে। “লোকে উষ তের ইত্যাদীনাম্ শব্দানাম্ অপ্রয়োগঃ” এইরূপ বাক্য হবে। সুতরাং তার অর্থ হচ্ছে—‘লোকে ‘উষ ‘তের।’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের অভাব আছে। কি হেতু এই সকল শব্দের প্রয়োগের অভাব আছে? ইহার হেতুরূপে “প্রয়োগান্যত্বাৎ” এই বাতিকাংশটিকে বুঝতে হবে। “প্রয়োগান্তত্বাৎ” এই শব্দটির এইরূপ অর্থ—“প্রযুক্ত্যতে ইতি” এইরূপ অর্থে প্রউপসর্গপূর্বক যুক্ত ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে এখানে ‘প্রয়োগ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে বুঝতে হবে। যাহাকে প্রয়োগ করা হয় তাহাই এখানে ‘প্রয়োগ’ এই শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। কাকে প্রয়োগ করা হয়? শব্দকেই প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং এখানে ‘প্রয়োগ’ বলতে শব্দকেই বুঝতে হবে। “প্রয়োগঃ অন্তঃ বস্তু [অর্থন্ত]’ স প্রয়োগান্তঃ’ তন্ত ভাবঃ প্রয়োগান্তত্বম্।” অর্থাৎ যে অর্থের বোধক অন্ত শব্দ আছে, তাহা ‘প্রয়োগান্ত’। যে অর্থ বুঝাবার জন্য অন্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু ‘উষ তের’ ইত্যাদি শব্দের যে যে অর্থ, সেই সেই অর্থ বুঝাবার জন্য অন্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়। ইহাই ‘প্রয়োগান্তত্বাৎ’ শব্দের অর্থ (২১৭)। সুতরাং সমগ্র বার্তিক বাক্যের অর্থ এইরূপ হলো— “যেহেতু ‘উষ, তের’ ইত্যাদি শব্দের যা যা অর্থ, সেই সেই অর্থের বোধক অন্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়, সেইহেতু ‘উষ, তের’ ইত্যাদি শব্দগুলির লোকে প্রয়োগ হয় না।” মহাভাষ্যকার এই বার্তিকের এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করবার জন্য বলেছেন—এই শব্দগুলির [উষ, তের ইত্যাদির] অপ্রয়োগ জ্ঞায্যই। ‘খলু’ ও ‘অপি’ এই দুইটি নিপাত অবধারণাথক। উহার ক্রম ভিন্ন হবে—অর্থাৎ “জ্ঞায্যঃ” এই শব্দের পরে ‘খলুপি’ এইরূপ ক্রম বুঝতে হবে। কেন জ্ঞায্য? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন—‘উষ’ এই-শব্দটি বস্-নিবাসে+কত্ববাচ্যে লিটের মধ্যমপুরুষের বহুবচনের [অ] রূপ।

(২১৭) প্রযুক্ত্যতে ইতি প্রয়োগঃ শব্দঃ সোহন্তঃ বস্যাধিগাতি তদ্বাদিত্যর্থঃ । ৯ নাপেশ ।

এই ‘উব’ শব্দের অর্থ—[‘তোমরা’] বাস করেছিলে’ এই অর্থ বুঝাবার জন্য লোকে—“ক যুয়ম্ উবিতাঃ” এইরূপ ভিন্নশব্দের প্রয়োগ করে। এখানে ‘উব’ শব্দটি পরোক্ষ অতীত কালকে বুঝায়, যেহেতু পরোক্ষ অতীতে লিট্ হয়। আর ‘উবিতাঃ’ এই শব্দটি বস্ ধাতুর উত্তর অতীত কাল মাত্রে ‘ক্ত’ [নিষ্ঠা] প্রত্যয় হয়েছে বলে কেবলমাত্র অতীতকাল সামান্যকে বুঝাচ্ছে। সুতরাং ‘উব’ এই শব্দের বা অর্থ, সেই অর্থ তো ‘উবিতাঃ’ শব্দটি বুঝাতে পারে না। ‘উবিতাঃ’ শব্দটি ‘উব’ শব্দের সমানার্থক নয়। এইজন্য ‘উবিতাঃ’ শব্দের সঙ্গে ‘ক’ এবং ‘যুয়ম্’ এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে। তাতে ‘ক’ এই শব্দটি পরোক্ষ অর্থকে বুঝাচ্ছে, ‘ক্তঃ’ প্রত্যয় [বস্+ক্তঃ=উবিতাঃ] অতীত কাল ও কর্তৃত্ব অর্থকে বুঝাচ্ছে এবং ‘যুয়ম্’ শব্দটি মধ্যমপুরুষের আভিযুখ্য এবং বহুবচন বুঝিয়ে ‘উব’ শব্দের সমানার্থক হয়ে গেছে (২১০)। ‘উব’ এই পদটি কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন। ‘উবিতাঃ’ এই পদটিও বসধাতু অকর্মক বলে তার উত্তর কর্তৃবাচ্যে—“গত্যর্থাকর্মকগ্নিষশীঙ্‌স্থাসবসজনরুহজীধতিভ্যচ্” [পাঃসূঃ ৩।৪।৭২] এই সূত্রানুসারে ক্ত প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে।

এইরূপ ‘ভের’ পদটি ত্ প্রবনসম্ভরণয়োঃ, ত্ ধাতুর লিটের কর্তৃবাচ্যে মধ্যমপুরুষের বহুবচনের রূপ [ত্+লিট্ কর্তৃ অ], এর অর্থ, তোমরা সম্ভরণ করেছিলে বা অতিক্রম করেছিলে। এই অর্থের জ্ঞানের জন্য “কিং যুয়ং তীর্ণাঃ” [পাঠান্তর আছে ক যুয়ংতীর্ণাঃ] এইরূপ অন্যশব্দের প্রয়োগ লোকে করে থাকে। প্রবন বা সম্ভরণ, গমনার্থক বলে ত্ ধাতুটি গমনার্থক হওয়ায়, গমনার্থক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ঐ ‘গত্যর্থাকর্মক’ ইত্যাদি সূত্রে ত্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করে ‘তীর্ণাঃ’ পদ সিদ্ধ হয়। এইরূপ ‘চক্র’ এই পদটি ডু কৃৎকরণে—কৃধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে পরশ্মৈপদে লিটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনে ‘থ’ [অ] প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। তার অর্থ ‘তোমরা করেছিলে’ কৃধাতু সাকর্মক বলে সাকর্মকধাতুর [গমনার্থকভিন্ন] উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয় না বলে ‘চক্র’ এই পদের অর্থ বুঝাবার জন্য কর্তৃবাচ্যে ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত ‘কৃতবন্তঃ’ ‘কিং যুয়ং কৃতবন্তঃ’ এইরূপ অন্যশব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এইভাবে ‘পেচ’ পদটিও ডুপচৎ পাকে, পচ্ ধাতু+লিট্

(২১০) বদাগুযেভাস্য উবিতা ইতি সমানার্থো ন ভবতি পরোক্ষতাদেঃ বিশেষদ্যানবগ্নাভ্যাপিতং প্রত্যায়নার পীঠান্তরসিদ্ধিঃ প্রযুক্তান্তে।—কৈরট।

কতৃমধ্যমপুরুষ বহুবচন পরস্মৈপদে ষ [অ] প্রত্যয়ান্ত। অর্থ পূর্ববৎ তোমরা পাক করেছিলে। এইধাতু ও সক্রমক বলে তার অর্থ বুঝাতে “পকবন্তঃ” এইরূপ ক্ষবতু প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এইভাবে ‘উব’ প্রভৃতি শব্দের অর্থ বুঝাতে লোকে ঐরূপ অন্তশব্দ যেহেতু প্রয়োগ করে, সেইহেতু ঐ ‘উব’ প্রভৃতি শব্দের অপ্রয়োগ ত্রায্য—এই কথা বার্তিককার ও মহাভাষ্যকার বললেন। প্রথম পূর্বপক্ষী অপ্রয়োগের হেতু দেখাতে না পেরে সিদ্ধান্তীর উন্নয়ন দেখায় আপত্তি দিয়েছিলেন ; আর এই বার্তিকে বা মহাভাষ্যে যে অপ্রয়োগের কথা আছে, সেই অপ্রয়োগের হেতু হচ্ছে অন্তশব্দের প্রয়োগ, অতএব অপ্রয়োগ ত্রায্য ইহাই এই বার্তিক ও ভাষ্যের তাৎপর্য ॥ ৫১ ॥

মূল

[বার্তিক]

অপ্রযুক্তে দীর্ঘসত্রবৎ ॥ ৪ ॥

[মহাভাষ্য]

যতাপ্যপ্রযুক্তাস্তথাপ্যবশ্যং * দীর্ঘসত্রবল্লক্ষণেনানুবিধেয়াঃ । তদ্ যথা দীর্ঘসত্রানি বার্ষশতিকানি বার্ষসহস্রিকানি চ ; ন চাত্তত্বে কশ্চিদপ্যাহরতি । কেবলমৃষিসংপ্রদায়ো ধর্ম ইতি কৃত্বা যাজ্ঞিকাঃ শাস্ত্রোণানুবিদধতে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ :—অপ্রযুক্ত [শব্দ] বিষয়ে দীর্ঘসত্রের মত [দীর্ঘসত্র ইদানীং অপ্রযুক্ত হলেও অত্ৰকালে যেমন প্রযুক্ত হোত, সেইরূপ কতকগুলি শব্দ ইদানীং অপ্রযুক্ত হলেও কালান্তরে প্রযুক্ত হোত] [বার্তিকার্থ] । [ভাষ্যার্থ] যদি ও [উব প্রভৃতিশব্দ] অপ্রযুক্ত [অব্যবহৃত] তথাপি দীর্ঘসত্রের মত লক্ষণের দ্বারা [ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারা] সংস্কার্য । যেমন—শতবৎসরব্যাপী, সহস্রবৎসরব্যাপী দীর্ঘসত্রসকল [বেদ থেকে জানা যায়] কিন্তু আজকাল কোন লোকও [সেই সকল দীর্ঘসত্রের] অনুষ্ঠান করে না । কেবল ঋষিসম্প্রদায় [বেদাধ্যয়ন] ধর্ম,—এইহেতু [বিজগণ বেদাধ্যয়ন করেন] যাজ্ঞিকগণ শাস্ত্রের দ্বারা [কল্প-সূত্রের দ্বারা] বলে থাকেন ॥ ৫২ ॥

বিবৃতি—পূর্বে বার্তিককার ও মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষীর মতাবলম্বনে

* ‘যতাপ্যপ্রযুক্তা অবশ্যং’ [তথাপি, পাঠ নাই] পাঠান্তর ।

বলেছেন—‘উষ’ প্রকৃতি শব্দগুলি যে অর্থ বুঝায় সেই অর্থ বুঝাবার জন্য লোকে অন্তশব্দ ব্যবহার করে, সেইজন্য ঐ ‘উষ’ ইত্যাদি শব্দগুলি অপ্রযুক্ত। এখন বার্তিককার ও মহাভাষ্যকার উভয়েই উত্তররূপে “শব্দগুলি অপ্রযুক্ত হলেও ব্যাকরণ শাস্ত্রে সেগুলির ব্যুৎপাদন করা যায়” ইহা বলবার জন্য দীর্ঘসূত্রের উদাহরণ দিয়েছেন। “অপ্রযুক্তে দীর্ঘসূত্রবৎ”—এইটি চতুর্থ বার্তিক। এর অর্থ হচ্ছে দীর্ঘসূত্র সকল পূর্বে অস্বষ্টিত হোত, এখন অস্বষ্টিত হয় না। অস্বষ্টিত না হলেও যেমন বোধাধ্যয়নকারী ব্যক্তিরূপে সেই সকল ‘সূত্র’ বেদের যে অংশে পঠিত আছে, সেই বোধাংশ অধ্যয়ন করেন এবং ব্যক্তিকেরা [যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋষিরা] কল্পসূত্রের সাহায্যে সেই সকল দীর্ঘসূত্রের কথা বলে থাকেন : সেইরূপ “উষ, তের” ইত্যাদি শব্দ সকল অপ্রযুক্ত হলেও ব্যাকরণশাস্ত্রে তাহাদের প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণ করে সেই সকল শব্দের অনুশাসন কর্তব্য বলে, ব্যাকরণশাস্ত্রে তাদের ব্যুৎপাদন অজ্ঞাত্য নয়। আশঙ্কা হতে পারে—ব্যাকরণশাস্ত্র প্রয়োগমূলক—প্রযুক্তশব্দ [সাধুশব্দ] সকল দেখে ব্যাকরণসূত্র রচনা করা হয়েছে। এখন ‘উষ, তের’ ইত্যাদি অপ্রযুক্ত শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণসূত্র যদি ঐ সকল শব্দের সংস্কার করে, তা হলে তো ব্যাকরণশাস্ত্র অপ্রমাণ হয়ে পড়ে। এর উত্তরে নাগেশ বলেছেন, বর্তমানে বা পানিনি যখন সূত্রগুলি রচনা করেন, সেইসময় শব্দগুলি অপ্রযুক্ত হলেও কালান্তরে [অতীতে] শব্দগুলি প্রযুক্ত হত—ইহা পানিনি দিব্যদৃষ্টি সহায়ে জেনে ঐ সকল শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়াদি দ্বারা ব্যুৎপাদনের নিমিত্ত সূত্র রচনা করেছেন, অতএব তাঁরসূত্র অপ্রমাণ হতে পারে না (২১২)। কল্পসূত্রে পাওয়া যায়—একশত বৎসর বা একহাজার বৎসর ব্যাপী এক একপ্রকার সূত্র অস্বষ্টিত হত। জ্যোতিষোন্ম যোগ তিন প্রকার—একাহ, অহীন এবং সূত্র। একদিনে যে সোমযোগ অস্বষ্টিত হয়ে সমাপ্ত হয়, তাকে ‘একাহ’ বলে। একদিনের অধিক দুই, তিন, ইত্যাদিরূপে ১২ দিন পর্যন্ত যে সোমযোগ অস্বষ্টিত হয়, তাহাকে ‘অহীন’ বলে। ১২ দিনের উপর, তের, চৌদ্দ দিন, একমাস, ছয়মাস, একবৎসর শত বৎসর সহস্রবৎসর ইত্যাদি দীর্ঘকালে অস্বষ্টিত সোমযোগকে সূত্র বলে। শত-

(২১২) নবপ্রযুক্তানুশাসনে বিশ্বলঙ্কাঙ্কুরসাপ্রাণাণাঃ শ্যাদন্তজাহ সংপ্রতি ইতি।
পানিনেরব্যাকরণপ্রণয়ন কালে ইত্যর্থঃ। মহাভাষ্যপ্রদীপে দ্রোত।

বৎসর, সহস্র বৎসর পর্যন্ত যে সত্ত্ব সকল অল্পকাল হত, সেগুলিকে দীর্ঘত্ব বলা হয় অনেক বজ্রমান মিলে সত্ত্বের অল্পকাল করতেন। কাত্যায়ন শ্রোতস্থজে [২৪।৪।২৩—২৪] “শতসংবৎসরং সাধ্যানম্। সহস্রসংবৎসরং বিশ্বস্বজাম্” ইত্যাদিরূপে সাধ্যান অয়ন নামক শতবৎসরব্যাপী সত্ত্বের এবং সহস্রসংবৎসর ব্যাপী বিশ্বস্বজাময়ন নামক সত্ত্বের উল্লেখ আছে। “অহানি বাভিসংখ্যাতাং” [ঠৈঃসূঃ ৭।৩১—৪০] এই মীমাংসাস্থজে বৎসরকে দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সহস্রবৎসর মাত্রই বাচতে পারে না—এইজ্ঞা এখানে বৎসর বলতে দিন বুঝতে হবে। অপরে বলেন এখন মাত্রই শতবর্ষজীবী হলেও পূর্বে মাত্রই বিশেষ করে ঋষিরা শতবৎসরের অধিক সহস্র বৎসর পর্যন্তও বাচতেন বলে এখানে বৎসরের অর্থ দিন ধরবার কোন হেতু নাই। বৎসর অর্থ ‘ই’ এখানে গ্রাহ্য।

ঋষিসম্প্রদায় = বেদাধ্যয়ন। অল্পবিদধতে = সংস্কার করেন। অল্পবিধেয়াঃ = সংস্কারের যোগ্য ॥ ৫২ ॥

মূল

[বার্তিক]

সর্বৈ দেশান্তরে ॥ ৫ ॥

[মহাভাষ্য]

সর্বৈ খণ্ডপি এতে শব্দা দেশান্তরেষু * প্রযুক্ত্যন্তে। ন চৈবোপলভ্যন্তে †। উপলব্ধৌ যন্তঃ ক্রিয়তাম্। মহান্ হি • শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ—সপ্তদ্বীপা বসুমতী, ত্রয়ো লোকাঃ, চত্বারো বেদাঃ সাক্ষাঃ সরহস্য। বহুধা ভিন্নাঃ ×, একশতমধ্যযুগাধাঃ, সহস্রবজ্রা সামবেদাঃ, একবিংশতিধা বাহুবৃচাম্, নবধা—ঋগ্বেদাঃ, বাকো-বাক্যম্, ইতিহাসাঃ, পুরাণম্, বৈজ্ঞানিকমিত্যেত্যাবাঙ্গদস্য প্রয়োগ-বিষয়ঃ। এতাবন্তঃ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়মনুনিশ্চয়স্য ‘সন্ত্যপ্রযুক্তা’ ইতি বচনং কেবলং সাহসমাত্রম্। এতন্নিশ্চাতিমহতি শব্দস্য

* ‘দেশান্তর’ পাঠান্তর। + ‘ন চৈত উপলভ্যন্তে’ পাঠান্তর। ০ ‘মহান্ শব্দস্য’ পাঠান্তর। × ‘বিভিন্ধাঃ’ পাঠান্তর।

প্রয়োগবিষয়ে তে তে শব্দান্তত্র তত্র নিয়তবিষয়া দৃশ্যন্তে । তদ্ যথা—শবতির্গতিকর্মণী কস্বোজেষেব ভাবিতো ভবতি, বিকারঃ * এনমার্ধা ভাষন্তে শব ইতি । হ্রস্বতিঃ সুরাষ্ট্রেণ, রংহতিঃ প্রাচ্যম-
খ্যেযু, গমিমেষবার্ধাঃ প্রযুক্ততে । দাতিলবনাথে প্রাচ্যেযু, দাত্রমুদীচ্যেযু । যে চাপ্যেতে ভবতোহপ্রযুক্তা অভিমতাঃ শব্দা এতেষামপি প্রয়োগো দৃশ্যতে । কং বেদে । তদ্ যথা †—
সপ্তাস্যে রেবতী রেবদূষ [ঋ. সং. ৪।৫।১।৪], যদ্যে রেবতী
রেবত্যাং তদূষ, ‡ যত্রাং নরঃ শ্রুত্যাং ব্রহ্ম চক্র [ঋ. সং. ১।১৬।৫।১১],
যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনুনাম্ [ঋ. সং. ১।৮৯।৯] + ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ :—সব [এইসব শব্দ] অন্তদেশে [প্রযুক্ত হয়] [বার্তিকানুবাদ] । ॥
[ভাষ্যানুবাদ] এই সকল শব্দ অন্ত দেশে ব্যবহৃত হয় । [আশঙ্কা] এই
শব্দগুলির [উষ, তের ইত্যাদি শব্দের] উপলব্ধি হয় না । [উত্তর] উপলব্ধির
নিমিত্ত যত্ন কর । শব্দের প্রয়োগের স্থল বিশাল [ব্যাপক] সপ্তদ্বীপসমস্থিত
পৃথিবী, তিন লোক [ভুলোক, ভুবলোক স্বর্লোক], অগ্নের সহিত, রহস্তের
সহিত চার বেদ বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন, - একশত এক অক্ষয় [যজুর্বেদের] শাখা,
সামবেদ সহস্রশাখাযুক্ত, ঋগ্বেদ একবিংশতি শাখাবিশিষ্ট, অথর্ববেদ নয়শাখায়
বিভক্ত, উক্তি প্রত্যাভিধ্বপশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, চিকিৎসাশাস্ত্র এই পরিমিত
শব্দের প্রয়োগের স্থল । শব্দের এতাবৎ প্রয়োগস্থলের আলোচনা না করে
“অপ্রযুক্ত [শব্দ] আছে” এই কথা বলা কেবল সাহসমাত্র [হঠকারিতামাত্র] ।
শব্দের প্রয়োগের এই অতি বিশাল ক্ষেত্রে, সেই সেই [নির্দিষ্ট] শব্দ সকল,
সেই সেই স্থলে নিয়ত অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায় । যেমন—গমনার্থক শুধাতু
কস্বোজদেশেই কথিত [ব্যবহৃত] হয় । আর্যেরা ইহাকে বিকার [মৃতপ্রাণী]
অর্থে ‘শব বলে ব্যবহার করেন । হ্রস্বধাতু [গমনার্থক] সুরাষ্ট্রে, রংহ ধাতু
পূর্বদেশে ও মধ্যদেশে, আর্যেরা কিন্তু [গমনার্থক] গম ধাতুকেই প্রয়োগ
করেন ।

* “বিকার এবৈবম” পাঠান্তর । B ‘প্রাচ্যমধ্যমেষু’ পাঠান্তর । † ‘তদ্বৎ’ পাঠ নাই
অন্তগুণকে ।

১ ‘রেবতী রেবত্যাঃ অদূষ’ এই পাঠান্তর দেখা যায়, উহা অত্যন্ত পাঠ ।

২ ‘যদ্যে নরঃ শ্রুত্যাং ইত্যাদি পাঠান্তর. অত্যন্ত ।

পূর্বদেশে দাতি [দা ধাতু] ছেদনার্থে, উত্তরদেশে দাত্ত অর্থে [ব্যবহার করে]। আর আপনার এই যে সকল অভিমত অপ্রযুক্ত [অপ্রযুক্তরূপে অভিমত] শব্দ, উহাদেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

[পূর্বপক্ষী] কোথায়? [উত্তর] বেদে। সপ্তাশ্ত্রে রেবতী রেবদূষ [হে] বিত্তশালী দেবগণ! আপনারা 'সপ্তাশ্ত্রে' বিত্তকে আলোকিত করেছেন। যদ্বা রেবতী রেবত্যাং তদূষ [হে বিত্তশালী দেবগণ! যাহা সম্পূর্ণ, সেইরূপ আলোকে আপনারা আমাদেরকে আলোকিত করেছেন]। যত্রা নরঃ ঋত্যাং ব্রহ্ম চক্র [হে বীরগণ! যে প্রার্থনা ঐকান্তিকভাবে ঋত হয়, তোমরা আমার জন্ত তাহা করেছ]। যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনুনাং [যেখানে তোমরা আমাদের শরীরের জরাকে দূচ করেছ] ॥ ৫৩ ॥

বিবৃতি :-বার্তিকার ও মহাভাষ্যকার পূর্বে বলেছেন—“উষ, তের” প্রভৃতি শব্দগুলি প্রাচীনকালে প্রযুক্ত হত, যেমন দীর্ঘসম্র। এখন বার্তিককার বলছেন—এই আধুনিক কালেও সেই সকল শব্দ অত্মদেশে প্রযুক্ত হয়। এই দেশে বর্তমানে প্রযুক্ত না হলেও অত্মদেশে বর্তমানকালেই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং পূর্বপক্ষী যে বলেছিল, শব্দগুলি অপ্রযুক্ত, পূর্বপক্ষীর ঐ কথা সম্পূর্ণ অযুক্ত। বার্তিককার দেশান্তরে শব্দগুলি প্রযুক্ত হয় বলেছেন। মহাভাষ্যকার বার্তিকের ব্যাখ্যায় বললেন—দেশান্তরে যেমন এই সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়; সেইরূপ এই দেশেও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে—ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়। বার্তিকের ‘দেশান্তরে’ শব্দটি লোকান্তর, বিষয়ান্তরের উপলক্ষণ। পূর্বপক্ষী বলছেন—“ন চৈত উপলভ্যন্তে” অর্থাৎ এই ‘উষ তের’ ইত্যাদি শব্দগুলি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্র অতি ব্যাপক। এই সপ্তদ্বীপা সম্পূর্ণ পৃথিবীতে শব্দের প্রয়োগ হয়। পুরাণ শাস্ত্রে এই পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপের বর্ণনা আছে—জম্বুদ্বীপ [ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত], প্রক্বদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ এবং পুন্ড্রদ্বীপ। এই সমস্ত দ্বীপে লোকে শব্দের ব্যবহার করে। তিন লোক—ভূলোক, ভুবলোক এবং স্বর্গলোক। যদিও এই তিন লোকের মধ্যে পৃথিবী অন্তর্গত হয়েছে, তথাপি পৃথিবীতে শব্দের ব্যবহারের বাহুল্য আছে বলে সপ্তদ্বীপা বহুমতী বলে পৃথিবীর পৃথগ্ভাবে উল্লেখ হয়েছে [নাগেশ]। ভুবলোকের দ্বারা অতল, বিতল, স্ততল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল

নামক অধোদেশে সপ্তলোকের গ্রহণ বুঝতে হবে। স্বর্লোকশব্দের দ্বারা—
 স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক বুঝতে হবে। স্ততরাং তিনলোক বলতে
 এখানে চতুর্দশভুবন বুঝতে হবে। এই চতুর্দশভুবনে শব্দের ব্যবহার আছে।
 তারপর শব্দ সকল সমস্ত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। সেইসব শাস্ত্রের উল্লেখ
 করেছেন মহাভাষ্যকার—প্রথমে চার বেদ। এই চারবেদের ব্যাখ্যায়
 মহাভাষ্যকার বলেছেন—অক্ষয়ুঁশাখা একশত এক। যজ্ঞ যজুর্বেদের মন্ত্রের
 কাজই প্রধানভাবে হয়ে থাকে, এবং সেই যজুর্বেদের কাজ যিনি করেন তাঁকে
 অক্ষয়ুঁ বলে। এইজন্ত অক্ষয়ুঁশাখা বলতে যজুর্বেদের শাখাসকল বুঝতে
 হবে। সামবেদ সহস্রবর্ষা, ‘বস্বান্’ শব্দের দ্বারাও এখানে শাখাকেই
 বুঝাচ্ছে, স্ততরাং সামবেদের এক হাজার শাখা। “একবিংশতিধা বাহুচ্যাম্”
 ঋগ্বেদে সবচেয়ে বেশী মন্ত্র আছে বলে সেই বেদ ষাঁরা পড়েন—তাঁদিগকে
 বাহুচ বলে। ‘বাহুচানামান্নারঃ’ অর্থাৎ বাহুচগণের বেদ এই অর্থে ‘এয়া’
 প্রত্যয় করে ‘বাহুচ্যাম্’ শব্দ নিস্পন্ন হয়। স্ততরাং ‘বাহুচ্যাম্’ বলতে
 ঋগ্বেদ। সেই ঋগ্বেদের একুশটি শাখা। “নবধা আথবংশো” অথবান্ শব্দের
 উত্তর ‘তেন প্রোক্তম্’ হ্রস্বে অণ্ প্রত্যয় করে ‘আথবণ্’ শব্দ সিদ্ধ হয়। সেই
 আথবণ্ শব্দের উত্তর আবার ‘ভমধীযতে’ অর্থে ঠক্ প্রত্যয় করে ‘আথবণিক’
 শব্দ নিস্পন্ন হয়। তারপর আবার আথবণিকদের বেদ এই অর্থে আথবণিক
 শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় এবং ইক প্রত্যয়লোপ করে ‘আথবণঃ’ পদ সিদ্ধ
 হয়। তার অর্থ অথবঁ বেদ। অথবঁ বেদের নয়টি শাখা। এইভাবে সমস্ত
 বেদ ১১৩১টি শাখায় বিভক্ত। তারপর বেদের অঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প,
 ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ। রহস্ত বলতে উপনিষদ্ অংশকে বুঝতে
 হবে। “বাকোবাক্যাম্” উচ্যতে ইতি বাকঃ পূর্বপক্ষবচনম্। অর্থাৎ যাহা
 বলা হয় তাকে বাক বলে, তার অর্থ পূর্বপক্ষের উক্তি। “উচ্যতে ইতি
 বাক্যাম্” উত্তরপক্ষবচনম্। অর্থাৎ ‘বাক্যাম্’ বলতে এখানে উত্তরপক্ষের উক্তি
 বুঝতে হবে। ‘বাকশ্চ বাক্যং চ অনয়োঃ সমাহারঃ’ এইরূপ সমাহার দ্বন্দ্ব
 সমাস করে ‘বাকোবাক্যাম্’ পদ নিস্পন্ন হয়েছে। যে শাস্ত্রে পূর্বপক্ষের উক্তি
 ও উত্তরপক্ষের উক্তি থাকে তাহাকে ‘বাকোবাক্যং’ শাস্ত্র বলে। অবশ্য ভগবান্
 শঙ্করাচার্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে ভবশাস্ত্রকে ‘বাকোবাক্যাম্’ বলেছেন।
 ‘ইতিহাস’ শব্দের অর্থ যে শাস্ত্রে পূর্বকালীন ব্যক্তিদের চরিত্রবর্ণনা থাকে

সেই শাস্ত্র। যেমন রামায়ণ, মহাভারত। পুরাণ-সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ-মবন্তর এবং তত্ত্ববর্ণনা যে শাস্ত্রে থাকে তাহাকে পুরাণ বলে। বৈজ্ঞক = চরক, সূত্র প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র। মহাভাষ্যকারের এই-এব উল্লিখিত শাস্ত্রের দ্বারা অগ্ৰাণ্ড শাস্ত্রও তাঁহার অভিপ্রেত বলে বুঝতে হবে। উপবেদ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, ত্রায়শাস্ত্র, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, চতুঃষষ্টি কলাবিজ্ঞা, কাব্য, নাট্য ইত্যাদি শাস্ত্রও বুঝতে হবে। অবশ্য শিষ্ট বা আপ্তবাক্যই গ্রাহ্য। নাস্তিক প্রভৃতির বাক্যকে মহাভাষ্যকার শব্দের প্রয়োগের স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই।

এই ভাবে চতুর্দশ ভূবন, বেদাদি বিশাল শাস্ত্রসমূহ শব্দের ক্ষেত্র। এই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা না করে, অগ্ৰাণ্ড লোকে না গিয়ে যে ব্যক্তি বলে এই শব্দগুলি ‘অপ্রযুক্ত’ তার মত মহামূঢ় আব কে আছে—এই অভিপ্রায়ে মহাভাষ্যকার বলেছেন ঐরূপ ‘অপ্রযুক্ত’ বলা হঠকারিতা। তারপর মহাভাষ্যকার বলেছেন ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন “শবতির্গতিকর্মা” ধাতুকথনে “ইচ্ছতির্পো ধাতুনির্দেশে” এই সূত্রানুসারে ইচ্ বা তিতপ্ প্রত্যয় হয়। ‘শুধাতু’ বুঝাবার জন্ত তিতপ্ প্রত্যয় করে ‘শবতিঃ’ এইরূপ হয়েছে। স্তত্রাং ‘শবতি’ মানে শুধাতু। গতি হয়েছে কর্ম যার অর্থ্যাং গতার্থক। শুধাতুর গমন অর্থে কদোদদেশেই প্রয়োগ হয়। আর আর্ধেরা বিকার অর্থে মৃত প্রাণীর দেহকে বুঝাবার জন্ত ‘শব’ শব্দের প্রয়োগ করেন। গমনার্থক ‘হন্ম’ ধাতু সূত্রান্ত্রেই প্রযুক্ত হয়। গমনার্থক ‘রংহ’ ধাতু পূর্বদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ব্যবহৃত হয়। আর্ধেরা গমন অর্থ বুঝাবার জন্ত ‘গন্ম’ ধাতুরই প্রয়োগ করেন। পূর্বদেশে ছেদন অর্থে দা ধাতুর প্রয়োগ হয়। আবার উত্তরদেশে ‘দাতি’ শব্দকে দাড [কাটারি] অর্থে ব্যবহার করে। এইভাবে শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায়। আব পূর্বপক্ষী যে, উষ, তের, চক্র পেচ’ প্রভৃতি শব্দকে অপ্রযুক্ত বলেছিলেন,— মহাভাষ্যকার সেই শব্দগুলি বেদে প্রযুক্ত আছে—ইহা দেখাবার জন্ত কতকগুলি বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। যদিও সেই মন্ত্রগুলির মধ্যে ‘তের’ এবং ‘পেচ’ শব্দের উল্লেখ নাই তথাপি এইরূপ বেদ পাওয়া যাবে যে বেদবাক্যে ঐ দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যাবে, এই অভিপ্রায়ই মহাভাষ্যকারের বুঝতে হবে। তা ছাড়া তো তিনি শব্দের বিশাল ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন। স্তত্রাং এমন অপ্রযুক্ত শব্দ নাই, পাণিনি, দার অম্বশাসন

করেছেন। অতএব প্রযুক্ত শব্দেরই অনুশাসন করার গাণিনি ব্যাকরণ
প্রমাণ ॥ ৫৩ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

কিং পুনঃ শব্দস্য জ্ঞানে ধর্ম'আহোস্থিৎ প্রয়োগে ? কশ্চাত্ত
বিশেষঃ ?

[বার্তিক]

জ্ঞানে ধর্ম'ইতি চেত্তথাহ ধর্মঃ ॥ ৬ ॥

[মহাভাষ্য]

জ্ঞানে ধর্ম'ইতি চেত্তথাহ ধর্মঃ * প্রাপ্নোতি । যো হি শব্দাজানা-
তাপশব্দানপ্যসৌ জানাতি । যথৈব শব্দজ্ঞানে ধর্ম'এবমপশব্দ-
জ্ঞানেহপ্যধর্মঃ । অথবা ভূয়ানধর্মঃ প্রাপ্নোতি । ভূয়াংসো হপশব্দা
অল্লীয়াংসঃ শব্দাঃ । একৈকস্য শব্দস্য বহবোহপভ্রংশাঃ । তদ্যথা—
গৌরিত্যস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকৈত্যেবমাদয়োহপভ্রংশাঃ

॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ :—[পূর্বপক্ষ] শব্দের জ্ঞানে ধর্ম অথবা প্রয়োগে [ধর্ম] ?

[অপর পূর্বপক্ষ] এখানে [শব্দের জ্ঞান বা প্রয়োগ বিষয়ে] বিশেষ [ভেদ]
কি ? (ভাষ্যান্তবাদ)

[পূর্বপক্ষরূপ বার্তিক] যদি জ্ঞানে ধর্ম ইহা [বল] তাহলে অধর্ম [ও
প্রাপ্ত হয়] ॥ ৬ ॥ [বার্তিকানুবাদ]

(ভাষ্যানুবাদ , জ্ঞানে ধর্ম—ইহা যদি হয়, সেইরূপ অধর্ম প্রাপ্ত হয় । যে,
শব্দ সকল [সাধুশব্দ] জ্ঞানে, সে, অপশব্দসকল ও [অসাধু শব্দও] জ্ঞানে ।
শব্দজ্ঞানে [সাধুশব্দজ্ঞানে] যেমনই ধর্ম [হয়], অপশব্দজ্ঞানেও এইরূপ
অধর্ম [হয়], অথবা বহুতর অধর্ম প্রাপ্ত হয় । যেহেতু অপশব্দ বহুতর
[অধিকসংখ্যক]; শব্দ [সাধুশব্দ] অল্পতর [অল্পসংখ্যক] । এক একটি
সাধুশব্দের বহু অপভ্রংশ [আছে] । যেমন—‘গৌঃ’ এই সাধুশব্দের গাবী,

গোণী, গোতা, গোপোতলিকা—ইত্যাদি প্রকার অপভ্রংশ সকল [আছে] ॥ ৫৪ ॥

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার প্রথমেই ‘শব্দানুশাসন’ শাস্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে বলে—শব্দের স্বরূপ, শব্দজ্ঞানের প্রয়োজনের কথা বলে ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন উচিত—ইহা দেখিয়েছেন। তারপর ব্যাকরণশাস্ত্র কিভাবে শব্দের উপদেশ করে—তাহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করে, শব্দের প্রকার ভেদ, অর্থের স্বরূপ, শব্দ, অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধের নিত্যতা প্রতিপাদন পূর্বক শব্দ প্রয়োগের লোকব্যবহারপূর্বক কীর্তন করে ব্যাকরণের ধর্মনিয়মকারকতা প্রদর্শন করেছেন। তারপর ‘অপ্রযুক্ত শব্দের সংস্কারজনকতানিবন্ধন ব্যাকরণশাস্ত্র অপ্রমাণ’—এই প্রকার পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা খণ্ডন করে শব্দের প্রযুক্ততা স্থাপন করেছেন। এখন সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম অথবা প্রয়োগে ধর্ম—এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপনের নিমিত্ত প্রথমে পূর্বপক্ষ বাতীক অল্পসারে পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা প্রদর্শন করছেন—“কিং পুনঃ শব্দজ্ঞানে ধর্ম আহোস্থিৎ প্রয়োগে” ? সাধু-শব্দের জ্ঞান থেকে ধর্ম উৎপন্ন হয়, অথবা জ্ঞানে প্রয়োগ বা ব্যবহার করলে ধর্ম উৎপন্ন হয় ? এইরূপ পূর্বপক্ষীর বাক্য শুনে, ততস্থ কোন ব্যক্তি অথবা দ্বিতীয় কোন পূর্বপক্ষী—জিজ্ঞাসা করছেন—“কশ্চাত্ত বিশেষঃ ?” অর্থাৎ শব্দের জ্ঞান মাত্র থেকে যদি ধর্ম হয়, অথবা জ্ঞানপূর্বক শব্দের প্রয়োগ [উচ্চারণ] থেকে যদি ধর্ম হয়, তাহলে বিশেষ বা প্রভেদ কি ?

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষ রূপে বাতীককার বলেছেন—সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যদি ধর্ম হয় বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে অধর্মও হবে। “জ্ঞানে ধর্মঃ অথবা প্রয়োগে” এইরূপ স্থলে সপ্তমীর অর্থ ‘জনকতা’ বলে বুঝতে হবে। অর্থাৎ সাধুশব্দের জ্ঞান ধর্মের জনক বা প্রয়োগ, ধর্মের জনক। বাতীকে যে বলা হয়েছে—“জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেৎ, তথা অধর্মঃ” এর বথাক্রত অর্থ হচ্ছে—‘সাধুশব্দের জ্ঞান যদি ধর্মের জনক হয়, তাহলে সেইরূপ অধর্মের জনক হবে।’ কিন্তু যাঁহা ধর্মের জনক, তাহা আবার কিরূপে অধর্মের জনক হবে ? ধর্ম ও অধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ বলে, যেই বস্তু ধর্মের জনক হয়, সেই বস্তু অধর্মের জনক হতে পারে না! অতএব বাতীকগ্রন্থ অসঙ্গত মনে হয়। এইরূপ আশঙ্কা হলে মহাভাষ্যকারের কথা স্মরণ করতে হয়। মহাভাষ্যকার পূর্বে বলেছিলেন—“ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্” ব্যাখ্যা থেকে শব্দের

বিশেষ অর্থের জ্ঞান হয়, সন্ধেহবশত লক্ষণ বা লক্ষণবাক্য অলক্ষণ হয় না। এইজন্য মহাভাষ্যকার উক্ত বার্তিক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—শব্দের অর্থাৎ সাধুশব্দের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে, তার আত্মবদিক ভাবে অসাধু শব্দের জ্ঞান অবর্জনীয়ভাবে অর্জিত হয়ে যায়। ব্যাকরণ শাস্ত্র থেকে প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণজনিত সাধুশব্দের জ্ঞান হলে সেই সাধু শব্দ ভিন্ন অন্ত শব্দগুলি যে অসাধু এই জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে হবেই। তাকে বর্জন করা যাবে না। তাহলে এখন সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যদি ধর্ম স্বীকার করা হয়, সাধুশব্দের জ্ঞানের অবশ্রুত্বাবী রূপে অর্জিত অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মও হবে; অধর্ম অবশ্রুই স্বীকার করতে হবে। এইরূপ অর্থ করার বার্তিক গ্রন্থ অসঙ্গত হয় না। মহাভাষ্যকার এই কথা বলে, তারপর বলেছেন; অসাধু শব্দজ্ঞান থেকে কেবল অধর্ম হবে—এইমাত্র নয়; কিন্তু অধিক অধর্ম হবে। কারণ সাধু শব্দের অপেক্ষা অসাধু শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী। একটি সাধু শব্দকে জানলে সেই সাধু শব্দের পর্যায় অসাধু শব্দ অনেক থাকায়, অনেক অসাধু শব্দের জ্ঞান অবশ্রুত্বাবী হবে। তাতে একটি সাধুশব্দের জ্ঞানথেকে যদি একটি ধর্ম হয়, তাহলে তার পর্যায় অনেক অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অনেকগুলি অধর্ম হবে। একটি সাধু শব্দের জ্ঞানজন্য একটি ধর্ম যদি, অসাধু শব্দজ্ঞানজন্য অধর্মসমূহের মধ্যে একটি অধর্মকে নষ্ট করে—ইহা স্বীকার করা হয়, তাহলেও অসাধু শব্দ অনেক বলে, তজ্জন্য অধর্মের সংখ্যার আধিক্যই সিদ্ধ হবে। অসাধু শব্দের সংখ্যা যে অনেক বেশী তাহা জানাবার জন্য মহাভাষ্যকার বলেছেন ‘গৌঃ’ এই একটি সাধু শব্দের অশব্দরূপ অসাধু শব্দ গানী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা ইত্যাদি আছে। সুতরাং সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে উক্তরূপে বহু অধর্মও উপস্থিত হবে বলে স্বীকার করতে হবে ॥ ৫৪ ॥

মূল

[বার্তিক]

আচারে নিয়মঃ ॥ ৫ ॥

[মহাভাষ্য]

আচারে পুনঃ বিনিয়মং বেদয়তে—“তেহসুরা হেহলয়ো হেহলয় ইতি কুর্বন্তঃ পরাবত্ববু” রিতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ :—[শব্দের] প্রয়োগে নিয়ম [সাধুশব্দ প্রয়োগ করবে অসাধু-
শব্দপ্রয়োগ করবে না—এইরূপ নিয়ম] ॥ ৭ ॥ [বার্তিকানুবাদ] । [ভাষ্যানুবাদ]
বেদ [শব্দের] প্রয়োগ বিষয়ে নিয়ম জানান—সেই অস্বরেরা হে অলিগণ,
হে অলিগণ—এইরূপ উচ্চারণ করে পরাজিত হয়েছিল ॥ ৫৫ ॥

বিরূতি :—শব্দের [সাধুশব্দের] জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে, শব্দের জ্ঞান
লাভ করতে গেলে অসাধুশব্দের জ্ঞান অবশ্যভাবী বলে সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে
যেমন ধর্ম হবে, সেইরূপ অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মও হবে। এই হেতু—
শব্দের জ্ঞানে ধর্ম = এই পক্ষটি যুক্তিযুক্ত নয়। এই পক্ষটি বেদবিরুদ্ধ (২২০)।
অতএব বার্তিককার “শব্দের প্রয়োগে ধর্ম” এই পক্ষে নিয়মের কথা বলেছেন
“আচারে নিয়মঃ” এখানে বার্তিকে ‘আচার’ শব্দের অর্থ ‘প্রয়োগ’। সূত্ররং শব্দের
অর্থ সাধুশব্দের প্রয়োগে [উচ্চারণে] নিয়ম আছে বা নিয়ম জ্ঞাপিত হয়েছে।
মহাভাষ্যকার বার্তিক গ্রন্থের “নিয়ম” এর ব্যাখ্যা করেছেন “আচারে পুন ঋষি
নিয়মং বেদয়তে”। মহাভাষ্যের ঋষি শব্দের অর্থ বেদ। যেহেতু “তেহস্বরা”
ইত্যাদি বেদবাক্য ঋষিকর্তৃক রচিত নয়। যদিও মহাভাষ্যকার বেদসমূহ
বিভিন্ন ঋষি প্রণীত বলেছেন, তথাপি তাহা সর্বসম্মত নয় বলে, ঋষিশব্দের
এখানে ‘বেদ’ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বেদ নিয়ম জ্ঞাপন করেছেন—এই
কথা বলে মহাভাষ্যকার “তেহস্বরাঃ হেহলয়ঃ হেহলয়ঃ” ইত্যাদি” ঋতি
উদ্ধৃত করে নিয়মের জ্ঞাপন বৃথি দিয়েছেন। অস্বরেরা “হেহলয়ঃ হেহলয়ঃ”
ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অসাধু শব্দ উচ্চারণ করার ফলে পরাজিত হয়েছিল। এ
থেকে বুঝা যাচ্ছে যে অসাধুশব্দের প্রয়োগ থেকে অস্বরের অধর্ম হয়েছিল।
এ থেকে আরও বুঝা গেলে যে—‘সাধুশব্দের প্রয়োগ থেকে ধর্ম হয়।’ সূত্ররং
“তেহস্বরাঃ” ইত্যাদি ঋতি থেকে এই নিয়ম জ্ঞাপিত হল “সাধুশব্দের প্রয়োগ
করবে, অসাধুশব্দের প্রয়োগ করবে না।” এখানে এই নিয়মই বার্তিককারের
বার্তিকের তাৎপর্য। এই সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ : ৩ সংখ্যক মহাভাষ্যের
বিরূতিতে দ্রষ্টব্য। সাধুশব্দের প্রয়োগ থেকে যে ধর্ম হয়—তার জ্ঞাপক অত্র-
ঋতিও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে—“একঃশব্দঃ সম্যগ্জাতঃ স্প্রযুক্তঃ স্বর্গে
লোকে চ কামধুগ্ ভবতি।” ॥ ৫৫ ॥

(২২০) এবং ৮ প্রয়োগাদেবার্থবন্ধধোংপীতি জ্ঞানাকর্ম ইতি বেদবিরুদ্ধমিতি ভাষ্যঃ।—
মহাভাষ্যপ্রণীপোদ্যোত।

মূল

[মহাভাষ্য]

অন্ত তর্হি প্রয়োগে ।

[বার্তিক]

প্রয়োগে সর্বলোকস্য ॥ ৮ ॥

[মহাভাষ্য]

যদি প্রয়োগে ধর্মঃ, সর্বে লোকোহভ্যুদয়েন যজ্যেত ।
কশ্চেনানীং ভবতো মৎসরো যদি সর্বে লোকোহভ্যুদয়েন যজ্যেত ?
ন খলু কশ্চিৎসৎসরঃ । প্রযত্নানর্থক্যং তু ভবতি । ফলবতা চ নাম
প্রযত্নেন ভবিতব্যম্ । ন চ প্রযত্নঃ ফলাদ্ ব্যতিরেকেচ্যঃ । নন্তু চ যে
কৃতপ্রযত্নাস্তে সাধীয়াঃ শব্দান্ প্রযোক্ষ্যন্তে, ত এব সাধীয়োহভ্যুদয়েন
যোক্ষ্যন্তে ।

ব্যতিরেকোহপি বৈ লক্ষ্যতে—দৃশ্যন্তে হি কৃতপ্রযত্নাশ্চাপ্রবীণাঃ,
অকৃতপ্রযত্নাশ্চ প্রবীণাঃ । তত্র ফলব্যতিরেকোহপি স্যাৎ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ :—[মহাভাষ্য] তা হলে [শব্দের] প্রয়োগে [ধর্ম—এই পক্ষ]
হউক [স্বীকৃত হোক] । [বার্তিক] প্রয়োগে [ধর্ম এইপক্ষে] সকল
লোকের [ধর্ম প্রসঙ্গ হবে] । [মহাভাষ্য] যদি [শব্দের] প্রয়োগে ধর্ম হয়,
তা হলে সকল লোক [মাহুষ] অভ্যুদয়ের [স্বর্গাদি] দ্বারা যুক্ত হবে । [পূর্বপক্ষ]
যদি সমস্ত লোক অভ্যুদয়ের দ্বারা যুক্ত হয় [তাতে] এখন আপনার ঘেব কেন ?
[উত্তর] না আমার ঘেব নাই । প্রযত্নের ব্যর্থতা হয় । প্রযত্ন ফলজনক হওয়া
উচিত । প্রযত্ন ফলবানে থাকবে না এটা ঠিক নয় ।

[পূর্বপক্ষ] যাহারা প্রযত্ন করে তাহারা সাধুতরভাবে [উত্তমরূপে] শব্দের
[সাধুশব্দের] প্রয়োগ করবে, এবং তাহারাই [উত্তমরূপে] অধিকতর অভ্যু-
দয়ের দ্বারা যুক্ত হবে ? [উত্তর] ব্যতিরেকও দেখা যায়—দেখা যায় যারা
[ব্যাকরণশাস্ত্রে] প্রযত্ন করে তারা [শব্দপ্রয়োগবিষয়ে] অকুশল [হয়], আর
যারা [ব্যাকরণে] প্রযত্ন করে না, তারা [শব্দ প্রয়োগে] কুশল হয় । সেইস্থলে
[শব্দপ্রয়োগের কুশলতা ও অকুশলতায়] ফলের ব্যতিরেক ও হবে ॥ ৫৬ ॥

বিবৃতি—পূর্বে বাতি'ককার এবং মহাভাষ্যকার শব্দের প্রয়োগে নিয়মের কথা বলেছেন। তাতে মহাভাষ্যকার নিজের মতামতসারে বলেছেন—“অন্ত তর্হি' প্রয়োগে” অর্থাৎ শব্দের জ্ঞানে ধর্ম অথবা প্রয়োগে ধর্ম—এই দুই পক্ষের মধ্যে ‘জ্ঞানে ধর্ম’ এই পক্ষে দোষ বলা হয়েছে। ঐ পক্ষে যদি দোষ থাকে—আর প্রয়োগে যদি নিয়মই থাকে তা হলে “শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয়” এইপক্ষই স্বীকার করা হউক। ইহার উত্তরে অথবা এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বাতি'ককার শব্দের প্রয়োগপক্ষে দোষের আপত্তি দিচ্ছেন—“প্রয়োগে সর্বলোকশ্চ।” “শব্দের প্রয়োগে ধর্ম” এইপক্ষ স্বীকার করলে সকল লোকের ধর্ম ও তজ্জ্ঞ অভ্যুদয়ের [স্বর্গাদির] প্রসঙ্গ হবে। মহাভাষ্যকারও এই বাতি'কের ব্যাখ্যায় বললেন—যদি শব্দের প্রয়োগে ধর্ম স্বীকার করা হয়, তাহলে সব লোক অভ্যুদয় প্রাপ্ত হবে। বাতি'ককার ও মহাভাষ্যকারের এই কথায় কোন পূর্বপক্ষী বলেছেন—“কশ্চদানীং.....যুজ্যেত ?” যদি সাধুশব্দের প্রয়োগকরে ধর্মজ্ঞ অভ্যুদয়—সকল লোকের সম্ভাবিত হয়, তাহলে তো সেটা কোন দোষের নয়, পরন্তু তাহা মঙ্গলেরই হেতু হয়। আপনার [বাতি'ককারের ও ভাষ্যকারের] তাতে [সকলের অভ্যুদয় প্রাপ্তিতে] দ্বेष কেন ? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“ন খলু কশ্চিৎ.....ন চ প্রগত্বঃ ফলাদ্ ব্যতিরচ্যঃ”। না, আমার দ্বেষ নাই। সকল লোকে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হবে—এইটা দোষ নয়, কিন্তু প্রয়োগে ধর্ম স্বীকার করলে প্রযত্ব অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রযত্ব ব্যর্থ হবে। আমি ব্যর্থতা দোষের কথাই বলছি। শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হলে কেন ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যয়নপ্রযত্ব ব্যর্থ হবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাষ্যকার প্রযত্বের ব্যর্থতার কথা বলেছেন। অভিপ্রায় এই, শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হলে সকল লোক শব্দের প্রয়োগ করে ধর্মলাভ করবে। যারা ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রযত্ব করে নাই, তারাও শব্দের প্রয়োগ করে ধর্মপ্রাপ্ত হবে, আর ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রযত্ব করে, শব্দের প্রয়োগ যারা করবেন তাঁরাও তুল্যভাবে ধর্মপ্রাপ্ত হবেন। এতে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রযত্ব ব্যর্থ হল। কারণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রযত্ব না করে যদি ধর্ম বা তজ্জ্ঞ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহলে ব্যাকরণে প্রযত্বটি আর অভ্যুদয়ের কারণ হবে না। সুতরাং ব্যাকরণে প্রযত্ব ব্যর্থ হবে। অশ্রয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা কারণতা নির্ণয় হয়। তৎসৃষে তৎসত্তা—হচ্ছে অশ্রয়। তদসৃষে তদসত্তা হচ্ছে ব্যতিরেক। যেমন যুক্তিকা সৃষে

ঘটের সত্তা যুক্তিকা অসৎ ঘটের অসত্তা দেখা যায় বলে এইরূপ
 'অম্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান থেকে ঘটের প্রতি যুক্তিকার কারণতা জানা যায়।
 এইরূপ ব্যাকরণের প্রযুক্ত থাকলে যদি ধর্ম হয় তাহলে অম্বয় থাকবে। এবং
 ব্যাকরণের প্রযুক্ত না থাকলে যদি ধর্ম না হয়, তাহলে ব্যতিরেক থাকবে।
 কিন্তু ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করে সব লোক শব্দের প্রয়োগ করে যদি ধর্মপ্রাপ্ত
 হয়, তা হলে ব্যাকরণে প্রযুক্তের অভাবেও ধর্ম প্রাপ্ত হওয়ার ব্যতিরেক থাকলো
 না; ব্যতিরেকের ব্যাভিচার হল। সুতরাং ব্যাকরণে প্রযুক্তটা আর ধর্ম বা
 অভ্যাসের প্রতি কারণ হলো না। অতএব ব্যাকরণে প্রযুক্ত ব্যর্থ হবে।
 প্রযুক্তের ফল থাকা উচিত। প্রযুক্তটি ফলের আশ্রয়ে যদি না থাকে তাহলে
 প্রযুক্ত নিষ্ফল হয়। যেমন—অভ্যাসরূপফলের অধিকরণ যদি ব্যাকরণের
 অনধ্যয়নকারী ব্যক্তি হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিতে প্রযুক্তের অভাব থেকে
 যাবে। তাতে প্রযুক্তটি “ব্যতিরেক্য” অর্থাৎ ফলকে ছেড়ে থাকবে। সুতরাং
 ব্যাকরণ প্রযুক্ত ব্যর্থ হবে। কিন্তু এক্ষণ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ইহাই মহাভাষ্য-
 কারের বার্তিকব্যাখ্যার তাৎপর্য। মহাভাষ্যকার এইরূপ বলতে কোন
 পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেছেন—“নমু চ যে কৃতপ্রযুক্তা... যোক্ত্যন্তে?” যারা
 ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রযুক্ত করবেন তাঁরা উত্তমরূপে অধিক সাধু শব্দ প্রয়োগ
 করবেন; তাতে তাঁরা অধিক ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে অধিক অভ্যাস লাভ করবেন।
 আর যারা ব্যাকরণে প্রযুক্ত করবেন না তাঁরা সাধুশব্দের প্রয়োগ করলেও তত
 উত্তমরূপে বা অধিকভাবে সাধুশব্দের প্রয়োগ করতে পারবেন না। তাতে
 তাঁরা অধিক ধর্ম বা অভ্যাস প্রাপ্ত হবেন না। এইভাবে ব্যাকরণে প্রযুক্তের
 সার্থকতা আছে। ইহাই পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বার্তিকের অভিপ্রায় অম্বসারে বলেছেন—
 “ব্যতিরেকোহপি বৈ লক্ষ্যতে... তত্র ফলব্যতিরেকোহপি জ্ঞাতঃ।” অনেক
 সময় দেখা যায় যারা ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রযুক্ত করেছে, তারা শব্দ প্রয়োগে তত
 কুশল হয় না। আবার ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রযুক্ত করে নাই—এইরূপ অনেক
 লোক শব্দপ্রয়োগে বেশ কুশল হয়। যারা শব্দপ্রয়োগে কুশল হয়, তাদের
 ফলও নিশ্চয় ভাল হয়। আর যারা শব্দপ্রয়োগে কুশল হয় না—তাদের
 ফলেরও ন্যূনতা হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শব্দের প্রয়োগে ধর্ম স্বীকার
 করলে ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রযুক্ত ব্যর্থ হয় ॥ ৫৬ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

এবং তর্হি নাপি জ্ঞান এব ধর্মো নাপি প্রয়োগ এব । কিং তর্হি ?

[বার্তিক]

শাস্ত্রপূর্বকে প্রয়োগে অভ্যুদয়স্তত্ত্বল্যাং বেদশব্দেন ॥ ৯ ॥

[মহাভাষ্য]

শাস্ত্রপূর্বকং যঃ শব্দান্ প্রযুক্তে সোহভ্যুদয়েন যুজ্যতে ; তত্ত্বল্যাং বেদশব্দেন । বেদশব্দা অপ্যেবমভিবদন্তি “যোহগ্নিষ্টোমেন যজতে য উচৈনমেবংবেদ” “যোহগ্নিনাচিকেতং চিত্বতে য উ চৈনমেবং বেদ” [তৈঃ ব্রাঃ ৩।১।৭।২] ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ :—[মহাভাষ্যানুবাদ] তাহলে এইরূপে জ্ঞানেও [সাধুশব্দের জ্ঞানে] ধর্ম [হয়] না, প্রয়োগেও ধর্ম [হয়] না । প্রয়োগে ধর্ম [হয়] না । তাহা হলে কি ? [কোন বস্তু থেকে ধর্ম হয়] ?

[বাতিকাঙ্কবাদ] শাস্ত্রপূর্বক [ব্যাকরণের অধ্যয়নপূর্বক] প্রয়োগে [সাধুশব্দের প্রয়োগে] [ধর্ম], তাহা [শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগ] বেদ শব্দার্থের সহিত তুল্য ॥ ৯ ॥

[মহাভাষ্যানুবাদ] যে ব্যক্তি শাস্ত্রপূর্বক [ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যয়ন পূর্বক] শব্দ সকল [সাধুশব্দ সকল] প্রয়োগ করে সেই ব্যক্তি অভ্যুদয়ের [শ্রুগাদিকলের] দ্বারা যুক্ত হয় । বেদের শব্দ যে অর্থের বোধক সেই অর্থের সহিত তাহা [শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগ] তুল্য । বেদের শব্দও এইরূপ বলেন—“যিনি অগ্নিষ্টোম যাগ করেন এবং ঐ অগ্নিষ্টোমযাগকে এইরূপ জানেন ।” [তিনি যথার্থ ফল প্রাপ্ত হন] ।

“যিনি নাচিকেতনামক অগ্নির চয়ন [স্থণ্ডিলরচনাপূর্বক নাচিকেত অগ্নিহোপন ও তৎসাধ্য কর্ম] করেন এবং যিনি এই চয়নকে জানেন” [তিনি যথাযথ ফলপ্রাপ্ত হন] ॥ ৫৭ ॥

বিবৃতি :—সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে অসাধু শব্দজ্ঞানজনিত বহু অধর্ম এবং সাধুশব্দের প্রয়োগে ধর্ম স্বীকার করলে—ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রযুক্ত ব্যর্থ

হয়। এইভাবে বার্তিককার উভয়পক্ষেই দোষ দেখিয়ে এসেছেন। বার্তিক অহুসারে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“তাহলে জানেও ধর্ম হয় না। প্রয়োগেও ধর্ম হয় না।” উভয় পক্ষ নিষিদ্ধ হওয়ায় তটস্থ কোন ব্যক্তি বা কোন পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করছেন—“কিং তর্হি ?” তাহলে কি ? অর্থাৎ কিসে ধর্ম হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার সিদ্ধান্ত বসলেন—“শাস্ত্রপূর্বকে... বেদশব্দেন”। শাস্ত্রপূর্বক অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রকৃতপ্রত্যাদির জ্ঞানপূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করলে ধর্ম হয়। এবং সেই ধর্ম থেকে অভ্যুদয় হয়। কেবল প্রয়োগ থেকে ধর্ম স্বীকার করলে ব্যাকরণে প্রযত্ন ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রকৃতি-প্রত্যাদির জ্ঞানপূর্বক শব্দের [সাধুশব্দের] প্রয়োগে ধর্মস্বীকার করলে ব্যাকরণ প্রযত্ন ব্যর্থ হয় না। কারণ ব্যাকরণ অধ্যয়নে যত্ন না করলে প্রকৃতি প্রত্যাদির জ্ঞান হয় না। অতএব প্রকৃতি প্রত্যাদির জ্ঞানপূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ সম্ভব হয় না। যারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করে সাধুশব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁদের সেই প্রয়োগ প্রকৃতিপ্রত্যাদির জ্ঞানপূর্বক নয় বলে—সেই প্রয়োগ হতে ধর্ম হয় না। কিন্তু যারা ব্যাকরণাধ্যয়ন করে প্রকৃতিপ্রত্যাদির জ্ঞানপূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁরা ধর্ম ও ধর্মজন্ম অভ্যুদয়ের দ্বারা যুক্ত হন। অতএব ব্যাকরণে প্রযত্ন ব্যর্থ নয়। কেবল জানে ধর্ম হয় না। কেবল জানে ধর্ম না হলেও জ্ঞানপূর্বক প্রয়োগে ধর্ম হয়—ইহাই এখানে সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছে। মহাভাষ্যকার বার্তিকের এইরূপ ব্যাখ্যা করে ‘তত্ত্বল্যাং বেদশব্দেন’ এই বার্তিকাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন—বেদের শব্দসকলও এইরূপ বলেন—অর্থাৎ ‘জ্ঞানপূর্বক অহুষ্ঠানে ধর্ম বা অভ্যুদয় হয়—এই কথা বলেন। কেবল জানে বা কেবল অহুষ্ঠানে অভ্যুদয় হয় না। এই কথা বলে মহাভাষ্যকার দুইটি বৈদিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। ‘যিনি অগ্নিষ্টোম যাগের পদ্ধতি জেনে অগ্নিষ্টোম যাগ করেন তিনি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন।’ ‘যিনি নাটিকেত নামক অগ্নির চয়ন [চয়ন একপ্রকার কর্ম] জেনে—তার অহুষ্ঠান করেন—তিনি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন ?’ এই দুইটি দৃষ্টান্তে জ্ঞানপূর্বক অহুষ্ঠানে ধর্ম হয়—ইহাই বলা হয়েছে। ইহার তুল্য শব্দের প্রয়োগে অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যাদির জ্ঞানপূর্বক সাধু শব্দের প্রয়োগেও পূর্বোক্ত দুইটি বৈদিক স্থলের মত ধর্ম হয়। বার্তিকের ‘বেদশব্দেন’ এই শব্দের অর্থ হচ্ছে—‘বেদঃ শব্দঃ [অর্থবোধকঃ] যন্ত [অর্থস্ত]’ এইরূপ বহুব্রীহি সমাসনিষ্কাশ হয়ে বৈদিক অর্থের [অহুষ্ঠানের],

সহিত। বৈদিক অনুষ্ঠানের সহিত তুল্য হচ্ছে শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগ। অগ্নিষ্টোম জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠানে যেমন ধর্ম হয়, সেইরূপ ব্যাকরণজ্ঞাত প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি জ্ঞানপূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয় ॥ ৫৭ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অপর আহ তত্তুল্যাং বেদশব্দেনেতি। যথা বেদশব্দা নিয়ম পূর্বকমধীতাঃ ফলবন্তো ভবন্তি, এবং যঃ শাস্ত্রপূর্বকং শব্দান্ প্রযুক্তো সোহ ভূদয়েন যুজ্যত ইতি। অথবা পুনরন্তু জ্ঞান এব ধর্ম ইতি। ননু চোক্তং জ্ঞানে ধর্ম ইতি চেতুধাহ ধর্ম ইতি। নৈব দোষঃ। শব্দপ্রমাণকা বয়ম্, যচ্ছব্দ আহ—তদশ্মাকং প্রমাণম্। শব্দশ্চ শব্দজ্ঞানে ধর্মমাহ, নাপশব্দজ্ঞানেহ ধর্মম্। যচ্চ পুনরশিষ্টা-প্রতিষিদ্ধং নৈব তদোষায় ভবতি নাভূদয়ায়। তদ্যথা—হিক্তিত হসিত কণ্ডুয়িতানি নৈব দোষায় ভবন্তি নাভূদয়ায় ॥৫৮॥

অনুবাদ :- অপরে বলেন—“তত্তুল্যাং বেদশব্দেন” ইহার অর্থ, যেমন নিয়মপূর্বক অধীত বেদশব্দ ফলবান্ হয়, এইরূপ যে, শাস্ত্রপূর্বক [ব্যাকরণা-ধারনজনিত প্রকৃতিপ্রত্যয় জ্ঞানপূর্বক] শব্দের প্রয়োগ করে সে অভূদয়ের দ্বারা যুক্ত হয়।

অথবা [সাধুশব্দের] জ্ঞানেই ধর্ম হউক্। [পূর্বপক্ষী] বলা তো হয়েছিল = জ্ঞানে ধর্ম ইহা যদি [স্বীকার করা হয়] তাহলে সেইরূপ অধর্ম [হবে]। [উত্তর] না। এই দোষ হয় না। আমরা শব্দপ্রমাণবাদী, শব্দ যাহা বলে তাহা আমাদের প্রমাণসিদ্ধ। শব্দ - শব্দজ্ঞানে ধর্ম বলে, অপশব্দ জ্ঞানে অধর্ম বলে না। আর যে সকল শব্দ বিহিতও নয় নিষিদ্ধও নয়, তাহা দোষের কারণও হয় না, অভূদয়ের কারণও হয় না। যেমন হিকা, হাস্ত ও কণ্ডুয়ন শব্দ, দোষের হেতুও নয়, অভূদয়ের হেতুও নয় ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বাস :- “তত্তুল্যাং বেদশব্দেন” এই বার্তিকবাক্যাংশের ব্যাখ্যা মহাভাষ্যকার পূর্বেই করেছেন। সেই ব্যাখ্যায় ‘বেদশব্দটি’ বহুব্রীহি সম্বাস নিষ্পন্নরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। এখন ভাষ্যকার বলছেন অপরে বলেন—“বেদশব্দ” এই শব্দটি কর্মধারয় সম্বাসনিষ্পন্নরূপে গ্রহণ করতে হবে।

“বেদ এব শব্দ” ‘বেদশব্দ.’। বেদ শব্দ যেমন ব্রহ্মচর্যাঙ্গাদি নিয়মপূর্বক অধীত হলে ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ শাস্ত্রপূর্বক অর্থাৎ ব্যাকরণাধ্যয়নপূর্বক প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি জ্ঞানপূর্বক শব্দের প্রয়োগ করলে অত্যাশঙ্ক্য হবে। এইভাবে বাস্তবিকতারের সিদ্ধান্ত হল, শাস্ত্রপূর্বক প্রয়োগে ধর্ম হয়, কেবল জ্ঞানে বা কেবল প্রয়োগে ধর্ম হয় না। কিন্তু মহাভাষ্যকার কেবল জ্ঞানেও ধর্ম হয়—এই পক্ষ স্থাপন করবার জন্য বলছেন—“অথবা পুনরন্ত জ্ঞান এব ধর্ম ইতি।” সাধুশব্দের জ্ঞানেই ধর্ম হউক; কোন ক্ষতি নাই। তাতে পূর্বপক্ষী বলেন—“নহু চোক্তংঅধর্ম ইতি।” সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে—অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হবে—এই দোষের আপত্তি পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। পূর্বপক্ষীর এই কথার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলছেন “নৈষ দোষঃ; ... নাপশব্দজ্ঞানেই ধর্মম্।” সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম স্বীকার করলে সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ করতে হলে অসাধু শব্দের জ্ঞান অবশ্যজ্ঞাবী হলেও অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্মের আপত্তি হতে পারে না। কারণ সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যে ধর্ম হয়, তার বোধক শ্রুতিরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। ‘অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়’—এই বিষয়ে কোন শাস্ত্র প্রমাণ নাই। ধর্ম ও অধর্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ। উহার প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব অহুমানও সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শব্দই ধর্মাদর্ম সম্বন্ধে প্রমাণ। শাস্ত্র যদি বলে সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে ধর্ম হবে, তাহলে তাহা [সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম] প্রামাণিক হবে। শাস্ত্র যদি অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়—এই কথা না বলে তাৎপরে অসাধু শব্দের জ্ঞান অধর্মের জ্ঞানক হতে পারে না।

“একঃ শব্দঃ সম্যগ্জ্ঞাতঃ শাস্ত্রাস্থিতঃ সূত্রযুক্তঃ স্বর্গলোকে চ কামধুগ্ ভবতি” এই শ্রুতি থেকে জানা যাচ্ছে একটি শব্দ [সাধুশব্দ] সম্যগ্জ্ঞাত হলে স্বর্গে বা ইহলোকে কাম্য ফল প্রদান করে। এই ধরণের কোন শাস্ত্র নাই বাহা অসাধু শব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয়—এই কথা বলে। সুতরাং অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হতে পারে না বলে—‘সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম’ এইপক্ষ স্বীকারে কোন বাধা নাই। “অসাধু শব্দ জ্ঞানবে না” এইরূপ নিষেধ যদি শাস্ত্রে থাকতো তাহলে যেখানে যেখানে নিষেধ থাকে, সেই সেই স্থলে নিষেধের অহুষ্ঠান বা জ্ঞান থেকে অধর্ম হয় বলে, অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হত। কিন্তু ঐরূপ নিষেধও দেখা যায় না।

যে বিষয়ে কোন বিধি থাকে না বা নিষেধ থাকে না সেই বিষয় থেকে ধর্মও হয় না বা অধর্মও হয় না। মহাভাষ্যকার এর উদাহরণ দিচ্ছেন— যেমন হিকা, হাসা ও কণ্ঠ্যন ইত্যাদি। হিকার শব্দ, হাসার শব্দ বা কণ্ঠ্যনের শব্দ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন বিধান নাই; এবং নিষেধও নাই। অতএব ঐ হিকা প্রভৃতি কোন অভ্যাসেরও হেতু হয় না বা কোন প্রত্যাভ্যাসেরও হেতু হয় না। সুতরাং সাধুশব্দের জ্ঞানে অভ্যাসের কথার শাস্ত্রে আছে বলে জ্ঞানে ধর্ম স্বীকারে কোন অল্পপপত্তি নাই। আমরা [বৈয়াকরণর] শব্দকে প্রমাণ স্বীকার করি—ইহাই মহাভাষ্যকারের তাৎপৰ্য ॥ ৫৮ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অথবাহি ভূপায় এবাপশব্দজ্ঞানং শব্দজ্ঞানে। যো হি অপশব্দজ্ঞানাতি শব্দানপ্যসৌ জানাতি। তদেবং জ্ঞানে ধর্ম ইতি ক্রবতোহি র্থাদাপন্নং ভবতি—অপশব্দজ্ঞানপূর্বকে শব্দজ্ঞানে ধর্ম ইতি।

অথবা কুপখানকবদেতৎ ভবিষ্যতি। তদ্ যথা কুপখানকঃ কুপং খনন্ যতপি মৃদা পাংসুভিচ্চাবকীর্ণো ভবতি সোহপ্সু সঞ্জাতাসু তত এব তং গুণমাসাদয়তি, যেন স চ* দোষো নির্হণ্যতে, ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবতি। এবমিহাপি যতপি অপশব্দজ্ঞানেহ ধর্মস্তথাপি যন্তুসৌ শব্দজ্ঞানে ধর্মস্তেন চ+স দোষো নির্ধানিষ্যতে, ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবিষ্যতি। যদপুচ্যতে আচারে নিয়ম ইতি, যাজ্ঞে কর্মণি স নিয়মোহি ত্রানিয়মঃ(২২১)। এবং হি জ্ঞায়তে যর্বাণস্তর্বাণো নাম ঋষয়ো বভূবুঃ প্রত্যক্ষধর্মণঃ পরাবরজ্ঞা বিদিতবেদিতব্য। অধিগত

*. যন চ স দোষো' পাঠান্তর।

+ 'তেন স চ বোবো' পাঠান্তর।

(২২১) 'যজ্ঞে যুশব্দপ্রয়োগাক্রমোঃ পশব্দপ্রয়োগাদবধি ইতি তত্রৈব তয়োঃ প্রত্যাগনিয়মঃ। তদ-
তিরিক্তস্থলে তু যুশব্দাপশব্দয়োঃ প্রয়োগঃ নিয়মঃ।' উদ্যোত।

যাথাতথ্যাঃ । তে তত্রভবন্তো যদ্বান স্তদ্বান ইতি প্রযোক্তব্যে
যবানস্তবান ইতি প্রযুক্ততে । যাজ্ঞে পুনঃ কর্মণি নাপভাষন্তে ।
তৈঃ পুনরনুরৈ যাজ্ঞে কর্মণি অপভাষিতম্, ততস্তে পরাভূতাঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ :—অথবা অপশব্দের জ্ঞান, [সাধু] শব্দের জ্ঞানে উপায়। যে
‘অপশব্দ জানে’ সে শব্দ সাধুশব্দ ও জানে। সুতরাং এইরূপ হলে [সাধুশব্দের
জ্ঞানে অপশব্দজ্ঞান উপায় হলে] ‘জ্ঞানে ধর্ম’ এই কথা বলা থেকে অর্থাৎ প্রাপ্ত
হয়—অপশব্দ জ্ঞান পূর্বক [সাধু] শব্দের জ্ঞানে ধর্ম [হয়]।

অথবা ইহা [অপশব্দের জ্ঞান জন্ত অধর্ম ও সাধুশব্দের জ্ঞান জন্ত ধর্ম] কুপ
খনন কারীর মত হবে। যেমন কুপ খননকারী ব্যক্তি কুপ খনন করে যদিও
মাটি এবং কাদার দ্বারা যুক্ত হয়, [তথাপি] [কুপে] জল উদ্ভূত হলে, সেই ব্যক্তি
সেই জল হতে সেই [সেই এমন] গুণ প্রাপ্ত হয়, যে গুণের [জলের গুণের] দ্বারা
সেই দোষ [কর্দম, ধূলি প্রতিতিদোষ] নিবৃত্ত করা হয়, এবং অধিকতর অভ্যাসের
[মঙ্গল গুণের] সহিত [তাহার] যোগ হয়। এইরূপ এখানেও [শব্দজ্ঞানেও] যদিও
অপশব্দের জ্ঞানে অধর্ম [হয়] তথাপি শব্দ [সাধুশব্দ] জ্ঞানে সেই যে ধর্ম [হয়]
তাহার দ্বারা সেই দোষ [অধর্মদোষ] বিনষ্ট করা হয় এবং অধিকতর অভ্যাসের
[অপূর্বের] দ্বারা যোগ হয়। আর যে বলা হয় ‘হয়েছে’ আচারে [শব্দপ্রয়োগে]
নিয়ম [আছে], সেই নিয়ম যজ্ঞকর্মে [প্রয়োজ্য], যজ্ঞকর্মভিন্ন স্থলে অনিয়ম।
এইরূপ শোনা যায় [ঋতিবাক্য শোনা যায়]—যোগজ প্রত্যক্ষের দ্বারা ধর্মজ্ঞান
সম্পন্ন, পরা ও অপরাবিষ্ঠাসম্পন্ন, জ্ঞাতব্যবিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন, তত্ত্বসাক্ষাৎ
কারবান্, যবান তবান নামক ঋষিগণ ছিলেন। সেই পূজ্য ঋষিগণ
‘যবা নঃ’ ‘তবা নঃ’ এইরূপ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে—‘যবানঃ’ ‘তবানঃ’
এইরূপ প্রয়োগ করেছিলেন। [তাঁরা] কিন্তু যজ্ঞকর্মে অপভাষা [অপভ্রংশাদি
অসাধুশব্দ] প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু সেই অস্বরেরা যজ্ঞকর্মে অপভাষা
[অশুদ্ধ শব্দ] প্রয়োগ করেছিল; সেই হেতু তারা পরাজিত হয়েছিল ॥৫৯॥

বিরুদ্ধি :—মহাভাষ্যকার শব্দের [সাধুশব্দের] ‘জ্ঞানে ধর্ম’ এই পক্ষ স্বীকার
করে, অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয় না ইহা দেখিয়ে এসেছেন। এখন তিনি
অন্তরূপে অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয় না—অথচ সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম হয়—
ইহা প্রতিপাদন করবার জন্ত বলেছেন “অথবা অভ্যাসায় এব……শব্দজ্ঞানে
ধর্ম ইতি।” শব্দের [সাধুশব্দের] জ্ঞান অর্জন করতে গেলে অপশব্দ অর্থাৎ

অসাধুশব্দের জ্ঞান অবশ্যস্বাভাবী। অপশব্দগুলিকে অপশব্দরূপে জানলে, তা থেকে ভিন্নরূপে শব্দের জ্ঞান হয়। সুতরাং সাধুশব্দের জ্ঞানলাভে অপশব্দের জ্ঞান উপায় অর্থাৎ সহকারী কারণ বলে, অপশব্দের জ্ঞানের কোন পৃথক্ ফল নাই। সাধুশব্দজ্ঞানের নাস্তরীয়ক [অবশ্যস্বাভাবী] হচ্ছে অসাধুশব্দের জ্ঞান। এইজন্তু তার পৃথক্ ফল নাই। অতএব অপশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হতে পারে না। এই বিষয়ে নাগেশ একটি দৃষ্টান্ত বলেছেন। অগ্নি আনয়ন করতে গেলে পাত্রের আনয়ন অগ্নি আনয়নের নাস্তরীয়ক [অবশ্যস্বাভাবী], অগ্নি আনয়নের ফল থেকে পাত্র আনয়নের পৃথক্ ফল নাই। সেইরূপ সাধুশব্দের জ্ঞানে অসাধুশব্দের জ্ঞান নাস্তরীয়ক [অবশ্যস্বাভাবী] বলে, অসাধুশব্দের জ্ঞানের পৃথক কোন ফল নাই। অতএব সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম হলেও, অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয় না। এইজন্তু মহাভাষ্যকার বলেছেন—যে অপশব্দ জ্ঞানে সেই সাধুশব্দ জ্ঞানে। সুতরাং ‘জ্ঞানে ধর্ম’ এইপক্ষে অর্থাৎ পাওয়া যায়—অপশব্দের জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে ধর্ম হয়।

শব্দের জ্ঞানে ধর্ম হয়, অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয় না—ইহা মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত। তিনি এই সিদ্ধান্ত বলার পর—“তুয়াতু দুর্জনঃ” এই শ্রায়ে ‘অসাধুশব্দের জ্ঞানে অধর্ম হয়’ ইহা অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার করে নিয়েও “সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম” এই পক্ষটিকে ব্যবস্থাপিত করছেন—“অথবা কুপখানকবদিত্যাদি... ভূয়সা চাত্ত্যদয়েন যোগো ভবিষ্যতি”। পর্বন্ত ঐশ্বের দ্বারা ‘অভ্যুপগমবাদ’ দেখান হয়েছে। দুর্জন ব্যক্তিকে সহসা বশীভূত করা কষ্টকর, এইজন্তু সে যা চায়, প্রথমে তাকে তার প্রার্থিত বস্তুর কিয়দংশ দিয়ে দিতে হয়। সে তার প্রার্থিত বস্তু পেলে আপাতত তুষ্ট হয়। ইহাকে ‘তুয়াতু দুর্জনঃ’ শ্রায় বলে। এখানে অসাধু শব্দের জ্ঞানে যদিও অধর্ম হয় না—ইহা মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত, তথাপি “অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়” ইহা স্বীকার করে নিয়ে, সেই অধর্মদোষের পরিহার ধর্ম থেকে হবে—বলে কুপখানকের উপমা দিয়েছেন। কুপ খনন করতে গেলে শরীরে কাশা মাটি লাগবেই। কিন্তু কুপ খনন করা হয়ে গেলে, সেই কুপ থেকে যে জল বেরোয়, সেই জলের দ্বারা কুপখননকারী ব্যক্তি শরীরে লগ্ন কর্দম ও শুষ্ক যুক্তিকা প্রকালন করে ফেলে, আর অধিকতাবে কূপের জলে স্নান আচমন পানাদি কার্য নিষ্পাদন করে।

সেইরূপ সাধুশব্দের জ্ঞানলাভ করতে গেলে অসাধুশব্দের জ্ঞান অবশ্যস্বাভাবী বলে; যদিও সেই অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়, তথাপি সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যে উৎকৃষ্ট ধর্ম বা ধর্মের ফল অভ্যাসের উপর হয়, সেই ধর্মের দ্বারা অসাধুশব্দজ্ঞান জ্ঞাত অল্প অধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, অধিকন্তু ধর্মের উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। তবে প্রশ্ন হতে পারে—পূর্বে বার্তিকে এবং মহাভাষ্যে—বলা হয়েছিল এক একটি সাধুশব্দের অনেক অপশব্দ আছে; অতএব সাধুশব্দ অপেক্ষা অসাধু শব্দ অনেক বেশী বলে সাধু শব্দের জ্ঞান থেকে যে পরিমাণ ধর্ম হবে, অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে তার অপেক্ষা অধিক অধর্ম হবে। অল্প ধর্ম অধিক অধর্মকে নষ্ট করতে পারে না। সুতরাং এখানে কুপখননের উপমা সঙ্গত হতে পারে না। কুপের বহুজলের দ্বারা শরীরের অল্প কাদা মাটি ধোয়া যায়। কিন্তু সাধুশব্দ জ্ঞানজ্ঞাত অল্পধর্ম বা ধর্মফলের দ্বারা অসাধুশব্দ জ্ঞান জন্য প্রচুর অধর্ম ধ্বংস করা যায় না। এর উত্তরে বলা যায়—পূর্বে যে বার্তিক ও মহাভাষ্যে—অসাধু শব্দের প্রাচুর্য বশত প্রচুর অধর্মের আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাহা পূর্বপক্ষীর মতে করা হয়েছিল। পূর্বপক্ষীর সেইমত ঠিক নয়। অধর্মের প্রাচুর্য হবে—এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। শাস্ত্রের বিধি বাক্যের দ্বারা ধর্ম বোধিত হয়। এইজন্ত ধর্ম উৎকৃষ্ট বা ধর্মের ফল উৎকৃষ্ট। সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে যে ধর্ম হয়—তার প্রমাণ শাস্ত্র বাক্য হচ্ছে ‘একঃ শব্দঃ’ ইত্যাদি, কিন্তু অসাধু শব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়—এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রবাক্য নাই। সাধুশব্দের জ্ঞান থেকে ধর্ম হয়—ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ হওয়ায়, কল্পনা করা হয়, সাধুশব্দের বিপরীত হচ্ছে অসাধু শব্দ, অতএব অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম হয়। ইহা কল্পনীয় বলে অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে প্রচুর অধর্ম হয়, ইহা সিদ্ধ হতে পারে না, কিন্তু অল্প অধর্ম হয়, তাহাও অভ্যাসগমবাদে। অতএব সাধুশব্দজ্ঞানজ্ঞাত বহুতর ধর্মের দ্বারা অসাধুশব্দ জ্ঞানজ্ঞাত অল্প অধর্ম নষ্ট হতে পারে বলে ‘কুপ খননটি’ এ স্থলে উপমা হতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগজন্ত যে প্রচুর ধর্ম হয়, সেই ধর্মের দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদিযাগে পশু হিংস্রজন্ত অল্প অধর্মকে সঙ্ক করা যায় (২২২)। অবশ্য সাংখ্যেরা ধর্ম জ্ঞাত অধর্মের

(২২২) ব্রহ্মসংহিতা হি পুণ্যসম্ভারোপনীত বর্গব্রহ্মমহাভূতাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাণিষ্যাণোপা দত্তাঃ
হুঃস্বধিকপিকাস্। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী সাংখ্যকারিকা-২

বিনাশ স্বীকার করেন না। কিন্তু এখানে মহাভাষ্যকার কুপখানকের উপমা দিয়ে বলেছেন সাধুশব্দজ্ঞানজন্ম ধর্মের দ্বারা অধর্ম দোষ নষ্ট হয়। “ধর্মন্তেন চ স দোষো নির্ধানিষ্যতে।” অতএব অসাধুশব্দের জ্ঞান থেকে অধর্ম স্বীকার করলেও সেই অধর্ম, সাধুশব্দজ্ঞানজন্ম ধর্মের দ্বারা নষ্ট হয়ে যাবে, আরও সাধুশব্দ জ্ঞানজন্ম উৎকৃষ্ট ধর্মের দ্বারা উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি হবে। মহাভাষ্যে যে “কুপখানকঃ” শব্দটি আছে তাহা। “কুপশ্ব খানকঃ” এইরূপ বিগ্রহে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নিম্পন্ন। আর “খানকঃ” শব্দটি খন [অবদারণে] ধাতুর উত্তর থল্ প্রত্যয় [থল্‌তৃচো ৩।১।১৩৩] করে নিম্পন্ন হয়েছে। যদিও ‘কুপংখনতি’ এইরূপ বিগ্রহে “কর্মণ্য্ [৩।২।১]” সূত্রে অণ্ প্রত্যয় করে ‘কুপখান’ পদ সিদ্ধ হত, তথাপি ‘বাহসরূপোহ স্ত্রিয়াম্ [৩।১।৩৪] অর্থাৎ কৃৎ প্রকরণে স্ত্রীলিঙ্গে অধিকার ভিন্ন অসমানরূপ সামান্যশাস্ত্রকে বিশেষ শাস্ত্র বিকল্পে বাধা দেয়—এই নিয়মে ‘অণ্’ প্রত্যয়রূপ বিশেষ বিধি সামান্য ‘ম্বল’ প্রত্যয়কে পক্ষে বাধা দেয় নাই বলে খন্‌ ধাতুর উত্তর থল্‌ করে ‘খানক’ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। কুপখানকবৎ = ‘কুপ-খানকেন ইব’ এইরূপ তৃতীয়ান্ত পদের উত্তর ইবার্থে বতি প্রত্যয় হয়েছে। ‘এতৎ = অসাধুশব্দজ্ঞানজন্ম অধর্ম’। মৃদা = কদমের দ্বারা। পাংস্থতিঃ = শুষ্ক মৃস্তিকা দ্বারা। অবকীর্ণঃ = লিপ্ত। তত এব = জল হতেই। আসাদয়তি = প্রাপ্ত হয়। যেন = যোগ্যকর্তৃক। কর্তায় তৃতীয়া। নির্হণ্যতে = নিব্‌ + হন্‌ ধাতুকর্মবাচ্যে লট্‌ ত, ‘হন্তে’ [৮।৪।২২] সূত্রে গত। ‘শব্দজ্ঞানে ধর্মন্তেন চ স দোষঃ নির্ধানিষ্যতে’। এই ভাষ্যে ‘তেন’ শব্দের অর্থ সেই ধর্ম কর্তৃক। কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া করে ‘তেন’ সিদ্ধ হয়েছে। নির্ধানিষ্যতে = নিব্‌ + হন্‌ ধাতু কর্মবাচ্যে লট্‌ ত। ‘স্মিচসীষুটতাসিষু ভাবকর্মণৌরূপদেশেহ জ্ঞানগমদৃশাং বা চিগ্‌বদিট্‌ চ’ [১।৪।৬১] সূত্রে কর্মবাচ্যে বিকল্পে চিগবৎ ও ইট্‌ হয়েছে। ‘হো হন্তেগ্রিণ্‌রেষু’ [৩।৭।৫৪] সূত্রে হন্‌ ধাতুর হকার স্থানে ‘ষ’ হয়েছে।

এইভাবে মহাভাষ্যকার ‘সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম’ এই পক্ষ স্বীকার করে অসাধু শব্দের জ্ঞানজনিত অধর্ম দোষের পরিহার করলেন। এখন বার্তিককার যে বলেছিলেন “আচারে নিয়মঃ” অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগে নিয়ম—সাধুশব্দ প্রয়োগ করবে, অসাধুশব্দ প্রয়োগ করবে না। এই নিয়মের বিষয় মহাভাষ্য-কার খণ্ডন করার জন্ত বলেছেন—“যদপ্যুচ্যতে—আচারে নিয়ম ইতি……—

‘তত্ত্বেন্ণ পরাকৃত্যঃ।’ সাধু শব্দের প্রয়োগ করবে অসাধু শব্দের প্রয়োগ করবে না—এই নিয়ম সর্বত্র নয়, কিন্তু যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্মে এই নিয়ম। ‘ব্রাহ্মণেন ন য়েচ্ছিত্বৈ নাপভাষিত্বৈ’ ব্রাহ্মণ অপভাষা বলবে না—এই নিষেধ যজ্ঞাদি কর্মে; সর্বত্র নয়। অর্থাৎ যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্মে অসাধু শব্দের প্রয়োগ করবে না, কিন্তু সাধু শব্দের প্রয়োগ করবে। যজ্ঞাদি কর্মে অসাধু শব্দের প্রয়োগ থেকে অধর্ম হয়। যজ্ঞাদিভিন্নস্থলে অসাধু শব্দের প্রয়োগে অধর্ম হয় না। যদি বলা যায় যজ্ঞাদিকর্মভিন্নস্থলে অসাধু শব্দের প্রয়োগ করলে যে অধর্ম হয় না, কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মে অসাধু শব্দের প্রয়োগে অধর্ম হয়, তা জানলে কি করে? তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন ‘যবর্ণান্তবর্ণঃ’ নামক কয়েকজন ঋষি ছিলেন। তাঁরা যজ্ঞাদিকর্মভিন্ন স্থলে—“যদ্বা নঃ তদ্বা নঃ” অর্থাৎ যজ্ঞাদিব্যতিরিক্তস্থলে ‘যদ্বা’ যে বস্তু ‘তদ্বা’ সেই বস্তু হোক, তাতে আমাদের কি? এই অর্থে “যদ্বা নন্তব্বা নঃ” এইরূপ প্রয়োগ করা উচিত ছিল, তা না করে তাঁরা “যবর্ণঃ তবর্ণঃ” এইরূপ প্রয়োগ [অপভাষা প্রয়োগ] করেছিলেন। যজ্ঞে তাঁরা অপভাষা প্রয়োগ করেন নাই। এই জন্ত তাঁদের পরাজয় হয় নাই। কিন্তু অসুরেরা যজ্ঞ কর্মেই “হে অরয়ঃ হে অরয়ঃ” এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্তে “হেহলয়ঃ হেহলয়ঃ”, এইরূপ অসাধু শব্দের প্রয়োগ কবেছিল, তাতে তারা দেবতাদের নিকট পরাজিত হয়েছিল। সেই পরাজয় থেকে বুঝা যাচ্ছে যজ্ঞ কর্মে অসাধু শব্দের প্রয়োগবশত অসুরদের অধর্ম হয়েছিল। আর ঋষিদের যজ্ঞ-কর্মে অসাধু শব্দের প্রয়োগ না করায় অধর্ম হয় নাই। ঋতিতে বর্ণিত আছে—সেই ঋষিগণ “যবর্ণান্তবর্ণঃ” বলেছিলেন—এই হেতু তাঁদের নাম হয়ে গেল যবর্ণান্তবর্ণ ঋষি। সেই ঋষিদের চারটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে, —প্রত্যক্ষধর্মণঃ, পরাবরজ্ঞাঃ, বিদিতবেদিতব্যঃ ও অধিগতযাথাতথ্যাঃ। উহার অর্থ যথা—প্রত্যক্ষধর্মণঃ = প্রত্যক্ষঃ ধর্মঃ যেবাং তে’ অর্থাৎ যোগজ-সাক্ষাৎকার দ্বারা যারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। অথবা যোগাভ্যাসজনিত ঋষিদের প্রত্যাক্রূপধর্ম ছিল। পরাবরজ্ঞাঃ = পরা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, অবরা অর্থাৎ অপরা বিদ্যা—যারা সেই পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা জানেন।

বিদিতবেদিতব্যঃ = বিদিতং বেদিতব্যং যেবাম্। জ্ঞাতব্য বস্তুকে যারা শ্রবণ মনন ও নির্দিধ্যাসন দ্বারা জানেন। অধিগতযাথাতথ্যাঃ = অধিগতং

বাখাতথ্যং যৈঃ । ‘যখাতথ্য’ এই শব্দের উত্তর স্বার্থে—ব্যঞ্ প্রত্যয় করে বাখাতথ্যং সিদ্ধা হয়েছে । যারা বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর যখাতথ্য স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন ।

ঋষিদের এইরূপ বিশেষণ থেকে বুঝা যাচ্ছে তাঁরা ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছিলেন । তাঁরা যজ্ঞকর্মে অপভাষা প্রয়োগ করেন নাই—এই কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানীদেরও কর্মে অধিকার আছে (২২৩) ।

মহাভাষ্যকার এবং হি ক্ষয়তে বলে—যে শ্রুতি উদ্ধৃত করেছেন উহা কোন্ শ্রুতিতে আছে তাহা জানা যায় নাই । যা হোক এখানে মহাভাষ্যকার সাধু শব্দের জ্ঞানে ধর্ম ইহা প্রতিপাদন করেছেন, এবং যজ্ঞাদি কর্মে শব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয় ইহাও সূচনা করেছেন । আর শাস্ত্র পূর্বক প্রয়োগে ধর্ম ইহা ভো বার্তিকের সিদ্ধান্ত ॥৫২॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অথ ব্যাকরণমিত্যন্ত শব্দস্য কঃ পদার্থঃ ? সূত্রম্ ।

[বার্তিক]

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোহনুপপন্নঃ ॥ ১০ ॥

[মহাভাষ্য]

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থো নোপপত্ততে ব্যাকরণস্য সূত্রমিতি । কিং হি তদন্ত্য সূত্রাদ্য ব্যাকরণং যস্তাদঃ সূত্রং স্তাৎ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ :- [মহাভাষ্যানুবাদ [আচ্ছা] ‘ব্যাকরণম্’ এই শব্দের অর্থ কি ? [একদেশীর উত্তর] সূত্র ।

[বার্তিকানুবাদ] ব্যাকরণ শব্দের অর্থ সূত্র হলে ষষ্ঠী বিভক্তির [ব্যাকরণস্য সূত্রম্] অর্থ অনুপপন্ন [হয়] ॥১০॥

[মহাভাষ্যানুবাদ] সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হলে ‘ব্যাকরণের সূত্র’ এইরূপ ষষ্ঠী

বিভক্তির অর্থ উপপন্ন [যুক্ত] হয় না। সূত্র থেকে সেই ব্যাকরণ কি ভিন্ন, বাস্তব এইসূত্র হবে ? ৬০॥

বিবৃতি :—ব্যাকরণের দ্বারা শব্দের [সাধুশব্দের] অনুশাসন করা হবে—ইহাই মহাভাষ্যকারের “অথ শব্দানুশাসনম্” থেকে আরম্ভ করে এযাবৎ গ্রন্থের সংক্ষেপে বক্তব্য। আর ব্যাকরণ ব্যতিরেকে প্রযাজ্য প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত করা যায় না [ন চাস্তুরেণ ব্যাকরণঃ প্রযাজ্যঃ সবিভক্তিকাঃ কার্ণাঃ] এবং [অধ্যায়ঃ ব্যাকরণম্] ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত—ইহা মহাভাষ্যকার পূর্বে বলে এসেছেন। মোট কথা ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে ইহা বলা হয়েছে। এখন ‘ব্যাকরণ’ এই শব্দের অর্থ কি? ইহা জানাবার জন্য বিচার করা হচ্ছে। প্রথমেই প্রশ্ন করা হয়েছে ‘ব্যাকরণ এই শব্দের অর্থ কি? এই প্রশ্ন কোন পূর্বপক্ষী করেছে অথবা কোন তটস্থ ব্যক্তি করেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আপাতত মহাভাষ্যকার বললেন ‘সূত্রম্’। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ। যদিও ইহা মহাভাষ্যকারের সিদ্ধান্তের একদো, তথাপি তিনি আপাতত উত্তর দিয়েছেন এইজন্য—এর উপর বিচারের অবকাশ হবে, তাতে বিচার করে শেষে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত বর্ণিত হবে। মহাভাষ্যকারের এই উত্তরে, অথবা বার্তিকগ্রন্থের অবতারণার বীজরূপে মহাভাষ্যকারের এই উক্তিভে বার্তিককার বলেছেন ‘সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠীর্থোহনুপপন্নঃ।’ ‘সূত্রে ব্যাকরণে’ এখানে ভাবে সপ্তমী। ‘সূত্রে ব্যাকরণে সতি’ অর্থাৎ ‘সূত্র ব্যাকরণশব্দের অর্থ হলে’ ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ অযুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন “রামস্ত গৃহম্” রামের ঘর। রাম ভিন্ন পদার্থ আর গৃহ ভিন্ন পদার্থ। রামের সঙ্গে গৃহের স্বত্বস্বামিত্ব সম্বন্ধ থাকার, সেই সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয়েছে। কিন্তু ‘ঘটের কলস’ এইরূপ ষষ্ঠীর ব্যবহার হয় না। যেহেতু ঘট ও কলস অভিন্ন বস্তু। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র-গুলিকে ব্যাকরণ বললে, সূত্র এবং ব্যাকরণ অভিন্ন পদার্থ হবে। তাতে লোকের [শিষ্টব্যক্তিদেরও] যে ব্যবহার আছে “ব্যাকরণস্ত সূত্রম্” ‘ব্যাকরণের সূত্র’ এইরূপ ব্যবহারে ষষ্ঠীর অর্থ অনুপপন্ন হয়ে যাবে। যদি ব্যাকরণ এবং সূত্র ভিন্ন পদার্থ হয়, তাহলে তাদের কোন ভেদসম্বন্ধ বুঝাবার জন্য ‘ব্যাকরণের সূত্র’ এইরূপ প্রয়োগ হতে পারবে। কিন্তু সূত্রেই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে ‘ব্যাকরণের সূত্র’ এইরূপ প্রয়োগের অনুপপত্তি হবে। সুতরাং সূত্র ভিন্ন কোন বস্তুকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলা হউক—ইহাই মহাভাষ্যকারের = পূর্বপক্ষরূপে তাৎপর্য ॥ ৬০ ॥

মূল

[বার্তিক]

শব্দাপ্রতিপত্তিঃ ॥ ১১ ॥

[মহাভাষ্য]

শব্দানাং চাপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি—ব্যাকরণাচ্ছব্দান্ প্রতিপত্ত্বা-
মহ ইতি । ন হি সূত্রত এব শব্দান্ প্রতিপত্ত্বন্তে । কিং তর্হি ?
ব্যাখ্যানতশ্চ । ননু চ তদেব সূত্রং বিগ্রহীতং ব্যাখ্যানং ভবতি । ন
কেবলানি চর্চাপদানি ব্যাখ্যানম্—বুদ্ধিঃ আৎ ঐচ্ ইতি । কিং তর্হি ?
উদাহরণং প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহার ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং
ভবতি ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] শব্দের জ্ঞানের অভাব [প্রাপ্ত হয়] ।
[মহাভাষ্যানুবাদ] শব্দসমূহের জ্ঞানের অভাব প্রাপ্ত হয় । যেহেতু [লোকে]
সূত্র থেকেই শব্দ সকলের জ্ঞানলাভ করে না । তাহলে কি ? [কি থেকে
শব্দের জ্ঞান হয় ?] ব্যাখ্যা থেকেও [শব্দের জ্ঞান হয়] । সেই সূত্রই
বিগ্রহেত [বিগ্রহ করা হলে] হলে ব্যাখ্যা হয় । কেবল [সূত্রের] পদগুলির
বিভাগ করলে ব্যাখ্যা হয় না—যেমন :—‘বুদ্ধিঃ’ ‘আৎ’, ‘ঐচ্’—[এইভাবে
সূত্রের পদগুলির বিভাগ করলেই ব্যাখ্যা হয় না] তাহলে কি ? [কি করলে
ব্যাখ্যা হয় ?] । উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ বাক্যের অধ্যাহার—এই সমস্ত
মিলিত হয়ে ব্যাখ্যা হয় ॥ ৭১ ॥

বিবৃতি :—সূত্রকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বললে “ব্যাকরণশ্চ সূত্রম্”
এইরূপ লোকব্যবহৃত ষষ্ঠীর অঙ্গুপপত্তি হবে । ইহা পূর্বে বার্তিককার ও
ভাষ্যকার বলেছেন । এখন সূত্রকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে আর একটি
দোষের আপত্তি হয়—তাহাই বার্তিককার বলেছেন—“শব্দাপ্রতিপত্তিঃ” ।
‘ব্যাকরণ থেকে আমরা শব্দ সকল জানি’—লোকের এইরূপ ব্যবহার হয়,
সেই ব্যবহারের অঙ্গুপপত্তি হয়ে যাবে । যেহেতু ব্যাখ্যারহিত কেবল সূত্র
শ্রবণ করে লোকের শব্দের জ্ঞান হয় না । সুতরাং কেবল সূত্রকে ব্যাকরণ

শব্দের অর্থ বললে, লোকের “ব্যাকরণ থেকে শব্দ জানি” এইরূপ ব্যাকরণ থেকে শব্দপ্রতিপত্তিবিসয়ক ব্যবহার অল্পপন্ন [অযুক্ত] হয়ে যাবে। মহাভাষ্যকার এই জ্ঞাত—“ন হি সূত্রেত এব শব্দান্ প্রতিপত্ত্বৈ” সূত্র থেকেই লোকে শব্দ জানে না।

তবে কি থেকে লোকে শব্দ জানে? এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়ে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“ব্যাখ্যানতশ্চ” অর্থাৎ সূত্র এবং ব্যাখ্যা থেকে শব্দজ্ঞান হয়। ‘চ’ পদের দ্বারা সূত্রকেও বুঝান হয়েছে। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী বলেছেন “নহু চ তদেব.....ব্যাখ্যানং ভবতি।” সেই একই সূত্রকে যখন বিগৃহীত করা হয়—অর্থাৎ পদগুলিকে বিভক্ত করে দেখান হয় তখন সেই সূত্রই ব্যাখ্যা হয়।

তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“ন কেবলানি চর্চাপদানি ঐচ্ ইতি।” ‘চর্চা’ শব্দের অর্থ অভ্যাস। ‘চর্চাপদানি’—শব্দের অর্থ হচ্ছে—অভ্যাসের জ্ঞাত বিভক্ত পদ সকল। যেমন বেদের অভ্যাস করবার জ্ঞাত বেদাধ্যায়ীরা বেদবাক্যের পদগুলিকে বিভক্ত করে পাঠ করেন, সেইরূপ ব্যাকরণের সূত্রের পদগুলিকে কেবল বিভক্ত করলেই সূত্রের ব্যাখ্যা হয় না। “বুদ্ধিরাদৈচ্” এই সূত্রটির পদগুলিকে ‘বুদ্ধিঃ আং ঐচ্’ এইভাবে বিভক্ত করলেই ব্যাখ্যা হয় না। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করছেন “কিং তর্হি?” অর্থাৎ ব্যাখ্যা কাকে বলে? উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেন—উদাহরণ, প্রত্যাধাহরণ, বাক্যাধ্যাহার ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি।”

সূত্রের পদগুলির বিগ্রহ, উদাহরণ, প্রত্যাধাহরণ ও বাক্যের অধ্যাহার—এই সব মিলিত হলে তবে ব্যাখ্যা হয়। যেমন “বুদ্ধিরাদৈচ্” এই সূত্রে আদৈচ্, বুদ্ধিসংজ্ঞাঃ স্তাং এইরূপ বাক্যশেষের অধ্যাহার করতে হবে। তারপর উদাহরণ দিতে হবে—ইহ + এহি = ইহেহি, এখানে ‘ঐ’ বুদ্ধি। প্রত্যাধাহরণ = উদাহরণের বিপরীত হচ্ছে প্রত্যাধাহরণ। যেমন—উপ + ইন্দ্রঃ = উপেন্দ্রঃ। এখানে ‘এ’ বুদ্ধি নয়। এইসব হচ্ছে ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা পাঁচ প্রকার বলে জ্ঞাত কথিত আছে! যথাঃ—মূল শ্লোক বা সূত্রের (১) পদগুলির বিভাগ প্রদর্শন করা, (২) পদের অর্থ কথন, (৩) সমস্ত পদের সমাসবাক্য প্রদর্শন...

(৪) বাক্যের অর্থ দেখান, (৫) মূল বাক্যের অর্থের উপর আক্ষেপ অর্থাৎ আশঙ্কা দেখিয়ে তার সমাধান প্রদর্শন করা (২২১)।

কেহ কেহ আক্ষেপকে একটি পৃথক্ ব্যাখ্যা বলি সমাধানকে তাৎকে পৃথক্ বলেন; তাঁদের মতে ব্যাখ্যা ৬ প্রকার। অপরে বলেন (১) উপোদ্যাত [উপক্রমণিকা], (২) পদ, (৩) পদের অর্থ, (৪) পদের বিগ্রহ, (৫) চালনা [বিশ্লেষণ], (৬) প্রত্যবস্থা [বাক্যের অর্থ] এই ছয় প্রকার ব্যাখ্যা (২২৫) ॥ ৬১ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

এবং তর্হি শব্দঃ ।

[বার্তিক]

শব্দে ল্যুড়র্থঃ ॥ ১২ ॥

[মহাভাষ্য]

যদি শব্দে ব্যাকরণং ল্যুড়র্থো নোপপত্ততে । ব্যাক্রিয়তেহেনেনেতি ব্যাকরণম্ । ন হি শব্দেন কিঞ্চিদ্ ব্যাক্রিয়তে । কেন তর্হি ? সূত্রেণ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ :—[ভাষ্যানুবাদ] তাহলে এইরূপ অবস্থায় [সূত্রে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ স্বীকার করলে পূর্বোক্ত দোষ হওয়ায়] শব্দ [সাধুশব্দ] [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হউক]

(২২৪) পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যবোজনঃ ।

আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

[গীতা উপোদ্যাত শব্দরভাষ্যের আনন্দগিরিকৃত টীকায় উক্ত]

পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যবোজনঃ ।

আক্ষেপোহন সমাধানং ব্যাখ্যানং বড়বিধংমতম্ ॥

[পরিত্যক্তশব্দশব্দের ভৈরবীটীকায় উক্ত]

পরামর উপপুরাণের ১৮শ অধ্যায়ে অন্তরূপ পাঠ আছে

পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যবোজনঃ ।

আক্ষেপেনু সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

(২২৫) উপোদ্যাতঃ পদকেব পদার্থঃ পদবিগ্রহঃ ।

চালনা প্রত্যবস্থাস্ত ব্যাখ্যা তত্রস্ত বড়বিধাণা

[কিতীশচাঁটাজীর পঞ্চশাহিক ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত]

[বার্তিকানুবাদ] শব্দে [ব্যাকরণ] এই শব্দের অর্থ যদি ‘শব্দ’ হয় তাহলে] ‘লুট্’ প্রত্যয়ের অর্থ [অল্পপন্ন হয়] ।

[মহাভাষ্যানুবাদ] যদি শব্দ [সাধুশব্দ] ব্যাকরণ [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হয়] [তাহলে] ‘লুট্’ প্রত্যয়ের অর্থ উপপন্ন [যুক্ত] হয় না । বাহার দ্বারা ব্যাকৃত করা হয় অর্থাৎ ব্যুৎপাদন [প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিশ্লেষণ] করা হয়, তাহা ব্যাকরণ । শব্দের দ্বারা কোন কিছু ব্যাকৃত করা হয় না । তাহলে কিসের দ্বারা [কিসের দ্বারা ব্যাকৃত করা হয়] ? সূত্রের দ্বারা [ব্যাকৃত করা হয়] ॥ ৬২ ॥

বিশ্বাস্তি :—সূত্রকে ‘ব্যাকরণ’ এই শব্দের অর্থ স্বীকার করলে যষ্টীর অর্থ ‘অল্পপন্ন হয় এবং শব্দের অপ্রতিপত্তি হয় । এই দুইটি দোষ দেখান হয়েছে ।

এইজন্য আশঙ্কা করা হচ্ছে তাহলে শব্দকে অর্থাৎ সাধুশব্দকে ‘ব্যাকরণ’ এই শব্দের অর্থ স্বীকার করা হউক । মহাভাষাকার সেই আশঙ্কা দেখিয়েছেন “এবং তর্হি শব্দঃ” । সূত্রপক্ষে পূর্বোক্ত দোষদ্বয় থাকায় ‘শব্দই’ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হউক । এই আশঙ্কার উত্তরে বার্তিকার বলছেন—“শব্দে ল্যুডর্থঃ” এই বার্তিকের সঙ্গে “ন উপপত্ততে” এইরূপ বাক্যাংশের অধ্যাহার করে অর্থ বুঝতে হবে । শব্দকে অর্থাৎ সাধুশব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলে স্বীকার করলে “ব্যাকরণম্” এই শব্দে যে ল্যুট্ প্রত্যয় হয়েছে, সেই ‘ল্যুট্’ প্রত্যয়ের অর্থ উপপন্ন হবে না । কেন উপপন্ন হবে না—ইহা বুঝাবার জন্য মহাভাষাকার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—“ব্যাক্রিয়তে অনেন” এইরূপ করণবাচ্যে বিপূর্বক আঙপূর্বক কৃধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করে ‘ব্যাকরণ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে । তার অর্থ হচ্ছে যার দ্বারা শব্দকে ব্যাকরণ অর্থাৎ ব্যুৎপাদন করা যায় তাহাই ব্যাকরণ । সূত্রের দ্বারা শব্দকে ব্যুৎপাদন করা হয় । এইজন্য ব্যুৎপাদনের করণ হচ্ছে সূত্র, আর কর্ম হচ্ছে শব্দ । ‘ব্যাকরণ’ শব্দটি করণবাচ্যে ল্যুডন্ত বলে—যার দ্বারা ব্যাকরণ অর্থাৎ ব্যুৎপাদন করা হয় তাকে ব্যাকরণ বলা হবে । যাকে ব্যুৎপাদন করা হয় সেই কর্মকে ব্যাকরণ শব্দ বলা যাবে না । শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে শব্দের দ্বারা কোন বস্তুকে ব্যাকরণ করা হয় না বলে, করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থ অসঙ্গত হয়ে যাবে । সূত্রের দ্বারা শব্দকে ব্যাকরণ বা ব্যুৎপাদন করা হয় বলে—সূত্রকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ স্বীকার

করলে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থ উপপন্ন হয়। কিন্তু সূত্রে পক্ষে পূর্বে অন্ত দোষের
দেখান হইয়াছে। প্রশ্ন হতে পারে কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় দেখা যায়। যেমন—
“রাজভোজনাঃ শালয়ঃ” এই স্থলে ভূজ্যন্তে যে তে ভোজনাঃ” অর্থাৎ বাকে
ভোজন করা হয়, এইরূপ কর্মবাচ্যে ভূজ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করা হইয়াছে।
তারপর “রাজঃ ভোজনাঃ” এইরূপ কতৃষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সঙ্গে সমাস করে “রাজ
ভোজনাঃ” শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেইরূপ এখানেও “ব্যাক্রিয়তে যৎ তৎ
ব্যাকরণম্” এইরূপ কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় কবে, শব্দকেই ব্যাকৃত করা হয় বলে
শব্দই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলে স্বীকৃত হউক। এতে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থের
অনুপপত্তি হবে না। এর উত্তরে কৈয়ট এবং নাগেশ বলেছেন কর্মবাচ্যে ল্যুট্
প্রত্যয়, কদাচিৎ কোন স্থলে, যেখানে উপায় নাই, সেইরূপ স্থলে স্বীকার করা
হয়, সর্বত্র হয় না। অতএব ‘ব্যাকরণ’ শব্দে কর্মবাচ্যে ল্যুট্ করা যাবে না
(২২৬) ॥ ৬২ ॥

মূল

[বার্তিক]

ভবে চ তদ্ধিতঃ ॥ ১৩ ॥

[মহাভাষ্য]

ভবে চ তদ্ধিতো নোপপত্ততে—ব্যাকরণে ভবো যোগো বৈয়া-
করণ ইতি। ন হি শব্দে ভবো যোগঃ। ক তর্হি? সূত্রে ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] ভব [তত্রভবঃ—সেখানে উদ্ভূত] অর্থে
তদ্ধিত [প্রত্যয়] [উপপন্ন হবে না—যদি শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ স্বীকার
করা হয়]। [মহাভাষ্যানুবাদ] ভব অর্থাৎ তাহাতে আছে বা উদ্ভূত
এই অর্থে তদ্ধিত [প্রত্যয়] উপপন্ন হবে না। ব্যাকরণে উদ্ভূত যে যোগ

(২২৬) শব্দ ইতি করণে ল্ভাড্ বিধীয়তে। শব্দে ব্যাক্রিয়মাৎপদং কর্ম, ন তু করণমিতি
ভাবঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

ননু রাজভোজনা ইতিবৎ কর্মণি ল্যুটি ন দোষোহত আহ করণে ইতি। কর্মণি, সতু কদাচিৎক
ইতি ভাবঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোক্তোক্ত।

[সম্বন্ধ] বৈয়াকরণ [এই ভাবে যে ভব অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করে বৈয়াকরণ শব্দ নিম্পন্ন হয়, তাহা উপপন্ন হবে না—বদি শব্দ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হয়]। যেহেতু শব্দে যোগ উৎপন্ন হয় না। তা হলে কোথায়? [কোথায় যোগ উৎপন্ন হয়?]। সূত্রে [যোগ উৎপন্ন বা উদ্ভূত হয়] ॥ ৩৩ ॥

বিবৃতি :—শব্দকে 'ব্যাকরণ' এই শব্দের অর্থ বললে দ্বিতীয় দোষের আপত্তি দিচ্ছেন বার্তিককার “ভবে চ তদ্ধিতঃ”। ‘তত্র ভবঃ’ অর্থাৎ সেই খানে আছে বা উৎপন্ন হয় বা অভিব্যক্ত হয় এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেমন ‘মথুরায়াং ভবঃ মাথুরঃ’ মথুরা দেশে যে জন্মে বা থাকে সে মাথুর। এইরূপ ব্যাকরণে ভব অর্থাৎ বিজ্ঞমান যে যোগ [সম্বন্ধ] এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় [অণ্] করে ‘বৈয়াকরণ’ শব্দ নিম্পন্ন হয়। কিন্তু শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ স্বীকার করলে এইরূপ ভব অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় অমুপপন্ন হবে। কারণ “শব্দে আছে যে যোগ” এইরূপ অর্থ অসঙ্গত। শব্দে যোগ [শব্দে] থাকে না। কিন্তু সূত্রে যোগ [শব্দে] থাকে ॥ ৩৩ ॥

মূল

[বার্তিক]

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ ॥ ১৪ ॥

[মহাভাষ্য]

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা নোপপত্তন্তে, পাণিনিনা প্রোক্তং পাণিনীয়ম্। আপিশলম্, কাশকৃৎস্নম্ ইতি। ন হি পাণিনিনা শব্দাঃ প্রোক্তাঃ। কিং তর্হি? সূত্রম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] [শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ স্বীকার করলে] প্রোক্ত [কথিত] প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় সকল [অমুপপন্ন হয়ে যাবে]। [মহাভাষ্যানুবাদ] [শব্দ ব্যাকরণ শব্দার্থ হলে] প্রোক্ত প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় সকল উপপন্ন হয় না। পাণিনি কর্তৃক প্রোক্ত পাণিনীয়ম্। [অপিশলি কর্তৃক প্রোক্ত] আপিশলম্, [কাশকৃৎস্ন কর্তৃক প্রোক্ত] কাশকৃৎস্নম্। কিন্তু পাণিনি কর্তৃক শব্দ কথিত হয় নাই। তা হলে কি? [পাণিনি কর্তৃক কৃি কথিত হয়েছে]। সূত্র কথিত হয়েছে ॥ ৬৪ ॥

বিবৃতি :—শব্দের ব্যাকরণশব্দার্থ পক্ষে বার্তিককার তৃতীয় দোষ দিয়েছেন “প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ ।” প্রোক্তার্থক তদ্ধিত প্রত্যয় এবং অত্রাত্ম অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়ে থাকে । যেমন পাণিনি কর্তৃক প্রোক্ত ‘পাণিনীয়’ । অপিশলি কর্তৃক প্রোক্ত ‘আপিশল’ ইত্যাদি । শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে এই প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় অযুক্ত হয়ে যাবে । পাণিনি কর্তৃক শব্দ প্রোক্ত হয় নাই, কিন্তু সূত্রই প্রোক্ত হয়েছে । ‘সূত্র’ ব্যাকরণ শব্দার্থ হলে পাণিনি কর্তৃক সূত্র কথিত হয়েছে বলে “পাণিনীয়ম্” ইত্যাদি স্থলে প্রোক্তার্থক তদ্ধিত উপপন্ন হয় । শব্দ পক্ষে তাহা অযুক্ত হয়ে যায় ॥ ৬৪ ॥

মূল

কিমর্থমিদমুভয়মুচ্যতে ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি ; ন প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইত্যেব ভবেহপি তদ্ধিতশ্চোদিতঃ স্মাৎ ? পুরস্তাদিদমাচার্যেণ দৃষ্টম্—ভবে চ তদ্ধিত ইতি, তৎ পঠিতম্ । তদন্তর-কালমিদং দৃষ্টং প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি, তদপি পঠিতম্ । নচেদানী-মাচার্ঘাঃ সূত্রাণি কুত্ৰা নিবর্তয়ন্তি ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ :—ভব অর্থে তদ্ধিত এবং প্রোক্তাণ্যর্থক তদ্ধিত এই উভয় কি অন্য বলা হয়েছে, প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত [এইমাত্র] বলা হয় নাই কেন ? [প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত] এইমাত্র বললেই ‘ভব’ অর্থে তদ্ধিত আশঙ্কিত হয়ে যায় ?

আচার্য [বার্তিককার] পূর্বে ‘ভব অর্থে তদ্ধিত’ ইহা দেখেছেন [পাণিনি সূত্রে দেখেছেন], সেইহেতু তাহা [ভব অর্থে তদ্ধিতের কথা] বলেছেন । তারপর ‘প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত’ ইহা দেখেছেন ; এইহেতু তাহাও [প্রোক্তাণ্যর্থক তদ্ধিতের কথা] বলেছেন । আচার্য [কাত্যায়ন] এখনই সূত্র করে অর্থাৎ বার্তিক রচনা করে, তাহা নিবৃত্ত করেন নাই ॥ ৬৫ ॥

বিবৃতি :—মহাভাষ্যকার এখানে বার্তিকের উপর একটি আশঙ্কা উঠিয়ে তার সমাধান করেছেন । বার্তিককার বলেছেন শব্দ যদি ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হয় তাহলে ‘ভব’ অর্থে তদ্ধিত অল্পপন্ন হবে । তারপর বলেছেন প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত অল্পপন্ন হবে । মহাভাষ্যকার বলেছেন প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত

প্রত্যয় সকলের মধ্যেই তো ভব অর্থে তদ্ধিত অন্তর্ভূত। হুতরাং প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিত সকল অল্পপন্ন হয় এই কথাই বার্তিককার বলতে পারতেন। তা না বলে তিনি একবার ভবঅর্থে তদ্ধিতের অল্পপত্তি, তার পর প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিতসকলের অল্পপত্তি এইরূপ উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ করে বললেন কেন? মহাভাষ্যকার এইরূপ বার্তিককারের উপর আশঙ্কা করে তার উত্তর দিয়েছেন—বার্তিককার কাত্যায়ন প্রথমে ভব অর্থে তদ্ধিত হয় ইহা পাণিনি সূত্রে দেখেছেন, এই জন্য সেই ভব অর্থে তদ্ধিতের অল্পপত্তির কথা বলেছেন। তারপর বার্তিককার দেখলেন প্রোক্ত প্রভৃতি অর্থেও তা তদ্ধিত হয়। তাহা দেখে পরে আবার প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিতের অল্পপত্তির কথা বলেছেন। যেমন সামান্য সূত্রের দ্বারা কোন বিষয় প্রতিপাদন করে, বিশেষসূত্রের দ্বারা সেই বিষয় প্রতিপাদন করা হয়, সেইরূপ বার্তিককারও অল্পপত্তি দেখাবার জন্য প্রথমে ভব অর্থে তদ্ধিতের, তারপর প্রোক্তাদি অর্থে তদ্ধিতের কথা বলে ‘শব্দ’ কে ব্যাকরণ শব্দের বাচ্যার্থ থেকে নিবৃত্ত করেছেন। এতে বার্তিককারের কোন দোষ হয় নাই ॥ ৬ : ॥

মূল

অয়ং তাবদদোষো যচ্চ্যতে “শব্দে ল্যুড়র্থ” ইতি। নাবশ্যং করণাধিকরণয়োরেব ল্যুড়্বিধীয়তে। কিং তর্হি? অতোহপি কারকেষু—কৃত্যল্যুটো বহুলম্ [৩৩।১১৩] ইতি তদ্ যথা—প্রক্কন্দনং প্রপতনমিতি। অথবা শব্দৈরপি শব্দা ব্যাক্রিয়ন্তে—তদ্ যথা গৌরিত্যুক্তে সর্বে সন্দেহা নিবর্তন্তে—নাশো ন গর্দভ ইতি ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ :- “শব্দে ল্যুড়র্থঃ” [‘ব্যাকরণ’ এই শব্দের অর্থরূপে ‘শব্দকে’ গ্রহণ করলে ল্যুট্ প্রত্যয়েব অর্থের অল্পপত্তি হয়] এই যে বলা হয়েছে—এই দোষ হয় না। করণবাচ্যে বা অধিকরণ বাচ্যেই অবশ্য ল্যুট্ প্রত্যয়ের বিধান করা হয়; তা নয়। তাহলে কি? [অন্ত কোন অর্থে ল্যুট্ বিহিত হয়]? “কৃত্যল্যুটো বহুলম্” এই সূত্রে অত্র কারকেও [ল্যুটের বিধান হয়]। যেমন—প্রক্কন্দন, প্রপতন।

অথবা শব্দের দ্বারাও শব্দের ব্যাকরণ [ব্যুৎপাদন] করা হয়। যেমন ‘গৌঃ’ ইহা বললে—অশ্ব নয়, গর্দভ নয়, এইভাবে সকল সন্দেহ নিবৃত্ত হয় ॥ ৬৬ ॥

বিবৃতি :—শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে বার্তিককার যে দোষ দিয়েছিলেন “শব্দে ল্যুডর্থঃ” অর্থাৎ ব্যাকরণ শব্দে করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থের অল্পপত্তি হয় ; মহাভাষ্যকার সেই দোষ উদ্ধার করবার জন্য বলেছেন —“অয়ং তাবদদোষো.....প্রস্বন্দনং প্রপতনমিতি ।”

করণকারকে এবং অধিকরণ কারকেই যে ল্যুট্ হবে—এইরূপ ঐকান্তিক নিয়ম নাই। অত্কারকেও ল্যুটের বিধান আছে। “কৃত্যল্যুটো বহুলম্” এই শ্লোকে যেখানে যে বাচ্যে বা কারকে কৃত্যপ্রত্যয় বা ল্যুট্ প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় সেখানে বহুলভাবে কৃত্য ও ল্যুট্ হয়।

অতএব ‘ব্যাকরণ’ শব্দে কর্মকারকে ল্যুট্ প্রত্যয় করলে ‘ব্যাক্রিয়ন্তে যৎ’ [তৎ শব্দস্বরূপম্] বাহাকে ব্যাকৃত করা হয়—এই অর্থে ল্যুট্ প্রত্যয় করলে—ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থ অল্পপত্তি হয় না। কারণ শব্দকেই ব্যাকৃত করা হয় বলে কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় সঙ্গত হয়। অত্কারকে ল্যুটের উদাহরণ মহাভাষ্যকার প্রদর্শন করেছেন—প্রস্বন্দনং প্রপতনমিতি। ‘প্রস্বন্দতি অশ্বাৎ’ প্রপততি অশ্বাৎ’ এইরূপ অপাদানকারকে এখানে ল্যুট্ হয়েছে। যদিও “ভীমানয়োহপাদানং” [৩।৪।৭৪] এই শ্লোকে অপাদানকারকে ভীমানিগণের অন্তর্গত বলে প্রস্বন্দন ও প্রপতন শব্দ সিদ্ধ হয় তথাপি সেই “ভীমানয়োহপাদানং” প্রভৃতি শ্লোকে ‘কৃত্যল্যুটো বহুলম্’ এই শ্লোকের বিস্তার বলে “প্রস্বন্দন” প্রভৃতি শ্লোকে ‘কৃত্যল্যুটো বহুলম্’ শ্লোকে ল্যুট্ প্রত্যয় হতে কোন বাধা নাই।

এখন কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে ব্যাকরণ শব্দ নিষ্পাদন করলেও বার্তিকের “শব্দে ল্যুডর্থঃ” এই অল্পপত্তির পরিহার হয় না। কারণ বার্তিককারের অভিপ্রায় হচ্ছে বিপূঃ আঙ্ পূঃ কৃৎ করণে ল্যুট্ করে এই ব্যাকরণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, এখন কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করে শব্দকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলে প্রতিপাদন করলেও করণবাচ্যে ল্যুটের অর্থের অল্পপত্তি তো থেকেই গেল। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন — “অথবা শব্দৈরপি শব্দা ব্যাক্রিয়ন্তে—তদ্ যথা গো রিত্যুস্তে সর্বে সন্দেহা নিবর্তন্তে নাথো ন গর্দভ ইতি ।” ‘ব্যাক্রিয়ন্তে অনেন’ এইরূপ করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করলেও ‘শব্দ’ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হতে পারে। বাহার দ্বারা শব্দকে ব্যাকৃত করা যায়

তাহাকে ব্যাকরণ বললেও শব্দকে ব্যাকরণ বলা যায়। কারণ শব্দের ঘায়াও শব্দকে ব্যাকৃত করা হয়। যেমন মহাভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ‘গৌঃ’ এই শব্দ বললে গৌশব্দের বাচ্য অর্থের নিশ্চয় হয়, সেইরূপ অশ্ব প্রভৃতি শব্দ সান্নাদিমান্ বস্তুর বাচক নয়— ইহাও বুঝা যায়। অতএব ব্যাকৃতি হচ্ছে বিপরীত নিবৃত্তি এবং সদৃশ সংগ্রহ। “গৌঃ” শব্দ স্থলে বিপরীত অশ্বাদির বাচকতা নিবৃত্তি এবং সান্নাদিমান্ অত্যাগ্ গোবাক্তি সকলের সংগ্রহ। এইরূপ “স্বক্দ্ৰুপাশ্চঃ” শব্দ বললে প্রক্দ্ৰুপাশ্চঃ, দধ্যানয়নম্, ইত্যাদি সদৃশ শব্দের যেমন জ্ঞান হয়, সেইরূপ দৈত্যারিঃ, উপেন্দ্র ইত্যাদি শব্দের নিবৃত্তি হয়। অতএব করণবাচ্যে ল্যাট্ প্রত্যয় করে ব্যাকরণ শব্দ নিষ্পন্ন করলেও অমুপপত্তি হয় না ॥ ৬৬ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অয়ং তর্হি দোষঃ—ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি। এবং তর্হি—

[বার্তিক]

লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্ ॥ ১৫ ॥

[মহাভাষ্য]

লক্ষ্যং চ লক্ষণং চৈতৎসমুদিতং ব্যাকরণং ভবতি। কিং পুনর্লক্ষ্যং, কিং বা লক্ষণম্? শব্দো লক্ষ্যঃ, সূত্রং লক্ষণম্। এবমপ্যয়ং দোষঃ—সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দঃ প্রবৃত্তোহবয়বে নোপপদ্যতে। সূত্রাণি চাপ্যধীমান ইষ্যতে—বৈয়াকরণ ইতি। নৈষ দোষঃ। সমুদায়েষু হি শব্দাঃ প্রবৃত্তা অবয়বেষুপি বর্তন্তে, তদ্ যথা—পূর্বে পঞ্চালাঃ, উত্তরে পঞ্চালাঃ, তৈলং ভুক্তম্, য়তং ভুক্তম্, শুক্লো, নীলঃ, কপিলঃ কৃষ্ণ ইতি। এবময়ং সমুদায়ে ব্যাকরণ শব্দঃ প্রবৃত্তোহবয়বেষুপি বর্ততে। অথবা পুনরন্তু সূত্রম্। নহু চোক্তম্ সূত্রে ব্যাকরণে স্বর্ধ্যর্থোহমুপপন্ন ইতি? নৈষদোষঃ—ব্যপদেশিবদ্ধ্যাবেন ভবিষ্যতি। বদপ্যচ্যতে—শব্দাপ্রতিপত্তিরিতি; ন হি সূত্রত এব শব্দান্ প্রতি-

পাঠ্যে। কিং তর্হি? 'ব্যাক্যানতশ্চ' ইতি। পরিত্রুতমেতৎ—
'তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাক্যানং ভবতি' ইতি। নম্বু চোক্তম্—'ন
কেবলানি চর্চাপদানি ব্যাক্যানম্—বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্' ইতি। কিং
তর্হি? উদাহরণং প্রত্যাদাহরণং বাক্যাধ্যাহার ইত্যেতৎ সমুদিতং
ব্যাক্যানং ভবতি' ইতি। অবিজ্ঞানত এতদেবং ভবতি। সূত্রত এব হি
শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। আতশ্চ সূত্রত এব, যো হ্যৎসূত্রং কথয়েন্নাদো
গৃহ্যেত ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ :—'ভাষ্যানুবাদ' তা হলে এই দোষ 'থেকে গেল' ভব অর্থে
তদ্বিত এবং প্রোক্তার্থক তদ্বিত। এইরূপ হলে—[বার্তিকানুবাদ] লক্ষ্য
এবং লক্ষণ [এই উভয়ই] ব্যাকরণ [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ]।

[মহাশাখ্যানুবাদ] লক্ষ্য এবং লক্ষণ এই সমুদায় ব্যাকরণ [ব্যাকরণ
শব্দের অর্থ] হয়। লক্ষ্য কি? এবং লক্ষণই বা কি? শব্দ [হচ্ছে] লক্ষ্য।
আর সূত্র [হচ্ছে] লক্ষণ। এইরূপ হলেও এই দোষ [হয়]—ব্যাকরণ শব্দ
সমুদায়ে প্রবৃত্ত [হওয়ায়] অবয়বে [অবয়বকে বুঝাতে] উপপন্ন হয় না। অথচ
সূত্র সকলের অধ্যয়নকারী ব্যক্তিতেও বৈয়াকরণ [এইরূপ শব্দের প্রয়োগ]
স্বীকার করা হয়। না, এই দোষ হয় না। সমুদায়ে প্রবৃত্ত শব্দ সকল
অবয়বেও প্রবৃত্ত হয়। যেমন পূর্ব পঞ্চাল দেশ, উত্তর পঞ্চাল দেশ। তৈল
পান করেছে, স্নাত ভোজন করেছে। শুল্ক, নীল, কপিল [কটা রং] কৃষ্ণ
ইত্যাদি। এইরূপ সমুদায়ে [প্রবৃত্ত] এই ব্যাকরণ শব্দ অবয়বেও প্রবৃত্ত
হতে পারে। অথবা সূত্র [ব্যাকরণ শব্দের অর্থ] হউক। আজ্ঞে বলা হয়েছে,
সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হলে বগীর অর্থ অল্পপন্ন হয়? না—এই দোষ হয় না।
ব্যপদেশিবস্তাবে [অভেদে ভেদের আরোপ করে] হবে [বগীর অর্থ উপপন্ন
হবে]। আর যে বলা হয়েছিল শব্দের অপ্রতিপত্তি। সূত্র হতেই শব্দ জানে
না। তাহলে কি? ব্যাখ্যা হতে [শব্দ জানে]। ইহার পরিহার করা
[এর উত্তর দেওয়া] হয়েছে—সেই সূত্রই বিগৃহীত হলে ব্যাখ্যা হয়। আজ্ঞে
একথা তো বলা হয়েছে—কেবল চর্চামান ১৮ সকল অর্থাৎ পদগুলির বিভাগই
ব্যাখ্যা হয় না। 'বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্' এইরূপ বিগৃহীত পদ ব্যাখ্যা হয় না।
তাহলে কি? [ব্যাখ্যা কোন পদার্থ?] উদাহরণ, প্রত্যাদাহরণ, বাক্যের

অধ্যাহার এই সমস্ত ব্যাখ্যা হয়। যে জানে না তার এইরূপ [উত্তর] হয়।
 সূত্র থেকেই শব্দসমূহকে [লোকে] জানে। এইহেতু সূত্র থেকেই [শব্দের
 জ্ঞান হয়]। যে সূত্রের বাহিরে বলে—তার ঐ কথা গ্রাহ্য হতে পারে
 না ॥ ৬৭ ॥

বিশৃতি ৩:—শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বললে বার্তিককার যে দোষ দিয়ে-
 ছিলেন, মহাভাষ্যকার সেই দোষের উদ্ধার করে শব্দ ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হতে
 পারে—ইহা ব্যবস্থাপিত করেছেন। কিন্তু শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বললে
 বার্তিককারের “শব্দে লুপ্ত্যর্থঃ” এই আপাদিত দোষটি মাত্র মহাভাষ্যকার
 উদ্ধার করেছেন। বার্তিককারের আপাদিত আরও একটি [এক হিসাবে]
 দোষ—ভব অর্থে তদ্ধিতের এবং প্রোক্তার্থক তদ্ধিতের অল্পপপত্তি রূপ দোষ
 কিন্তু থেকে গেল। তার উদ্ধার তো মহাভাষ্যকার করেন নাই। শব্দকে
 ব্যাকরণশব্দের অর্থ বললে ‘ব্যাকরণে ভবো যোগঃ বৈয়াকরণঃ’ এইরূপ প্রয়োগ
 অল্পপপন্ন হবে। কারণ শব্দে তো যোগ সম্ভব নয়, কিন্তু সূত্রেই যোগ সম্ভব।
 আর পাণিনিকর্তৃক প্রোক্ত পাণিনীয়, এইরূপ প্রোক্ত অর্থে তদ্ধিতও অল্পপপন্ন
 থেকে গেল। কারণ পাণিনি কর্তৃক শব্দ প্রোক্ত হয় নাই, কিন্তু সূত্র উক্ত
 হয়েছে। এই দোষ যে থেকে গেল মহাভাষ্যকার তার স্বরণ করিয়ে
 দিয়েছেন—“অয়ং তর্হি দোষ……… তদ্ধিতা ইতি”। এই দোষ
 উদ্ধারের জন্য বার্তিকগ্রন্থের অবতারণা করবার উদ্দেশ্যে মহাভাষ্যকার
 বললেন—‘এবং তর্হি’ এইভাবে শব্দকে ব্যাকরণশব্দের অর্থ স্বীকার করলে যদি
 ভব অর্থে তদ্ধিত এবং প্রোক্তার্থক তদ্ধিতের অল্পপপত্তি থেকে যায় তা হলে—
 সেই দোষ পরিহারের জন্য—“লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্” এই বার্তিকসিদ্ধান্ত
 উল্লেখ করা হল। লক্ষ্য এবং লক্ষণ—এই উভয়ই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ।
 মহাভাষ্যকার এই বার্তিকের ব্যাখ্যার বলেছেন—“লক্ষ্যং লক্ষণং চৈতৎ সমুদিতং
 ব্যাকরণং ভবতি।” লক্ষ্য ও লক্ষণ এই উভয়ের সমুদিতরূপই ব্যাকরণ শব্দের
 অর্থ। এই কথার পাওয়া গেল ব্যাকরণশব্দটি ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম। যেমন
 “অগ্নিনীকুমারত্ব” অগ্নিনীকুমারত্বয়েই পর্যাপ্ত। সেইরূপ ব্যাকরণত্ব, শব্দ ও সূত্র
 এই উভয়ে পর্যাপ্ত। ব্যাকরণ শব্দটি যোগরূঢ়ি বৃত্তিতে শব্দ এবং সূত্র উভয়কেই
 বুঝাচ্ছে। লক্ষ্য ও লক্ষণের অর্থ জানাবার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—“কিং
 পুনর্লক্ষ্যম্, কিং বা লক্ষণম্” লক্ষ্য কি, লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার

বলেছেন—“শব্দো লক্ষ্যঃ, সূত্রং লক্ষণম্”। শব্দানুশাসনশাস্ত্র দ্বারা, শব্দের জ্ঞানই লক্ষ্য প্রয়োজন বলে কথিত হওয়ায় শব্দই [সাধুশব্দই] লক্ষ্য। শব্দকে জানাবার জ্ঞান সূত্রে, সূত্রের দ্বারা শব্দকে জানা যায় বলে সূত্র হলো লক্ষণ। “লক্ষ্যতে অনেনেনিতি লক্ষণম্” যার দ্বারা শব্দ লক্ষিত হয়। এখন শব্দ এবং সূত্র এই উভয়কে ব্যাকরণশব্দের অর্থ বলায় ভব অর্থে তদ্বিত এবং প্রোক্তার্থক তদ্বিতের অনুপপত্তি দোষ হয় না। কারণ ব্যাকরণ শব্দের একদেশ যে সূত্র সেই সূত্রে ভবযোগ সম্ভব হয়। এবং পাণিনি কর্তৃক সূত্র প্রোক্ত হওয়ায় প্রোক্তার্থক তদ্বিতও উপপন্ন হয়। এই পক্ষে ব্যাকরণশব্দ সূত্র ও শব্দ উভয়কে বুঝায় বলে—এই সমুদায় এবং তার অবয়বের ভেদ বিবক্ষা [বলবার ইচ্ছা] করে—‘ব্যাকরণশাস্ত্র সূত্রম্’ এইরূপ যষ্টির অর্থও উপপন্ন হয়। যেমন ‘বৃক্ষের শাখা’ এইরূপ ব্যবহারে বৃক্ষসমুদায় ও তার অবয়ব শাখার ভেদ বিবক্ষা করা হয়। আর এই সূত্র ও শব্দ এই সমুদায় থেকে শব্দের জ্ঞান হয় বলে ব্যাকরণ থেকে শব্দসকল জানে [ব্যাকরণাচ্ছব্দান্ জানাতি]—এইরূপ ব্যবহারও সিদ্ধ হয় বলে ‘শব্দাপ্রতিপত্তিরূপ দোষ হয় না। আর সূত্র এবং শব্দ এই সমুদায়ের অন্তর্গত সূত্রের দ্বারা শব্দের ব্যাকরণ অর্থাৎ ব্যুৎপাদন করা হয় বলে করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থেরও উপপত্তি হয়। সূত্ররাং এই উভয়ের ব্যাকরণশব্দার্থে কোন দোষ নাই।

‘বৃক্ষ’ শব্দটি সমুদায়কে অর্থাৎ শাখা, মূল, স্কন্ধ, পত্র প্রভৃতি সমুদায়কে বুঝায়। লোকেও সমুদায়েই বৃক্ষশব্দের প্রবৃত্তি [প্রয়োগ বা ব্যবহার] হয়, একদেশ কেবল শাখা, বা মূলকে—বৃক্ষশব্দে ব্যবহার করে না। এইরূপ লক্ষ্য-লক্ষণ অর্থাৎ শব্দ ও সূত্র এই সমুদায়কে যদি ব্যাকরণশব্দের অর্থ বলা হয়, তাহলে একদেশ বা অবয়বকে অর্থাৎ কেবল শব্দকে বা কেবল সূত্রকে বুঝাবার জ্ঞান তো ব্যাকরণ শব্দের প্রয়োগ হতে পারবে না। অথচ যিনি সূত্র সকল অধ্যয়ন করেন [শব্দ অধ্যয়ন না করেও] তাঁকে ‘বৈয়াকরণ’ বলা হয়। ‘ব্যাকরণং বেত্তি অধীতে বা’ এই অর্থে বৈয়াকরণ শব্দ নিম্পন্ন হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে, যে সূত্র সকলকেও ব্যাকরণশব্দে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শব্দ ও সূত্র এই সমুদায়ে প্রবৃত্ত [ব্যবহৃত] ব্যাকরণশব্দ অবয়বকে বুঝাতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা “এবমপ্যয়ং দোষঃ সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দ... বৈয়াকরণ ইতি।” এই মহাভাষ্যে উত্থাপন করা হয়েছে।

তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“নৈষ দোষঃ । সমুদায়েষু..... অবয়বেষুপি বর্ততে।” যে শব্দ কোন সমুদায়কে বুঝায়, সেইশব্দ সমুদায়ের অবয়বকে বুঝাতেও অনেকস্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন ‘পঞ্চাল’ শব্দ সমগ্র পঞ্চাল দেশকে বুঝায়, অথচ সেই সমগ্র পঞ্চাল দেশের এক এক অবয়বেও পঞ্চাল শব্দব্যবহৃত হয়। যেমন পূর্বপঞ্চাল, উত্তর পঞ্চাল। এইরূপ ‘দ্ব্যত’ বা ‘তৈল’ শব্দ সাধারণত তৈলসমুদায় অর্থাৎ একমণ, একসের, একছটাক তৈলকে বুঝায় বা দ্ব্যত সমুদায়কেবুঝায়। কিন্তু যখন অল্প তৈল বা দ্ব্যতকে সংস্কৃত করে ঔষধ তৈয়ার করা হয়, তখন সেই ঔষধ লোকে সেবন করলে, বলা হয় এই ব্যক্তি তৈল ভোজন করেছে, দ্ব্যত ভোজন করেছে। এইভাবে সমুদায়ের বোধক শব্দ অবয়ব বা একদেশেও ব্যবহৃত হয়। কোন বস্তু বা অণুকোন দ্রব্যের যদি কতক অংশ লাল আর কতক অংশ সাদা বা কাল হয়, তাহলে সমুদায় বস্তু বা দ্রব্যকে ‘লাল’ বলে যখন ব্যবহার করা হয়, তখন সেই বস্তুর যে অংশ লাল নয়, অণুঅংশে ‘লাল’ ব্যবহার করায় তাকেও লাল বলে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে সমুদায়ে প্রবৃত্ত শব্দ অবয়বে যেরূপ ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ শব্দ ও সূত্র—এই সমুদায়ে ব্যবহৃত ব্যাকরণশব্দ, সূত্রমাত্র বা শব্দমাত্ররূপ অবয়বেও ব্যবহৃত হতে পারবে। মহাভাষ্যকার এইভাবে বাস্তবিকের মতানুসারে ‘শব্দ ও সূত্র’ এই উভয়কে ব্যাকরণ শব্দের অর্থরূপে ব্যবস্থাপিত করে—কেবল সূত্রেও ব্যাকরণ শব্দের ব্যবহার অর্থাৎ কেবল সূত্রও ব্যাকরণশব্দের অর্থ হতে পারে—ইহা নিজে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিপাদন করছেন—“অথবা পুনরন্তু সূত্রম্।” মহাভাষ্যকারের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র দেখা যায়। এর পূর্বেও যখন বাস্তবিককার সিদ্ধান্ত করলেন—শাস্ত্র পূর্বক সাধুশব্দের প্রয়োগে ধর্ম হয়, শব্দের জ্ঞানে ধর্ম হয় না। তখনও মহাভাষ্যকার প্রথমে বাস্তবিকের মতে সেই শাস্ত্রপূর্বক শব্দপ্রয়োগে ধর্ম হয়—ইহা ব্যাখ্যা করে পরে নিজে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তির দ্বারা শব্দের জ্ঞানেও ধর্ম হয়—ইহা ব্যবস্থাপিত করলেন। এখানেও ঠিক বাস্তবিককার কেবল সূত্র বা কেবল শব্দ ব্যাকরণশব্দের অর্থ হতে পারে না—ইহা দেখিয়ে শব্দ ও সূত্র এই উভয়কে যখন ব্যাকরণশব্দের অর্থ বলে সিদ্ধান্ত করলেন, মহাভাষ্যকারও ঠিক বাস্তবিককারের মত অনুসারে ব্যাখ্যা করলেন। এখন তিনি নিজে স্বতন্ত্র ভাবে কেবল সূত্রকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বলে ব্যবস্থাপিত করবার জন্য যুক্তির উপস্থাপন করেছেন। তিনি বললেন কেবল সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হউক। মহাভাষ্যকার

এইকথা বলাতে কেবল সূত্র ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হলে বার্তিককার যে দোষের আপত্তি দিয়েছিলেন পূর্বপক্ষী সেই দোষের স্বরণ করিয়ে বলেছেন—“নহু চোক্তং সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠার্থোহনুপন্ন ইতি।” কেবল সূত্র, ব্যাকরণ শব্দার্থ হলে সূত্রের নিজের সঙ্গে নিজের ভেদ না থাকায় ‘ব্যাকরণের সূত্র’ এইরূপ ষষ্ঠীর অর্থ অসম্ভব হয়ে যায়।

তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন “নৈষ দোষঃ, ব্যপদেশিবস্তাবেন ভবিষ্যতি।” বিশিষ্ট অপদেশ ব্যপদেশ অর্থাৎ মুখ্য ব্যবহার। সেই ব্যপদেশ আছে যার সে হলো ব্যপদেশী অর্থাৎ যার [যে বস্তু] মুখ্য ব্যবহার আছে সে ব্যপদেশী। যেমন “রামস্ত গৃহম্” এখানে রামের ষষ্ঠীব্যবহার মুখ্য। কারণ এই মুখ্যব্যবহারের স্বস্থানমিত্তরূপ সম্বন্ধ বা নিমিত্ত আছে। কিন্তু যেখানে মুখ্য ব্যবহারের নিমিত্ত নাই সেখানে ব্যপদেশীর মত নিমিত্ত—সম্বন্ধাদির নিমিত্ত ভেদের কল্পনা করে ব্যবহার হয়, তাকেই ‘ব্যপদেশিবদ্ ভাব’ বলা হয়। যেমন “রাহুর শির” এখানে ষষ্ঠীর মুখ্যব্যবহারের নিমিত্ত, ভেদ নাই; কারণ ‘রাহু’ হচ্ছে মণ্ডকমাত্র, রাহুর অন্তকোন শরীরাবয়ব নাই। রাহুর স্বরূপ হচ্ছে মণ্ডকমাত্র, সেই মণ্ডক থেকে যদি ভিন্নরূপে রাহুর হস্ত পদাদি সমুদায় থাকতো তা হলে, ‘রাহুর শির’ এইরূপ মুখ্যব্যবহার হত। কিন্তু এই মুখ্যব্যবহারের নিমিত্ত যে ভেদ সেই ভেদ নাই এই জ্ঞান এ স্থলে ভেদের কল্পনা করে ‘রাহুর শির’ এইরূপ ব্যবহার হয়। “রাহুর শির” এইরূপ ব্যবহারে যে জ্ঞান হয় তাকে যোগদর্শনে বিকল্পাত্মক জ্ঞান বলে। “শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ” বস্তু নাই, অথচ শব্দের সামর্থ্যে একপ্রকার যে জ্ঞান হয়, তাকে বিকল্প বলে। রাহু ও শিরের ভেদ নাই, অথচ ‘রাহুর শির’ এইরূপ শব্দ থেকে একপ্রকার জ্ঞান হয়। ইহাই ব্যপদেশিবস্তাব। মহাভাষ্যকার বলেছেন এইরূপ সূত্র এবং ব্যাকরণের মধ্যে ভেদ না থাকলেও ‘রাহুর শির’ এই ব্যবহারের মত ‘ব্যাকরণের সূত্র’ এখানেও এইরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হবে। তারপর সূত্রমাত্রকে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বললে বার্তিককার যে দ্বিতীয় দোষ দিয়েছিলেন “শব্দাপ্রতিপত্তিঃ” অর্থাৎ “ব্যাকরণ থেকে শব্দ জ্ঞানে” লোকের যে এইরূপ ব্যবহার হয়, সূত্র মাত্র থেকে লোকে শব্দ জ্ঞানতে পারে না বলে, সূত্রমাত্রকে ব্যাকরণ শব্দার্থ বললে সেই “ব্যাকরণ থেকে শব্দ জ্ঞানে”, এই ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়ে বাবে। এই দোষের উদ্ধার করবার

জ্ঞাত মহাভাষ্যকার বলেছেন—“বদপ্যুচ্যতে শব্দপ্রতিপত্তিঃ.....পশ্চিহতঃ।
 যেতৎ তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতীতি।” কেবল সূত্র থেকে
 লোকে শব্দ জানে না, কিন্তু সূত্রের ব্যাখ্যা থেকে শব্দ জানে বলে সূত্রমাত্র
 ব্যাকরণ শব্দের প্রবৃতি হলে, ‘ব্যাকরণ থেকে শব্দ জানে, এইব্যবহার অমুপপন্ন
 হবে না। কারণ সূত্রই বিগ্রহ যুক্ত অর্থাৎ পদগুলির বিভাগকরা হলে সেই
 সূত্রই ব্যাখ্যাস্বরূপ হয়। সেই ব্যাখ্যা হতে লোকে শব্দ জানে। অতএব
 শব্দপ্রতিপত্তি দোষ হয় না। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী বলছেন
 “নহ্ন চোক্তম্ ন কেবলানি চর্চাপদানি... ..ব্যাখ্যানং ভবতি।”
 পূর্বেই বলা হয়েছে যে “বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্” ইত্যাদিরূপে কেবল সূত্রের পদগুলির
 বিভাগকরে দিলে ব্যাখ্যা হয় না; কিন্তু উদাহরণ, প্রত্যাধাহরণ, বাক্যাধ্যাহার
 ইত্যাদি করলে তবে ব্যাখ্যা হয়। সুতরাং কেবল সূত্র [সূত্রের বিভক্ত
 পদসমূহ] ই ব্যাখ্যা হয় না বলে, সূত্রমাত্র থেকে শব্দ জানা যায় না। ইহাই
 পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন “অবিজানত
 এতদেবং ভবতি.....নাদো গৃহেত।” এতৎ=এইশব্দ জান। এবং—
 উদাহরণ, প্রত্যাধাহরণ, বাক্যাধ্যাহার প্রভৃতি ব্যাখ্যাসহিত সূত্র থেকে
 শব্দের জ্ঞান। যারা মনে করে উদাহরণ, প্রত্যাধাহরণ, বাক্যাধ্যাহার,
 বিগ্রহ ইত্যাদি সহিত সূত্র থেকে শব্দের জ্ঞান হয়; তাদের এইরূপ
 মনে করাটা অজ্ঞান থেকে হয়। তারা প্রকৃত তত্ত্ব জানে না।
 কেন তারা অজ্ঞান? তার উত্তরে বলেছেন ভাষ্যকার—সূত্র থেকেই
 লোকের শব্দ জ্ঞান হয়। প্রশ্ন হতে পারে কেবল সূত্র থেকে কিরূপে
 শব্দের জ্ঞান হবে? সূত্র থেকেই তো লোকের শব্দের জ্ঞান হয় না। তার
 উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—যে উৎসূত্র বলে অর্থাৎ যে সূত্রের প্রকৃত
 তাৎপর্ষের বাহিরে উদাহরণ ইত্যাদি বলে, তার সেই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হতে পারে
 না। মহাভাষ্যকারের এই কথা থেকে সূচিত হয়েছে উদাহরণ, প্রত্যাধাহরণ,
 বাক্যাধ্যাহার প্রভৃতি যা কিছু ব্যাখ্যা সে সবই সূত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে।
 সূত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত নাই এইরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করে তা হলে, তাহা
 উৎসূত্র বলে অপ্রামাণিক হবে। সেই ব্যাখ্যা শিষ্টব্যক্তির গ্রহণ করবেন না।
 সুতরাং প্রামাণিক বা কিছু ব্যাখ্যা তা সূত্রে অন্তর্নিহিত বলে “সূত্র থেকেই
 লোকে শব্দ জানে” মহাভাষ্যকারের এই কথা বৃজ্জিহতই হয়েছে।

মহাভাষ্যকারের এই কথা যে যুক্তিবৃক্ত তদ্বিষয়ে একটি শ্লোক দেখা যায়। নাগেশ তার উল্লেখ করেছেন ‘শূদ্রেণেব হি তৎসর্বং যদ্বৃক্তো যচ্চ বার্তিকে। শূদ্রেণ যোনিরিহার্থানাং শূদ্রে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম॥’ বৃত্তিতে অর্থাৎ ভাষ্যাদি ব্যাখ্যাতে যাহা উক্ত হয় এবং বার্তিকে যাহা উক্ত হয়, সে সমস্তই শূদ্রে থাকে শূদ্রেই সকল অর্থের যোনি অর্থাৎ কারণ, শূদ্রেই সব প্রতিষ্ঠিত।

মহাভাষ্যে যে ‘আতশ্চ’ এইখানে ‘আতঃ’ শব্দটি আছে উহা একটি নিপাত। তাহার অর্থ “অতঃ” অর্থাৎ এই হেতু। তারপর “নাদো গৃহ্যেত” এইস্থলে “ন অদঃ” এইরূপ বিচ্ছেদ করে নিয়ে অর্থ বুঝতে হবে। অদস্ শব্দের নপুংসকলিঙ্গের একবচনের রূপ “অদঃ” অর্থ—উহা। অথবা “নাদঃ” শব্দমাত্র [অর্থশূন্য] যে উৎসূত্র বলে তার শব্দ ‘নাদ’ মাত্র অর্থাৎ অর্থশূন্য শব্দমাত্র ॥ ৬৭ ॥

মূল

[মহাভাষ্য]

অথ কিমর্থো বর্ণানামুপদেশঃ ?

[বার্তিক]

বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ ॥ ১৬ ॥

[মহাভাষ্য]

বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ। কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি। বৃত্তয়ে সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্তিপ্রয়োজনো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ।

কা পুনর্বৃত্তিঃ ? শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ। অথ কঃ সমবায়ঃ ? বর্ণানা-
মাহুপূর্ব্যেণ সন্নিবেশঃ। অথ ক উপদেশঃ ? উচ্চারণম্। কুত
এতৎ ? দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ। উচ্চার্য হি বর্ণানাহ—উপদিষ্টা ইমে
বর্ণা ইতি ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ :—[মহাভাষ্যানুবাদ] [আচ্ছা] অইউগ্ ইত্যাদিরূপে [বর্ণের
উপদেশ কি প্রয়োজনে ? [বার্তিকানুবাদ] [শাস্ত্রের] প্রবৃত্তির উপযোগী
বর্ণগত ক্রমবিশেষের জন্ত [বর্ণ সকলের] উপদেশ।

[মহাভাষ্যভূবাদ] [শাস্ত্রের] প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণগত ক্রমবিশেষের [ক্রমবিশেষ বুঝাবার জন্তু জন্তু বর্ণসকলের উপদেশ। বৃত্তিসমবায়ের অর্থ কি ? [বৃত্তি-সমবায়—এইখানে কিরূপ সমাস হয়েছে] ?

বৃত্তির নিমিত্ত সমবায়—বৃত্তিসমবায়। অথবা বৃত্ত্যর্থক সমবায় বৃত্তিসমবায়। অথবা বৃত্তিপ্রয়োজন সমবায় বৃত্তি-সমবায়। বৃত্তি কি ? [বৃত্তি শব্দের অর্থ কি ?] শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। সমবায় কি ? [সমবায় শব্দের অর্থ কি ?] বর্ণ সকলের পৌৰ্ব্বাপৰ্য্যরূপে সন্নিবেশ। উপদেশ কি ? [উপদেশ শব্দের অর্থ কি ?] উচ্চারণ। কিহেতু ইহা [উপদেশের অর্থ—উচ্চারণ কেন ?] দিশধাতু উচ্চারণার্থক। বর্ণসকল—উচ্চারণ করেই বলে—এই বর্ণসমূহ উপদিষ্ট হল ॥ ৬৮ ॥

বিবৃতি :—ব্যাকরণ শাস্ত্রই শব্দাভ্যুশাসনশাস্ত্র। এই ব্যাকরণে সাধুশব্দের অভ্যুশাসন করা হবে—ইহাই সংক্ষেপে মহাভাষ্যকারের তাৎপর্য বলে এষাবৎ মহাভাষ্য থেকে জানা গেছে। কিন্তু ব্যাকরণের প্রথমেই যে ‘অইউণ্, ঋ ২ ক্,’ ইত্যাদি ১৪টি সূত্র আছে; তাতে বর্ণেরই উপদেশ করা হয়েছে। বর্ণের উপদেশের দ্বারা তো কোন সাধু শব্দের অভ্যুশাসন হয় না। সুতরাং এইসকল বর্ণের উপদেশের প্রয়োজন কি ? এইরূপ প্রশ্নকা মহাভাষ্যকার উঠিয়েছেন—“অথ কিমর্থোবর্ণানামুপদেশঃ ?” এই গ্রন্থে। ইহার উত্তরে বার্তিককার বলেছেন—“বৃত্তি-সমবায়ার্থ উপদেশঃ।” এখানে ‘বৃত্তি’ শব্দের অর্থ—“প্রবৃত্তি” শাস্ত্রের অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। সেই বৃত্তির জন্তু অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রবৃত্তির জন্তু সমবায়, বৃত্তিসমবায়। ‘সমবায়’ শব্দের অর্থ=বর্ণসমূহের ক্রমবিশেষ ‘অ ই উণ্—’ ইত্যাদি ক্রমবিশেষ। সুতরাং ‘বৃত্তিসমবায়ের’—স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে—শাস্ত্রের প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণসমূহের ক্রমবিশেষ। সেই বৃত্তি সমবায় হয়েছে অর্থ=প্রয়োজন বার, তাহা বৃত্তি-সমবায়ার্থ। উপদেশ=বর্ণের উপদেশ। লঘুউপায়ে শাস্ত্রের প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণসকলের যে ক্রমবিশেষ তাহা বুঝানো হচ্ছে—[অইউণ্, ইত্যাদিরূপে] বর্ণ-উপদেশের প্রয়োজন। লোকে প্রসিদ্ধ যে মাতৃকাবর্ণ “অ আ ই ঈ ইত্যাদি, তার দ্বারা বর্ণের জ্ঞান হয়। কিন্তু সেইরূপ বর্ণজ্ঞানের দ্বারা পাণিনি ব্যাকরণের লঘুউপায়ে প্রবৃত্তি হয় না। যেমন—‘দধি + অত্র’ এখানে ইকারের স্থানে ষ্কার বিধান করতে গেলে বলতে হবে—অববর্ণ পরে থাকলে ই ঙ্গ স্থানে য্ হয়।

আবার ‘মধু+অজ্ঞ’ এখানকার সন্ধির জ্ঞ বলাতে হবে স্বরবর্ণ পরে থাকলে উ উ স্থানে ব্ হয়। এতে অনেক গোরব হয়ে যায় কিন্তু ‘অইউণ’ ইত্যাদি মাহেশ্বর সূত্রের দ্বারা প্রত্যাহার সংজ্ঞা সিদ্ধ হলে—“ইকো ষণ্টি” এইরূপ অতি সংক্ষিপ্ত শব্দের সাহায্যে—স্বরবর্ণ পরে থাকলে, ইঈ, উউ, ঋঋ, ২ র স্থানে ষধাক্রমে ষ্, ব্, বু ল্ আদেশ হয়—ইহা জানা যায়। এতে অনেক লাঘব হয়। এইভাবে লঘু উপায়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রবৃত্তির নিমিত্ত “অইউণ্” ইত্যাদিরূপে বর্ণোপদেশ করা হয়েছে। ইহাই “বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ” এই বার্তিকের তাৎপর্যার্থ। বার্তিককার বর্ণোপদেশের আরও কতকগুলি প্রয়োজন পরে বলবেন। “বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ” এই বার্তিকের ব্যাখ্যা করতে মহাভাষ্যকার ‘বর্ণা-নাম্’ পদের অধ্যাহার করে বলেছেন—বৃত্তিসমবায়ার্থে বর্ণানামুপদেশঃ। কার উপদেশ? বর্ণসকলের উপদেশ। ইহাই অর্থ।

“বৃত্তিসমবায়ার্থঃ” এই বার্তিকাংশের ‘বৃত্তিসমবায়’ শব্দটিতে কিরূপ সমাস হয়েছে ইহা জানাবার জন্ত মহাভাষ্যকার প্রশ্ন উঠিয়েছেন—“কিমিদং বৃত্তিসম-বায়ার্থ ইতি।” অর্থাৎ ‘বৃত্তিসমবায়’ কি সমাস? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন “বৃত্তয়ে সমবায়ঃ……… বৃত্তিসমবায়ঃ। মহাভাষ্যকার পূর্বে ‘ধর্ম-নিয়মঃ’ শব্দে যেভাবে সমাসবাক্য দেখিয়েছিলেন, এখানেও ঠিক সেই রীতিই অবলম্বন করেছেন, তার দ্বারা “বৃত্তিসমবায়” শব্দে কিন্তু চতুর্থীতৎপুরুষ সমাস হয় নাই। কারণ প্রকৃতি-বিকৃতিভাব না থাকলে একরূপস্থলে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয় না। এখানে বৃত্তি ও সমবায়ের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই। কিন্তু তাদর্থ্যে চতুর্থী দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে তাদর্থ্যরূপ সম্বন্ধ বৃষিষ্মে সম্বন্ধে যে যষ্টী হয়, সেই যষ্টীস্বতের সহিত যষ্টীতৎপুরুষ সমাস প্রতিপাদন করা। সুতরাং প্রথমে “বৃত্তেঃ সমবায়ঃ”—বৃত্তিসমবায়ঃ এইরূপ যষ্টীতৎপুরুষ সমাস হয়েছে। এই প্রথম যষ্টীসমাস পক্ষে অর্থ হচ্ছে—লাঘব বশত অর্থাৎ প্রত্যা-হার সংজ্ঞার দ্বারা শাস্ত্রে প্রবৃত্তির জ্ঞ বর্ণের উপদেশ।

তারপর মহাভাষ্যকার দ্বিতীয় বিগ্রহ দেখিয়েছেন ‘বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ঃ বৃত্তিসমবায়ঃ।’ এই দ্বিতীয় বিগ্রহে—বৃত্তি শব্দটি লক্ষণাদ্বারা বৃত্ত্যর্থকে বুঝাচ্ছে। বৃত্তি=মানে বৃত্ত্যর্থ। সুতরাং ‘বৃত্তিশ্চাসৌ সমবায়চেতি। এইরূপ কর্মধারয় সমাস করে “বৃত্তিসমবায়ঃ” এই পদ সিদ্ধ হয়েছে—ইহাই বুঝতে হবে। এই দ্বিতীয় বিগ্রহে অর্থ হচ্ছে—শাস্ত্র প্রবৃত্তির উপযোগী যে

সমবায় অর্থাৎ বর্ণসমূহের ক্রমবিশেষ; তাহা। যেমন—“ইগ্ বণঃ সস্ত্র-সারণম্” [১।১।৪ঃ]। যণের স্থানে [ব্ ব্ ব্ ল্ স্থানে] যে ইক্ [ই উ ঋ ঌ] তাহাকে সস্ত্রসারণ বলে। এখানে যে ব্ ব্ ব্ ল্ স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ঌ আদেশ—ইহা ‘অইউণ্’ ইত্যাদি সূত্রে বর্ণের ক্রমবিশেষেরই কল।

এরপর তৃতীয় বিগ্রহে বলা হয়েছে—“বৃত্তিপ্রয়োজনো বা সমবায়ঃ বৃত্তি-সমবায়ঃ”। বৃত্তিঃ প্রয়োজনং যন্ত স ‘বৃত্তিপ্রয়োজনঃ’ এইভাবে প্রথমে বহুব্রীহি সমাস করে, তারপর “বৃত্তিপ্রয়োজনঃ সমবায়ঃ” এইরূপ শাকপাণ্ডিবাদিভ্যং কর্ম-ধারয় অর্থাৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাস করে, মধ্যবর্তী ‘প্রয়োজন’ পদের লোপ করে “বৃত্তিসমবায়ঃ” এইপদ সিদ্ধ হয়েছে।

এইপক্ষে “বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ” এর অর্থ হচ্ছে—এইরূপ বর্ণগত ক্রম বিশেষের দ্বারা প্রথমে ‘ইৎসংজ্ঞা তারপর ‘প্রত্যাহার’ সংজ্ঞা, তারপর “টুলোপে পূর্বন্ত দীর্ঘোহণঃ” [৬।৩।১১ঃ] ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। এইভাবে মহাভাষ্যকার ‘বৃত্তিসমবায়’ শব্দের সমাস প্রদর্শন করে ‘বৃত্তি’ শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করবার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন = ‘ক’ পুনর্বৃত্তিঃ? অর্থাৎ এখানে ‘বৃত্তি’ শব্দের অর্থ কি? এর উত্তরে বলেছেন = “শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ” পানিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের [সূত্রের] প্রবৃত্তি।

‘সমবায়’ শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করবার জন্য প্রশ্ন করেছেন—‘অথ কঃ সমবায়ঃ?’ ‘বৃত্তিসমবায়, এখানকার ‘সমবায়’ শব্দের অর্থ কি? উত্তরে বলেছেন—“বর্ণানামাহুপূর্য্যেণ সন্নিবেশঃ” বর্ণ সকলের ক্রমবিশেষবিধিষ্ট রূপে উপস্থাপন। তারপর ‘উপদেশ’ শব্দের অর্থ জ্ঞানাবার জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন—“অথ ক উপদেশঃ?” এখানে ‘উপদেশ’ শব্দের অর্থ কি?

উত্তরে বলেছেন—‘উচ্চারণম্’। ‘উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্’ বৈয়াকরণ সস্ত্রদ্বায়ে আন্ত উচ্চারণকে উপদেশ বলে। এখন ‘অই উণ্’ ইত্যাদি চৌদ্দটি সূত্র যদি মহেশ্বরের আন্ত উচ্চারণ হয়, তাহলে ‘বর্ণসমায়’ অনাদি বলে যে প্রসিদ্ধি আছে, সেই প্রসিদ্ধি মিথ্যা হয়ে যায়। এইজন্য এখানে ‘উচ্চারণ’ শব্দের অর্থ করতে হবে অভিব্যক্তি। শিব চৌদ্দবার ঢকা বাজিয়ে ছিলেন। সেই চৌদ্দবার ঢকা নিনাদের দ্বারা অনাদি বর্ণসমায় অভিব্যক্ত হয়েছে (২২৭)।

তারপর মহাভাষ্যকার প্রশ্ন করেছেন—“কৃত এতৎ”—কি হেতু ইহা?

(২২৭) নমু বেদশাস্ত্রোচ্চারণমতানুসারে, তৎ কথনুপদেশবাবহারোক্ত অহ-
—ভাবেউচ্চারণমিতি, ঢকানিনাদেনাভিব্যক্তিরহর্থঃ।—মহাভাষ্যপ্রবীণোদ্যোত।

অর্থাৎ ‘উপদেশ’ শব্দ থেকে ‘উচ্চারণ’ অর্থ কি করে পাওয়া গেল ? উত্তরে বলেছেন—“দিশিষ্কারণক্রিয়ঃ।.....ইমে বর্ণা ইতি।” উচ্চারণ হয়েছে ক্রিয়া বাহার যে দিশ্, ধাতুর তাহা [দিশ্, ধাতু] ‘উচ্চারণক্রিয়ঃ’। ধাতুর অর্থ হচ্ছে ক্রিয়া। সুতরাং দিশ্, ধাতুর অর্থ উচ্চারণ। দিশ্, ধাতু থেকেই উচ্চারণ ক্রিয়া বুঝায়। ‘উপদেশ’ শব্দটি উপ + দিশ্, ধাতুর উত্তর ভাবাচ্যে ঘঞ্, প্রত্যয়-নিপায়। এইজন্ত ‘উপদেশ’ শব্দের অর্থ উচ্চারণ। লোকেও বর্ণসকল উচ্চারণ করে বলে—এই বর্ণসকল উপদিষ্ট হল ॥৬৮॥

মূল

[বার্তিক]

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ ॥ ১৭ ॥

[মহাভাষ্য]

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ কর্তব্যঃ—অনুবন্ধানাসঙ্ক্যা-
-মীতি। ন হানুপদিশ্য বর্ণান্ অনুবন্ধাঃ শক্যা আসঙক্তৃম্।

স এষ বর্ণানামুপদেশো বৃত্তিসমবায়ার্থশ্চানুবন্ধকরণার্থশ্চ।
বৃত্তিসমবায়শ্চানুবন্ধকরণঞ্চ প্রত্যাহারার্থম্, প্রত্যাহারো বৃত্ত্যর্থঃ
॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] এবং অনুবন্ধ করবার জন্ত [বর্ণসকলের
উপদেশ]

[মহাভাষ্যানুবাদ] অনুবন্ধ করবার [বুঝাবার] জন্তও,—অনুবন্ধ করব [বুঝাব]
এই হেতু বর্ণসকলের উপদেশ কর্তব্য। বর্ণসকলের উপদেশ না করে অনুবন্ধ
করা [বুঝান] সম্ভব নয়। বর্ণসকলের সেই এই উপদেশ—শাস্ত্র প্রবৃত্তির
উপযোগী বর্ণসকলের ক্রম বিশেষের জন্ত এবং অনুবন্ধ করবার [জ্ঞাপন করবার]
জন্ত। শাস্ত্র প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণগত ক্রম বিশেষ এবং অনুবন্ধনিপাদন
প্রত্যাহারের জন্ত। প্রত্যাহার, শাস্ত্রের প্রবৃত্তির জন্ত ॥ ৬৯ ॥

বিস্তৃতি :—বার্তিককার বর্ণোপদেশের একটি প্রয়োজন বলেছেন বৃত্তি
সমবায়ার্থ অর্থাৎ লাঘববশত শাস্ত্র প্রবৃত্তির উপযোগী বর্ণগত ক্রম বিশেষ। এখন

বর্ণোপদেশের দ্বিতীয় প্রয়োজন বলছেন—‘অনুবন্ধকরণার্থঃ’। এখানে ‘চ’ শব্দের অর্থ সমুচ্চয়। বর্ণের উপদেশ বৃত্তিসমবায়ার্থ এবং অনুবন্ধকরণার্থ। “উচ্চরিতপ্রধ্বংসঃ হ্রস্ববন্ধঃ” অর্থাৎ বাহা উচ্চরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। নাগেশ বলেছেন—বাহা সমুদায়ের শেষে থাকে, এবং বাহাকে অন্তরূপ করা যায় না (২২৮)। যেমন “অইউণ্” এইখানে ‘অ, ই, উ, ণ্’ এই চারিটি বর্ণের সমুদায়ের শেষে আছে ‘ণ্’ এই বর্ণটি। একে অন্তরূপ করা যায় না। কার্যকালে একে গ্রহণ করা যায় না, অথচ ইহার কার্য থাকে। “অইউণ্” এখানে প্রথম ‘অ’ এবং শেষ ‘ণ্’ এই দুটি বর্ণ নিয়ে ‘অণ্’ প্রত্যাহার হয়। তাতে ‘অ ই উ’ এই তিনটি বর্ণ কে ধরা হয়; কিন্তু ‘ণ্’ কে ধরা হয় না। অথচ ‘ণ’ অক্ষরটি ‘অণ্’ প্রত্যাহার গঠন করবার জন্ত। মহাভাষ্যকার বলেছেন—‘অনুবন্ধ করব’ এইজন্ত বর্ণসকলের উপদেশ করা উচিত। যেহেতু বর্ণের উপদেশ না করে অনুবন্ধ করা যায় না। ঠিক অনুবন্ধ করা যায় না কারণ যাকে অনুবন্ধ করা হবে বলা হচ্ছে, সেই বর্ণ তো পূর্ব থেকে সিদ্ধ হয়েই আছে। এইজন্ত ‘অনুবন্ধ করার’ অর্থ হচ্ছে অনুবন্ধের জ্ঞাপন করা। ‘অ ই উ ণ্’ এই সমুদায়ে ‘ণ্’ বর্ণটি যে অনুবন্ধ তাহা জ্ঞাপন করা হচ্ছে, বর্ণোপদেশের প্রয়োজন। এইজন্ত মহাভাষ্যকার বলেছেন—“ন হ্রস্বপদিশ্চ বর্ণান্ অনুবন্ধাঃ শক্যা আসঙ্ক্তুন্ম।” বর্ণের উপদেশ না দিয়ে অনুবন্ধ করা অর্থাৎ অনুবন্ধ জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে বাত্বিককার বলেন—‘বৃত্তিসমবায়ের জন্ত এবং অনুবন্ধ করার জন্ত বর্ণের উপদেশ।’ কিন্তু বৃত্তিসমবায়ের এবং অনুবন্ধ করার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন “ব্রহ্মসমনায়শ্চ.....প্রত্যাহারার্থম্”। শাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যুপযোগিবর্ণক্রম বিশেষ এবং অনুবন্ধ করণের প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যাহার। ‘প্রত্যাহার’ কিসের জন্ত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন “প্রত্যাহারো বৃত্তার্থঃ।” প্রত্যাহারের প্রয়োজন হচ্ছে—শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। প্রত্যাহার সংজ্ঞা গ্রহণ করে, লঘু উপায়ে পানিনিবাকরণ শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়েছে। ‘প্রত্যাহ্রিয়ন্তে বর্ণা অশ্বিন্’ অর্থাৎ যাতে বর্ণগুলির সংগ্রহ হয়, তাকে প্রত্যাহার বলে। ‘অণ্’ ‘অক্’ প্রভৃতি সংজ্ঞার নাম প্রত্যাহার। এই সংজ্ঞা গুলির দ্বারা অনেক বর্ণের সংগ্রহ হয়। প্রতি+আ+হ্র+অধিকরণ কারকে ঘঞ্=প্রত্যাহারঃ। লাঘব হেতুক শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হচ্ছে প্রত্যাহারের প্রয়োজন। আসঙ্ক্তুন্ম=আ+সন্জ্+তুন্ম ॥ ৬৯ ॥

মূল

[বার্তিকাংশ]

ইষ্টবুদ্ধার্থশ্চ ॥ ১৮ ॥

[মহাভাষ্য]

ইষ্টবুদ্ধার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ—ইষ্টান্ বর্ণান্ ভোক্তামহে•ইতি ।
ন হ্নুপদিশ্য বর্ণানিষ্টা বর্ণাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] এবং অভিলষিত [বর্ণ] জ্ঞানের [বর্ণ বুঝাবার] জ্ঞাত [বর্ণের উপদেশ] । [মহাভাষ্যানুবাদ] ইষ্টজ্ঞানের জ্ঞাতও [অভিলষিত বর্ণ জ্ঞাপনের জ্ঞাতও] বর্ণ সকলের উপদেশ = ইষ্ট বর্ণ সকল—বুঝাব । বর্ণের উপদেশ না করে = ইষ্ট বর্ণ জ্ঞাপন করা সম্ভব নয় ॥ ৭০ ॥

বিস্তৃত :—বার্তিককার বর্ণোপদেশের তৃতীয় প্রয়োজন বলছেন—“ইষ্ট বুদ্ধার্থশ্চ ।” এখানে ‘ইষ্ট’ বলতে “ইষ্ট বর্ণ সকল” ইহাই বুঝতে হবে । আর ‘বুদ্ধি’ বলতে ‘বোধন’ [বুঝান] এইরূপ অর্থ বুঝতে হবে । কারণ মহেশ্বর পাণিনির নিকট “অ ই উ ং” ইত্যাদিরূপে বর্ণের উপদেশ করেছেন—পাণিনিদ্বারা আমাদের ইষ্ট বর্ণ জ্ঞান উৎপাদন করবার জ্ঞাত । মহেশ্বরের নিজের ইষ্ট বর্ণ জ্ঞান উৎপন্ন হবে বলেই মহেশ্বর পাণিনির নিকট উপদেশ করেন নাই । কিন্তু পৃথিবীর মানুষের যাতে ইষ্টবর্ণের জ্ঞান হয়, সেইজন্য মহেশ্বর বর্ণোপদেশ করেছেন । অতএব ইষ্টবুদ্ধার্থশ্চ এখানে—‘ইষ্টবোধনার্থশ্চ’ এইরূপ বুধ্-ধাতুর ভিতরে ‘ণিচ্’ প্রত্যয়ের অর্থ অন্তর্ভুক্ত বলে বুঝতে হবে । ইষ্টবর্ণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—বর্ণের কলা প্রভৃতি দোষ আছে । সেই কলাদির কথা পরে ভাষ্যকার বলবেন । কলা প্রভৃতি দোষ শূন্য বর্ণ বুঝাবার জ্ঞাত—মহেশ্বর বর্ণের উপদেশ করেছেন । ইহাই বার্তিকের অর্থ । মহাভাষ্যকার ইহাই ব্যাখ্যা করবার জ্ঞাত বলেছেন “ইষ্টবুদ্ধার্থশ্চ.....ভোক্তামহে ইতি ।” ‘ইষ্ট বর্ণ বুঝাব’—এইজন্য বর্ণসকলের উপদেশ । এখানে মহাভাষ্যে “ভোক্তামহে” পদ আছে । তার অর্থ ‘বুঝাব’ কিন্তু মহেশ্বর বা পাণিনি বা কাত্যায়ন—এঁরা কি নিজেরা ইষ্টবর্ণ বুঝাবার জ্ঞাত বর্ণের উপদেশ করেছেন ? এঁদের তো ইষ্টবর্ণের

জ্ঞান সিদ্ধই আছে। এঁরা নিজেরদের ইষ্টবর্ণ জ্ঞানের জন্ত বর্ণের উপদেশ করেন নাই। কিন্তু আমাদের ইষ্টবর্ণ জ্ঞানের উৎপাদনের জন্তই তাঁরা বর্ণের উপদেশ করেছেন। অবশ্য বর্ণের উপদেশ মহেশ্বরই করেছেন। তিনিও নিজের জন্ত নয়। কিন্তু আমাদের জন্ত। অতএব “ভোৎস্তামহে” পদটি সঙ্গত হতে পারে না। এইজন্ত নাগেশ বলেছেন—“ভোৎস্তামহে” এই পদের অর্থ—“বোধস্থিতিমহে” বুঝাব। এখানেও ‘ণিচ্’ প্রত্যয়ের অর্থ ‘বুধ’ ধাতুর মধ্যে অন্তর্ভূত হয়ে আছে। ইহাই বুঝতে হবে। অতএব “ইষ্টবর্ণ অর্থাৎ কল্যাণি দোষশূন্য বর্ণসকল [লোকদের] বুঝাব”—এইজন্ত বর্ণের উপদেশ। সেইজন্ত মহাভাষ্যকার বলেছেন—“ন হনুপদিশ্চ... ..শক্যা বিজ্ঞাতুম।” বর্ণের উপদেশ না করে কলাদি দোষশূন্য বর্ণ বুঝানো যায় না। এই হেতু বর্ণের উপদেশ ॥ ৭০ ॥

মূল

[বার্তিক]

ইষ্টবুদ্ধার্থশ্চেতি চেহুদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিক—দীর্ঘপ্লুতানাম-
প্যুপদেশঃ ॥ ১১ ॥

[মহাভাষ্য ।

ইষ্টবুদ্ধার্থশ্চেতি চেহুদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকদীর্ঘপ্লুতানাম-
প্যুপদেশঃ কর্তব্যঃ। এবং গুণা অপি হি বর্ণা ইব্যস্তে ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ :-[বার্তিকানুবাদ] ইষ্টবোধনের জন্ত যদি হয়, [তাহলে] উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ ও প্লুতে [বর্ণ সকলেরও] বর্ণ উপদেশ [করা উচিত]। [মহাভাষ্যানুবাদ] যদি ইষ্ট [বর্ণ] বুঝান [বর্ণোপদেশের প্রয়োজন] [উদ্দেশ্য] হয় [তা হলে] উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত অনুনাসিক, দীর্ঘ এবং প্লুতেরও [এই সকল বর্ণেরও] উপদেশ করা উচিত। এইরূপ গুণ বিশিষ্ট বর্ণসকলও ইষ্ট ॥ ৭১ ॥

বিস্তৃতি :-পূর্বে ‘ইষ্টবুদ্ধার্থ’ এই বার্তিকের বর্ণনা করা হয়েছে সেটা স্বতন্ত্র বার্তিক গ্রন্থ নয়। কিন্তু “ইষ্টবুদ্ধার্থশ্চেতিপ্যুপদেশঃ” এই বার্তিকের প্রথম অংশকে আবৃত্তি করে মহাভাষ্যকার ব্যাখ্যার সুবিধার জন্ত প্রথমে পৃথক ভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই পূর্ব বার্তিকে বলা হয়েছে - ইষ্টবর্ণ

স্বাক্ষার অল্প বর্ণের উপদেশ করা হয়েছে। তারপর বার্তিককার আশঙ্কা করছেন—“ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেৎ.....উপদেশঃ।” ইষ্ট বর্ণ বুঝানো যদি মহেশ্বরের [বা পাণিনির] উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কলাদি দোষ বহিত বর্ণের উপদেশ করা যেমন উচিত, সেইরূপ উদাত্ত প্রভৃতি গুণ যুক্ত বর্ণেরও উপদেশ করা উচিত। সমস্ত দোষশূন্য বর্ণ যেমন ইষ্ট, সেইরূপ সমস্ত গুণ যুক্ত বর্ণও ইষ্ট। উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিত, অমুনাসিক, দীর্ঘ, প্লুত বর্ণের জ্ঞানও লোকের অভিলষিত। এই সকল বর্ণের জ্ঞান না হলে, পদের অর্থেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান হবে না। উদাত্ত, অমুদাত্ত প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। মহেশ্বরের ‘অ ই উ ণ্’ ইত্যাদি সূত্রে কিন্তু দীর্ঘ, প্লুত, অমুনাসিক এবং উদাত্তাদি তিন স্বর বিশিষ্ট বর্ণের উপদেশ নাই। অথচ সেইসব দীর্ঘ, প্লুত, অমুনাসিক, উদাত্ত অমুদাত্ত, স্বরিত বর্ণের উপদেশ করা উচিত। কারণ এইরূপ দীর্ঘ, প্লুতাদি বর্ণ জ্ঞান অভিলষিত। একই কালে উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বর দিয়ে—সূত্রের পাঠ করা সম্ভব নয়। এইজন্য কোন একটি স্বর দিয়ে সূত্রের পাঠ করতে হবে। যে স্বর দিয়ে সূত্রের পাঠ করা হবে, সেই স্বর ভিন্ন অপর দুটি স্বরের কথা বলে দেওয়া উচিত হবে অর্থাৎ তিনটি স্বরের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পাঠ করা উচিত। কিন্তু মহেশ্বর তাহা করেন নাই—ইহাই পূর্ব পক্ষীর অভিপ্রায় ॥ ৭১ ॥

মূল

[বার্তিক]

আকৃত্যুপদেশাৎসিদ্ধম্ ॥ ২০ ॥

[মহাভাষ্য]

অবর্ণাকৃতিরূপদিষ্টা সর্বমবর্ণকুলং গ্রহীষ্যতি। তথৈবর্ণাকৃতিঃ।
তথোবর্ণাকৃতিঃ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ :—[বাতিকাশ্রবাদ] জ্ঞাতির উপদেশ থেকে [উদাত্তাদির উপদেশ] সিদ্ধ [হয়ে গেছে]।

[মহাভাষ্যানুবাদ] অবর্ণ জ্ঞাতি [অথ] উপদিষ্ট হয়ে সমস্ত অবর্ণকে গ্রহণ করবে। এইরূপ ইবর্ণ জ্ঞাতি [ইষ] [উপদিষ্ট হয়ে সকল ইবর্ণকে, গ্রহণ করবে। এইরূপ উবর্ণ জ্ঞাতি ॥ ২২ ॥

বিবৃতি :—পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে বার্তিককার বলেছেন “আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধম্ ।” যেমন গোত্ৰাদি জাতির দ্বারা তাদের আশ্রয়রূপ সকল গোব্যক্তিকে সংগ্রহ করা হয়। সেইরূপ অঙ্ক, ইন্দ্র প্রভৃতি এক এক বর্ণগত জাতির উপদেশের দ্বারা উদাত্ত প্রভৃতি সকল বর্ণেরই উপদেশ করা হয়েছে। মহেশ্বর শূত্রে [অইউণ] বিশেষ বিশেষ উদাত্ত প্রভৃতি সকল বর্ণের গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আকৃতি অর্থাৎ বর্ণগত জাতিকে প্রধান ভাবে বলতে ইচ্ছা করা হয়েছে বলে, বিশেষ বিশেষ উদাত্ত প্রভৃতি বা দীর্ঘ প্রভৃতি বর্ণের বিবক্ষা করা হয় নাই। জাতির উপদেশ করতে গেলে, অকার প্রভৃতি হ্রস্বব্যক্তির উপ-উপদেশ ব্যতীত জাতির উপদেশ করা সম্ভব নয়। সেই জন্য “অইউণ্” ইত্যাদি শূত্রে হ্রস্ব অকারাদি ব্যক্তির উচ্চারণ করা হয়েছে। হ্রস্ব ব্যক্তির উচ্চারণ করলেও সেই হ্রস্বমাত্র বর্ণকে গ্রহণ করা অভিপ্রেত নয়। কিন্তু হ্রস্ব ব্যক্তি গত অঙ্ক প্রভৃতি জাতির বিবক্ষা প্রধান ভাবে থাকায় তার দ্বারা সমস্ত দীর্ঘাদি বা উদাত্তাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণব্যক্তি গৃহীত হয়ে গেছে বলে, কোন অল্পপণ্ডিত [কেন দীর্ঘাদির উপদেশ করা হল না ইত্যাদি আশঙ্কার] নাই। মহাভাষ্যকার—সেইজন্য বলেছেন অবর্ণজাতির গ্রহণের দ্বারা সমস্ত অবর্ণ ব্যক্তি গৃহীত হয়ে যায়; এইরূপ ইবর্ণজাতি এবং উবর্ণাদি জাতি দ্বারা সমস্ত ইউ বর্ণ ব্যক্তি গৃহীত হয়ে যায় ॥ ৭২ ॥

মূল

[বার্তিক]

আকৃত্যুপদেশাৎসিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাঙ্গীনাংপ্রতিষেধঃ ॥ ২১ ॥

[মহাভাষ্য]

আকৃত্যুপদেশাৎসিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাঙ্গীনাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ ।

কে পুনঃ সংবৃতাঙ্গীনাং ? সংবৃতঃ কলঃ ধাতঃ এগীকৃতঃ অশ্রুতঃ অধর্কঃ গ্রন্থঃ নিরন্তঃ প্রগীতঃ উপগীতঃ ক্রিঃ রোমশ ইতি ।
অপর আহ—

গ্রন্থং নিরন্তমবলম্বিতং হত-
মশ্মুকৃতং ধাতমথো বিকম্পিতম্ ।
সন্দষ্টমেণীকৃতমধ'কং দ্রুতং
বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ ॥ ইতি ।

অতোহন্তো ব্যঞ্জনদোষাঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] জ্ঞাতির উপদেশ বশত যদি [দীর্ঘাদি ও উদাত্তাদি] সিদ্ধ হয় [তা হলে] সংবৃত প্রভৃতির নিষেধ [করতে হবে] । [মহাভাষ্যানুবাদ] জ্ঞাতির উপদেশ থেকে [উদাত্তাদি] সিদ্ধ হয়, ইহা যদি বল [তাহলে] সংবৃত প্রভৃতির নিষেধ বলতে হবে। সংবৃত প্রভৃতি কাহার? সংবৃত, কল, ধাত, এণীকৃত, অশ্মুকৃত, অধ'ক, গ্রন্থ, নিরন্তম প্রণীত, উপণীত, স্কিন্ধ, রোমশ । অপরে বলেন—গ্রন্থ, নিরন্তম, অবলম্বিত, বিহত, অশ্মুকৃত, ধাত, বিকম্পিত, সন্দষ্ট, এণীকৃত, অধ'ক, দ্রুত, বিকীর্ণ; এইগুলি স্বরের দোষ বিষয়ে ভাবনা । এতস্তিন্ন দোষ সকল ব্যঞ্জনের দোষ ॥ ৭৩ ॥

বিরতি :—“আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাম্ প্রতিবেদঃ” এইটি একটি সম্পূর্ণ বার্তিক । পূর্বে যে “আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধম্” এই অংশটি মাত্র উদ্ধৃত করে মহাভাষ্যকার তার ব্যাখ্যা করেছেন—সেটা এই বার্তিকেরই প্রথম খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন করে বা আবৃত্তি করে প্রয়োজনবশত মহাভাষ্যকার তার ব্যাখ্যা করেছেন । সেটা একটা পৃথক্ বার্তিক নয় । যাই হোক পূর্বে বলা হয়েছিল আকৃতির অর্থাৎ জ্ঞাতির প্রাধান্ত বিবন্ধ করে ‘অইউণ্, ইত্যাদিশূত্রে বর্ণের উপদেশ করায় দীর্ঘ প্রভৃতি এবং উদাত্ত প্রভৃতি বর্ণেরও গ্রহণ সিদ্ধ হয়ে যায় । তার উপর এখন আশঙ্কা হচ্ছে—জ্ঞাতির উপদেশ বশত যদি উদাত্তাদির গ্রহণ সিদ্ধ হয় তা হলে সংবৃত প্রভৃতিরও গ্রহণ সিদ্ধ হয়ে যায় বলে, পৃথগ্ ভাবে সংবৃত প্রভৃতির নিষেধ করাও দরকার হয়ে পড়বে । মনুজ্ঞান জ্ঞাতির দ্বারা যেমন উত্তম মনুজ্ঞান সকলের সংগ্রহ হয়, সেইরূপ দ্রুত ভাষ্যাদি মনুজ্ঞানেরও সংগ্রহ হবে । কারণ দ্রুতভাষ্যাদিমনুজ্ঞানো মনুজ্ঞান জ্ঞাতি থাকে । এইরূপ অশ্ম, ইত্ প্রভৃতি বর্ণগত জ্ঞাতির দ্বারা যদি সকল অবর্ণ, ইবর্ণ প্রভৃতির গ্রহণ হয়, তা হলে উদাত্তাদি গুণ যুক্ত বর্ণেরও যেমন সংগ্রহ হবে, সেইরূপ কলাদি দোষযুক্ত বর্ণেরও সংগ্রহ হবে । অথচ গুণযুক্ত বর্ণেরই

উচ্চারণ করতে হয়, দোষযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ করতে নাই। দোষযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করলে ইষ্টফল লাভ হয় না, পরন্তু অনিষ্টফল হয়। এখন বর্ণগত জাতির দ্বারা সকল বর্ণের গ্রহণ হলে দোষযুক্ত বর্ণেরও সংগ্রহ হবে যাক বলে সেই দোষযুক্ত সংবৃত্ত প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারণ করবে না—এইরূপ নিষেধ করে দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। অথচ কি মহেশ্বর, কি পাণিনি কেইই এইরূপ নিষেধ সূচক সূত্র বলেন নাই। ইহাই পূর্বপক্ষীর আশঙ্কার তাৎপর্য। মহাভাষ্যকার একটি প্রশ্ন উঠিয়েছেন, বার্তিকে যে “সংবৃত্তাদীনাং প্রতিষেধঃ” এই বাক্যে সংবৃত্ত প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে—সেই সংবৃত্ত প্রভৃতি কারা—অর্থাৎ বর্ণের দোষ কি কি? ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার প্রথমে নিজের মতে ১২ প্রকার দোষের উল্লেখ করেছেন। তার পর অপরের মতে ১২ প্রকারে দোষের বা দোষযুক্ত বর্ণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে নিজের মতে (১) সংবৃত্ত, (২) কল, (৩) দ্ব্যাত, (৪) এণীকৃত, (৫) অযুক্ত, (৬) অধর্ক, (৭) গ্রস্ত, (৮) নিরস্ত, (৯) প্রগীত, (১০) উপগীত, (১১) ক্ষিপ্র, (১২) রোমশ, এই ১২টির উল্লেখ করেছেন। তার পর অপরের মতেও ২টির উল্লেখ করেছেন, সেই ১২টির মধ্যে অবলম্বিত, হত বা নিহত, সংদষ্ট, দ্রুত বিকীর্ণ ও বিকম্পিত এই ছয়টি মহাভাষ্যকারের উল্লিখিত দোষ থেকে ভিন্ন দোষ উক্ত হয়েছে এবং মহাভাষ্যকারের উল্লিখিত সংবৃত্ত, কল, প্রগীত, উপগীত, ক্ষিপ্র ও রোমশ—এই ছয়টি দোষ বাদ পড়েছে। এই সকল দোষের মধ্যে সংবৃত্তত্বটি ব্রহ্ম অবর্ণ ভিন্ন অপর সকল স্বরবর্ণের দোষ। ব্রহ্ম অবর্ণের গুণ হচ্ছে সংবৃত্তত্ব।

কল = যে বর্ণ যে স্থানথেকে উচ্চারণ করা আবশ্যিক, সেই বর্ণকে অভ্যস্থান থেকে উচ্চারণ করলে—তাহা কল হয় অর্থাৎ কলত্ব দোষ যুক্ত হয়। দ্ব্যাত = বার নিশ্বাস প্রশ্বাস খুব জোরে জোরে পড়ে সে ব্যক্তি ব্রহ্মবর্ণ উচ্চারণ করলেও দীর্ঘের মত মনে হয় এইরূপ বর্ণকে দ্ব্যাত বলে। এণীকৃত = সন্নিহিত। এমন ভাবে উচ্চারণ করে যে ওকার কি ঔকার—তার নিশ্চয় হয় না, পরন্তু সন্দেহ হয়। এইরূপ উচ্চারিত বর্ণকে এণীকৃত বলে। অযুক্ত = বর্ণ উচ্চারণকারী ব্যক্তি কোন বর্ণকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছে, অথচ উচ্চারণটা মুখের ভিতরের দিকে কিছুটা হচ্ছে, এইরূপ উচ্চারিত বর্ণকে অযুক্ত বলে। অধর্ক = যে উচ্চারণে দীর্ঘবর্ণও ব্রহ্মের মত উচ্চারিত হয় এইরূপ উচ্চারিত

বর্ণকে অর্ধক বলে। গ্রন্থ=যে উচ্চারিত বর্ণ জিহ্বার মূলে কিছুটা নিরুদ্ধ হয়, সেই বর্ণই গ্রন্থসংজ্ঞক হয়। নিরন্তর=কর্কশভাবে উচ্চারিত বর্ণ অথবা তাড়াতাড়ি উচ্চারিত বর্ণকে নিরন্তর বলে। প্রগীত=গানের মত যে বর্ণকে উচ্চারণ করা হয় তাকে প্রগীত বলে। উপগীত=একটি বর্ণের নিকটে আর একটি বর্ণ এমন ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে দ্বিতীয় বর্ণটি প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে -এইরূপ উচ্চারিত বর্ণকে উপগীত বলে। ক্ষিপ্ত=কম্পনযুক্তরূপে উচ্চারিত বর্ণকে ক্ষিপ্ত বলে। রোমশ=গম্ভীরভাবে উচ্চারিত বর্ণকে রোমশ বলে। অবলম্বিত=অপর বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অন্য যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাকে অবলম্বিত বলে। নিহত=কর্কশভাবে উচ্চারিত বর্ণকে নিহত বলে। সন্দেহ=যে উচ্চারিত বর্ণ বুদ্ধিপ্রাপ্তের মত মনে হয় সেইরূপ উচ্চারিত বর্ণকে সন্দেহ বলে। বিকীর্ণ=একবর্ণ অপর বর্ণে যদি ব্যাপ্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তাহলে তাকে বিকীর্ণ বলে। স্রোকে যে “স্বরদোষভাবনাঃ” শব্দটি আছে তার অর্থ বলেছেন নাগেশ—‘স্বরদোষজ্ঞাতি সকল’। এই যে দোষ ১২টি বা ১৮টি বা বলা হয়েছে এগুলি স্বরবর্ণের দোষ বৃত্তে হবে। “স্বরদোষ জ্ঞাতি” ১২ বা ১৮। সুতরাং দোষ ব্যক্তি অনন্ত ইহা কৈয়ট বলেছেন। এইসকল স্বরদোষ থেকে ভিন্ন যে দোষ সেগুলি ব্যঞ্জন বর্ণের দোষ। মহাভাষ্যকার এই কথা বলে ব্যঞ্জনবর্ণের দোষ কতগুলি বা কি কি সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই ॥ ৭৩ ॥

মূল

নৈষ দোষঃ।

[বার্তিক]

গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎসংবৃত্তাদীনাং নিবৃত্তিঃ ॥ ২২ ॥

[মহাভাষ্য]

গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎ সংবৃত্তাদীনাং নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি। অস্ত্যাহদ্ গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনম্। কিম্? সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্ফাতি। [প্রত্যাপত্তিবচনম্] এবং তহ্যষ্টাদশা ভিন্নাং নিবৃত্তকলাদিকামবর্ণন্ত প্রত্যাপত্তিং বক্ষ্যামি। সা তর্জি বস্তব্য্যা ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ :—[মহাভাষ্যানুবাদ] [না] এই দোষ হয় না। [বার্তিকানুবাদ] গর্গাদির [গণে] বিদাদির [গণে] [সংবৃত্তাদিদোষরহিত] পাঠ আছে; এই হেতু সংবৃত্ত প্রভৃতির [সংবৃত্তাদি দোষযুক্ত বর্ণের] নিবৃত্তি [হয়]। [মহাভাষ্য-
ানুবাদ] গর্গাদির এবং বিদাদির [সংবৃত্তাদি দোষরহিত] পাঠ আছে বলে, সংবৃত্ত প্রভৃতির [সংবৃত্ত প্রভৃতির] নিবৃত্তি হবে। গর্গাদি ও বিদাদি [গণে] তে [বর্ণসকলের বা বর্ণঘটিত গর্গাদি ও বিদাদির] পাঠে অন্তপ্রয়োজন আছে। কি ? [কি অন্তপ্রয়োজন ?] সমুদায়ের [গর্গাদি সমুদায় ও বিদাদি সমুদায়ের] যাহাতে সাধুত্ব [কলত্বাদিদোষরহিতত্ব] হয়। [প্রতিবিধি বচন—পুনরুদ্বার বাক্য] এইরূপ হলে [গর্গাদি বিদাদি পাঠের অন্ত প্রয়োজন থাকলে] আঠার প্রকারে বিশিষ্ট কলত্বাদি দোষশূন্য অবর্ণ প্রতিবিধি বলব। তাহলে সেই প্রতি-
বিধি বলা উচিত [বল] ॥ ৭৪ ॥

নিবৃত্তি :—আশঙ্কা হয়েছিল—বর্ণগত জ্ঞাতির প্রধানভাবে বিবক্ষা করে যদি সমস্ত উদাত্তাদি ও দীর্ঘাদি বর্ণের সংগ্রহ করা হয়; তাহলে সংবৃত্তাদি বর্ণেরও সংগ্রহ হয়ে যাবে। সেই সংবৃত্তাদি বর্ণের আবার নিষেধ করতে হবে। তার উত্তরে মহাভাষ্যকার পরবর্তী বার্তিক গ্রন্থানুসরণে বলছেন—“নৈষ দোষঃ” না এই দোষ অর্থাৎ পূর্বোক্ত দোষ হয় না। কেন দোষ হয় না ? তার উত্তরে বার্তিকগ্রন্থ হচ্ছে—“গর্গাদি বিদাদি পাঠাৎ সংবৃত্তাদীনং নিবৃত্তিঃ।” গর্গাদি গণে [৪।১।১০৫] গর্গাদিশব্দের এবং বিদাদিগণে [৪।১০৪] বিদাদিশব্দের পাঠ আছে। সেই গর্গাদিশব্দ এবং বিদাদিশব্দ সংবৃত্ত প্রভৃতিদোষরহিত বর্ণের দ্বারা ঘটিত অর্থাৎ গর্গাদিগণে বা বিদাদিগণে যে সকল শব্দের উল্লেখ আছে—সেই সকল শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলি সংবৃত্তাদি দোষশূন্য। সংবৃত্তাদি দোষশূন্য বর্ণ সমূহের দ্বারা ঘটিত গর্গাদিশব্দের ও বিদাদিশব্দের সেই সব গণে উচ্চারণ করা হয়েছে। সুতরাং সেই গর্গাদি ও বিদাদি শব্দে দোষশূন্য বর্ণের জ্ঞান হলে অন্ততঃ পাঠক দোষশূন্যরূপে বর্ণসকল উচ্চারণ করতে পারবে। অতএব বর্ণগত জ্ঞাতির দ্বারা উদাত্তাদি বর্ণের সংগ্রহ হলেও সংবৃত্তাদি বর্ণের গ্রহণ হবে না, কারণ গর্গাদি ও বিদাদির পাঠ থেকেই সংবৃত্তাদি বর্ণের নিবৃত্তি—হয়ে যাবে। ইহাই বার্তিককারের এই বার্তিকগ্রন্থের অভিপ্রায়। মহা-
ভাষ্যকারও এইভাবে বার্তিক ব্যাখ্যা করে আর একটি আশঙ্কা উঠিয়েছেন—“অন্ত্যন্তদ্.....প্রয়োজনম্”। গর্গাদিগণে গর্গাদিশব্দের এবং বিদাদিগণে

বিদাদিশব্দের পাঠের অল্প প্রয়োজন আছে। সংবৃত্তাদি দোষনিবৃত্তি করা-গর্গাদিপাঠের বা বিদাদিপাঠের প্রয়োজন নয়, কিন্তু অল্পপ্রয়োজন আছে। মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করেছেন ‘কিম্?’ অর্থাৎ কি অল্প প্রয়োজন আছে? তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্মাদিত্তি।” গর্গাদি শব্দের উত্তর যঞ্ প্রত্যয় করে এবং বিদাদি শব্দের উত্তর অঞ্ প্রত্যয় করে সমুদায়ের অর্থাৎ গর্গাদি প্রকৃতি যুক্ত প্রত্যয়ের যাতে সাধুত্ব হয় = গার্গ্য ইত্যাদি পদ বা বৈদ ইত্যাদি পদ যাতে সিদ্ধ হয় তার জন্য গর্গাদি-গণে গর্গাদিশব্দের এবং বিদাদিগণে বিদাদিশব্দের পাঠ আছে—বর্ণগত সংবৃত্তত্ব প্রভৃতি দোষ নিবৃত্তির জন্য গর্গাদির বা বিদাদির পাঠ করা হয় নাই। ইহাই মহাভাষ্যকারের আশঙ্কার অভিপ্রায়। [দোষের পুনরুচ্চারের বর্ণন] [প্রত্যাপত্তি-বচনম্] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে যে পাঠ দেওয়া হয়েছে, তাহা সকল পুস্তকে নাই। এইজন্য উহা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যাহা হউক, মহাভাষ্যকারের পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে তিনি স্বয়ংই বলেছেন—“এবং তর্হি..... প্রত্যাপত্তিং বক্ষ্যামি।” অর্থাৎ গর্গাদি ও বিদাদি পাঠের যদি অল্প প্রয়োজন থাকে, তার দ্বারা যদি সংবৃত্তাদি বর্ণের নিবৃত্তি না হয়, তাহলে অবর্ণের যে সকল দোষ আছে সেই দোষ নিবৃত্তি করে বা সেই সকল দোষ শূন্যরূপে অবর্ণের প্রতিবিধি অর্থাৎ দোষের পুনঃ উচ্চার করব। এখানে মহাভাষ্যে অবর্ণ টি উপলক্ষণ বুঝতে হবে বর্ণমাত্রই এখানে অবর্ণের দ্বারা উপলক্ষিত হয়েছে। অবর্ণের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিত, অমুনাসিক ও অনমুনাসিক ভেদে ১৮ প্রকার ভেদ আছে বলে মহাভাষ্যকার বলেছেন ‘অষ্টাদশধা ভিন্নাম্’। এইরূপ ই বর্ণ, উ বর্ণ ও ঋ বর্ণেরও ১৮ প্রকার ভেদ বুঝতে হবে। আর সংবৃত্তত্বটি হ্রস্বঅবর্ণের গুণবলে মহাভাষ্যকার অবর্ণের ‘নিবৃত্তকলাদিকাম্’ বলেছেন। অর্থাৎ কলত্বাদি দোষশূন্য অবর্ণের, সংবৃত্তত্বাদিদোষশূন্য ই বর্ণের, এইরূপ যথাযোগ্য দোষশূন্য বর্ণ সকলের প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ দোষের পুনরুচ্চারের বচন বা বর্ণনা করব। মহাভাষ্য-কার পানিণির ‘অ অ’ [৮।৪।১৮] এই শেষ সূত্রের ভাষ্যে অবর্ণের দোষ [কলত্বাদিদোষ] সমূহের উচ্চার করেছেন। সেই জন্য এখানে বলছেন অবর্ণের কলত্বাদিদোষের উচ্চার করব বা কলত্বাদি দোষশূন্য অবর্ণ বিষয়ক প্রতিবিধি [দোষের পুনরুচ্চারের বিধান] বলব। অবর্ণ উপলক্ষণ সকলবর্ণেরই দোষের উচ্চার করা হবে—ইহাই মহা ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। মহাভাষ্যকারের এই

কথায় পূর্বপক্ষী বলেছেন—“সাঁ তর্হি বক্তব্যম্” সেই প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ প্রতিবিধি বা দোষোদ্ধারের বর্ণনা করা উচিত। অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্রের [পাণিনি-ব্যাকরণের] শেষে যদি সমস্ত বর্ণের সংরতত্ত্ব প্রভৃতি দোষনিবৃত্তির জ্ঞাত্য প্রতি-বিধান [দোষের পুনরুদ্ধার] করা হয় তাহলে গৌরব দোষ হয়ে যাবে। এই গৌরব দোষ প্রদানকরাই এখানে পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় ॥৭৪ ॥

মূল

[বার্তিক]

লিঙ্গার্থা তু প্রত্যাপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

[মহাভাষ্য]

লিঙ্গার্থা সাঁ তর্হি ভবিষ্যতি। তত্তর্হি বক্তব্যম্। যত্নপ্যেত-
দ্রুচ্যতে। অথবা এতর্হি অনেকমনুবক্তব্যতং নোচ্চার্যমিৎসংজ্ঞা চ ন
বক্তব্যম্, লোপশ্চ ন বক্তব্যঃ। যদনুবন্ধৈঃ ক্রিয়তে তৎকলাদিভিঃ
করিয়তে। সিধ্যাত্যেবম্, অপাণিনীয়ং তু ভবতি। যথাক্সাস-
মেবাস্ত। ননু চোক্তম্, “আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ
সংবৃতাঙ্গাদীনাং প্রতিষেধ” ইতি। পরিক্রতমেতৎ গর্গাদিবিদাদি
পাঠাৎ সংবৃতাঙ্গাদীনাং নিবৃত্তিভিঃ বিষ্যতীতি। ননু চাক্সাসগর্গাদিবিদাদি-
পাঠে প্রয়োজনমুক্তম্। কিম্? সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা
স্বাদিতি। এবং তদ্ব্যভয়মনেন ক্রিয়তে—পাঠশ্চৈব বিশেষ্যতে
কলাদয়শ্চ নিবর্ত্যন্তে। কথং পুনরেকেন যত্নেনোভয়ং লভ্যম্?
লভ্যমিত্যাহ। কথম্? দ্বিগতা অপি হেতবো ভবন্তি। তদ্যথা :—
আত্মাশ্চ সিদ্ধাঃ পিতরশ্চ প্রীণিতা ইতি। তথা বাক্যাক্সাপি দ্বিষ্টানি
ভবন্তি—শ্বेतো ধাবতি, অলম্ব্যসানাং যাতেতি। অথবা ইদং
তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ—কেমে সংবৃতাঙ্গদয়ঃ জ্ঞায়েরম্মিতি? আগমেষু।
আগমাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। বিকারেষু তর্হি। বিকারা অপি শুদ্ধাঃ
পঠ্যন্তে। প্রত্যয়েষু তর্হি। প্রত্যয়া অপি শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। ধাতু-
ষু তর্হি। ধাতবোহপি শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রাতিপদিকেষু তর্হি।

প্রাতিপদিকান্যপি শুদ্ধানি পঠ্যন্তে । যানি তর্হি অগ্রহণানি প্রাতি-
পদিকানি । এতেষামপি স্বরবর্ণানুপূর্ণীজ্ঞানার্থ উপদেশঃ কর্তব্যঃ ।
শশঃ যয ইতি মা ভূং । পলাশঃ পলায ইতি মা ভূং । মঞ্চকো
মঞ্জক ইতি মা ভূং ।

আগমাশ্চ বিকারাশ্চ প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ ।

উচ্চাৰ্যন্তে ততস্তেষু নেমে প্রাপ্তাঃ কলাদয়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে মহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্ত
প্রথমে পাদে প্রথমম্বাহিকম্ ।

— — —

অনুবাদ :—[বার্তিকানুবাদ] [ধাতুপ্রভৃতিতে হিত কলত্ব প্রভৃতি] লিঙ্গের
[নিবৃত্তির জন্ত] জন্তও [পুনরুদ্ধার] প্রতিবিধি । [মহাভাষ্যানুবাদ] তা হলে
[বর্ণসকলের সংবৃত্তাদি দোষনিবৃত্তির জন্ত প্রত্যাপত্তিতে গৌরব হলে] সেই
প্রত্যাপত্তি [ধাতুপ্রভৃতি গত কলত্বাদিলিঙ্গ নিবৃত্তির] লিঙ্গের নিমিত্তও হবে । তা
হলে সেই [ধাত্বাদিগত কলত্বাদি] লিঙ্গ বলতে হবে । যদিও ইহা [সেইলিঙ্গ]
বলা হয় । অথবা এখন অনেক শত অনুবন্ধ উচ্চারণ করবার প্রয়োজন নাই,
ইৎসংজ্ঞা বলবার প্রয়োজন নাই, লোপ [সংজ্ঞা] বলবার প্রয়োজন নাই । অনু-
বন্ধের দ্বারা যাহা [যে প্রয়োজন] করা হয়, কলা [কলত্ব] প্রভৃতির দ্বারা তাহাই
করা হবে । এইরূপে [সকল অর্থ] সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা পাণিনির মতানু-
যায়ী হয় না । যেমন ভাবে বর্ণনা আছে, সেই ভাবেই থাকুক ।

আজ্ঞে ! বলা হয়েছে—জ্ঞাতির উপদেশ দ্বারা অনুদাত্তাদিবর্ণের গ্রহণ সিদ্ধ
হলেও সংবৃত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট বর্ণের গ্রহণ হয়ে যাওয়ায় তাদেরও নিষেধ করতে
হবে ।

এর পরিহার [উত্তর] করা হয়েছে [গর্গাদিগণে এবং বিদাদিগণে] গর্গাদির
ও বিদাদির পাঠ থেকে সংবৃত্ত প্রভৃতির নিবৃত্ত হবে ।

আজ্ঞে ! বলা হয়েছে—গর্গাদির ও বিদাদির পাঠবিষয়ে অন্ত প্রয়োজন
আছে । কি ? [কি প্রয়োজন] । সমুদায়ের বাহাতে সাধুই সিদ্ধ হয় [সেই প্রয়ো-
জন সিদ্ধ হয়] । এইরূপ হলে [গর্গাদি বিদাদি পাঠের অন্ত প্রয়োজন থাকলে]

তাহলে ইহার দ্বারা [গর্গাদি ও বিদাদির পাঠের দ্বারা] উভয় [প্রয়োজন] করা [নিষ্পাদন করা] হয়, [গর্গাদির ও বিদাদির] পাঠই [গর্গাদি বিদাদিগণে শুদ্ধ বর্ণপাঠ] বিশেষিত করা হয় এবং কলত্র প্রভৃতিরও নিবৃত্তি করা হয়। একপ্রযমে কিরূপে উভয় লব্ধ হয়? লব্ধ হয়—ইহা [সিদ্ধান্তী] বলেন। কিরূপে? [কিভাবে উভয়ের লাভ হয়]। হেতু সকল দুই অর্থগত [দুই প্রয়োজন সম্পাদক] হয়। যেন—আত্মবুদ্ধি সফল জলসিক্ত হয় ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন। সেইরূপ বাক্যসকল ও দুই অর্থে স্থিত হয়। যেতো ধাবতি [স্নেহে ধাবন করে]। অলম্বুমানাং বাতা [অলম্বুসদেশের গমনকর্তা] ইত্যাদি। অথবা ইহাকে [পূর্বপক্ষীকে] ইহা [এইবিষয়] জিজ্ঞাসা করতে হবে—এই সংবৃত্ত প্রভৃতি কোথায় শুনেছ? আগম সকলে [শুনেছি]। আগম সকল শুদ্ধভাবে পাঠকরা হয়। তাহলে বিকার সমূহে [শুনেছি]। বিকার সকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। তাহলে প্রত্যয়সমূহে [শুনেছি] প্রত্যয়সমূহও শুদ্ধ পঠিত হয়। তাহলে ধাতুসমূহে [শুনেছি] ধাতুসকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। তাহলে প্রাতিপদিক সমূহে [শুনেছি]। প্রাতিপদিক সকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। তাহলে যে প্রাতিপদিকগুলি কার্যবিধিতে অনূদিত হয় নাই, [সেই সকল প্রাতিপদিকে সংবৃত্তাদি দোষ শুনেছি]। এইসকল অগ্রহণ প্রতিপদিকেরও স্বর; বর্ণের আত্মপূরী [যথাক্রমে] জ্ঞানের জন্ত উপদেশ [অম্ববাদরূপে গ্রহণ] করতে হবে। যাতে ‘শশঃ’ এইস্থলে ‘ষষঃ’ এইরূপ না হয়। ‘পলাশঃ’ এইস্থলে ‘পলাষঃ’ এইরূপ না হয়। ‘মঞ্চকঃ’ এইস্থলে ‘মঞ্জকঃ’ এইরূপ না হয়।

আগম, বিকার, ধাতুর সহিত প্রত্যয় [শুদ্ধভাবে] উচ্চারিত হয়। সেই হেতু সেই আগম প্রভৃতিতে এই কলত্রাদির প্রাপ্তি নাই ॥ ৭৫ ॥

ইতি পশ্চাৎশিক্ষকের বার্তিক ও মহাভাষ্যের অম্ববাদ।

বিবৃতি :—পূর্বে বলা হয়েছিল অত্র, ইত্য প্রভৃতি জাতির দ্বারা উদাত্তাদি সকল বর্ণব্যক্তির সংগ্রহ করলে সংবৃত্তত্র ব। কলত্র প্রভৃতি বিশিষ্টরূপে অশুদ্ধ বর্ণগুলিরও সংগ্রহ হয়ে যাবে; সেইগুলির আবার নিষেধ করতে হবে। তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছিলেন শাস্ত্রের শেষে সকল বর্ণের কলত্রাদিদোষের উদ্ধারার্থ প্রতিবিধি করা হলে। তাতে পূর্বপক্ষী বলেছিলেন শাস্ত্রান্তে সমস্ত বর্ণের প্রতিবিধি বললে গৌরব দোষ হয়ে যাবে। এই গৌরব দোষ বারণের জন্ত এখন বার্তিককার বলছেন “লিঙ্গার্থী তু প্রত্যাপত্তিঃ”।

অর্থাৎ ‘ডু পচব্ পাকে’ এই ধাতুর ‘ডু’ এবং ‘ব্’ টি অমুবন্ধ। তার ‘ইং’ হয়। ‘ইং’ হলে লোপ হয়। এই ভাবে অনেক ধাতু, প্রত্যয়, প্রভৃতিতে যে অমুবন্ধ হয়, সেই অমুবন্ধ স্থানীয় ধাতুপ্রভৃতিতে স্থিত যে কলত্র প্রভৃতি লিঙ্গ, সেই লিঙ্গের জন্ত—লিঙ্গের নিবৃত্তির জন্তও শাস্ত্রান্তে প্রত্যাপত্তি করা হবে। শাস্ত্রের শেষে বর্ণগত সংবৃত্তাদি দোষোদ্ধারের জন্তই যে কেবল প্রতিবিধি করা হবে তা নয় কিন্তু ধাতু প্রভৃতি স্থিত কলত্র প্রভৃতি লিঙ্গেরও নিবৃত্তির জন্ত প্রতিবিধি [দোষোদ্ধারার্থ বিধি] করা হবে। অতএব গৌরব দোষ হতে পারে না। মহাভাষ্যকারও বার্তিকের ব্যাখ্যায় এই কথা বলেছেন “লিঙ্গার্থা সা তর্হি ভবিষ্যতি।” অমুবন্ধস্থানীয় ধাতুপ্রভৃতিস্থিত কলত্রাদি লিঙ্গনিবৃত্তির জন্তও সেই প্রত্যাপত্তি বা দোষোদ্ধার প্রতিবিধি করা হবে। বার্তিককার ও মহাভাষ্যকারের এই কথায় পূর্বপক্ষী বলেছেন ‘তত্তর্হি বক্তব্যম্’ অর্থাৎ ধাতু প্রভৃতিতে স্থিত কলত্রাদি লিঙ্গের কথা বলা। সেই সমস্ত কলত্রাদি লিঙ্গের কথা বললেও গৌরব দোষ পরিস্কৃত হয় না, পরন্তু গৌরব দোষ থেকে যায়—এই অভিপ্রায়ে পূর্বপক্ষী বলেছেন। পূর্বপক্ষীর এই দোষ পরিহারের জন্ত মহাভাষ্যকার বার্তিকের এবং মহাভাষ্যেরও প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেছেন “যজ্ঞপ্যেতদ্ভ্যতে অথবৈতর্হি করিষ্যতে।” যদিও ধাতু প্রভৃতিস্থিত কলত্রাদি লিঙ্গ বলা হয়, তথাপি শাস্ত্রে ধাতু প্রভৃতিতে অমুবন্ধ, ইংসংজ্ঞা, লোপ প্রভৃতি না করার গৌরব দোষ হয় না। এক একটি অমুবন্ধের শত শত উচ্চারণ করা হয়, আবার অনেক অমুবন্ধ আছে। অতএব অনেক শত শত অমুবন্ধ করতে গেলে তার আবার ইং সংজ্ঞা করতে হবে, তার আবার লোপ করতে হবে। এতে অনেক গৌরব হয়ে যায়। সেই সব অমুবন্ধ, ইংসংজ্ঞা, ইতের লোপ না করার জন্ত গৌরব হবে না। অমুবন্ধ না কবলে “অণ্‌ইক্” প্রভৃতি প্রত্যাহার সংজ্ঞা কি করে করা হবে? তার উত্তরে প্রদীপকার কৈয়ট বলেছেন “আদিরন্তোন সহেতা” এইরূপ প্রত্যাহার সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্র না করে “আদি কলৈঃ সহ” এইরূপ বলব। আর ‘অণ্’ এইরূপ সংজ্ঞা না করে “অইউ” এইরূপ সংজ্ঞা করা হবে। এতে “অইউণ্” এইরূপ সূত্রে ‘ণ্’ রূপ অমুবন্ধ করতে হবে না। অমুবন্ধ জনিত ইং সংজ্ঞা করতে হবে না। এবং ‘লোপ’ ও করতে হবে না। এইরূপ ধাতুতেও অমুবন্ধ না করে, কলাদি বর্ণের গ্রহণের দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন

“অহুদাত্তিত আত্মনেপদম্” এই শব্দের দ্বারা—এখ-ধাতুর অহুদাত্ত শব্দ ইং হইলে এবং শীড়্-ধাতুর ঙ্ ইং হইলে আত্মনেপদ হয়। এখ ধাতুর অকারকে অহুদাত্ত অহুবদ্ধ এবং শীড়্-ধাতুর ঙ্কে অহুবদ্ধ ইং না করে কলঙ্ক দোষযুক্ত রূপে পাঠ করে “কলাদাত্মনে পদম্” এইরূপ শব্দ করলে আত্মনেপদ সিদ্ধ হবে। অথচ অহুবদ্ধ করা, ইং সংজ্ঞা করা ও লোপ করা প্রভৃতি অনেক গৌরব থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়। এইভাবে ধাতুপ্রভৃতি অহুবদ্ধাদি না করে কলঙ্কাদি দোষ যুক্তরূপে পাঠ করলে অনেক গৌরব পরিহৃত হয়। তারপর শাস্ত্রের শেষে বর্ণগত কলঙ্কাদি দোষ নিবৃত্তির জন্য প্রত্যাশক্তি করলে সেই সমস্ত দোষনিবৃত্তি হয়ে যাবে। এতে আর গৌরব হবে না। এইভাবে প্রত্যাশক্তির দ্বারা দুটি কার্য সিদ্ধ হবে—বর্ণগত সংবৃত্তাদিদোষের নিবৃত্তি হবে এবং ধাতুপ্রভৃতির ষটক বর্ণগত কলঙ্কাদি দোষের নিবৃত্তি হবে। মহাভাষ্যকার বলেছেন অহুবন্ধের দ্বারা যে কার্য করা যেত, সেই কার্যই কলঙ্কাদিযুক্ত বর্ণের দ্বারা করা হবে। তাতে অহুবদ্ধাদিকরণ জনিত গৌরব দোষ হবে না। মহাভাষ্যের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে পূর্বপক্ষী বলেছেন “সিধ্যাত্যেবম্, অপাণিনীষং তু ভবতি।” যদিও এভাবে সংবৃত্তাদিদোষের পরিহার হয় অথচ অহুবদ্ধাদির অকরণ জনিত গৌরবদোষেরও পরিহার হয়, তথাপি এই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন পাণিনির মতানুযায়ী নয়। কারণ “অইউণ্” ইত্যাদি বর্ণসমাম্মায়কে সমর্জন করবার জন্য বর্ণগত জ্ঞাতির দ্বারা সকলবর্ণ সংগৃহীত হয়, বলায় সংবৃত্তাদি দোষযুক্ত বর্ণেরও গ্রহণ হয়। সেই দোষ পরিহার করবার জন্য অহুবদ্ধাদি না করে অন্য ভাবে ধাতু প্রভৃতির বর্ণকে কলঙ্কাদিযুক্ত উচ্চারণ করে, শাস্ত্রান্তে প্রত্যাশক্তির দ্বারা সেই দোষ পরিহার করলে ‘বিছার ভয়ে পালিয়ে এসে সাপের মুখে পড়ার মত হয় অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা করার আবশ্যক হয় বলে অনেক কষ্ট কল্পনা করতে হয়। অথচ পাণিনি সরল উপায়েই লোকের শব্দজ্ঞানের জন্য প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুতরাং বার্তিককারের বা মহাভাষ্যকারের এই উপায় পাণিনির রীতি নয়। পূর্বপক্ষী এইরূপ দোষ প্রদান করলে মহাভাষ্যকার বলেছেন “যথাত্মাসমেবাস্ত।” অর্থাৎ “অইউণ্” ইত্যাদি বর্ণসমাম্মায়ে যেমন ভাবে বর্ণের সন্নিবেশ আছে, সেই সন্নিবেশেই অহুদাদি জ্ঞাতির দ্বারা সকলবর্ণের গ্রহণ হোক। এর উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেছেন “নহু চোক্তম্ ...প্রতিবেদ ইতি।” জ্ঞাতির উপদেশের দ্বারা সকল বর্ণের

একটি সিদ্ধ হলে সংস্কৃতাদিরও গ্রহণ হওয়ার তাদের নিষেধ করতে হবে—
এই ঘোষণার কথা আমি পূর্বে বলেছিলাম।

উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“পরিকৃতমেতৎ নিবৃত্তি র্তবিষ্যতীতি।”
গর্গাদি বিদাদি পাঠ থেকে সংস্কৃতাদি বর্ণের নিবৃত্তি হবে—এই উত্তর বলেছি।
পূর্বপক্ষী পুনরায় তাঁর পূর্বউক্তি অরণ করিয়ে দিচ্ছেন—“নহ চান্যদ্.....
সাধুঃ বধা। স্মারিতি” গর্গাদি বিদাদি পাঠের অন্ত প্রয়োজন বলেছিলাম, প্রকৃতি
প্রত্যয় সমুদায়ের সাধুঃ গর্গাদি বিদাদি পাঠের প্রয়োজন—একথা বলেছিলাম।
তার উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন—“এবং তর্হি.....নিবর্ত্যন্তে।” গর্গাদি
ও বিদাদি পাঠের অন্ত প্রয়োজন থাকলেও সংস্কৃতাদি ঘোষণারও নিবৃত্তি হবে।
গর্গাদি প্রকৃতি এবং বধা প্রত্যয় এই সমুদায়ের সাধুঃও যেমন সিদ্ধ হবে, সেই-
রূপ সংস্কৃত্য প্রকৃতি ঘোষণারও নিবৃত্তি হবে। গর্গাদিবিদাদি পাঠের এই উত্তর
প্রয়োজন আছে।

মহাভাষ্যকারের এই কথার পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করেছেন—“কথং পুনরেকেন
প্রবর্ত্তেনোভয়ং লভ্যম্” এককথায় কিরূপে উত্তর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? উত্তরে
মহাভাষ্যকার বলেছেন—“উত্তর প্রয়োজনেন লাভ হয়।” পূর্বপক্ষী পুনরায়
জিজ্ঞাসা করেছেন—“কথং”? এককথায় উত্তর প্রয়োজন কি করে সিদ্ধ হয়,
ব্যাখ্যা করে বুঝাও। ইহাই হচ্ছে পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়। মহাভাষ্যকার উত্তরে
উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন—“দ্বিগতা অপি.....বাত্তেতি।” সৌ [অবর্ণাঃ]
পতাঃ দ্বিগতাঃ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস। অনেক হেতু দুটি করে প্রয়োজন
সম্পাদন করে, অর্থাৎ একটি কর্তৃ প্রত্যয়ে দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যেমন আম-
গাছে জলমোচন করলে আমগাছ-জলি যেমন সিদ্ধ হয়, সেইরূপ সিদ্ধকৃত্যও
তৃপ্ত হন। আবার অনেক কাক্যেরও দুই অর্থ আছে যেমন—বেতো থাকতি।
অলঙ্কারাং বাতা বা ইতো থাকতি—ককুর এলিকে আসছে। যেতো থাকতি—
বেতী [ধবল কুঠারিযোগ্যেত] দৌড়ছে। অলঙ্কারাং বাতা—অলঙ্কারদেহে
গমনকর্তা। অলঙ্কারাং বাতা—যেদের মত কাদের রং তাদের গমন কর্তা
সমর্থ। এই কুট্টান্ত অনুসারে গর্গাদিবিদাদি পাঠেরও উত্তর প্রয়োজন সিদ্ধ
হবে। ইহাই মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায়। মহাভাষ্যকার এইভাবে গর্গাদি
বিদাদি পাঠের প্রায় পূর্বপক্ষীর অসম্বন্ধা দূর করে অভ্যস্তাবে—সংস্কৃতাদিঘোষণার
প্রসক্তি হই এই কথা বলেছেন—অথবা “ইদং ভাব্যং..... নেমে প্রাপ্তাঃ

কলাদয়ঃ।” অতিপ্রায় এই যে—কেবল এক একটি বর্ণের প্রয়োগ লোকে করা হয় না, কিন্তু স্ববৃত্ত ও তিঙত পদের প্রয়োগ করা হয় বা ধাতু, প্রাতিপদিক প্রভৃতির উচ্চারণ করা হয়। শিষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ পানিনি প্রভৃতি আচার্য ব্যক্তিগণ, ধাতু, প্রাতিপদিক প্রভৃতি যেভাবে পাঠ করেছেন—সেখানে তাঁরা শুদ্ধবর্ণবিশিষ্টরূপেই পাঠ করেছেন। সূতরাং সংবৃত্তাদিদোষের এসক্তিই বধন নাই, তখন সংবৃত্তাদিদোষের প্রতিবেদ করতে হবে—পূর্বপক্ষীয় এই আশঙ্কা নিরূল হয়ে যায়। এখানে পূর্বপক্ষী একটি কথা বলেছেন “অগ্রহণানি প্রাতিপদিকানি” এর অর্থ হচ্ছে—‘ডিখ’ ‘ভবিখ’ প্রভৃতি কতকগুলি প্রাতিপদিক আছে—বাক্য ব্যাকরণের সূত্রে গ্রহণ করা হয় নাই অর্থাৎ ব্যাকরণের প্রক্রিয়ায় বাদে উল্লেখ করা হয় নাই। সেই সব প্রাতিপদিকে সংবৃত্তাদিদোষ আছে। ইহাই পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেছিলেন। উত্তরে মহাত্ম্যাকার বলেছেন—এই সকল প্রাতিপদিকেরও উপদেশ করতে হবে। নাগেশ উপদেশের অর্থ করেছেন—“ভ্যাপ্ প্রাতিপদিকাৎ” ইত্যাদি সূত্রে অনুবাদরূপে এই সকল ডিখ, ভবিখ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের গ্রহণ করা হয়েছে সূতরাং সেই সব প্রাতিপদিকেরও অন্তঃস্বর্ণের পাঠ নাই। স্বর ও বর্ণের বধ্যবন্ধ বন্ধিবেশের জ্ঞানের অন্ত এই সকল প্রাতিপদিকেরও গ্রহণ করতে হবে, তাতে সেই সকল প্রাতিপদিকেও সংবৃত্তাদি গণ্য থাকবে না। এইটা বুঝাবার জন্য মহাত্ম্যাকার বলেছেন—“শশঃ” এই শব্দটির অর্থ ধরগোস। সেই ধরগোস অর্থে—যাতে “বযঃ” এইরূপ পাঠ কেহ না করে, তারকন্ত এই প্রকারের প্রাতিপদিকগুলিকেও শুদ্ধভাবে ব্যাকরণ প্রক্রিয়ায় অনুবাদরূপে গ্রহণ করিতে হবে। এইভাবে ‘পলাশঃ’ স্থলে যাতে ‘পলাবঃ’ পাঠ না করে। ‘মককঃ’ স্থলে ‘মককঃ’ পাঠ না করে। এইসব বলে মহাত্ম্যাকার উপসংহারে বলেছেন—আগম, বিকার, ধাতু, প্রত্যয় প্রভৃতি সর্বত্রই শুদ্ধভাবে পাঠিত হয়েছে। সূতরাং সংবৃত্তাদিদোষের প্রাপ্তি নাই। মহাত্ম্যাকারের শেষোক্ত কথা ঘরা বুঝা যাচ্ছে যে—‘সংবৃত্তাদির প্রতিবেদ পক্ষ’ নিরাকৃত হয়েছে অর্থাৎ ‘অইউপ’ ইত্যাদি বর্ণোপদেশের প্রয়োগ নাই। এর উত্তর দিতে গিয়ে বার্তিককার এসকলকে যে সংবৃত্তাদির প্রতিবেদ করতে হবে বলেছিলেন—, সেই প্রতিবেদের কার্য এসময় নাই, ইহাই মহাত্ম্যাকার বলেন। সর্বত্র শুদ্ধবর্ণের পাঠ থাকিলে সংবৃত্তাদির এসময় না থাকায় তাঁর প্রতিবেদের কথাও উঠতে পারে

না। আর মহাভাষ্যকারের এই কথায় বুঝা গেল যে সর্বত্র ধাতু প্রভৃতিতে শুদ্ধবর্ণ উচ্চারিত হয়েছে বলে, কোথায়ও অনিষ্টবর্ণের জ্ঞান হয় না। অতএব “ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ” অর্থাৎ ইষ্টবর্ণের জ্ঞানের জন্য বর্ণের উপদেশ এই তৃতীয় প্রয়োজনটি আর বর্ণোপদেশের প্রয়োজন নয়। সর্বত্রই যখন শুদ্ধ বর্ণের পাঠ আছে, তখন পাঠ থেকেই শুদ্ধবর্ণের জ্ঞান হবে। তারজন্য আর বর্ণোপদেশের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং “বৃত্তিসমবায়ার্থ” এবং “অম্লবন্ধকরণার্থ” এই দুইটিই বর্ণোপদেশের প্রয়োজন—ইহাই মহাভাষ্যকারের শেষোক্তি দ্বারা স্থচিত হয়েছে ॥ ৭৫ ॥

ইতি মহর্ষিপুত্রশ্লোকিত মহাভাষ্যের পশ্চাৎশ্লোকের বিবৃতি ।